শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

উদ্ভাসে ভারত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-[illegible]য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
ন- জ্ঞান . নিরাকার
সম[illegible] আকার-নি[illegible]র সমন্বয়।
আকার-সাকার-নি[illegible]কার সমন্বয়।
জড়-অজড় স. চৈতন্য-
অচৈতন্য -

- [illegible]গোপাল

মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৫, ১৯৬[illegible] [illegible]শাদিকা—শ্রীরে[illegible] দ্বাবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুই-এর সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

সূচীপত্র : মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৫, ১৯৬৯

আমাদের কথা
লাঞ্ছন-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা
কালী-সঙ্গীত
শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ
প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৭৭)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
স্মৃতি-মন্থন
শ্রীমান
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৬৯)
সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি)
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
সাময়িকী
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯-র মধ্যবর্তী নির্বাচন
আজকের প্রার্থনা
বেদানিল
আমার বাড়ি
শ্রীভারতী

বিজ্ঞপ্তি

উজ্জলভারত

উজ্জলভারত পত্রিকার একবিংশ বর্ষ শেষ হইল। মাঘ ১৩৭৫ (১৯৬৯) হইতে ইহার দ্বাবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। সর্বসাধারণের সহযোগিতাই ইহার একমাত্র পাথেয়। আমরা সকলের সঙ্গে নিজেদিগকে যুক্ত করিয়া সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি যাহাতে ভবিষ্যতে সর্বসমন্বয়ের—বিপরীতের সমন্বয়ের—সামগ্রিক জীবনবাদ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারি।

কার্য্যাধ্যক্ষ, উজ্জলভারত

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ কর্তৃক

১৯৪২-এ আগষ্ট আন্দোলনে জেলে থাকাকালীন লিখিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

অবধূত-ভাষ্য

মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে জড় ও চেতনের যে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার সহিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সামগ্রিক জীবন-চেতনার দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে, তাহা বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিশোধনে বিপ্লবী দর্শন। যে-কেহ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কথিত এই বিপ্লবী চিন্তাধারার অনুরাগী, তাঁহাকেই এই গীতা-ছাপানোর কাজে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য দান করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে।

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

1. Place of publication	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
2. Periodicity of its publication	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
3. Printer's name, nationality and address	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
4. Publisher's name, nationality and address	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5. Editor's name, nationality and address	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	Renu Mitra M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, Renu Mitra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 16th February, 1968.

Sd. Renu Mitra,
Signature of the Publisher.

ফাগুন লাগার দিনে

পথ চলতে পায়ের আরাম, চলনের খোলামেলা গতি, ঝিরঝিরে মনোরম স্টাইল বাটার এই সব সান্ডাল বা চপ্পলে নিজেকে আপনি অনেক বেশি পরিপাটি এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন। সুইডস, ফোমের ওপর চামড়া, ভেলভেট মোলায়েম আর মসৃণ চামড়ার সোল — প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য আরাম। স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আকর্ষণটি বেশিক্ষণ। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে সান্ডাল ও চপ্পলের নানাবিধ সুদৃশ্য নকশা।

Bata

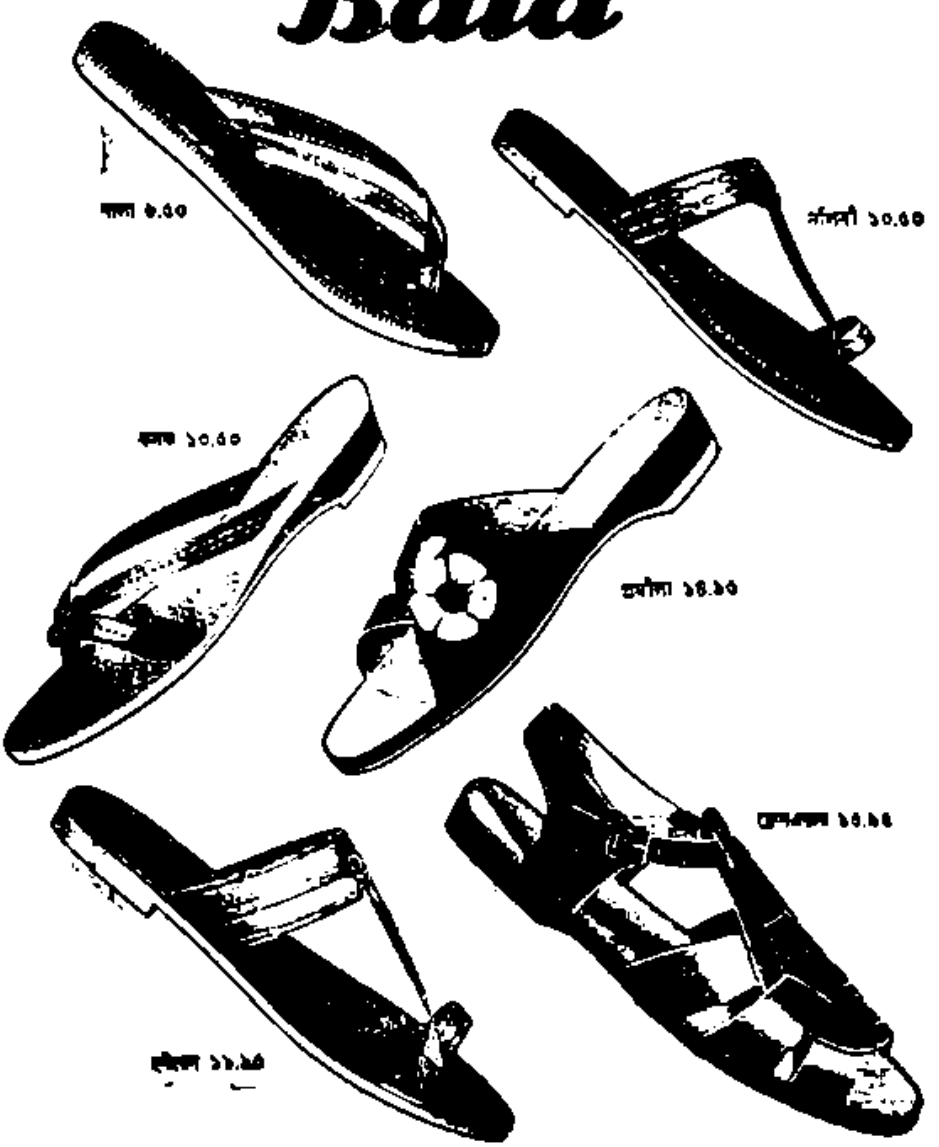

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		বাংলার ঋষি	৩·০০
শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০	বাংলার বিদুষী	২·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·০০	বাংলার মনীষী	১·৩০
কর্মবাণী	১·২৫	জীবন গড়া	০·৭৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০	আচার্য জগদীশ	২·৫০
Soul of India Speaks	৫·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
পকেট গীতা	৩·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ		শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি	
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	বিদ্যাসাগর	২·২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০		

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

উদ্বোধন

মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৯ দ্বাবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

'উদ্বোধন' পত্রিকা তাহার একবিংশ বর্ষ শেষ করিয়া ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে দ্বাবিংশ বর্ষ আরম্ভ করিল। যিনি প্রথম দিন আরম্ভ করিয়াছিলেন তিনি আজ ব্যক্তি-দেহে উপস্থিত নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিতাগোপালের যে-আদর্শকে রূপ দিতে যে-সংকল্পে দৃঢ় হইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, সে-আদর্শ আর সে-সংকল্প অত্যন্ত বাস্তব বলিয়াই ঘরে বাইরের নানা বিপর্যয়, মন-জনের শূন্যতা, অনেক প্রকারের অনেক কর্মের চাপ সব সহ্য করিয়াও উদ্বোধন দীর্ঘ একবিংশ বর্ষ পথ চলিয়া আসিয়াছে। সেই আদর্শ ও সংকল্পের দিকে চাহিয়া ইহাও মনে হয় যে ত্রিবিধতের অজানা অন্ধকারে পা বাড়াইবার শক্তিও তাহার সেই আদর্শ ও সংকল্পের মধ্যেই রহিয়াছে। দ্বাবিংশ বর্ষের এই যাত্রারম্ভ-ক্ষণে সেই আরম্ভ-দিনের পুরুষোত্তমানন্দের পুরুষোত্তম-সংকল্পকে স্মরণ করি, সেই সংকল্পে সংকল্পবান হইয়া সেদিনের আদর্শকে নূতন করিয়া গ্রহণ করি। সে আদর্শ সমগ্রতার, সে আদর্শ রূঢ় বাস্তব ও বাস্তবাতীত আদর্শের সমন্বয়ের। সে আদর্শের প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীনিতাগোপাল যাহার জীবনে পরস্পর-বিপরীতের সমন্বয় বর্তমান সময়ে রূপ লাভ করিয়াছিল। আজ এই দিনে শ্রীশ্রীনিতাগোপালের শ্রীচরণে প্রণত হই তাঁহার জীবন ও আদর্শকে আত্মস্থ করিতে, জীবনকে সুস্থ সমুজ্জ্বল করিতে—ব্যক্তি-জীবন, সমষ্টি-জীবনকে। ব্যক্তি-জীবনকে অধিক মূল্য দিয়া যোগ্যতার উৎকর্ষকে জীবন-যাত্রার মানদণ্ড করিলে শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া কোলীন্যের সৃষ্টি করে; যে কোন শক্তিই—তা ধনেরই হউক বা কুলেরই হউক, বা পাণ্ডিত্যেরই হউক, আত্মারই হউক বা আর যাহারই হউক—কেন্দ্রীভূত হইয়া কোলীন্য লাভ করিলেই তা শোষণের যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীশ্রীনিতাগোপাল এই জন্যই ব্যক্তি-জীবনের উৎকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি-জীবনের সমতা বা সাম্য সাধনার উপর সমান মূল্য দিয়া সামগ্রিক জীবন-চেতনাকে সর্বাঙ্গীণ রূপ দিয়াছেন। এই তত্ত্বেরই ব্যাখ্যানে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলিলেন, 'উৎকর্ষ লাভ কর আদর্শের ক্ষেত্রে, মনের ক্ষেত্রে; যে part play করিতে যে-mission লইয়া এ সংসারে আসিয়াছ, সেইখানে মানুষের সেবা করিয়া তুমি বিশেষ, সেইখানে অপরের সঙ্গে তোমার বৈষম্য—কিন্তু দেহের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ আনিতে হইবে, খাওয়ার পড়ার সব ব্যাপারে commoner হও'। এইভাবে দুইদিক চালাইতে থাকিলে সে জীবনে কোন অবস্থা কোলীন্যের সৃষ্টি করিয়া অপরের শোষণের কারণ হয় না। আজিকার দিনে 'ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অমৃতান' এ কথা সকলের জীবনে আনিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ্যতা অর্জনও জাতির জীবনে অপরিহার্য সত্য যখন তাহা সর্বভূত হিতায়। শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ এই উভয় দিকের সুসমঞ্জস ও পারস্পরিক মানমর্যাদাপূর্ণ একটি জীবন-চেতনা সমগ্র বিশ্বের কাছে উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। উদ্বোধন সেই কথাই বলিয়া আসিয়াছে বলিবে। আজ ইহার দ্বাবিংশবর্ষ যাত্রা-দিনে প্রণত হ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের প্রতি—তিনি যে কাজ যে কথা আরম্ভ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন এই উজ্জীবন-ভারতের মাঝখানে, সে কাজে তিনি শক্তি যোগাইবেন—এই নিশ্চিন্ত নির্ভরতা থাকুক শত বিপর্যয় সত্ত্বেও।

রাজনীতি যে পবিত্র জীবন যাপনের সঙ্গে বিরোধী নয়, রাজনীতি যে সমগ্র জীবনেরই একটা অধ্যায়, এবং ব্যক্তি বা সমষ্টি জীবনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে হইলেও যে রাজনীতিকে অস্পৃশ্য অনাচরণীয় করিয়া রাখা যায় না, একথা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের তত্ত্বে ছিল ইহার বাস্তব রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন সেদিন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা জনসাধারণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেতনা জাগ্রত করার প্রচেষ্টার মধ্যে। আমার স্বার্থের হানিকর অপরকে নস্যাৎ করিবার মনোবৃত্তিই শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মনোবৃত্তি—তাই সংঘর্ষ-মূলক, ধ্বংসমূলক রাজনীতির কথা তাহাদের কচিকর। এই কারণেই গান্ধী-রাজনীতি দুর্বোধ্য যদিও দার্শনিক ভাবে গান্ধী রাজনীতিরও অন্তর্নিহিত ঐক্যের খবর গান্ধীজীর অতবড় সমর্থক শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দই গান্ধীজীর সামনে সেদিনই উপস্থিত করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারা সহজবোধ্য তো নয়ই—প্রাচীন কালে শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিয়া, জিজ্ঞাসিত হইলে শত্রুকে জয়ের পথ বলিয়া দিয়া শত্রুর সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইত। এ পথ আজিকার দিনের মানুষ বুঝিবে, না শুনিবে? আজিকার দিনে সবই গোপন। গান্ধীজী রাজনীতিকে কূটনীতিকতার নোংরামি হইতে উদ্ধার করিয়া সোজাসুজি জন-মানসের মর্যাদাপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সর্বক্ষেত্রের শোষণহীন জীবন-চেতনার রাজনীতিতেও শুদ্ধ পবিত্র চিন্তাধারা ছিল—তাই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিল। আজ নূতন বৎসরের যাত্রাক্ষণে গান্ধীজীকে আমাদের প্রণতি জানাই। তাঁহার দেশ তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই, গ্রহণ তো করেই নাই—তবু তাঁহার অবদান জাতির জীবনে আজিও তাহার অবকাশ রাখে।

সামগ্রিক জীবন-চেতনা সাহিত্যক্ষেত্রে বহুলাংশে সৃষ্টি রূপ পাইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের রচনায়—নূতন যুগের নূতন মূল্যায়ন তাঁহার কাছে যেমন ধরা পড়িয়াছিল, তেমনি চিরন্তন সত্যের সামগ্রিকতাও তাঁহার দৃষ্টি হইতে অপসারিত হইয়া যায় নাই কোনদিন। সামগ্রিক জীবনচেতনার প্রবক্তা হিসাবে তাঁহাকেও জানাই আমাদের প্রণতি—জাতিকে তিনি যে চিন্তাসম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন তাহা বলিষ্ঠ পথরেখাই অঙ্কিত করে।

আজ আবেষ্টন আজন্ম নানা বিপরীত বিরুদ্ধতায়। আদর্শের কমবেশী সুষ্ঠুতা সত্ত্বেও আচরণের দিক দিয়া বিশৃঙ্খলতা কলি-হত জীবকে একেবারেই ছাড়িয়া গিয়াছে। আমরা আচরণের ক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলতাসহ আদর্শে সর্বজীবগত জীবনচেতনা আনিবার প্রচেষ্টায় যত প্রতিহতই হই না কেন সেই কথাই বলিয়া যাইব, সর্বক্ষেত্রে একদেশ-দর্শী চিন্তাধারা পরিহার করিয়া দার্শনিকতাকে সামগ্রিক জীবনদর্শন প্রস্থাপন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাইব। শুদ্ধ চিন্তাধারার খোঁজ পাইলে একদেশদর্শিতার মোহান্ধকার হইতে পার হওয়ার শক্তি, আচরণে শুদ্ধিতা আনিবার শক্তি জীবনে আসিবে—আমরা সেই বিশ্বাস লইয়া চলিব।

যাঁহারা এ কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীশ্রীনিতাই-গোপাল-শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ তাঁহাদের ভিতর রূপে অদৃশ্য শক্তিধারা ঐ কাজ চালাইয়া যাইতেছেন—আমরা তাঁহাদের সহিত একাত্ম হইয়া তাঁহাদের আরব্ধকে আগাইয়া লইতে দৃঢ়বদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধতার পথ চলিব—এই সংকল্পকে নূতন দিনে নূতন করিয়া লইলাম।

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

['লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নরনারায়ণ আশ্রম তথা 'উজ্জয়ন্তভারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারম্ভ ক্ষণে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন সংক্ষেপে ইহার যে অর্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অনুভব—লাঙ্গল যাহার দ্যোতক—এই সমন্বয়ধর্মী তত্ত্ব-প্রকাশক এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। ভবিষ্যৎ ভারত তথা ভবিষ্যৎ বিশ্ব একই সঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'আমি বিশ্বনাগরিক' এই দুই-ই আস্বাদন করিবে। —সঃ—উঃ তাঃ।]

বিশ্বসঙ্ঘ-রচনার শুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাম'-চক্র ও চক্রী-'পুরুষের' সমন্বয় করিয়া দিবা একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চলে বাহিরে মনুষ্যরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথা স্থানে ও যথা মানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের ধ্বংসঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রহ্মধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-স্থাপন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে যমুনা-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজমূর্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্যোন্মুখ রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি-ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম্ রূপ লইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপজনাবৃত। কৃষি-ক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিয়াও তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা **'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'**।

উজ্জয়ন্তভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে।

"পুরুষোত্তম-বিশ্ব পচা গলা এই জগতের বাহিরে নয়; সেই বিশ্ব এই বিশ্বেরই পুরুষোত্তম-অগ্নিতে রূপান্তর-হওয়া পুরুষোত্তম-রূপ। পুরুষতন্ত্র-স্তরকে পুরুষোত্তম-স্তরের কাছে সমর্পণ করিলেই এই স্তরের সব বন্ধন খুলিয়া যায়, এই স্তরের সব কিছু মুক্তির অগ্নিতে জারিত হইয়া এই স্তরেরই বুক চিরিয়া (বুঝায়) ভাগবত রূপে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়, যেমন হংসীমাতার বুকের তাপ পাইয়া ডিম হইতে ছানা বাহির হয়।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

কালী-সঙ্গীত

॥ শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ ॥

নাম-সাদৃশ্যে সহজেই বোঝা যায়, কালী-সঙ্গীত শ্যামা-সঙ্গীতেরই নামান্তর এবং লৌকিক রূপ। রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীত যেমন সহজ সরল আন্তরিকতার গুণে লোক-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, আমাদের আলোচ্য কালী-সংগীতও যশোহর খুলনার গ্রামাঞ্চলে তেমনি ব্যাপক ও সমান জনপ্রিয়। বিশেষতঃ খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলে কালী-সংগীতের জনপ্রিয়তার কথা আমাদের অজানা নয়। এই প্রসঙ্গে খুলনা জেলার নিরক্ষর মহিলা সাধক কবি কবে'ল কামিনীর নাম বাংলার লোক-সংগীত আলোচনা-কারী মাত্রেরই কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। কবে'ল কামিনীর পর তাঁর স্বামী তারাচাঁদ ও অন্যান্য গায়ক বৃন্দ এই কালী-সংগীত প্রচারে ও তার প্রসারে যথা-সাধ্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। (কবে'ল কামিনী ও তারাচাঁদের বিষয়ে বর্তমান লেখকের পৃথক প্রবন্ধ কৌতূহলী পাঠকের কাজে লাগবে আশাকরি। দ্রষ্টব্যঃ রম্যরীণা, ১৩৬৭ চৈত্র।) যাই হোক রামপ্রসাদী গানের মত আলোচ্য কালী-সংগীত তথা শ্যামা-সংগীত বাংলার নিজস্ব সম্পদ।

কালী-সংগীতের বিষয়ে পরিচিতিমূলক একটু ভূমিকা প্রয়োজন। খুব সংক্ষেপে, যেটুকু না বললে নয় তাই এখানে বলা গেল। বাকীটুকু সংগীতরস উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সহজেই বুঝে নিতে পারবেন বলেই বিশ্বাস করি আন্তরিকভাবে।

নাম-সাদৃশ্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, কালী-সংগীত তথা শ্যামা-সংগীতের মূল নিহিত আছে শাক্ত পদাবলী তথা শাক্ত সাহিত্যের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতিকাগুলিকে বাংলা শাক্ত সাহিত্যের আদিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকেও শাক্ত সাহিত্যরূপে গ্রহণ করতে বাধা নেই। মনসার ভাসান বহুকাল অবধি প্রচলিত ছিলো। তবে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর বিপ্রদাসের "মনসা বিজয়ই" প্রাচীনতম সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলে জানা গেছে। বালিকাখণ্ডগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের রচনা। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া গেল শাক্ত সাহিত্যের এমন একটি রূপ যা একমাত্র বাংলাদেশেই পাওয়া গেল—ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নয়। অর্থাৎ, সংস্কৃত সাহিত্যে চণ্ডীর যে উগ্রমূর্তির বর্ণনা আছে, বাংলার শাক্ত কাব্যে তার সাদৃশ্য বড়ো একটা পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষার নমনীয়তা, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের রীতিধর্মিতা এই উভয়ের মিলনে দেবী চণ্ডীর ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্তিও যেন একটা কোমলভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে দেখা গেল শাক্ত পদাবলী। এই পদাবলীও একান্তভাবে বাংলা দেশেরই নিজস্ব সম্পদ। দেবীকে উপলক্ষ্য ও উপজীব্য করে এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে হরগৌরীকে নিয়ে কিছু কিছু লোক-সংগীত ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও পাওয়া যায়; কিন্তু ভারতের অন্য প্রদেশের সংগীত বা পদাবলীর তুলনায় বাংলার শাক্তপদাবলী এক ভিন্ন জাতের ও বিচিত্র স্বাদের জিনিষ এককথায় তা অনেক উঁচুদরের ভক্তিভাবসমন্বিত।

প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরসই শাক্তপদাবলীর মূল উৎস। এই ভক্তিরস বাৎসল্যরসে পরিণত হয়ে কখনও কন্যা-রূপে, কখনও মাতারূপে দেবীকে আরাধনা করবার প্রেরণা দিয়েছে ভক্তের মনে। সন্তান-স্নেহ বা মাতৃ-পরায়ণতার মধ্যে যে একটি স্নিগ্ধ ও অনির্বাচনীয় ভাব

আছে, তাই শাক্ত পদাবলী সাহিত্যকে প্রাণরসে উজ্জীবিত করেছে। অখণ্ডসাধনা স্নেহরস নিষেকে অতিরিক্ত হয়ে মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। এই হলো শাক্ত পদাবলীর সাহিত্যিক সিদ্ধির মূল কথা। নিগূঢ় তত্ত্বকে কঠিন ও দুর্বোধ্য করে' প্রচারের পরিবর্তে নিতান্ত সরল ভাষায় ও সহজভাবে হৃদয়ের স্বতঃউচ্ছ্বসিত ভাবগুলি ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে, স্বতঃউচ্ছ্বসিত ভাবগুলি সহজেই আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে আসে তখন আমাদের অন্তরও স্পন্দিত হয়ে ওঠে সাধকের মতো সাধনার আনন্দে। আমাদের আলোচ্য কালী-সংগীত প্রসঙ্গেও এই কথার সমর্থন মিলবে। শাক্ত পদাবলী তথা শাক্ত সাহিত্যের সার কথাগুলি বর্তমানে আলোচ্য কালী সংগীতেও অনুপস্থিত নয়।

দুই

বর্তমান গীতগুলির কথায় ফিরে আসা যাক। কালী-সংগীত প্রায়ই কালী, কালীপদ, কালীপ্রসন্ন, কালীদাস, কালীদাসী প্রভৃতি ভনিতায় রচিত হয়। এখানেও দেখা যাচ্ছে, গীতগুলির শেষে কালী ও কালীপদ ভনিতা রয়েছে। যথা: কালী বলে শুন মন, কালীপদ এই বলে, কালী কালী বলে কালী, কালী কহে এই সত্য, কালী কহে এই নীতি, কালী কহে দয়া তার, কালী গানে হয়ে প্রসন্ন, কালী বলে এই যুক্তি, কালী বলে ছোড় কর, কালীপদ কহে যথা, কালী করে নিবেদন, কালী কহে এই নাথ, কালীপদ এই তো ভণে, কালী বলে এই সার, কালী বলে প্রসন্ন মনে, ইত্যাদি।

কালী-সংগীত সাধারণত প্রেম ভক্তি ও পরমার্থভাব নিয়ে রচিত হয়। গীতগুলির মূল সুর, প্রেম, যথা: প্রেমরত্ন মহারত্ন, যে নাহি সাধন করে। এ রত্ন না করে হয়, কেমনে পাইবে তাঁরে।—প্রেমের সঙ্গে ভক্তি ও পরমার্থভাবও অঙ্গেয় বন্ধনে জড়িত। ভক্ত জানেন, এ ভবসাগরে সংসার যন্ত্রণা ঘোরতর। বুদ্ধিবলে এ যন্ত্রণার মুক্তি নেই, আছে ভক্তিতে। তাই ভক্ত বলেন—সাধন ভজন রীতি নীতি জানি নে, তোমার শরণ নিলাম—তুমি দয়া করো, ভব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও। শেষ পর্যন্ত ভক্তের চরম উপলব্ধি হয়: এসেছো একাকী যে মন, কাকে বলবে আপন। মায়ার কুহকে পড়ে, বৃথা করো আকিঞ্চন ॥—এ কথা ভারতীয় দর্শনের সার কথা। পল্লী কবির ভাষায় এ কথা কতো সহজে উচ্চারিত হয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আর এ কথার আবেদন শ্রোতার মনে কত গভীরে গিয়ে পৌঁছয় তা' সংবেদনশীল শ্রোতা ও পাঠকমাত্রেই আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

শাক্ত-সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, শ্যামা-সংগীত সাধারণত বাৎসল্য ও ভক্তিরস, তথা সন্তানভাবে ও মাতৃভাবে রচিত। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত কালী-সংগীতগুলির অধিকাংশই কান্তাভাবে রচিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে সঙ্কলিত গীতগুলি থেকে এখানে উক্ত কান্তাভাবপূর্ণ অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল —

১। প্রেমেতে না হয়ে মত্ত, যে করে নাথেরই তত্ত্ব,
খোঁজে যদি স্বর্গ মর্ত্য, তবু কি সে পায় তাঁরে ॥—
(গীত ১)

পিরীতি বিষম জ্বালা, পিরীতি বিষম জ্বালা।
যে মজেছে সেই জানে, এর যতো লীলা খেলা ॥—
(গীত ২)

৩। প্রাণতোমারে ভালোবাসে, প্রাণে বাঁচি না।
দরশন দিয়ে নাথ, ঘুচাও মম যাতনা ॥— (গীত ৩)
বলিতে না পারি নাথ, কতো ভালোবাসি তোমায়।
দরশন বিনা তব, মম দেহ প্রাণ যায় ॥— (গীত ৪)

৫। কতো ভালোবাসি হে প্রাণ, বলিতে যে পারি নে।
দেখা দিয়ে রাখোরে প্রাণ, বাঁচি নে হে বাঁচিনে ॥
(গীত ৫)

৬। এত কষ্ট যাতনাতে, আছি তবু এক চিতে,
তবু না পাইলাম নাথে, অপেক্ষাতে প্রাণ গেল ॥—
(গীত ৬)

ওহে প্রাণকান্ত আমি, দেখা দে রে দেখা দে রে।
বিরহানলে মন জ্বলে, বাঁচিনা রে বাঁচিনা রে ॥ (গীত ৭)

৮। একান্ত হে প্রাণকান্ত, পড়েছি মায়ারই ফাঁদে।
দিবা নিশি প্রাণসখা, তব লাগি প্রাণ কাঁদে ॥
(গীত ৮

হর মম দুঃখরাশি, প্রাণনাথ দয়া করে।
রীতিনীতি জানে না প্রাণ, তুমি তোমারে কি
প্রকারে।—(গীত ১২)

১৩। ওহে প্রাণকান্ত তব, অন্য কেহ নাহি জানে।
কল্পিত যোষণা লোকে, করে তব নানা স্থানে।
(গীত ১৩)

১৪। প্রাণকান্ত নাহি জ্ঞাত, পাবো প্রাণ কতো কালে।
তোমায় ছেড়ে প্রাণনাথে, পড়েছি ভ্রমেরই জালে॥
(গীত ১৪)

১৫। বিরীতি না মানে জাতি, কুলমান মানে না।
যার সঙ্গে যার পড়ে মন, তাঁরি করি উপাসনা
(গীত ১৫)

১৬। তোমার প্রণয় রসে, মজিয়াছে প্রাণ মন।
দিবানিশি প্রাণ কাঁদে, করি নাথ আকিঞ্চন॥
(গীত ১৬)

গীতগুলির মূলকথাই হলো প্রেম। কবি বলছেন: প্রেমেতে না হয়ে মত্ত, যে করে নাথেরই তত্ত্ব, খোঁজে যদি স্বর্গ মর্ত্য, তবু কি সে পায় তাঁরে। —এই প্রেম যে লৌকিক নয়, বরং তা সাধন পথের ঈপ্সিত পারমার্থিক-ভাবে মণ্ডিত, তা বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না। তাই, কবি তাঁর আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে বলেছেন: তোমার প্রণয়রসে, মজিয়াছে প্রাণমন; দিবানিশি প্রাণ কাঁদে, করি নাথ আকিঞ্চন॥—ভারতীয় দর্শনে ও সাহিত্যে এই ভাব দুর্লভ নয়—দেবতাকে প্রিয় রূপে এবং প্রিয়কে দেবতারূপে কল্পনা করা—ভারতীয় কবি ও সাহিত্যিকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কারণ, সনাতন ভারতবর্ষ অধ্যাত্মসাধনা ও পরমার্থভাবের পীঠস্থান। এখানে মানুষের মাঝে দেবতা বারবার একাকার হয়ে গেছেন, এবং এইভাবে যুগে যুগে মনুষ্যত্বের, তথা অতেতনজ্ঞানের জয় ঘোষিত হয়েছে।

এখানে আলোচ্য গীতগুলি থেকে বাছাই করে, প্রেম ভক্তি ও পরমার্থভাবের কয়েকটি গীত উদ্ধৃত করা গেল, বর্তমান প্রবন্ধের সমর্থনে। (প্রেম ১, ভক্তি ১, পরমার্থ ১—মোট তিনটি।)—

প্রেম ১

প্রেমরত্ন মহারত্ন, যে নারি সাধন করে।
এ রত্নে না করে যত্ন, কেমনে পাইবে তাঁরে॥
প্রেমেতে না হয়ে মত্ত, যে করে নাথেরই তত্ত্ব,
খোঁজে যদি স্বর্গ মর্ত্য, তবু কি সে পায় তাঁরে॥
কালী বলে শুন মন, সুরসিক যেই জন,
প্রেম নীরে ডুবে সে জন, সুখে দরশন করে॥

ভক্তি ২

হর মম দুঃখরাশি, প্রাণনাথ দয়া করে।
রীতিনীতি জানি না প্রাণ, তুমি তোমারে কি
প্রকারে॥
শরণ করি জোড় হাত, বাঞ্ছা পূর্ণ করো নাথ,
কে বোঝে তোমারই মত, নিজগুণে বলো রে॥
ব্যতিব্যস্ত হলে পরে, দরশন কে পেতে পারে,
নয়ন তুলে সে দেখে যারে, তরে সে ভবসাগরে॥

পরমার্থ ৩

এসেছো একাকী রে মন, কারে বলরে আপন।
মায়ার কুহকে পড়ে, বৃথা করো আকিঞ্চন॥
এলে একা যাবে একা, ললাটেরই এই লেখা,
কেন না হইবে সখা, সময়ে করো রে স্মরণ॥
মন্ত্র হবে সার্থা সনে, পড়ে ঘোর মায়া বাঁধনে,
ত্রিলোক না ভাবিলে মনে, পুন কবে হবে মিলন॥
কালী বলে এই সত্য, সকলই দেখ অনিত্য,
চিন্তা করো পরমার্থ, ছেদন হবে ভব বন্ধন॥

ভাষা ও রচনা সূত্রে বলা যায়, আলোচ্য গীতগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। গীতগুলিতে লিরিকধর্মী কবিতার সুরও লক্ষণীয়। রচনায় সহজ স্বচ্ছন্দ গতি—গীতগুলির অপর বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতপ্রধান বাংলা ভাষা ও শব্দ প্রয়োগে কবির দক্ষতা প্রশংসনীয়।

তিন

গীত-সংকলন॥ এখানে প্রেম ভক্তি ও পরমার্থভাব সমন্বিত ২০টি গীত প্রকাশ করা গেল। মোট গীতগুলি দু'জন গায়কের নিকট থেকে সংগৃহীত: প্রেমভাব সমন্বিত ১—৭ সংখ্যক গীত একজনের কাছে, এবং ভক্তি

ও পরমার্থভাবসমন্বিত ৮—২০ সংখ্যক গীত অপরজনের কাছে পাওয়া গেছে। সংগৃহীত গীতগুলি আগে প্রেম ও পরে পরমার্থ—পর পর এই দুইভাগে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। গীতগুলিতে আর কোনরকম সংস্কার করা হয়নি।

ক প্রেম ১

প্রেমরত্ন মহারত্ন, যে নাহি সাধন করে।

...ইত্যাদি পূর্বে দ্রষ্টব্য

২

পিরীতি বিষম জ্বালা, পিরীতি বিষম জ্বালা।
যে মজেছে সেই জানে, এর যতো লীলাখেলা॥
যে মজে যাঁহারই তরে, অবশ্য সে তাঁরে পাবে,
স্বর্গ নরক দুই তবে, চিনে লও এই বেলা॥
যে ডুবেছে প্রেম-সাগরে, সে সকল বলিতে পারে,
বিচ্ছেদ আর মিলনেতে, কত সুখ কত জ্বালা॥
প্রেম কি গাছের ফল, পাড়িবে করিয়া বল,
দেহ প্রাণ করিলে নাশ, মেলে সে চিকন কালা॥
কালীপদ এই বলে, স্বর্গ মর্ত্য ভূমণ্ডলে,
চলিতেছে কালে কালে, সকলই তাঁর লীলা খেলা।

৩

প্রাণ তোমারে ভালোবেসে, প্রাণে বাঁচিনা।
দরশন দিয়ে নাথ, ঘুচাও মম যাতনা॥
তুমি বিনা প্রাণেশ্বর, ত্রিজগৎ অন্ধকার,
নাশ মম হৃদয় তিমির, করে প্রিয় করুণা॥
রূপেরই গরিমা তব, তিন লোকে করে স্তব,
না পাই দেখা কেন তব, বলো নাথ বলো না॥
কালী কালী বলে কালী, প্রসন্ন হইলে কালী,
দরশন হবে কালী, যাবে দুঃখ যাতনা॥

৪

বলিতে না পারি নাথ, কতো ভালোবাসি তোমায়।
দরশন বিনা তব, মম দেহ প্রাণ যায়॥
রজনী ও দিনমানে, দহে প্রাণ মনাগুণে।
দীন হীন এ অধীনে, নয়ন তুলে না দেখ হায়॥
হর মম দুঃখরাশি, অশেষ প্রকারে তুমি,
দরশনে অবিনাশী, রক্ষা করো ত্রিকাল যায়॥

৫

কতো ভালোবাসি যে প্রাণ, বলিতে যে পারি নে।
দেখা দিয়ে রাখো যে প্রাণ, বাঁচি নে যে বাঁচি নে॥
রূপের গরিমা তব, ত্রিসংসারে করে স্তব,
না পাই দেখা কেন তব, দীন হীনে বলনা॥
কতো কাল ভিন্ন করে, রাখিবে এ অধীনারে,
তব রূপ নাহি হেরে পাব কতো যাতনা॥
কালী কহে এই নীতি, অদৃষ্টে যা আছে স্থিতি,
ফিরাইতে সেই গতি, বিধি বিষ্ণু পারে না॥

৬

বিরহ অনল আসি, যখন যেহে ঘর করিল,
লোম চর্ম অস্থি যত, সকলই পুড়িয়া গেল॥
এত কষ্ট যাতনাতে, আছি তবু এক চিত্তে,
তবু না পাইলাম নাথে, অপেক্ষাতে প্রাণ গেল॥
সময় হইল গত, তবু না আইল নাথ,
বুঝি প্রাণ হয় হত, জানাই কাহারে বলো॥
আমার এ দুঃখ যতো, কারে করি অবগত,
নাহি হেরি মনোমত, কে দয়া করিবে বলো॥
কালী কালী বলে কালী, সহায় হইলে কালী,
নাথেরে পাইবে কালি, ঘুচিবে বিরহানল॥

৭

ওহে প্রাণকান্ত আসি, দেখা দে রে, দেখা দে রে।
বিরহানলে মন জ্বলে, বাঁচিনা যে বাঁচিনা রে॥
তব দরশন বিনা, ঘোচেনা দুখ যাতনা,
পুরাও নাথ মম বাসনা, ডাকি তোমায় বারে বারে॥
প্রাণ সখা ছেড়ে তোমায়, পড়ে মহা ঘোর দায়,
না হেরি অন্য উপায়, যদি দয়া না করো রে॥
কালী কহে দয়া তাঁর, জগতে আছে বিস্তার,
সময়ে হবে উদ্ধার, অসময়ে না হয় রে॥

খ পরমার্থ ৮

আশ্চর্য্য হইলাম দেখে, পৃথিবীর আচরণে।
নিজ মন্দিরে আছো নাথ, কেহ নাহি তাঁরে চিনে॥

কেহ যায় গয়া কাশী, কেহ দেবালয়ে বসি,
জপে মালা দিবানিশি, কেহ যায় গঙ্গা স্নানে ॥
কেহ বা মক্কায় যায়, কেহ যা মসজিদে ধায়,
ঊর্দ্ধমুখে কেহ চায়, ঘনঘরে বাখানে ॥
কালী গানে হয়ে প্রণত, কহে ঠিক ধন্য ধন্য,
ত্রিকুটী যেই জ্ঞানশূন্য, সে জানিবে কেমনে ॥

(৯)

একান্ত হে প্রাণকান্ত, পড়েছি মায়ারই ফাঁদে।
দিবা নিশি প্রাণ সখা, তব লাগি প্রাণ কাঁদে ॥
পড়ে মহামায়া ফাঁদে, যতো নড়ি ততো কসে,
না দেখি উপায় শেষে, ডাকি নাথ কেঁদে কেঁদে ॥
না হলে তোমারই দয়া কাটে কি এ মহামায়া,
নয়ন যায় নিক্ষেপিয়া, কাটো এ মায়ারই ফাঁদে ॥
কালী বলে এই যুক্তি, বিনা ত্রিকুটীর ভক্তি,
কেমনে হইবে মুক্তি, বিষম মায়ারই ফাঁদে ॥

(১০)

বলিতে কে পারে নাথ, তোমারই মহিমা যত।
বিন্দু গায়ে সিন্ধু গুণ, নিতান্ত এ অসঙ্গত ॥
অসীম মহিমা হেরে, দেবাসুর সুর নরে,
বাক্য নাহি মুখে সরে জ্ঞান বুদ্ধি হয় হত ॥
বিন্দু বৃথা আশা করে, প্রণমিত স্রষ্টাকরে,
হেন সাধ্য কোথা তারে, কর গুণ বিস্তারিত ॥
এ আশা করিতে পারে, পুন করে সিন্ধুনীরে,
মিলিতে পারিব আমি, এ আশা তার সুদূরত ॥
কালী বলে এই নীতি, তাঁর প্রেমে যার মতি,
সে মম হৃদয়ে স্থিতি, নিশিদিন বিরাজিত ॥

(১১)

তোমারই মহিমা নাথ, তুমি ভালো জানো নিজে।
অন্যে জ্ঞাত নাহি সখা, এ তিন লোকেরই মাঝে ॥
তুমি আদি অন্ত তুমি, বৃথা আমি বলি আমি।
আমি মিথ্যা তুমি নিত্য, এ তিন জগৎ মাঝে ॥
ভ্রমে পড়ে তিন লোকে, আমি আমি বলে ডাকে,
ভ্রমেতে রেখেছে ঢেকে, কি করিবে কালে কালে ॥
কাটে যার ভ্রম-জাল, তার কাছে কি আসে কাল,
এলে কাল হয় কাল, জ্যোতির্ময় মহাতেজে ॥

অনিত্য ছিল নিত্য হয়ে, তিন লোক সে ত্যজিয়ে,
অমৃত গোলোকে গিয়ে, মহানন্দে সে বিরাজে ॥
কালী বলে জোড় কর, ওহে সখা প্রাণেশ্বর,
তোমা বিনা অন্ধকার, এ তিন সংসার মাঝে ॥

(১২)

হর মম দুঃখরাশি, প্রাণনাথ যদি কৃপা করে,
...ইত্যাদি পূর্বে দ্রষ্টব্য

(১৩)

ওহে প্রাণকান্ত তব, অন্ত কেহ নাহি জানে।
কল্পিত ঘোষণা লোকে, করে তব নানাস্থানে ॥
কটাক্ষে ত্রিলোক পতি, ত্রিজগৎ করিয়া স্থিতি,
সৃজিলে হে নানাজাতি, দেখ এই ত্রিভুবনে ॥
নানা বর্ণে দিয়ে জন্ম, রচিলে অশেষ ধর্ম,
কে জানে তোমারই মর্ম, কত খেলা খেলরে মনে ॥
যে যাহার ধর্ম মতে, পূজে তোমায় নানা মতে,
এ জগৎ সংসারেতে, আপনাপন ভালো জেনে ॥
যে তোমায় যেরূপে ভজে, তাহে তুষ্ট তুমি নিজে,
মিছে এ সংসার মাঝে, দোষাদোষী অকারণে ॥
কালীপদ কহে যথা, এ নহে নূতন কথা,
জগতেরই এই প্রথা, চারি যুগে সবে জানে ॥

(১৪)

অনিত্য অহঙ্কারে মত্ত, পরমার্থ নিন্দ না।
যোগীন্দ্র ঋষীন্দ্র ইন্দ্র, যে পদ করে সাধনা ॥
এ দেহ অনেক ওরে মন, পদ্মপত্রের বারি যেমন,
নিমেষে হবে পতন, জেনেও কি তা জানো না ॥
বি অক্ষর মন্ত্র বলি, হৃদয়েতে দিয়া তুলী।
চিত্র আঁকো লয়ে কালী, হবে না এ দুখ খণ্ডনা ॥
অকারের আকারেতে, ত্রিভুবন সৃষ্টি তাতে।
অন্ত এলো কোথা হতে, তিলেক তা ভাবিলেনা ॥
বিকার ছাড়িলে পর দেখা কেহ নাহি পর,
একা সেই আদিশ্বর, তখন হবে এ ধারণা ॥
শত্রু মিত্র নাই এখানে, ভ্রমেতে ভবো গণনা ॥
একতা হইলে ভবে, ভব খেলা ফুরাইবে,
সর্ব দুঃখ নাশিবে, না রহিবে ভাবনা ॥

কালী করে নিবেদন, ওঁকারে যার নাহি জ্ঞান,
তুষ্ট নহে তার মন, শুনে মম মন্ত্রণা ॥

(১৫)

প্রাণকান্ত নাহি জ্ঞাত, পাবো প্রাণ কবে কালে।
তোমারে ছেড়ে প্রাণনাথ পড়েছি ভ্রমেরই জালে ॥
কতো জন্ম জন্মান্তরে, খুঁজে দেশ দেশান্তরে,
তব রূপ নাহি হেরে, পড়েছি মহা গণ্ডগোলে ॥
বিষম প্রেমেরই হাটে, নানা তীর্থ জাহ্নবী তটে,
মন্দির মসজিদ মঠে, ঘুরি নাথ পাবো বলে ॥
যারে তারে পথে ঘাটে, জিজ্ঞাসি বাজার হাটে,
কান্ত বিনা বুক ফাটে, দয়া করে দাও গো বলে ॥
শুনে বলে : পাগল এটা, হয়েছে বাতিকের ছিটা,
এর সঙ্গেতে বকে কেটা, বলে : পাবি আগে গেলে ॥
কেহ বলে পাবি তাঁরে, পরকাল বিচার পরে,
বাক্য শুনে জ্ঞান হরে, ভাসি আমি নয়ন জলে ॥
তাই ভাবিলাম মনে, জিজ্ঞাসিলে অন্য জনে,
নিজে যেই নাহি জানে, উপদেশ দিবে কি বলে ॥
কালী কহে ওহে নাথ, তুমি না দেখালে পথ,
অন্যে নাহি এ সামর্থ্য, পায় তোমায় কোন কালে ॥

(১৬)

নয়নেরে দোষো মিছে, তাঁরে দোষা অকারণে।
ভালো বাসাবাসি কোথা, মনের মিলন বিনে ॥
দেখে আঁখি কত শত, সবে কি হয় মনোমতো।
মনে না হয় মনোনীত, ভালোবাসে সেই জনে ॥
ক্ষণেক না হেরে তাঁকে, পলকে প্রলয় দেখে।
বলে এ সংসারে থেকে, কি ফল এ জীবনে ॥
মন যারে মনে করে, অন্যে কি তার মনে ধরে।
যতো দেখে এ সংসারে, কিছু নাহি লাগে মনে ॥
পবিত্র প্রেমিক যে জন, হেরিলে সে ত্রিভুবন।
টলে কি তাঁহারই মন, সে রূপ যার গাঁথা মনে ॥
কালীপদ এই তো জগে, হেরে আঁখি ত্রিভুবনে।
ভুলাতে কি পারে মনে, মনে মনে যোগ বিনে ॥

(১৭)

পিরীতি না মানে জাতি, কুলমান মানে না।
যার সঙ্গে যার পড়ে মন, তাঁরি করে উপাসনা ॥
নীচ কিংবা উচ্চ বর্ণ, সংসারে প্রভেদ মাত্র,
প্রেমে নহে ভিন্ন ভিন্ন, এক ধাতুর রচনা ॥
যার সঙ্গেতে মন মনে, জাতি কুল কেবা খোঁজে।
মিছে এ সংসার মাঝে, দোমারোপের ঘোষণা ॥
জাতি কুল প্রেমেরই হাটে, দেখা নাহি এক চেটে।
প্রেমিক সুজন লোটে, প্রেমহীনে জানে না ॥
কালী বলে এই সত্য, যে জানে না প্রেম-তত্ত্ব,
করিবে সে আপত্ত, বিশ্বাস তার হবে না ॥

(১৮)

যতনে রতন মেলে, কিছু নহে ধন বিনা।
হিংসা দ্বেষ না ত্যজিলে, পূর্ণ হয় না কামনা ॥
এক চিত্তে ব্রত না হলে, দীনে দয়া না করিলে,
ধিক্কার না ত্যাগ করিলে, নন্দকিশোর মেলে না।
সাধিলে যতন করে হেরিবে হর বরাকরে।
বন্ধু বিনা নাহি সংসারে, নিজে হবে এ ধারণা ॥
কালী বলে এই সার, দরশন যে পায় তাঁর।
নয়নে না দেখে পর, ভিন্ন ভাব সে জানে না ॥

(১৯)

তোমার প্রণয় বলে, মজিয়াছে প্রাণ মন।
দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে, তবি নাথ আকিঞ্চন ॥
আশা করে আছি নাথ, পূর্ণ করো মনোরথ,
আশায় আশে হেরি পথ, ঝরে মন দুনয়ন ॥
আমার এ কর্ম দোষে, তুমি না হেরিলে এসে,
মিছে কি হইবে ভুষে, অদৃষ্টের এ লিখন ॥
পূর্ব জন্ম কর্ম ফলে, তুমি নাহি দেখা দিলে।
জানি না হে কতো কালে, পাবো তব দরশন ॥
কালী বলে প্রণয় মনে, ওহে নাথ সময় বিনে,
কেবা পায় ত্রিভুবনে, তরো ধন আকিঞ্চন ॥

(২০)

রাখো মম প্রতি দয়া, দয়ার সাগর তুমি।
খাঁচা-বদ্ধ পাখির মতো, মায়াজালে বদ্ধ আমি ॥
কপাল দোষে এ যাতনা, বাঁচে না প্রাণ দয়া বিনা।
বুদ্ধিবলে কাটিবে না, নিশ্চয় জেনেছি আমি ॥

কালী বলে ওহে নাথ, দয়া বিনা কে পায় পথ।
দগ্ধ হয় মনোরথ, দয়া না করিলে তুমি ॥

(২১)

এসেছ একাকী যে মন, কারে বলবে আপন।
...ইত্যাদি পূর্বে দ্রষ্টব্য।

চার

সংকলিত গীতগুলিতে কবির সাধকভাব সুপ্রকাশিত। সাধন পথের পরিভাষা এবং প্রতীক শব্দ ও বাক্যাংশ সমন্বিত গীতগুলি রীতিমতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যথা: পিরীতি বিষম জ্বালা, সকলই তাঁর লীলা খেলা, নাশ মন হৃদয় তিমির, অদৃষ্টে যা আছে স্থিতি, সহায় হইলে কালী নাথেরে পাইবে কালি, দয়া তাঁর জগতে আছে বিস্তার, নিজ মন্দিরে আছো নাথ কেহ নাহি তাঁরে চিনে, পড়েছি মায়ারই ফাঁদে, বিনা ত্রিকুটীর ভক্তি কেমনে হইবে মুক্তি, বিন্দু গায়ে সিন্ধু গুণ, পুন কবে সিন্ধু নীরে মিশিতে পারিব আমি, তুমি আদি অন্ত তুমি, আমি মিথ্যা তুমি নিত্য, কে বোঝে তোমারই মত, মিছে এ সংসার মাঝে দোষাদোষী অকারণে, এ দেহ কণেক ওরে মন পদ্মপত্রের বারি যেমন, শত্রু মিত্র অভেদ জ্ঞানে ভালোবাসো দুই জনে, ওকারে যাব নাহি মন তুই নহে তার মন, তোমায় ছেড়ে প্রাণনাথ পড়েছি ভ্রমেরই জালে, মন্দির মসজিদ মঠে খুঁজি নাথ পাবো বলে, ভালোবাসাবাসি কোথা মনের মিলন বিনে, এ সংসারে থেকে কি করল এ জীবনে, যার সঙ্গেতে মন মজে জাতি কুল কেবা খোঁজে, যতনে রতন মেলে বিন্দু নহে ধন বিনা, পূর্ব জন্ম কর্মফলে তুমি নাহি দেখা দিলে, খাঁচা-বদ্ধ পাখীর মতো মায়াজালে বদ্ধ আমি, কপাল দোষে এ যাতনা বাঁচে না প্রাণ দয়া বিনা, মায়ার কুহকে পড়ে বৃথা করো আত্মধন, এলে একা যাবে একা ললাটেরই এই লেখা, সকলই দেখ অনিত্য, চিন্তা করো পরমার্থ কেমন হবে ভব বন্ধন,...ইত্যাদি।

পরিশেষে একথা বলা বোধ হয় অসংগত হবে না যে, সহজ সরল ভাব ভাষা ও মনোরম প্রকাশভঙ্গি সমন্বিত যশোহর-খুলনার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত শ্যামা-সংগীতের লৌকিক রূপ এই কালী-সংগীতগুলিতে শক্তি-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

"সমস্ত কর্মের মূল রহিয়াছে প্রকৃতি-পুরুষের, অনাত্মা-আত্মার মিলনের মধ্যে। এই মিলন তখনই নিরবদ্য, এবং এই নিরবদ্য নির্মল মিলনের ফলে কর্মও হয় তখনই কর্ম-অকর্মের সমন্বয়ে দিব্যকর্ম, যখন প্রকৃতি নিজের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কেবলা মূর্তিতে কেবল পুরুষের সমকক্ষ, প্রকৃতি-পুরুষ যখন নিজেদের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান ও অনন্ত অব্যবধান রাখিয়াই নিত্যযোগযুক্ত।...পর'পরবিরুদ্ধ অর্থের সামঞ্জস্য পুরষতন্ত্র স্তরে হয় না; সামঞ্জস্য হয় পুরুষোত্তম-স্তরে। পুরুষোত্তম-স্তরে কর্মে অকর্মে রহিয়াছে অনন্ত ব্যবধান, অথচ তাহারা পরস্পরের আত্মীয় পরমাত্মা।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—
(৭৭)

মিশ্রির টুকরা বাইরে থেকে নিয়ে নিজের দেহ বড় করে,… জীব খাদ্যকে আত্মসাৎ করে বড় হয়—জড়ে কোন chemical combination হয় না।…বাইরের জিনিষকে 'হজম' করে বড় হওয়াই প্রথমানবপু, growing from within …টাকায়, গায়ের জোরে…বাইরের বস্তু দিয়ে বড় হওয়াটা জড়ের বড় হওয়া… ; হজম-শক্তি নষ্ট হলে ভাতও হজম হয় না।…যে জগৎকে বাইরের করে রাখে, নিজের থেকে পৃথক করে রাখে, জগৎ তাকে ডুবায়…শ্রীকৃষ্ণ দীপ্তাগ্নির ঘন বিগ্রহ। উপনিষৎ অগ্নি পূজা করার কথা বলেছেন—হজম শক্তি বাড়ে—দেহের মনের হজম শক্তি বাড়াতে হবে। ব্রজলীলা হজম করার ছবি, মথুরা যাবকার প্রারম্ভও হজম হয়ে গিয়েছিল। ঋষিরা light diet-এর কথা বলেছেন…এমন জনসমাজে থাকতে নিষেধ করেছেন …। কৃষ্ণ জীবের ভালো দুঃখ আনলেন, complex life-এর মধ্যে high thinking আনলেন। ঋষিদের simple life-a high thinking ছিল।…কৃষ্ণ বললেন, বিশ্বকে পরিপাক করতে হবে। বর্তমান যুগ অত্যন্ত complex, তাই কৃষ্ণই বর্তমান যুগ-দেবতা। বিশ্বের গতি লক্ষ্য কর—ক্লাশ VII-এর বইতে জড় আর জীবের পার্থক্যের কথা রয়েছে অর্থাৎ সকলকেই আজ একটা ব্যাপকতর ক্ষেত্রের মধ্যে এনে ফেলেছে।…বিশ্বটা আজ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে—আলজিয়ার্সের যুদ্ধ আর সুয়েজ ক্যানেলের ঝগড়া আমাদেরকেও আজ বুঝতে হবে।…প্রতিক্রিয়ার আজ ঘরের জীবন নাই, বাইরের জীবনই কেবল বাড়ছে—এই সামঞ্জস্যহীনতায় কোন শান্তি পাওয়া যাবে না—growth from within অপরিহার্য।…বায়ুর ভিতর অক্সিজেন নাইট্রোজেন কার্বনডায়োক্সাইড ইত্যাদি। অক্সিজেন active গ্যাস, নাইট্রোজেন বাধা দেয়—inactive গ্যাস—নিস্তানোর দিকেই তার দৃষ্টি…। চিৎই যদি একান্ত হতো, এক মুহূর্তে সংসার জলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত… অচিৎ রয়েছে বলেই চিরকাল ধরে নিজতে নিজতে প্রকৃতি জন্মতে থাকবে। অচিৎ শিছটান দিচ্ছে বলেই চিৎ চিরকাল আছে।..অন্নকে আপন করতে হবে, স্ত্রীকে আপন করতে হবে…যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ বিজানত তত্র কঃ শোকঃ কঃ মোহঃ একত্বমনুপশ্যতঃ…। হজম হলে স্ত্রীপুত্র সংসার চালাবার শক্তি দেয়, জীবন পথে এগিয়ে দেয়। স্ত্রী পুত্র ধনঃ টাকাকড়ি ঘরবাড়ী হজম করে নিতে হবে।…অচিতের মাঝে চিৎ—চিতের মাঝে অচিৎ। অচিৎ না থাকলে চিৎ থাকে না, চিৎ না থাকলে অচিৎ থাকে না…। ব্রহ্ম পরিপূর্ণ হন যখন তিনি মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ান…। ঐতরেয় উপনিষৎ বলছেন অন্য সব দেহ থেকে মানুষ-দেহ দেখে দেবতারা তৃপ্ত, বললেন সুকৃতম্…। নিত্যগোপালে এই দর্শন বিশ্বের মধ্যে প্রচার করে রেখে গেছেন—তাঁকে বুকে রেখে এই দর্শন নিয়ে একলা চলেছি।..এই পথেই ধরার ধূলি হবে ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম-মানুষ।…

১৪, ২, ৫৭। আজ 'জ্ঞান-বিজ্ঞানে' 'জ্যামিতি ও ইউক্লিড' বলে একটী প্রবন্ধ বেরিয়েছে।…ইউক্লিডের জ্যামিতি আজ আর চলছে না—রাইমেন ইউক্লিডকে স্বীকার করেন নি—ইউক্লিডের postulates রাইমেন স্বীকার করেন না…দুটো সমান্তরাল রেখা কোনদিন মিলবে না—অসীমেও মিলবে না।…আজকের বৈজ্ঞানিক বলছে, তা তো হয় না—সসীমে বসে অসীমের কথা মেলে না…প্রত্যক্ষ তো সসীমের ক্ষেত্র—এরা বলে সসীমেই মেলে না। একটা বিন্দুর ভিতর দিয়া একটা

শুধু parallel চলে না—ইউক্লিড...একটা বিন্দুর ভিতর দিয়া বহু সমান্তরাল রেখা হতে পারে···। এই জিনিষটা জীবনে প্রয়োগ করা যায়···। বিশ্ব-নাগরিকত্বের মধ্যে প্রত্যেক মানুষ অপরের গায়ে গা না লাগিয়ে অনন্ত পথ যেতে পারে—বিশ্ব-নাগরিক জীবন যাপন করলে ক্ষেত্র বিরাট হয়, পথ খুলে যায়···যে-কোন পথ দিয়ে তখন যে-কোন জায়গায় যাওয়া যায়। অহংকারীর পক্ষে পথ বন্ধ হয়ে যায়—কোন এক পথে ছাড়া সে যেতে পারে না...। বিশ্ব-নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে কারো গায়ে গা না লাগিয়ে অনন্ত পথ চলা যেতে পারে...। রেণু প্রতিভা মীনু গোপা যে কেউ নিজের পথে চলে অনন্তের পথে চলে যেতে পারে···। এমন একটা বিরাটের ছবি আমার চোখে আছে যেখানে যেতে চাইলে আমি নিয়ে যেতে পারি, যেখানে কারো সঙ্গে ঠোকাঠুকি না করে বহু বা সর্বের মধ্যে বাস করা চলে।...শিবানী বিড়ালীর বাচ্চা হয়েছে—বিড়ালের বাচ্চা থেকেও মানব-শিশু বেশী অসহায়..। মানুষ এত অসহায় তবু তার অহংকারের সীমা নাই...। অসহায়ের সহায় ভগবান—কিন্তু অহংকারীর গতি নাই—তার সহায় কেউ নয়—মানুষও নয়, ভগবানও নয়···। একটা বিন্দুর মধ্য দিয়া বহু সমান্তরাল রেখা টানা যেতে পারে—নিরহঙ্কারীর জীবনে বহু ভাবেই করুণা নেমে আসে···অবন্ধঃ অর্পণস্য মুখম্—অর্পণ যে করতে পেরেছে, তার জীবনের মুখের বন্ধ-বাঁধ-খুলে যায়—তরতর করে তার জীবনে করুণা প্রবেশ করতে পারে।···প্রত্যেক পথ সমান্তরাল···মানুষের সাথে গলাগলি হয়ে সমান্তরাল পথে অনন্তকাল চল।···বিজ্ঞানে এসে গেছে বিশ্বের এই ছবি। নিত্যগোপাল-প্রসাদে এই তত্ত্ব পেয়েছি।···মানুষকে ডাকি এই বিশ্ব-জীবন যাপন করবার তত্ত্ব নিতে—আমার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন নেই···। তুমায়কে লিখেছিলাম, কোন 'কিন্তু' নিয়ে এসো না।... অনুগত থাকলে যেমন সুখ হয়, কর্মশক্তি সহস্রগুণ বাড়বে···। এত বুদ্ধির কথা বলেও অর্জুনকে বললেন, শরণাগত হও, তোমার মন আমায় দেও···। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব বলতে না পারলে···সংসারে সকলে টানাটানি করে নিয়ে যাবে···। এ বিশ্ব এমন বস্তু যেখানে কেউ পথ হারায় না···। শরণাগতি ও একটা জীবন-জিজ্ঞাসা থাকলে ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে নিয়ে যায়—শরণাগত হলে অসাধ্যও সাধ্য হয়···যন্ত্র নাহংকৃত ভাবঃ বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে—যাহার অহংকৃত ভাব নাই এবং বুদ্ধি যাহার আসক্তি বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে যায় না—সে অসাধ্য সাধন করতে পারে···। নিজের বুদ্ধি নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না—জীবনে প্রথমে গ্রহণ কর। গ্রহণ না করে প্রথম থেকেই প্রচারের দিকে যেয়ো না। জীবনে জীবন দিয়ে কিছু যদি গ্রহণ করতে চাও, বিনয়ী হও, শ্রদ্ধাবান হও।···গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য না মিলে এক···। আকাশে বাতাসে জলের মাছের কাছে বাণী রয়েছে—নেয় কে?···অহংকারী মানুষ সুযোগ লাখি মেরে ফেলে দিচ্ছে···তবু তিনি পরম দয়াল...। তাঁকে দয়াল বলে যে বুঝল সে-ই বলতে পারল, 'অধম অকৃতি বলে কম করে কিছু দাওনি'···। এই বিশ্বে তাঁর অবতরণকে সার্থক কর···। নিত্যগোপাল, তুমি পথ, তুমি পথ...। তোমার পথে আমি পথ খুঁজে নেব···নিত্যগোপাল, আমি শরণাগত···এই ঝড়ের মাঝে আমি শরণাগত—আর আমি পথ হারাব না···নিত্যগোপাল, আমার ধ্রুবতারা···। সূর্য নিজলে চন্দ্র আলো দেয়, চাঁদ নিজলে তারা, তারা নিজলে মাটির আগুন, আগুন নিভে গেলে শুকবাক্য···। নিত্যগোপালের সেই বাণী 'ভয় কি, টেনে তুলব'—সেই বাণীই আমাকে পথ দেখিয়েছে, পথ দেখাবে···আমার সম্পদ ঐ বেদমন্ত্র তোমাদেরও পথ দেখাবে···তোমাদেরও তা বেদমন্ত্র হোক।...হাবড়া দক্ষিণেশ্বর পুরী যেখানেই থাক নিত্যগোপালই তোমার জীবন-দেবতা হোন—তাঁকে কেন্দ্র করে নিজের জীবনকে গুছিয়ে তোল।···নিত্যগোপাল, ওগো আমার সখী, আমি তো কিছু তোমার সেবা করতে পারলাম না... আমার জীবন তোমারই দান—আমাকে তোমার সেবা করবার সুযোগ দেও।···

১৮, ২, ৫৭। জীবন-যন্ত্র self-repairing—নিজের মেরামত নিজে করে। জীবনের মধ্যে এমন একটা

ক্ষমতা আছে, কোথাও ভেঙে গেলে জোড়া লাগে, মাংস খেতলে গেলে ভাল হয়—মনে তা হয় না···। এইখানেই মানুষের অসহায়···কোনদিনই ভাল হওয়ার পথ তার বন্ধ হয়ে যায় না···। পাপ থেকে জীবন বড় ·· ত্রুটিও সারে...সারাবার ইচ্ছা থাকলে। মানুষেরও কিছু করার আছে—ভাল হওয়ার ত্রুটি সারাবার ইচ্ছা থাকলে ত্রুটি সারে···। আশীর্বাদ জীবনে আছে, তাকে প্রয়োগ করতে পারলে ত্রুটি সারত···। যতই পাপী হোক, যতই ত্রুটি থাকুক, জীবন থাকলে ঘাবড়াবার কিছু নাই···। পরিপাক করবার শক্তি বাড়ে প্রার্থনার ভক্তিতে।... বাইরের প্রায়শ্চিত্তে কি হবে?···প্রেমই প্রায়শ্চিত্ত; ভালবাসাই শুধু জীবনকে বদলাতে পারে ··। তোমার ভিতরেও প্রেম আছে তাকে জাগ্রত কর, ফুটিয়ে তোল···। তোমার দিক থেকেও এ জন্য একটা চেষ্টা করতে হবে...। প্রত্যেকেরই ভগবানের সঙ্গে নাড়ীর যোগ রয়েছে···সেই নাড়ীর যোগ রক্ষা করলে শক্তি বাড়ে...। তোমার মান অভিমানের তোয়াক্কা সংসার রাখে না···। দেখতে পাও না চূর্ণ হয়ে গেছে ভগ্নিভগ্নের দম্ভ! এ সংসারে তোমার দম্ভ চালাতে পারবে না···বিনীত হও, সমস্ত কিছুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও।···ভগবানের সঙ্গে নাড়ীর যোগ, সেটা রক্ষা কর। ভেতর থেকে বড় হও...। বাইরে তো কিছু করে না—তুমি বাইরেটাকে কিভাবে নিলে, তোমার কি প্রতিক্রিয়া হল—তার উপর নির্ভর করবে তোমার অগ্রগতি···। একজন মন্দ বললে তার উপর অভিমান করলে, রাগ করলে লাভ নেই···। শিশু আছাড় খেলে মাটিকে মারলে কি হবে?.. নিজেকে জিজ্ঞেস কর, কেন বাহির আমাকে খোঁচায়? কেন আঘাত আসে?···অন্তরের যোগ বাড়িয়ে তোল...। আমার বাইরে অনেক সময় শাসন থাকে, অন্তরের যোগ যায় না...সেই যোগ বাড়িয়ে তোল···প্রথমানবপু হও।...ভগবানের সুস্থ দেহের বিদ্যুতের স্পর্শ নিয়ে তোমার ভিতরের বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে তোল···বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে একলা চলবে।···তাঁকে যদি ছুঁয়ে থাকতে পারি···তবে তাঁর স্পর্শে নিজের ভাঙা স্থান সারিয়ে নেওয়া যাবেই...। সুস্থ মানুষ হলে আঘাত পেলে খুঁজে দেখে, আর অসুস্থ মানুষ আঘাত পেলেই রাগ করে, তিক্ত হয়···। নিত্যগোপালের রূপ যোগ্যতা রোজ পাঠ হয়, তাঁকে ধ্যান করে তাঁর সুস্থতা নিজের মধ্যে আন···

ক্রমশঃ

স্মৃতি-মঞ্জুষা

॥ শ্রীমান ॥

অধ্যাপক সাগর চৌধুরী পাঠানকোট এক্সপ্রেসের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামড়ায় বসে আকাশ পাতাল চিন্তা করছেন। সারাদিন বেনারসে তাঁর অসুখের খাটুনি গিয়েছে। মধুর মেয়েটিকে তার দাদুদিদিমার সাথে রওনা করে দিয়েছেন কলকাতার দিকে। সাথে গিয়েছে সতী। অপূর্ব সম্ভাবনাযুক্ত মধু কত বড় অভিমান নিয়ে যে এ সংসার হতে চলে গেল তা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি নিজে ও সতী, যে মধুর ব্যথা আপন জীবন দিয়ে বুঝতে পেরেছিল। মধুর মেয়েটির ভবিষ্যৎ জীবন কোন্ ধারা নেবে, সে সত্যিই সামাজিক মর্য্যাদা পাবে কিনা এই চিন্তা তাঁকে অভিভূত করে তুলেছিল। যাক যা হয় হবে. তিনি আর কি-ই বা করতে পারেন। সাথে গিয়েছে সতী। সে-ই বা কি ভূমিকা নেবে কে জানে। স্বামীর সাথে মিলন হবে কিনা, তাই হচ্ছে সমস্যা।

মহুর মেয়ে সতীর জীবনে একটি মহা বিস্ময়। একে হজম করে নিয়ে তার জীবনে স্বামীর সাথে মিলন ঘটবে কি না কে জানে।

অধ্যাপক চৌধুরী আর চিন্তা করতে পারেন না। গত দুটি মাস তাঁর জীবনে বড় রকমের একটা ধসল গিয়েছে। নিজের সংসারে নেই বলতে কেউ নেই, অথচ যেখানেই যাচ্ছেন সর্বত্র জড়িয়ে পড়ছেন। শর্বরী তাঁকে ছেড়ে গিয়েছে। কোথায় আছে শর্বরী, কলকাতায় সে ফিরে গিয়েছে কিনা তা তিনি জানেন না। হয়ত শর্বরী নূতন জীবন শুরু করেছে। ঠাকুর তার সর্ব রকমের মঙ্গল করেন, এই ঠাকুরের কাছে তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা।

গাড়ী চলেছে পাঠানকোটের দিকে, যাবে ফয়জাবাদ লুপ হয়ে লখনৌ। তারপর মোরাদাবাদের পথে লক্সর। সেখান থেকে অমৃতসরের পথে। অধ্যাপক কোথায় যাবেন স্থির করেননি। সতীদের টিকিট কিনবার সময় নিজের জন্য একখানা টিকিট তিনি কিনেছিলেন, টিকিট ছিল বেরিলীর। ভেবেছিলেন যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে বেরিলীতে দুদিন থেকে আলমোড়া, রাণীক্ষেত হয়ে পুনরায় পাড়ি দেবেন অমৃতসরের দিকে। আর বেরিলীতে নামতে ইচ্ছে না করলে টিকিটের মেয়াদ বাড়িয়ে চলে যাবেন অমৃতসর, কিন্তু লক্সর নেমে দেরাদুনের দিকে বা হরিদ্বারের দিকে কিছুতেই যাবেন না। কি জানি শর্বরীরা যদি ওদিকেই কোথাও থাকে, মুখোমুখী না হওয়াই ভাল। যে তাঁকে ভুল বুঝে চলে যেতে পারে, তার সাথে দেখা হয়ে লাভই বা কি।

উঃ, জ্বরটা যেন চেপে আসছে। তিনদিন থেকেই শরীরটা অধ্যাপকের ভাল যাচ্ছিল না। মাঝে জ্বর হয়েছে, শরীরও ব্যথা। কিন্তু কোনও দিক থেকে খেয়াল করবার তাঁর সময় ছিল না। মহুর শিশুকন্যা তাঁর সমস্ত হৃদয়টা জুড়ে বসেছিল, তার সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়েছিলেন। শরীরের সামান্য বেদনার কথা তিনি মনের কোণেও আনতে পারেননি। কিন্তু আজ রাতে তারা গিয়েছে কলকাতার পথে। তাঁরও কাজ ফুরিয়েছে কিন্তু চিন্তার হাত থেকে তো রেহাই [illegible] তবু দেহ আজ বিদ্রোহ করে উঠছে।

রাত ভোর প্রায় হয়ে এল। আকবরপুর ছাড়িয়েছে। ঘণ্টা দুই একের মধ্যেই ট্রেনখানা গিয়ে লক্ষ্ণৌ পৌঁছাবে। কিন্তু দেহকে আর তিনি সচিয়ে রাখতে পারছেন না। মাথে জায়গা ছিল। তিনি শুয়ে পড়লেন, ঘুমিয়েও পড়লেন অচিরে।

• • •

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশন। যাত্রীদের ওঠানামা আর প্ল্যাটফরমের গণ্ডগোলে অধ্যাপক চৌধুরীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি মাথা তুলতে পারছিলেন না। মাথার অসহ্য যন্ত্রণা, আর জ্বরও রয়েছে খুব। এক কাপ চা পেলে বেশ হত। কিন্তু উঠে বসতে তিনি পারছেন না। কিন্তু এরকমভাবে শুয়ে থাকলেও তাঁর চলবে না। যেতে হবে অনেকটা দূর। চা খেয়ে শরীরটা চাঙা করলে তবে ত তিনি যেতে পারবেন।

অধ্যাপক জোর করেই উঠে বসলেন, জানালার কাছেই দাঁড়িয়েছিল নিমুমধ্যবিত্ত। এক পট চা শুধু তিনি চাইলেন। অন্য কিছু খাবার ইচ্ছা তাঁর করছিল না।

চা এল। তিনি চা কাপে ঢেলে খেতে শুরু করলেন। উল্টো দিকের বার্থে বসেও এক ভদ্রলোক চা ও খাবার খাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক বাঙালী, খুবই চেনা বলে অধ্যাপকের মনে হচ্ছিল। কিন্তু তিনি ঠাহর করতে পারছিলেন না, তিনি কে।

হঠাৎ ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন আপনি প্রফেসার চৌধুরী নন?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে ত আমি চিনতে পারছি না, বললেন অধ্যাপক চৌধুরী।

—ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, দশ বৎসর দেখা নেই, তবু চিনতে না পারবার ত কথা নয়।

—এবার চিনেছি, আপনি সতীশবাবু। খুব আনন্দিত হচ্ছি আপনাকে দেখে, আপনি অনীতার দাদু ত?

—হ্যাঁ, তাই।

—কেমন আছে অনীতা? অনেকদিন তার সাথে দেখা নেই। সেই কেরাজিনিতে অনীতা আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তখনই আপনার সাথে শেষ দেখা।

—উঃ, আশ্চর্য, এত কথা আপনার মনে আছে?

—আছে বই কি, সব কথাই আমার মনে আছে।

—তবু আমাকে চিনতে পারছিলেন না, তাই না?

—আমায় আর লজ্জা দেবেন না। শরীরটা কদিন খুব অসুস্থ বোধ করছি কাল রাত থেকেই বিশেষ করে। এখন জ্বরও রয়েছে বেশি, মাথা ধরাও প্রচণ্ড। তাই ঠিক চিনতে পারিনি। ক্ষমা করবেন।

—না না ছি ছি, এতে ক্ষমা চাইবার কি আছে। আপনি অসুস্থ, চা খেয়ে শুয়ে পড়ুন, বিশ্রাম নিন, পরে কথা হবে।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক চৌধুরীর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তিনি খিদমদ্গারকে চায়ের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন—

—সতীনবাবু, কিছু মনে করবেন না, আমি শুয়েই পড়লুম, শুয়ে শুয়েই কথা বলছি। প্রথম কথা, কোথায় চলেছেন, বলুন।

—যাচ্ছি আপাততঃ বেরিলী পর্যন্ত, তারপর বেরিলীকে কেন্দ্র করে এদিক ওদিক যাব ভাবছি।

—খুব ভাল কথা সতীনবাবু, আমারও তাই প্রোগ্রাম। আপনাকে সাথী পেলে খুব ভাল লাগবে। একলা পথ চলায় আনন্দ নেই।

সতীনবাবু চুপ করে থাকেন, উত্তর দেন না। অধ্যাপক চৌধুরীর প্রস্তাবটা সতীনবাবুর মনঃপুত হয়নি তা অধ্যাপক বুঝতে পারেন। কিন্তু কেন? অধ্যাপক চৌধুরী আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ঘুম আসছে, চোখ আর খুলে রাখতে পারছেন না। বললেন,

—সতীনবাবু, আমার শরীরটা খুব খারাপ বোধ হচ্ছে, আমি ঘুমিয়ে পড়ছি, বেরিলী এলে আমাকে ডাকবেন। হয়ত ভাল করে হাঁটতে পারব না, একটু সাহায্য করবেন। রিক্সায় তুলে ইম্পিরিয়েল হোটেলে যেতে বলে দেবেন রিক্সাওয়ালাকে।

অধ্যাপক চৌধুরী ঘুমিয়ে পড়লেন।

(২)

সতীন্দ্রবাবু গাড়ীতে বসে ভাবছিলেন তাঁর সঙ্গে অনীতার আসন্ন মিলনের কথা। বাইশ বৎসর হয়ে গেছে তাদের পরিচয়। শুধু পরিচয় নয়, গভীর ভালবাসায় গিয়ে তা দানা বেঁধে উঠেছিল। সতীন্দ্র বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়ায় ব্যাপারেও এমন একটা কিছু মন্দ নন, এম, এ, পাশ করেছেন, চাকুরী করতে যান নি, শুরু করেছিলেন ছোট খাট ব্যবসায়। তাঁর সাহিত্যের উদ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তবু সতীন্দ্র অনীতার বাবা-মার মন তোলাতে পারে নি। অনীতাদের অভিজাত বনেদী জমিদার পরিবার। সুন্দরী অনীতার মা চেয়েছিলেন তেমনি বড় ঘরের ছেলে তার জামাই হোক। তাই অনীতাকে তিনি সতীন্দ্রের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে মধুপুরে রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অনীতাকে তিনি বন্দী করেই রেখেছিলেন। অনীতা ভালবাসত সতীন্দ্রকে, সে সহসা সতীন্দ্রকে ভুলতে পারে নি। বন্দিনী অনীতা একদিন ঝিকে ঘুষ দিয়ে সতীন্দ্রকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে চিঠি সতীন্দ্রের কাছে পৌঁছায়নি। অনীতার মা-ই একদিন সেই চিঠিখানা অনীতাকে এনে ফেরত দিয়ে বলেছিলেন যে, এমনি করে অনীতার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে, অতএব সে যেন ওপথে আর অগ্রসর না হয়।

তারপর সতীন্দ্রের জীবনে এল দুঃখের দিন। অনীতার বিয়ে হল এক বর্ধিষ্ণু জমিদার বাড়ীতে। জমিদারের জ্যেষ্ঠপুত্র রামেশ্বরের সাথে অনীতার বিয়ে হয়ে গেল। সতীন্দ্র খবর পেয়েছিল অন্যের মারফত, কিন্তু অনীতার কাছে সে তার দাবীর কথা পৌঁছাতে পারেনি। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে সে। আজীবন, সেই শৈশবকাল থেকে সে যাকে হৃদয়ের ভাণ্ডার উজার করে ভালবেসে এসেছে, সে পর হয়ে গেল, কোন কিছুই তার করবার রইল না। এ ক্ষোভ সে কেমন করে হজম করে নেবে।

সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সারা ভারতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার ব্যবসা বানিজ্য সব পাটে উঠল। কিন্তু তবু সে মন স্থির করতে পারেনি। ভাবে কেন এমন হয়? ভগবানের কি দয়ামায়া বলে কিছু নেই? অকৃত্রিম ভালবাসার কি কোন মূল্যই নেই। না, নেই, ভগবানের কাছে নেই, নেই তার ভালবাসার জনের কাছে। অনীতা ত কি, এ পাশ করেছে, যথেষ্ট বয়স হয়েছে, বাবা মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে ত অনায়াসে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু সে দাঁড়ায়নি। হয়ত সে সত্যেন্দ্রকে ভালবাসে না। আর ভালবাসলেও সে হয়ত নূতনকে আরও বেশি ভালবেসেছে। মান সম্মান যশ এসব ফেলে দেবার জিনিস নয়। সত্যেন্দ্র স্থির করলে সে আর সংসারে ফিরে যাবে না, এমনি করেই সে ঘুরে বেড়াবে। আবার ভাবে, সে কেনই বা তার জীবনকে এমনি করে নষ্ট করবে। উভয়ের উদ্দেশ্য যখন এক থাকে, তখন ত্যাগের মধ্যে পরিতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু এ ত্যাগের মূল্যই বা কি? ত্যাগের মূল্য থাক আর না থাক, তবু তার আর গতানুগতিক জীবনকে ভাল লাগেনা। তাই সে সারা ভারতে ঘুরে বেড়িয়েই চলে।

একদিন কিন্তু অকস্মাৎ সত্যেন্দ্রের সাথে অনীতার দেখা হয়ে যায়। অদ্ভুত পরিস্থিতি। কাসিয়াং রেল ষ্টেশনের রিফ্রেসমেণ্ট রুমে তাদের দেখা। অনীতা ও তার স্বামী চলেছে দার্জিলিং-এ, সত্যেন্দ্রও তাই। কলকাতা থেকে পথে তাদের দেখা হয়নি। হল গিয়ে কাসিয়াং ষ্টেশনের খাবার ঘরে। সত্যেন্দ্র প্রথমে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু অনীতাই তাকে ডেকে নিয়েছিল, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল স্বামীর সাথে।

অনীতার স্বামী রামরেণু বসু। জাঁদরেল জমিদার, জাঁদরেল ব্যারিষ্টারও বটে। শ্রীযুক্ত বসু সত্যেনবাবুর পরিচয় পেয়ে খুশী হলেন। স্ত্রীর পুরাতন বন্ধু, তিনি সত্যেনবাবুকে সাদরে নিমন্ত্রণ করলেন দার্জিলিংএর বাড়িতে। অনীতাও অনুরোধে যোগ দিল স্বামীর সাথে।

প্রস্তাবে সত্যেন্দ্র ইতঃস্ততঃ করেছিল। কিন্তু অনীতারই জয় হল। টেনে নিয়ে গেল দার্জিলিং নিজের বাড়ীতে।

সত্যেন্দ্র অনীতাকে গভীর ভাবে ভালবেসেছিল, কিন্তু লোক সে খারাপ নয়। সে অনীতার ঘর ভাঙতে চায়নি। সে সাবধানেই ছিল। সে যথাসম্ভব অনীতাকে এড়িয়ে চলত। সকলে একত্র হয়ে যা কিছু আমোদ আহ্লাদ কথাবার্তা, অনীতার সাথে এককভাবে সে দেখা করতে চায়নি। কিন্তু অনীতার প্রবল ইচ্ছার কাছে তাকে হার মানতে হল। রামরেণুবাবুর অগোচরে দুজনের দেখাশুনা, কথাবার্তা চলতে লাগল। সত্যেন্দ্র ভাবল এ পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাবে, যাকে সে ভালবেসেছে, তাকে কর্দমের মধ্যে নামিয়ে এনে লাভ কি?

কিন্তু অনীতা সত্যেন্দ্রকে বুঝিয়েছে বিপরীত কথা। বলেছে, বরাবরই সত্যেন্দ্রকে সে ভালবেসেছে, এখনও বাসে, তার মনের উপর স্বামীর কোন অধিকার নেই। যে সমাজ তাদের মিলনে বাধা দিয়েছে, সেই সমাজকে এড়িয়ে যদি তারা জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে পারে, তাহলে ক্ষতিই বা কি? সমাজে তাজন চলছে, সমাজের কাঠামো ঠিক রেখে তার অন্তরালে কত কিই না চলছে! অতএব তাদেরই বা সেরকম ভাবে চলতে আপত্তি কি। সত্যেন্দ্রের মন তাতে প্রথমে সাড়া দেয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে অনীতার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে।

এমনি হয়। ভালমন্দের টানাপোড়েনে একদিকের জয় হয়। জয় হয় বিশেষ করে মন্দের। কিন্তু মন্দ বলে তাকে কেউ স্বীকার করে না। নানা অজুহাত সৃষ্টি করে তাকে ভালর পর্যায়ে নিয়ে ফেলে।

রামরেণুবাবু প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি জাঁদরেল ব্যারিষ্টার। তাঁর দাপটে হাইকোর্টের বিচারপতি পর্যন্ত হকচকিয়ে যান, আর তিনি তাঁর পুচকে স্ত্রী ও সত্যেন্দ্রের খেলা বুঝতে পারবেন না? তিনি সবই বুঝলেন, কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না। শুধু রাত্রিতে মদের মাত্রাটি বাড়িয়ে দিলেন। চললেন তিনি সর্বনাশের পথে এগিয়ে। স্বামী স্ত্রীর মনের গ্রন্থি যা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছিল, তা আবার ক্রমশঃ আলগা হয়ে এল।

তারপর কিছুদিন কেটে গেল। বেশ কিছুদিন। বছর পাঁচেক হবে হয়ত। রামরেণুবাবু নেশায় ডুবে থাকেন। স্ত্রীর সাথে কোন সম্বন্ধ নেই। দুইজনে একবাড়ীতে থাকেন বটে, কিন্তু দুজনের পথ আলাদা। রামরেণুবাবু দিনে যাবতীয় কর্মে নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু রাতে তিনি আলাদা মানুষ, সারারাত নেশায় তরপুর হয়ে কাটিয়ে দেন।

অনীতার পথ ভিন্ন। সে সারাদিন বাইরে কাটায় সতীন্দ্রের সাথে। সেও আর এক নেশা।

এ নেশারও একদিন পরিসমাপ্তি ঘটল। অনীতা জানাল, এ জীবন তার ভাল লাগছে না, এভাবে সারা জীবন চলবে না। তার চাই কর্ম-জীবনে প্রবেশ করা, স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকা।

কিন্তু কর্মজীবনে প্রবেশ করার কথা চিন্তা করলেই ত চলবে না। পথ কোথায়? শুধু বি, এ পাশের ডিগ্রী নিয়ে সে চাকুরী খুঁজতে যাবে কি করে?

অবশেষে অনীতা পথ খুঁজে পায়। সতীন্দ্রের সাহায্যেই সে করিমপুরের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। সেখানেই তার সাথে পরিচয় হয় অধ্যাপক চৌধুরীর।

সতীন্দ্র ফেরেই চলে। অনীতা শিক্ষণ সমাপনান্তে কলকাতায় ফিরে আসে। কিন্তু স্বামীর ঘরে নয়। পিতামাতার কাছে। পিতামাতা কন্যার ব্যবহারে দুঃখ। কিন্তু কি-ই বা করবার আছে! অনীতা জেনেছে রামরেণুবাবুর চরিত্রের গতি। পিতামাতা চুপ করে থাকেন। রামরেণুবাবুর চরিত্রে নারী-ঘটিত ত্রুটি নেই, আছে শুধু মদের নেশা। কিন্তু কেন এমন হল, তা ত আর কেউ তাকিয়ে দেখলেন না।

এদিকে অনীতার আকাঙ্ক্ষারও শেষ নাই। সে আরও বড় হবে, জীবনটা সে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করবে। কিন্তু সতীন্দ্র ছাড়া তার চলবেও না। তাই সে সতীন্দ্রের অর্থেই আমেরিকা চলে গেল। ফিরে এল দুবৎসর পর অর্থনীতি সম্পর্কিত এক ডিগ্রী। পেল কলকাতায় এক চাকুরী।

দিন বসে থাকে না, চলে ধীরে ধীরে আর নিজস্ব-গতিতে। সতীন্দ্র ইতিমধ্যে তার পুরাতন ব্যবসায়ে ফিরে গিয়েছিল, অর্থ উপার্জন করেছে, জুগিয়েছে অনীতার যাবতীয় অধিক চাহিদা।

চাকুরী পাওয়ার পরও অনীতার অর্থের ক্ষুধা মেটেনি। সতীন্দ্রের অর্থে সে সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়েছে।

এবার রামরেণুর কথা ভাবে সতীন্দ্র। রামরেণু শেষ পর্যন্ত তাঁর পেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আগে চলত রাতে নেশা, এবার তা শুরু হল দিনেও। অর্থের অভাব নেই, তাই তিনি হাইকোর্ট ছেড়ে দিলেন। ভাইয়েরা তাঁকে কত বোঝাত, কিন্তু রামরেণুবাবু কোন কথা বলতেন না। এমনি ভাবে দিন চলছিল। হঠাৎ বাতাস ঘুরে গেল। তিনি মদ পাওয়া ছেড়ে দিলেন, কিন্তু হাইকোর্টে আর প্রত্যাবর্তন করলেন না। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি চাকুরী নিয়ে গেলেন প্যারীতে। সেখানে তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হল।

স্ত্রী হিসাবে অনীতা লোকের কাছে চোখের জল ফেলল, কিন্তু আসলে তার হল মুক্তি। সতীন্দ্রও খুশী হয়েছিল। কারণ অনীতার সাথে মিলন এবার আসন্ন।

কিন্তু তাদের তখনও মিলন হয়নি। অনীতার চাকুরী পাকা হয়নি, আরও তাকে উঠতে হবে। অতএব আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে চলল প্রায় বৎসর বার।

সকলেরই বয়স হতে চলেছে। আর কতদিন অপেক্ষা করা যায়? কোন দিকেই আর বাধা নেই। অনীতার চাকুরীতে পদমর্যাদা বেড়েছে, তবে আর দেরী কেন? উভয়ে মিলে স্থির করল তারা বিয়ে করবে, তবে কলকাতায় নয়। সেখানে পরিচিত লোক বেশি। তারা বিয়ে করবে গিয়ে বেরিলীতে অনঙ্গ চাটার্জির বাড়ীতে। অনঙ্গ চাটার্জি সতীন্দ্রের বন্ধু। তাই সতীন্দ্র সেখানে চলেছে বিয়ের দু'দিন আগে সব ব্যবস্থা করতে। স্থির হয়েছে বিয়ের পর বরবধূ যাবে আলমোড়া, যাবে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে।

হঠাৎ সতীন্দ্র সম্বিৎ ফিরে পেল। ঘুমন্ত অধ্যাপক ঘুমের ঘোরে কি যেন বলছেন। হয়ত অসুখ বেড়েছে।

কৃশ বন্ধুনিও হতে পারে এই মনে করে সতীন্দ্র অধ্যাপকের মাথায় হাত দিয়ে দেখল। হাঁ, জ্বর তখনো রয়েছে। কিন্তু খুব বেশি নয়। অধ্যাপক ঘুমের ঘোরে বলছেন তুমি আমার কাছে থাক, তবেই আমি ভাল হয়ে যাব, ওষুধ আমার প্রয়োজন হবে না।

ট্রেন অনেকক্ষণ শাহজাহানপুর ছেড়ে গিয়েছে। দুর্বার গতিতে ট্রেন এগিয়ে চলেছে, আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই ট্রেন বেরিলী পৌঁছবে

আর দেরি করা ঠিক নয়; সতীন্দ্র অধ্যাপককে ডাক দিল। অধ্যাপক জেগে উঠলেন। একটু পরেই নামতে হবে। অধ্যাপক উঠে বসে তৈরি হয়ে নিলেন।

—একটু ভাল বোধ করছেন কি? জিজ্ঞাসা করল সতীন্দ্র।

—হ্যাঁ, অনেকটা ভাল বোধ করছি। একলাই নামতে পারব, ষ্টেটেলে যেতে পারব, ধন্যবাদ, আপনাকে আর আমার সাথে যেতে হবে না।

—না না, আমি আপনাকে পৌঁছে দেব। ষ্টেশনে আমার পরিচিত লোক আসবেন। তাঁদের মধ্যেই না হয় কেউ আপনাকে পৌঁছিয়ে দেবে।

অধ্যাপক চুপ করে রইলেন।

স্তব্ধতা ভেঙে সতীন্দ্র বললে, একটি বিষয়ে কৌতূহল হয়েছে অধ্যাপক চৌধুরী। আপনি ঘুমের ঘোরে বলছিলেন "তুমি আমার কাছে থাক, তবেই আমি ভাল হব। ওষুধ আমার লাগবেনা"। কেন বলেছিলেন ও কথা। স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?

অধ্যাপক চৌধুরী কথাটা শুনে চমকে ওঠেন। তিনি চুপ করে রইলেন। সহসা কথার উত্তর দিতে পারলেন না।

—কিছু বলছেন না যে অধ্যাপক চৌধুরী?

একটু সামলে নিয়ে অধ্যাপক বললেন

—বলছি। সত্যিই স্বপ্ন দেখছিলাম, কথাটা আমার নয়। ঘটনাটা হচ্ছে এই রকম, আমি একদিন এক পরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকের অসুস্থতার খবর শুনে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি খুবই অসুস্থ। কাছে বসে তাঁর মেয়ে। মেয়ে ঘুরে থাকেন। সেদিন তিনিও এসেছেন পিতাকে দেখতে। মেয়ে বাবাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন। বাবা খেতে চান না, শুধু বলেন, তুমি মা, আমার কাছে থাক, তাহলেই ভাল হয়ে যাব, ওষুধ আমার লাগবে না। হঠাৎ স্বপ্নে ঐ ঘটনাটি দেখছিলাম, তাই ঘুমের ঘোরে ঐ কথাটি মুখ হতে বের হয়ে এল। ভাগ্যবান সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তবু তাঁর ঐরকম কথা বলার লোক আছে, অনেকের ভাগ্যে ত সে কথা বলবার মত লোকও নেই।

সতীন্দ্র ও অধ্যাপক দুজনেই চুপ করে গেলেন। এর পর ত আর কথা চলেনা।

বেরিলীর আগের ষ্টেশন চেনেটি। সেখানে এক্সপ্রেস গাড়ী দাঁড়ায় না। তবু সিগন্যাল না পেয়ে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল।

সতীন্দ্র হঠাৎ বলল, আপনাকে একটি সুখবর দিচ্ছি অধ্যাপক চৌধুরী। পরশু আমার সাথে অনীতার বিয়ে। আপনাকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আপনাকে পেয়ে আমি ভাবছি, আপনি ভগবান-প্রেরিত।

অধ্যাপক চৌধুরী শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।

গাড়ী এসে বেরিলী ষ্টেশনে দাঁড়াল।

(৩)

বেরিলীর ইম্পিরিয়েল হোটেলের একটি দ্বিতল-কক্ষে অধ্যাপক চৌধুরী শুয়ে আছেন। জ্বর ছেড়ে গিয়েছে, স্নান খেয়েছেন। ভাবছিলেন শর্বরীর কথা। জানেন না শর্বরী উত্তর প্রদেশেরই কোথাও আছে কিনা। শর্বরী তাঁর অবচেতন মনে বাসা বেঁধে রয়েছে, তাই তিনি ঘুমের ঘোরে ওর সঙ্গেই কথাটি বলে ফেলেছিলেন। অসুস্থ বৃদ্ধের ঐ কথা শুনে জীবন সম্বন্ধে তাঁরই অজানিতে হয়ত মমত্ববোধ জেগেছিল। তাই তিনিও একদিন শর্বরীকে ঐকথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন আমার যদি কোনও দিন খুব অসুখ করে, তাহলে তুমি আমার কাছে থেকো। তাহলেই অসুখ আমার সেরে যাবে। ওষুধ আমার লাগবে না।

শর্বরী শুনে হেসে বলেছিল, এত বড় ধন্বন্তরী কি আমি যে, আমাকে দেখলেই অসুখ পালাবে? ভাল, তাই যদি হয়, তাহলে থাকব।

হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে কথাটা শেষ হয়েছিল।

আজ শর্বরী কোথায়? শর্বরীর অনুপস্থিতিতেও তিনি ভাল হয়ে উঠলেন। উঠতেই হবে। জীবনে আরও কত হাঙ্গামা পোহাতে হবে কে জানে।

হঠাৎ অধ্যাপক চৌধুরীর মনে পড়ে গেল অনীতার কথা। যেদিন অনীতা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এসেছিল, সেদিনটির কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী অনীতা সকলেরই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। অধ্যাপক চৌধুরীও তা থেকে বাদ পড়েননি! কিন্তু অনীতার সঙ্গে তাঁর মেলামেশার সুরটা ছিল অন্য রকমের। অত্যাচারী স্বামীর হাতে পড়ে তার জীবনটা বিষময় হয়ে উঠেছে, এই পরিচয়ই তিনি পেয়েছিলেন অনীতার কাছে।

কোমল মনের অধিকারী অধ্যাপক চৌধুরী সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিলেন অনীতার কথা। প্রসঙ্গ ক্রমে অনীতা সত্যেন্দ্রের কথাও বলেছিল। বলেছিল তার সাথে সত্যেন্দ্রের গভীর ভালবাসার কাহিনী। গভীর ভালবাসা থাকলেও সত্যেন্দ্রের সাথে তার বিয়ে হয়নি। বিয়ে হয়েছিল নেশাখোর মাতাল ব্যারিষ্টারের সাথে। কিন্তু কেন ব্যারিষ্টার সাহেব নেশাখোর ও মাতালে পরিণতি হয়েছিল, সে কথা উল্লেখ করেনি।

অধ্যাপক চৌধুরীর মনে প্রথমে সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু পরে তা উত্তরোত্তর জেগেছে। বিশেষ করে যখন অনীতার সঙ্গে তাঁরই সহকর্মী ও উপরের দায়িত্ব অধ্যাপক রায়ের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতার গুঞ্জনের সৃষ্টি করল।

অনীতাকে অধ্যাপক চৌধুরী খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন, তাই অনীতাও সুযোগ বুঝে অধ্যাপক চৌধুরীকে তার নবতম কাহিনীও জানিয়েছিল।

অধ্যাপক চৌধুরী জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি অধ্যাপক রায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন?

—আমার বাধা দেবার শক্তি কোথায়?

—কেন? তুমি স্পষ্ট বলতে পার না তোমার স্বামী আছে?

সে কথা বলবার উপায় নেই, কারণ আমিই জানিয়েছি আমি পতিব্রতার অবাঞ্ছিত। আমার সে ঘরে স্থান নেই।

—সত্যেন্দ্রের কথা বলেছ?

—বলেছি।

—তবুও তিনি অগ্রসর হচ্ছেন?

—হচ্ছেন বই কি। বলছেন, তাতে কোন দোষ নেই। একজনকে ছেড়ে আর একজনের উপর প্রীতি অর্পণ এক স্বাভাবিক ব্যাপার। একজনের উপর মনটা ক্রমশঃ একঘেয়ে হয়ে যায়, তাকে ছেড়ে যাওয়াই সুস্থ জীবনের লক্ষণ।

অধ্যাপক চৌধুরী অবাক হয়ে যান।

তিনি বলেন—অধ্যাপক রায় যাই বলুন না কেন, তোমার দিক থেকে তাঁর প্রতি টান দেখা যাচ্ছে কেন?

—সত্যিকার টান নেই, যান্ত্রিক টান আছে।

—তার কারণ?

—দাদা, আমার মনের গঠনকে আপনি বুঝতে পারবেন না। আমাকে যেদিন মা জোর করে বিয়ে দিলেন সেদিন থেকে আমার মনটা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গিয়ে নূতন ছাঁচে গড়ে উঠেছে। তারপর থেকে আমার মনে ভালবাসা বলতে কিছু নেই। আছে কেরিয়ার সৃষ্টি করার আগ্রহ। কারণ আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

—সত্যেন্দ্র একথা জানে?

—না, জানে না।

—তুমি তাহলে তাকে সত্যি ভালবাস না?

—হ্যাঁ বাসি, তবে যতটুকু সে আমাকে কেরিয়ার গড়তে সাহায্য করবে, ততটুকু ভালবাসা সে পাবে। বলা বাহুল্য সে সত্যিকার ভালবাসা নয়।

—মন ভাঙে তোমার জন্যে?

—নাই বা ভাঙুক, তাতে ক্ষতি কি? পেট ত ভরবে।

—তুমি মুক্তো ফেলে ঝিনুক ধরছ।

—মুক্তো আমি চিনি দাদা, সে ভুল আমি করব না

তবে ছুটো জিনিষের আপেক্ষিক গুরুত্ব দেখব নিশ্চয়ই, এ বিশ্বাস আপনি করতে পারেন।

তারপর অধ্যাপক রায়ের আনুকূল্যে অনীতা ভাল ভাবে শিক্ষণ সমাপন করে আমেরিকায় চলে যায়।

আমেরিকা হতে ফেরার কিছুদিন পরে অনীতার সাথে অধ্যাপক চৌধুরীর পথে দেখা। অনীতা অফিস ছুটির পর অফিস ফেরতা বাড়ী যাচ্ছে। সে অধ্যাপক চৌধুরীকে টেনে নিয়ে গেল কেয়াজিনিতে। সেখানে সত্যেন্দ্র অপেক্ষা করছিল।

সত্যেন্দ্রকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অনীতা অধ্যাপক চৌধুরীকে বলেছিল তার জীবনের উদ্দেশ্যের কথা। আগে সে বড় চাকুরীতে বহাল হবে তারপর সে সত্যেন্দ্রকে বিয়ে করবে। সত্যেন্দ্রও তাতে রাজী আছে।

অধ্যাপক বলেছিলেন চাকুরীর উচ্চশাখায় উঠতে কি করে? সেখানে কর্মের অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা দুই-ই ত দরকার।

আপনি সোজা পথের কথা বলেছেন, বাঁকা যে একটি পথ আছে, তা কি আপনার জানা আছে? নিশ্চয়ই নেই। এত বয়স হল কি করে, তাই আমি ভাবি। তবু আপনাকে বলব, আপনার এই নেতিবাচক যোগ্যতার জন্যই আমি আপনাকে শিক্ষক ও বন্ধু হিসাবে যথার্থভাবে গ্রহণ করতে পেরেছি। আর আমিও তাই এত সরলভাবে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারছি।

—তোমার কথার শেষ ভাগটি বুঝতে পেরেছি। প্রথম ভাগ বুঝতে পারিনি। আর একটি বাঁকা পথ কি?

—আপনি শিক্ষক, তাই আপনাকে 'বোকা' আখ্যায় ভূষিত করব না। কিন্তু আপনি ত একটি ক্ষেত্র হতেই জানেন যে আমি ভালবাসার দোহাই দিয়ে কত উঁচুতে উঠতে পেরেছিলাম। সে পথই আমি অবলম্বন করব।

এর পর আর অধ্যাপক কথা বাড়ান নি। তিনি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলেন।

তারপর বহুদিন চলে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন এক জায়গায় অনীতার সহপাঠী একজন উচ্চ সরকারী কর্মচারী শ্রীদাশগুপ্তের সাথে অধ্যাপক চৌধুরীর দেখা হয়ে গেল।

পুরাতন দিনের কথা অনেকক্ষণ ধরে চলল।

উঠল অধ্যাপক রায়ের কথা। তিনি তখন বড় পদ পেয়েছেন। দাশগুপ্ত অধ্যাপক রায়ের প্রসঙ্গে অনীতার কথা টেনে আনল। জানাল অধ্যাপক রায়ের পরিণত বয়সের কীর্তির কথা। তিনি এতটুকু বদলান নি। স্ত্রীর সাথে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। পুরাতন জীবনের সূত্র ধরেই তিনি জীবনে এগিয়ে চলেছেন।

আর অনীতার খবরও দাশগুপ্ত রাখে। অনীতাও তাঁর অফিসের সর্বোচ্চ কর্মচারীকে ভালবাসার ফাঁদে ফেলে চাকুরীর সিঁড়ি অনেকগুলি পার হয়ে গেছে।

অধ্যাপক চৌধুরী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। বলেছিলেন, জীবনে এমনি ঘটনাও ঘটে?

—ঘটে বই কি! চোখের সামনেই ত উদাহরণগুলো তুলে ধরলাম—বলেছিল দাশগুপ্ত।

হঠাৎ অধ্যাপক চৌধুরীর চিন্তায় বাধা পড়ল। বাইরে থেকে ডাক এল, অধ্যাপক চৌধুরী ঘরে আছেন?

—আছি, আসুন।

ঘরে এল সত্যেন্দ্র।

সত্যেন্দ্র বলল, অমৃতসর মেল আসার সময় হয়ে এল, চলুন তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে যাই। অনীতা এই ট্রেনেই আসবে। আজকেই বিয়ে।

—চলুন যাই।

দু'জনে তাড়াতাড়ি বের হয়ে ষ্টেশনে গেলেন। দু'চার মিনিটের মধ্যে গাড়ীখানা প্লাটফরমে এসে দাঁড়াল।

গাড়ীখানার আগুন খোঁজা হল। কোথায় অনীতা? অনীতা নেই। অনীতা আসেনি।

সত্যেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সজল চোখে এসে অধ্যাপকের কাছে দাঁড়াল। বলল—অনীতা এল না।

অধ্যাপক চৌধুরীরও চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন—এমনি করে অনীতারা কখনো আসে না। আসবেও না। চলুন হোটেলে ফিরি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৬৯)

আপন জনকে না চিনিবার মনোবৃত্তি মানুষের আছে মানুষ পরকে চেনে, আপনকেই পায়ে ঠেলে তোমার সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে তুমি আপনার হইতেও হও আপনার। অথচ তুমিই আজ সকলের চেয়ে পর। কবে তোমাকে বিশ্ব চিনিবে?...বেণু 'সুদর্শনে'র জন্য আমার পক্ষ হইয়া 'শ্রীনিতাগোপাল' প্রবন্ধ লেখে। উহা বুক পোষ্ট করিয়া কাল পাঠানো হইবে। সন্ধ্যার পর ট্রাষ্টীগণ যে মাতিস্বক্ষ'র আমার উপর দিয়াছেন ঠাকুরের শতবার্ষিকী উপলক্ষে, তাহা হইতে মুক্তি দিবার জন্য এক পত্র আমার কথা নিয়া বেণু লেখে। কাল গুরুপূর্ণিমা। আমার গুরু হইতে লজ্জা করে। গুরুপূজা লইয়া যে ব্যাপার মঠে চলিতেছে, তাহা আমার ভাল লাগে না। গুরু শ্রীনিতাগোপাল। গুরুগিরি কোনও দিনই আমি চাই নাই। আজিও না। তাঁহার পূজাই আজ করিতে হইবে। সকলেই যে যাহার গুরু লইয়া মাতামাতি করিতেছে, নিতাগোপালই বাদ পড়িতেছেন। আমার কান্না পায়। নিতাগোপালই যদি প্রতিষ্ঠিত না হন, কাহার কি মুরোদ যে কালের খোপে টিকিবে? কাল সকলকে মুছিয়া ফেলিবে, থাকিবেন শ্রীনিতাগোপালই। তিনি কালাতীত। কালাধীনদের আবার পূজা কি? গুরু গুরু, তোমার জয় হউক। তুমি জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানানন্দ, তুমি অবধূত সর্বসংস্কারবর্জিত, সহজ মানুষ। স্বামী আমার, তোমাকে নমস্কার।

১৪ই জুলাই

শ্রীগুরুপূর্ণিমা

'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ'। গুরু, বিশ্বগুরু, তোমার একটিমাত্র নমস্কার, আমার দেহপ্রাণমন সকল সত্তার নমস্কার। আমার শ্রান্ত দেহ মনের নমস্কার। আমার অহংভাব হর, আত্মসাৎ কর, আমার মুছিয়া ফেল, নিশ্চিহ্ন কর। তুমি থাক, তোমার মাঝে আমি মুছিয়া যাই। নমস্কার আমার মহানির্বাণ আনয়ন করুক। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবঃ মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ· তুমি পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম। তুমি আমার ভাঙিয়া গড়িয়া তোল, শোধন কর, তোমার ছাঁচে গড়িয়া তোল। তুমি ত্রিভঙ্গ। ব্রহ্মার ভঙ্গি, বিষ্ণুর ভঙ্গি, মহেশ্বরের ভঙ্গি তিন ভঙ্গি এক করিয়া তুমি ত্রিভঙ্গ। আমিও ত্রিভঙ্গ হইব, তোমায় প্রণাম করিব। আমার জীবন-ভরা বেদনার নমস্কার তোমার চরণে পৌঁছাক। শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বন্দামি, শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি, শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি, শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি। সকালে এখানের এরা গুরুপূজা করেন। আমি বলি, ঠাকুরই গুরু, তিনিই dynamic। আমরা শুধু জীবনে তাঁহাকেই ধারণ করিয়া চলিব। তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হও, দিব্য মানুষ হও, তাঁহার জীবনের ছাঁচে গড়িয়া ওঠ। আমার আশীর্বাদ। ৮॥ টায় পর মঠে যাই একা। জয়া আসে···তারিণী বাবু, নগেনবাবু, ক্ষিতীশবাবু, শেষে খগেনবাবুর সঙ্গে কথা হয়।·· আজ শতবার্ষিকীর এক সাধারণ সভার বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল আনন্দবাজারে। উহা আমি জানি না, কোন agendaও নাই। ১২ টায় ফিরি।...লীলা আসে সন্ধ্যার পূর্বে। সুদর্শনের লেখাটা আজ ডাকে দেই।

১৫ই জুলাই

ঠাকুর, বন্ধু আমার, নিত্যবন্ধু আমার, তুমি না হইলে আমার চলে না। সকলেই প্রায় আমার সঙ্গে তাহাদের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন দৃঢ় হউক। এ যে মুক্তির বন্ধন। বন্ধন যখন মুক্তির মত অবস্থা, তখন সেই বন্ধনই না নিত্য বন্ধন, মুক্তি বন্ধন। আমি তোমার সঙ্গে নিত্য বন্ধনে যুক্ত হইব। নিত্যগোপাল, তুমি আমার প্রাণ। দেখা দেও, দেখা দেও। আমার কি আছে তুমি ছাড়া? তোমাকে কেমন করিয়া ধরার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিব? সুযোগ দেও, তদুপযোগী মন দেও। রেণু ৯টার পর বাহির হইয়া···ফেরে ১২টার পর।...অনিল সমাজঘরে আসে ৯৷৷০টার পর, যায় ৪৷৷০টার পর। আমার জীবনের সাধনার কথা, মানুষকে ভালবাসার কথা, ১১ বৎসর যাহার কাছ হইতে যাহা পাইয়াছি তাহাকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ রাখা, যাহার সঙ্গে একদিনের পরিচয়, তাহার সেই পরিচয়ের মূল্য স্বীকার ইত্যাদি বলি...আমার পদত্যাগপত্র প্রতিভার মারফত তারিণীবাবুর কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।···

১৬ই জুলাই

নিত্যগোপাল, অক্ষিয়চন্দ্র, তুমি আমার কে, আমি-ই বা তোমার কে, আমার স্থান তোমার কাছে কোথায় তাহা তো তুমি আমাকে দেখাইয়া দিয়াছ। তুমি আমাকে তোমার বাম পাশে টানিয়া দাঁড় করাইয়াছ। দেখাইয়াছ—তুমি আমি যুগল। একই আসনে তুমি আর আমি। তুমি তো আমাকে ভিন্ন করিয়া পৃথক করিয়া রাখ নাই। তুমি আমি দেহে প্রাণে মনে এক অদ্বৈত। তুমি আজ লোকচক্ষুর অগোচরে, আমি আজিও লোকচক্ষুর সামনে। আমি কি তোমার হইয়া তোমার নাম রূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারিব? নহিলে তো আমার বাঁচিয়া থাকাই নিরর্থক হইবে। তোমার প্রতিনিধিত্ব যদি না করিতে পারিলাম, কেন তুমি এই অসম্ভবকে এমন উচ্চ স্থানের অধিকারী করিলে? আমাকে তোমার বাম পাশে দাঁড়াইবার মত যোগ্যতা দেও।

···তারিণীবাবু আসেন আমার খাবার সময়, প্রায় ১ ঘণ্টা থাকেন। শতবার্ষিকীর টীন আসিয়াছে জানিলাম। পানিহাটী হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক এক চিঠি দিয়াছেন ম্যানেজারের নামে পানিহাটিতে একজন ব্রহ্মচারী রাখিতে যাহাতে সেখানে লোকেদের আলাপ আলোচনার সুবিধা হয়। অথচ যাইবার কেহ নাই। এই তো অবস্থা মহানির্বাণ মঠের! শতবার্ষিকী উৎসব সার্থক হইলে এই চাপ পড়িবেই। তখন ইহাদের পলাইবার পথ থাকিবে না। নিত্যগোপালকে যে রূপে প্রচারিত করা হইতেছে, সেই রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া তো আলাপ-আলোচনা করিতে হইবে। কে করিবে? এই জন্যই তো উহারা আমায় চায় না। সন্ধ্যার পূর্বে ক্ষিতীশবাবু আসে। আমাকে মুক্তি দেওয়ার চিঠি পড়িয়া শুনানো হয়। মাখনবাবু আসে।···

১৭ই জুলাই

নিত্যগোপাল, তুমিই বর্তমান যুগের অনাদি আদি। তোমার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ 'সমন্বয়ে'র বার্তা পৌঁছাইয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু তিনিও জড়াজড় সমন্বয়ের বার্তা পৌঁছাইয়া যান নাই। তিনি তোমার আসার পথই সুগম করিয়া গিয়াছেন। তুমিই সর্বপ্রথমে জড়াজড় সমন্বয়ের দর্শন ও জীবন উপস্থাপিত করিয়া গেলে। রবীন্দ্রনাথ-শ্রীঅরবিন্দ বা বর্তমানের সমস্ত মনীষীরা তোমার পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, তোমারই দর্শন ও জীবনের বিবৃতি প্রদান করিয়া চলিয়াছেন।...তোমার সৃষ্টি-প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব তোমারই শক্তিরূপে তোমার জীবনে জীবন মিশাইয়া, তোমার জীবনে জীবন বিলাইয়া, মনোবুদ্ধির লয় করিয়া, তোমাতে তুমি বনিয়া গিয়া। আমি তোমার হইয়া তোমার সেবিকা-রূপে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। তোমার সঙ্গে থাকিবার মত আমাকে বানাইয়া তোল। ৭ টায় ক্ষিতীশ চক্রবর্তী আসে। গত রাত্রির ট্রাঙ্কলের আমার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য তাহারা অনুরোধ করিয়াছে। রেণুকেও পূর্বের মত কাজ করিবার জন্য সাগ্রহ আহ্বান জানাইতে ক্ষিতীশ এক

আবেদন ট্রাস্টিদের কাছে লিখাইয়া নিল। উহার তারা তাহারাই অধিক পরিমাণে।.. কালীবাবু আসেন ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অভিভাবণ ও বাণী দিয়া সেই।..কত জটিল সমস্যা যে আমার জীবন ঘিরিয়া আছে, ঠাকুর সবগুলিরই তো সমাধান করিয়া দিতেছেন। সমস্যা-আকীর্ণ আমার জীবন। শ্রীনিতাই-গোপাল না হইলে, তাঁহার পথের খোঁজ না পাইলে কোথায় যে ডুবিয়া যাইতাম সে জানে? তিনি তাঁহার কথা রক্ষা করিয়াছেন, 'সবং, যখন যেখানে আছ, সঙ্গে সঙ্গে আছি'। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর দিয়া অক্ষত দেহে চলিতে পারিতেছি, ইহা কি তাঁহার করুণা ছাড়া সম্ভব? তোমার করুণার জয় হউক।...

১৮ই জুলাই

ঠাকুর, 'তুমি আমার'—ইহাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। আমার নিকট তুমি তোমার বিশ্ব-দর্শন ও সমন্বয়ঘন জীবন রাখিয়া গিয়াছ বিশ্বের কাছে পৌঁছাইবার জন্য। সে কি আমার যে-সে গৌরব? কিন্তু তাহার আদৌ ঘত সদ্ব্যবহার তো যথোপযুক্ত করিতে পারিতেছি না। কী যে আমার সে জন্য বেদনা আমি অহর্নিশ ভোগ করি তুমি তাহা দেখিতেছ! মনে হয়, তোমার এমন দর্শন ও জীবন প্রচারের মত প্রচার করিতে পারিলে মানুষ তাহা লুফিয়া নিবে, কৃতার্থ হইবে। কিন্তু আমার হাত-পা যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ছুটিতে পারি বৈ কি, গর্জন করিতে পারি বৈ? দশটা বৎসর আগে হইলেও ঝড় বহাইতে পারিতাম। বুকের মধ্যে তো একটা সিংহ-গর্জন ঘুমাইয়া আছে। ওগো মহাবিপ্লবী, তোমার বিপ্লব সর্বাঙ্গে মাখিয়া আমাকে ঝড়ের মত ছুটিতে দাও। আমার কাছে গুপ্ত তোমার দর্শন ও জীবনের সার্থক ব্যবহার করিতে দাও। সকালে কিতীশ আসে। তাহার দেওয়া রেণুর সম্বন্ধে ট্রাষ্ট বোর্ডের কাছে আবেদনটীর বিচারের ভার শতবার্ষিকীর সহ সভাপতির কাছে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এদিকে টাকা ধীরে ধীরে সব খরচ হইয়া যাইতেছে। রেণুও কাজের দিক দিয়া খুব আগাইতে পারিতেছে না শরীর ভাল নয় বলিয়া। দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে। রেণু ডাক্তার মুখার্জীকে না পাইয়া সুবোধ ডাক্তারের কাছ হইতে ইনজেকশান (পেনিসিলিন) নিয়া আসে। ঠোঁটের উপর ফোস্কাটার খুব বেদনা। ক্লাশ VI-এর বই-এর কবিতা আজ শেষে। যমুনা এক চিঠি দিয়াছে। প্রতিভা কিছুদিন গিয়া থাকিবে যমুনার কাছে—এইরূপ স্থির হইল মিতুর ১০।১২ দিনের জন্য শান্তরাগাছি কাল যাইবে। এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমার মুক্তির পথ শুধু ঠাকুরের চরণতল এই জটিল অবস্থা হইতে বাহির হইবার সহজ পথ তাঁহার করুণার মধ্যে। আমার শরণ ঐ শ্রীচরণ। আমার যাহা সম্বল, ধন জন সব তুমি। কিছু যে আমার নাই। ঠিক 'আমার' বলিতে আমার কি কিছু আছে? তুমি এতদিন সযত্নে রাখিয়াছ, তাই চলিতে পারিয়াছি।

১৯শে জুলাই

ঠাকুর, আমার মুক্তির মহামন্ত্র, সকল জটিলকুটিল সমস্যার সমাধানমন্ত্র, 'তুমি আমার, আমি তোমার, তুমি আমি আমি তুমি'—'তত্ত্বমসি,' 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। গৌর আপনার লাগি আপনি কাঁদিয়া বিভোর, নিজকে নিজে পাইবার জন্য কি তাঁহার বেদনা, কান্না! তাঁহার নিজকে নিজে না-পাওয়ার মধ্য দিয়াই এই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, বিশ্বময় তাই এই কান্না। পাইবার জন্যই তো এই কান্না। পুরুষ-প্রকৃতি সকলেই নিজকে নিজে পাইবার জন্য এত চঞ্চল! গৌর-রূপে এই পুরুষ-প্রকৃতি একীভূত। সেই গৌরই তো তুমি। তোমার নিজকে নিজে পাইবার জন্যই সর্ব সমন্বয়ের প্রয়োজন, জড়াজড় সমন্বয়ের প্রয়োজন। সর্ব ধর্মসমন্বয়ই আত্মপ্রেমের, আত্মানন্দের বিকাশ, ঘন প্রকাশ। নিজকে পাইতে হইলে সব কিছুকে নিজ জীবনে পরিপাক করিতে হইবে। তুমি আমার, আমি তোমার, তুমি আমি আমি তুমি। চটার বিশ্বাস মহেন্দ্র দত্তের বাসায় যাই। তার স্ত্রীর আজ সপিণ্ডিকরণ। গান শুনিলাম প্রথমে 'ঘরে মুরারে হরে মুরারে' ইত্যাদি গান। পরে 'কি আর কব, সাধন-দুর্লভ জীবন-রতন', 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়', 'এখনো তেমনি বহে সে যমুনা' ইত্যাদি। সেই তুলসী তিল

দেহমন সমর্পিত'—সব তোমাকে দিলাম। আমার জীবন লইয়া তোমার প্রয়োজন তুমি সাধন কর। আমার জীবন তোমার সাধনায় মগ্ন হউক। ব্রহ্মে যে-সব 'event' ঘটিয়াছিল, তাহা আজিও ঘটিতেছে। আমরাই শুধু দেশ-কালের গণ্ডী আরোপ করিয়া পরিচ্ছিন্ন করি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মানুষ একই সনাতন ঘটনাকে যে-যার মত দেখে! ঘাট-বাল যখন আকাশে ওঠে, তখন সে আপনার ছন্দে আপনি চলে। খেলোয়াড়গণ তাহাদের যে-যার মত দিক নির্ণয় করে। শরণাগত হইলে মানুষ দেশাতীত কালাতীত হইয়া সর্ব দেশ-সমন্বয়, সর্ব কাল-সমন্বয়ের রস-আস্বাদনে সার্থক হয়। মিছু ১০।টার পর শান্তরাগাছি যায়।···জীবনের ঘটনাসমূহকে তাঁহারই 'দান' বলিয়া মাথা পাতিয়া না নিলে মায়াবাদকেই মানিয়া লইতে হয়। তখন ভগবান মঙ্গলময় আর মায়া 'অমঙ্গল' বিধান করিতেছেন—ইহা স্বীকার করা ছাড়া গতি থাকে না। ব্রহ্ম-মায়া সমন্বয় চাহিলে জীবনে যত বড় প্রতিকূল ঘটনাই ঘটুক না কেন, তাহাও ভগবানের দান, জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার প্রকাশ মনে করিতেই হইবে। রেণু প্রতিভার কাছে এই তত্ত্ব বৈকালে বলি।···

২০শে জুলাই

ঠাকুর, আমার জীবনের পরমা গতি তুমি। ঘটনাস্রোত আমাকে জাতি সমাজ কুল শীলের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছে। পিছনে সরিবার তো আর যো নাই। তাহা হইলে মৃত্যু, নিদারুণ মৃত্যু। এই গতিপথ একমাত্র তোমার শ্রীচরণ-প্রান্তেই সফল হইতে পারে। আমার সকল ঘটনা তোমার জীবন-আলোকেই সার্থক, ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ঘটনা তোমারই আশীর্বাদ। 'মিথ্যা' বলিয়া এড়াইয়া চলিব না, ঘৃণা করিব না। ইহার মধ্যে তোমাকেই দেখিতে চাহিব। নহিলে তুমি একজন, আর মায়া আর একটী শক্তি যে তোমার বিরুদ্ধে চলিতেছে এবং জীবকে বিপন্ন করিতেছে—ইহা মানিয়া লইতে হয়। তবে কি তুমি মায়াধীন, মায়ার উপর কি তোমার প্রভাব নাই? তাহা হইলে তোমার সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ কি? সমস্ত ঘটনার মাঝে তোমারই হাত দেখিব—শতাং শিবং সুন্দরম্। সকালে শ্রাবণ মাসের সাময়িকী শেষ করি। ধীরেন ডাক্তার আসে ২টার পর। অর্থাভাবে তাহার ··। তাহাকে ১০০ টাকা হাওলাত স্বরূপ দিব বলিলাম। ধীরেনের মত আমাদের সেবা কে করিয়াছে? ··মন্থর বাসায় যাই।···বেণু স্কুলে ছিল, পরে আসে। ঠাকুরের সামনে বেণুর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।...কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্রায় ২টায় আসি। পানিহাটীর পথে তারিণীবাবু আসেন প্রতিভার সঙ্গে।... সাময়িকী মুক্তির আনন্দ ··, বিশ্বশান্তির মূল সূত্রাবলী ও পানিহাটীতে শ্রীনিত্যগোপাল-শতবার্ষিকী। ২১শে জুলাই

ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শনের ছাঁচে আমার জীবনের প্রতিটী তত্ত্ব, প্রতিটী ঘটনা, প্রতিটী বৃত্তি, প্রতিটী অণু-পরমাণু গড়িয়া উঠুক, যাহাতে আমি তোমারই প্রতিমূর্তি, ছবি ও ছায়ার মত সংসারে বিচরণ করিতে পারি। আমাকে তোমার সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য-রূপ মুক্তি দেও। আমি তুমি হইয়া থাকি—ইহাই আমার কামনা। তুমি ছাড়া কে আছে আমার এই মৃত্যুময় সংসারে? বিশ্বের সকল দ্বন্দ্বের সমাধান তুমি। এমন স্পষ্ট জীবন কাহার আছে? জীবনগত ও দর্শনগত এমন স্পষ্ট সমন্বয়-জীবন তো গত ১০০ বৎসরের মত কাহারও মধ্যে দেখি না? সকলেই আংশিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে। তুমিই সার্থক পরিপূর্ণ সমন্বয়-মূর্তি।··· অনিল সমাজবাদ চিঠি দিয়াছে। যদি আমরা মানিক কিছু দেই, তবে সে তদ্বিতল্পা গুটাইয়া ওখান হইতে উজলকারতের কাজের জন্য আসিতে পারে। একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকের জন্য যাহা যত্নতম প্রয়োজন তাহা করিবার মত শক্তি আমাদের নাই। অন্য কোন আয়ের পথ থাকিলে আমরা হাত খরচ বাবদ কিছু দিতে পারি। এরাই কিছু নিতে পারে না। আর উহার সঙ্গে কর্মপথে অশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। মানুষ তো দেখিলাম অনেক। দূর হইতে ভালবাসাই ভাল। একত্র থাকিলেই গোলমাল সৃষ্টি হইবে। যে যার খেয়াল চালাইতে চেষ্টা করিবে। তখন ঝুঁকিলে পড়িব।

২২শে জুলাই

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় ভক্তই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচারসকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতাভাষ্যে ভগবান দত্তাত্রেয়নির্দ্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ত্রয়ীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

কিন্তু ঐ প্রকার ভ্রান্তি অপনীত হইলে, সেই মনুষ্য বা পুরুষ ত আপনাকে স্থাণু-দর্শন বা বোধ করে না। উক্ত চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে যদি বলা হইত, ভ্রান্তিক্রমে স্থাণু আপনাকে পুরুষ-বোধ বা দর্শন করে, তাহা হইলেও বরঞ্চ বলা যাইতে পারিত যে, ভ্রান্তিক্রমে ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম আপনাকে জীব-বোধ করেন, এবং সেই ভ্রান্তি তিরোহিত হইলে, সেই ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম আপনাকে আর জীব-বোধ করেন না। তখন তিনি আপনাকে ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম-বোধই করেন। সে পক্ষেও নানা অদ্বৈতমতের গ্রন্থাবলী এবং স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যেরও কোন কোন গ্রন্থের কোন কোন শ্লোকানুসারে আপত্তি করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই অনেকবার বলা হইয়াছে যে, অদ্বৈতমতের গ্রন্থাবলী এবং শঙ্করাচার্য্যের কতকগুলি শ্লোকানুসারেই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মণ নির্ব্বিকার,নিরঞ্জন ও নির্ম্মল। সুতরাং ভ্রান্তিক্রমে কখনও সেই ব্রহ্মের আপনাকে সবিকার-সমল-অঞ্জনবিশিষ্ট জীব-বোধ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে সমমতাবলম্বী শঙ্করাচার্য্যের—

"স্থাণৌ পুরুষবদ্ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্ত তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে॥"

বলা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। আর শঙ্করাচার্য্যের—ব্রহ্মনামাবলী-মালা অনুসারে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' স্বীকার করিয়া লইলে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য বা অভেদত্বই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলেও ব্রহ্মণের আপনাকে ভ্রান্তি-বশত জীব-বোধ হইতে পারে না। তাহা হইলে সেই ভ্রান্তি অপনারিত হইলেও সেই ব্রহ্মণ বা ব্রহ্ম আপনাকে অজীব-বোধ করিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম-জীবকে নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ও নির্ম্মলই বলিতে হয়। কারণ, ব্রহ্ম ত নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন এবং নির্ম্মল,—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্র ও বেদান্তানুসারে মুক্তকণ্ঠে বলা হইয়াছে? তবে জীব শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে যদি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নয় প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে সেই জীবও নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও শুদ্ধ স্বীকার করিতে হয়।

ত্রি-চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নঃ জ্ঞানসত্তমা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে অহং এবং মম, এই উভয়

অজ্ঞান। আমি আছি-বোধ এবং আমি-বোধ না থাকিলে, অন্য কোন প্রকার বোধই হইতে পারে না। আত্মবোধ হইবার প্রয়োজন হইলেও আমি-আত্মা বা অহমাত্মা এই বোধ হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমি-আত্মা বা অহমাত্মা এই বোধ হইলে, অবশ্যই আমি-আত্মা, আমার এই বোধও হইয়া থাকে। আত্মার আত্মজ্ঞান হইলে, আত্মা কি তখন নিজে, নিজের অস্তিত্ব-বোধ করেন না? সম্ভবতঃ অবশ্যই করেন। আমি কি—এই বোধ হইবার পূর্বে 'আমি'র অস্তিত্ব-বোধের অবশ্যই 'আমি'র প্রয়োজন হয়। সুতরাং আত্মা কি,—ইহা আত্মার বোধ হইবার পূর্বে অবশ্যই আত্মার অস্তিত্ব বোধ, আত্মার হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মার কেবল আত্মজ্ঞান হইবার প্রয়োজন হইলেও আত্মার নিজের অস্তিত্ব-বোধ এবং আত্মা কি,—এই বোধ বা জ্ঞান, আত্মারই প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং আত্ম-জ্ঞানই অদ্বৈতজ্ঞান নহে বলা যাইতে পারে। কারণ তোমার মতে যাহা আত্মজ্ঞান, তাহাতেও দুই প্রকার জ্ঞান বা বোধের বিদ্যমানতা থাকে। সেই দুই প্রকার বোধের তুমি কোন্‌টিকে সত্য, এবং কোন্‌টিকে অসত্য বলিবে? অথবা ঐ আত্মজ্ঞানে অদ্বৈততার অভাব-বশতঃ কি ঐ উভয় জ্ঞানকেই মিথ্যা বলিবে? কারণ তোমাদের অদ্বৈতমতে একাধিক জ্ঞানও অজ্ঞান। এই দুই প্রকার জ্ঞানকেও অদ্বৈত মতে অজ্ঞানের অন্তর্গত বলা যায়। এক প্রকার জ্ঞানের অতিরিক্ত যে জ্ঞান, তাহাকেই দ্বৈত জ্ঞান বলা যায়। অথবা ঐ দুই প্রকার জ্ঞানকে অদ্বৈতজ্ঞান বলা যায় না। তবে আমিই আত্মা —বলিলেই বা দোষ হইবে কেন? তবে আমি-আত্মার অস্তিত্ব-বোধ এবং আমি আত্মা কি,—এই জ্ঞানই বা দোষনীয় হইবে কেন? তুমি আত্মা যাঁহাকে বল, আত্মা শব্দ যেমন তাঁহার একটী উপাধি, তদ্রূপ আমি শব্দও তাঁহার অপর একটি উপাধি স্বীকার করিলেই বা দোষ কি হয়? অদ্বৈতমতে আত্মা শব্দ ব্যতীত তুমি যাঁহাকে আত্মা বল, তাঁহার ত আরও অনেক উপাধি আছে? অদ্বৈতমতে আত্মাকে শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, নিরঞ্জন, নির্বিকার, নির্মল, নিত্য, সত্য, সৎ, চিৎ, আনন্দ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মণ, দৃক্ প্রভৃতি নানা উপাধিবিশিষ্টই স্বীকার করা হয়। তবে সেই আত্মার 'আমি' এই শব্দ একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? সেই আত্মার 'তিনি' এই শব্দ একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? সেই আত্মার 'তুমি' এই শব্দ একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? সেই আত্মার 'যিনি' এই শব্দ একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? সেই আত্মার 'ইনি' এই শব্দ একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? অদ্বৈত মতাবলম্বী শঙ্করাচার্যও আপনাকে তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক স্থলেই অহমুপাধি-বিশিষ্ট আত্মা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন বা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী যে বিদ্বান পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিয়াছেন। শঙ্করাচার্য তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ।"

তাহা হইলে শঙ্করাচার্যের মতানুসারেই অহম্ শব্দ আত্মাবাচকও বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে শঙ্করাচার্যের মতানুসারেই অহং শব্দ ব্রহ্মবাচকও বলা যাইতে পারে; কারণ তিনি উক্ত পঞ্চত্রিংশ শ্লোকেই বলিয়াছেন 'ব্রহ্মাহ-মেব'। অথর্ব্ব বেদীয় মহাবাক্যেও অহং শব্দ ব্রহ্মবাচক বা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যবাচক। উক্ত বেদের এই প্রকার মহাবাক্য, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। আত্মা বা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যবাচক যে অহং, সে অহংকে কি প্রকারেই বা অজ্ঞান বলা যায়? আমি-ব্রহ্ম বা আমি-আত্মা, বলিলে কিম্বা বোধ হইলে, আমি-ব্রহ্ম বা আমি-আত্মা, আমার নিশ্চয়ই বোধ হইয়া থাকে, সুতরাং সেই আত্মা কখনও অজ্ঞান বলা যায় না। আমি-ব্রহ্ম বোধ হইলে, যদি আমি-ব্রহ্ম বা আমি-আত্মার সে বোধ থাকে, তাহা হইলে সে 'বোধ' হওয়াটাও এক প্রকার অজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৮-র মধ্যবর্তী নির্বাচন—স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটি অনিশ্চয়তা বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। ভারতবর্ষের নেতৃত্ব উহার কারণ অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও প্রতিকারে অপারগ হওয়ার ফলেই আজ ঐ অস্থিরতা বিক্ষোভ অতি উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে যাহার ফলে ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে গোটা ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতা-চ্যুত এবং ঐ সকল প্রদেশে কোন স্থায়ী সরকার গঠিত হইতে পারিতেছেনা। ঘন ঘন সরকারের উত্থান পতন রোধ করিয়া স্থায়ী সরকার গঠন করিবার প্রচেষ্টায় এই মধ্যবর্তী নির্বাচন। এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচন একই সময়ে পাঞ্জাব উত্তর প্রদেশ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হইল। ১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের উপর মানুষের আস্থাহীনতা অধিকাংশ প্রদেশে যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং দীর্ঘ ২০ বছর ক্ষমতা-সীন থাকার পর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ফলে সেই সময়ে একমাত্র কংগ্রেসের এই পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান ও তার প্রতিকারের একটা দাবী উঠিয়াছিল মাত্র কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দোষ শুধু বাহিরেই খুঁজিলেন মাত্র এবং যাহা ছিল তাহা লইয়াই আবার ঘর বাঁধিতে সচেষ্ট হইলেন। ফলে এবারের নির্বাচনেও, একমাত্র উত্তর প্রদেশ ব্যতীত, আর তিনটি প্রদেশেই কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি তো হইলই না বরং আরও অধিক অনাস্থা অভি-ব্যক্ত হইল। বাঙ্গালী জাতি হিসাবে চিরকাল চিন্তাশীল ও প্রাণবান, তাই পশ্চিমবঙ্গে যাহা ঘটিয়া গেল তাহাকে এক কথায় নিঃসঙ্গ বিপ্লব বলা যাইতে পারে। এরূপ যে ঘটিবে, বাঙ্গালী যে কংগ্রেসকে এরূপ ছেঁড়া পাতার মত নিক্ষেপ করিবে তাহা নির্বাচনের দিনেও যেন কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। গতবারের নির্বাচনেও কংগ্রেস ১৫৭টি আসন লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এবারের নির্বাচনে ঐ সংখ্যার অর্দ্ধেকের চাইতেও ১টি আসন কম পাইয়াছে। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের বিরোধী শক্তি হিসাবে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত প্রতিটি দলই গতবারের তুলনায় এবারে প্রায় দ্বিগুণ, কোন কোন দল, বিশেষ ভাবে প্রধান দল কম্যুনিষ্ট (মার্কসীষ্ট) দল ৮০টি আসন লাভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এবারের ফলাফল দেখিয়া মনে হয় যে একটা কিছু অঘটন ঘটন বা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ব্যতীত তাহার আর পুনরুজ্জীবনের কোন আশাই নাই। সর্বভারতীয় রাজনীতিতেও কংগ্রেসের এই বিপর্যয় রোধ হওয়ার মত কোন আশার আলোক আমরা দেখিতে পাইতেছি না। নির্বাচনে এই দারুণ পরাজয়ের পর ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া মুসলমান ভোটারদের ভোট না পাওয়া, লোকদল, আই, এন, ডি, এম, প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের উদ্ভব, প্রভৃতি দোষের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু দোষ বাহিরে নয়, দোষ অন্তরে। মহাত্মাজীর নিকট দীক্ষিত ও শিক্ষিত নেতৃবর্গ যে পরাজয়ের দোষ উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া আত্মসমীক্ষা ও আত্ম বিশ্লেষণের পরিবর্তে ঘন্দ্বমোহগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় দোষ কেবল বাহিরে খুঁজিলেন, ইহাতে আর আশা করিবার কিছু রহিল না। পশ্চিমবঙ্গে এক-দুই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও (নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা) কংগ্রেস সভাপতি বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এই জঘ পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া অনেকেই অনেক কথা বলিতেছেন। এই সকল কারণ রোগের মূল নয়, রোগের লক্ষণ মাত্র। মূল রহিয়াছে আরও গভীরে। ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী

মাসে (মাঘ, ১৩৪৪) শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ (ঘরিশালের পরমকুমার ঘোষ) তাঁহার উদ্বোধন পত্রিকায় "আমাদের কথা" নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ আজ সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ শেষ প্রশ্নের সম্মুখীন।...জটিল এই প্রশ্নসমূহের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে জাতির সর্ব্বাঙ্গীন জীবন্ত সৃষ্টির যাত্রাপথে অচলায়তন ভারতবর্ষের মূলতঃ স্থিতি-প্রধান কৃষ্টির পিছটান তাহার গতিরোধ করিবেই।... ব্রিটিশ আজ আর নাই; তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে রাজনৈতিক প্রেরণা সে এতদিন পাইয়াছে, সে রাজনীতি—তাহা আবেদন নিবেদন বা শাসনতান্ত্রিক সহযোগই হউক, সশস্ত্র বিদ্রোহ বা অহিংস অসহযোগই হউক—আজ সর্ব্বতোভাবে অচল। সে প্রেরণার কেন্দ্র আজ তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আর তো 'মুইট ইণ্ডিয়া' বাণী তাহার দেশপ্রেমের প্রেরণা দান করিবে না। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে, ব্রিটিশের রুদ্র পীড়নে যে আত্মশক্তি জাতির বুক চিরিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে শক্তির উৎসকে কোথায় আজ সে স্তব্ধ করিবে? কোনও নূতন হাঁ-ধর্ম্মী (positive), ব্যাপক ও গভীর দর্শন ও ভাবধারার শরণ না লইলে তো পুরাতনকে হজম করিয়া আগাইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। কে তাহাকে এই নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন প্রেরণা যোগাইবে? ব্রিটিশ-ভারতও নাই, আবার জার্মানির যুগের স্থাণুধর্ম্মী, প্রজাবাদী যে ভারত নেতিবাদের যুক্তিতে জগতের ওপারে তাহার ইষ্টলোকের ধ্যানে ব্যাপৃত ছিল, সে ভারতও নাই। কালপ্রবাহে তাহারই অন্তর হইতে উদ্ভূত প্রাণঘন বৌদ্ধ প্লাবন ও বহির্গত প্রাণের ধাক্কায় গতি ক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যন্ত্রচালিতবৎ সামনের দিকে সে অনেকখানি আগাইয়া আসিয়াছে। .....সে যে বহির্গত প্রাণধর্ম্মীদের আকর্ষণে অনেকটা দূর আসিয়া পড়িয়াছে, পিছন ফিরিবার পথ ও সুযোগ কি তাহার এতটুকুও আর খোলা আছে? .....ভারতবর্ষ কি আবার পিছনে ফিরিয়া অতীতকেই তীব্র সবেগে আঁকড়াইয়া থাকিবে, না অতীতকে নিশ্চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া প্রাণধর্ম্মের উদ্ধামস্রোতে একান্ত বর্ত্তমান ভুবনের পথ বহিয়া চলিবে? ...সামনে তাহাকে চলিতেই হইবে, অথচ সামনে পথ চলিবার শাস্ত্র বা বিজ্ঞান কিছুই তাহার জানা নাই। সর্ব্বগ্রাসী একটা অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও অজ্ঞেয়তা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে"।—এই অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও অজ্ঞেয়তার হাত হইতে মুক্ত করিয়া, সমাজ কাঠামোর মেরুদণ্ড স্বরূপ দর্শন ও চিন্তাধারাকে জীবনের ছাঁচে ঢালিয়া গান্ধিজীর ধ্যানের ভারত নূতন সমাজ গঠনের দিকে দেশকে পরিচালিত করিতে না পারার ফলেই কংগ্রেস আজ নেতৃত্বের আসন হইতে বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িল। উপরোক্ত প্রবন্ধে এবং তাঁহার অন্যান্য বহু প্রবন্ধ ও পুস্তকের মধ্য দিয়া স্বামীজী ভারতবর্ষের এই রুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় হিসাবে স্বরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বিত একটি জীবন্ত আদর্শের কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য কংগ্রেসী নেতাগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া এমনই মশগুল হইয়া গেলেন যে, এদিকে চিন্তা বা দৃকপাত করিবার সময়ও তাঁহাদের হইল না। এই ফাঁকে গোটা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই একটা কায়েমী স্বার্থের চক্র গড়িয়া উঠিল। স্বাধীনতা লাভের পর এত দিন পর্য্যন্তও, ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে গৃহীত গণতান্ত্রিক সমাজবাদের একটা ধোঁয়াটে স্লোগানযুক্ত একটি প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া কংগ্রেস নূতন সমাজের একটি সুস্পষ্ট চিত্র দেশের সামনে উপস্থাপিত করিতে পারে নাই, আর ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে গৃহীত সমাজবাদের দিকে দেশকে এক চুলও আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই বা কংগ্রেসে অনুপ্রবিষ্ট কায়েমী স্বার্থ-চক্রের কারসাজিতে আগাইয়া লইয়া যায় নাই।

বাঙলা দেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগ হইতেই অন্যান্য প্রদেশ হইতে অনেক বেশী রাজনৈতিক-সচেতন। বঙ্গ বিভাগের সুযোগে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস এমন একটি গোষ্ঠীর হাতে চলিয়া গেল যাহারা বিপ্লবী বাঙলাকে সযত্নে মুছিয়া ফেলিল। ভাবী যুব সমাজের কাছে যাঁহারা দেশ-প্রেমের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রেরণার উৎস হইতে পারিতেন তাঁহারা ঘটনা-প্রবাহে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেন।

বাঙলার যুব সমাজের বুকের মধ্যে যে নূতন সৃষ্টির ব্যাকুলতা—উহা কোন পথ না পাইয়া যেখানে সেখানে ভাঙিয়া পড়িতেছে। পথের সন্ধানে সে যদি দেখে ভারতবর্ষের ধর্মীয় স্থানে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, শিল্প-ক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, কৃষি ক্ষেত্রে, সরকারী বেসরকারী এক কথায় সমাজের সকল স্তরে শুধু বঞ্চনা আর বঞ্চনা, তবে এই অসহায় অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য সে যদি বিদ্রোহ করে, তবে তাহাদের দোষ দিয়া লাভ নাই। আমাদের শাসনতন্ত্রে সমানাধিকার, শিক্ষা-বিস্তার, কর্মসংস্থান প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি আছে, কিন্তু উহা কার্যকরী করার প্রচেষ্টায় কতটুকু আন্তরিকতা ছিল আর কতটুকু ফাঁকি ছিল ইহা আজ কংগ্রেসী নেতৃবর্গ নিজেদেরই নিজেরা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে পারিবেন। ফাঁকিটুকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না। ফাঁকিটুকি যে ছিল ইহা আজ আর বুঝিতে কষ্ট হয় না; নহিলে গত ২০ বৎসর কংগ্রেসী সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠায়, কৃষির উন্নতিতে, ব্যবসা বাণিজ্যে, শিক্ষা বিস্তারে, রাস্তাঘাট হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করা সত্ত্বেও উহার ফল কেমন করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের কুক্ষিগত হয়? সাধারণ মানুষেরও আজ অনেকটা বুদ্ধি হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে বঞ্চিত আশের সবটাই মুনাফাবাজ ব্যবসাদার শিল্পপতিরা শুষিয়া লয়। জনসাধারণকে এই বঞ্চনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেসী সরকার কিম্বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এতটুকুও নড়িয়া বসেন নাই। গত ২০ বৎসরে ইংরেজ আমল হইতে অন্ততঃ দশগুণ বেশী আইন রচিত হইয়াছে, কিন্তু সব আইনই নিষ্ক্রিয়। দুর্নীতি-পঙ্কে গোটা জাতটাই যেন আজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এই অবস্থার জন্য কংগ্রেসী নেতৃবর্গ ছাড়া আর কে দায়ী হইবে? এতকাল এক হয় তাঁহারা ক্ষমতার প্রতি কামবশতঃ অন্ধ হইয়াছিলেন, নয় তো ভেতরে ভেতরে স্বার্থদুষ্ট চক্রের কাছে নতি স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে শোষণ বৃদ্ধিরই সহায়তা করিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ রুদ্র জাগরিত হইয়াছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ ১৯৪৩ সনে "ভারতের মাটিতে মার্ক্সীয় দর্শন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "কম্যুনিজম আসার মূলে রয়েছে ধনিক ও ভূস্বামীদের অন্তরের কাম"। Class ও mass একই সমগ্রের দুইটি অংশ মাত্র। উহাদের হৃদয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যদি সমগ্রের সেবায় রত হইতে পারে তবেই একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে। আর class ও mass যদি উহাদের কামের দৃষ্টিতে শোষণের দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখে তবে সেখানে class war অনিবার্য। ধনিক ও ভূস্বামীদের অন্তরের কাম fact ঐ কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করাই আমাদের task। গান্ধিজী ছিলেন সমাজে প্রচলিত সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে, আচরণে ও চিন্তায়, মূর্ত প্রতিবাদ। তাঁহার শোষণ মুক্ত সমাজ পরিকল্পনায় class হীন mass বা mass হীন calssএর কল্পনা ছিল না। বর্তমান মনঃসমীক্ষণ অনুসারেও উহা যুক্তিযুক্ত নয়। class class রহিয়াও উহার অন্তরের কাম ঊর্ধ্বীভূত করার জন্য গান্ধিজী trusteeship মনোভাবের কথা বলিয়াছেন। দেশের দুর্ভাগ্য গান্ধিজীর অনুগামীগণ ভারতবর্ষে মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ private sector ও public sector-এ কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রবর্তন করিলেন, কিন্তু বিত্তের অধিকারের প্রতি কাম দৃষ্টি সংযত করার জন্য trusteeship ভাবধারার দেশকে, শিল্পপতি ভূস্বামীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এতটুকু চেষ্টাও করিলেন না। আজ কি ধনিক কি শ্রমিক, কি ভূস্বামী কি কৃষক সকলেই যেন কাম-কবলিত হইয়া পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে যাইতেছে।

উপরোক্ত ভারতের মাটিতে মার্ক্সীয় দর্শন প্রবন্ধে স্বামীজী লিখিয়াছেন—পুরুষোত্তম যুগে যুগে ভূ-ভার হরণের জন্য ধরার বুকে অবতীর্ণ হন। তখন তিনি রাখাল রাজ, গোষ্ঠবিহারী রূপে কৃষকদের সঙ্গে ব্রজলীলা আস্বাদন করেন, রাখালের রাজধী প্রতিষ্ঠার পত্তন

করেন। কৃ-তার তিনি যত হরণ করিবেন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা ততই বাস্তব হইবে। কৃ এবং কৃমি তখনই হয় নিজের কাছে তার-স্বরূপ, যখন কৃ-পতির দল, কৃ মালিকের দল শোষকের দৃষ্টিতে কৃ-এর দিকে, কৃমির দিকে তাকান। কৃ ও কৃমি এই ভাবে শোষিত ও ধর্ষিত হইলেই মুখ চিরিয়া রুদ্রের আবির্ভাব হয়। আজ বিশ্বে তাহারই তাণ্ডব নৃত্য চড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছে, প্রাকৃতিক বিধানে ইহা অনিবার্য্য। কম্যুইনিজমই রুদ্রের এই তাণ্ডবলীলা। ইহা আসিবেই, না আসিয়া ইহার গত্যন্তর ছিল না। যতদিন ও যতখানি কৃষামীদের 'লোভ' ততদিন ততখানি কম্যুইনিজম্ সত্য। কম্যুইনিজমকে বাহির হইতে ঠেকা দেওয়া চলিবে না। ইহার প্রতিকারের জন্য মূলের অনুসন্ধান করিতে হইবে।"—

প্রাকৃতিক বিধানে class ও mass থাকিবে। তবে উহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে ratio রহিয়াছে সে ratio অবশ্যই থাকা চলিবে না। ধনিক শ্রমিকের সম্পদের তারতম্য বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহা যেমন নিশ্চয়ই থাকিতে পারে না, তাহার পরিবর্ত্তন যেমন অবশ্য প্রয়োজন, তেমনি সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে class ও mass এই দুইটী দুইটী মনোবৃত্তি—সম্পদের পরিমাণ সেখানে একমাত্র কথা নয়। এক পয়সার জন্য পথের ভিখারীও অপরের সঙ্গে কলহ করিতেছে, আবার সম্পদের পরিমাণ যত বেশীই হউক তাহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা হইতে মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অতএব বাহিরের পরিমাণগত সাম্য আনিবার যেমন চেষ্টা করিতে হইবে, তেমনি সম্পদের প্রতি কণাই যে বিশ্বসম্পদ—World property—তাহাকে একান্ত আমারই করিয়া তোলার যে আমার পোড়া থেকেই অর্থাৎ এক পয়সা থেকেই কোন অধিকার নাই এই কথাটা—উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' কথাটাও মানুষের সামনে উপস্থিত করিতে হইবে। তাই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করিয়া mass class উভয়ই একই সমগ্রকে তাহাদের সকল প্রচেষ্টাদ্বারা গড়িয়া তুলিতে পারে এমন একটি বৃহত্তম synthesis-এর শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। class mass উভয়ে একই সমগ্র সমাজের অংশ হইয়া পরস্পরের পরিপূরকও বটে (যদিও আছে তাহাদের মধ্যে একটা পরস্পরবিরোধিতাও) এ কথাটা গোড়ায় স্বীকার করিতে পারিলেই সেই greater synthesisকে লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। শুধু classও সমগ্র সমাজ নয়, শুধু massও নয়। সেই সঙ্গে এই কথাও সত্য যে প্রতি মানুষই একই সঙ্গে classও বটে, massও বটে। এতখানি ব্যাপকতার সঙ্গে দেখিতে পারিলেই class war এড়াইয়াও কম্যুনিজমের সত্যকে আমরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বর্ত্তমান কালের শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও অতীতের পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও দর্শন অবলম্বনে এই তত্ত্ব প্রস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহার অনুশীলনের জন্য চাই এমন একদল কর্ম্মী যাঁরা আদর্শনিষ্ঠায়, তিতিক্ষায়, ধৈর্য্যে, মানব সেবায় নিরলস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সর্বোপরি সেবাবুদ্ধিপূর্ণ। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কি আজ আর এমন কর্ম্মীদের সমাবেশ সম্ভব? অপরাপর দলগুলির সম্বন্ধেও এই একই জিজ্ঞাসা।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মানুসারে কায়েমীস্বার্থ কংগ্রেস-দল শাসন ক্ষমতা হইতে জনসাধারণের ভোটে বিতাড়িত হইয়াছেন বটে কিন্তু তাহারা স্বলে যে দল বা যে সকল দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতেছেন তাহারাও কি শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন? এই সকল দলের পরস্পর বিরুদ্ধ চরিত্র দেখিয়া আশা করিতে পারি না যে জনসাধারণের দুঃখের ভার তাহারা হরণ করিতে পারিবেন। বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের মধ্যেকার প্রধান দল C P I (M) ও উহার সমক্ষমতাবলম্বীগণ class warএ বিশ্বাসী। ইহারা জনসাধারণের কল্যাণ অপেক্ষা যে class war-কে স্বরান্বিত করার জন্য সরকারকে ব্যবহার করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। class warকে স্বরান্বিত করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে ইহারাই যথা সময়ে সকল যাঁরা মুক্ত হওয়ার জন্য যুক্তফ্রন্টকে ভাঙিয়া দিবেন ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে। কংগ্রেস যেমন ক্ষমতাকে কায় দৃষ্টিতে দেখিয়া ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন, ইহারাও শেষ পর্য্যন্ত শেষরক্ষা ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। সে চিহ্ন কম্যুইনিষ্ট

জগতে এখন সুপরিস্ফুট। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মধ্যে যে মনোলিখিক চরিত্রের কল্পনা আছে উহার মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মানুসারেই যে ফাটল ধরিতেছে এই সত্য যদি ইহারা বুঝিয়া সাবধানে সকলকে লইয়া চলিবার পথ অবলম্বন করেন তবেই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া তাহারাও ধন্য হইবেন, পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদ ধারা ভারতের নিকট একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

আজকের প্রার্থনা

বেলানিল

কণ্ঠ আমার দীপ্ত কর হে
উন্নত কর শির,
শঙ্কা আমার দূর করে দাও
প্রাণ-মন কর ধীর।
শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া মায়া দিয়া
তোমার প্রেমেতে রাঙাও এ হিয়া
অসৎ নিরোধী সেবা মন নিয়া
হয়ে উঠি যেন বীর॥
হীনতা, হীনতা কালিমা মুছায়ে
শক্তি-হীনতা বেদনা ঘুচায়ে
পঙ্কিলক দূর করে দাও
ব্যর্থ ধরিত্রীর।
বিভেদ বিষাদে, শঙ্কিত মনে
বিশ্বাস নাহি আপনার জনে
ক্রুর দানবে গ্রাসিয়া ফেলিছে
নিত্য শান্তির নীড়।
সকলি গিয়াছে মলিনময় হ'য়ে
হীন অন্তরে আজি
আকুলিত মন পেয়েও হারায়
ব্যর্থতা ওঠে বাজি।

তোমার আলোর আঘাত হানিয়ে
পাঞ্চজন্য আবার বাজিয়ে
মোহতন্দ্রা দূর করে দাও
অসহায় পৃথ্বির।
দিকে দিকে শুনি হাহাকার রব,
মরণের পথে চলিয়াছে সব।
সৃজন মন্ত্রে বিনাশের সুর,
নব সৃষ্টিরে করিছে আতুর।
ভোগের কামনা শাপদের মত
টুটি ছেড়ে শান্তির।
তুমি ভগবান, আসি নর সাজে
আপনি বিকশি, আপনার মাঝে
বন্যা উঠায়ে, সমীর বহায়ে
ভাল হয়ো ধরণীর॥
মম অন্তরে নমি অহরহ
প্রতি ক্ষণে মোর মন কেড়ে নহ
তোমাতে আমায় লীন ক'রে দিয়ে
তোমার ঠাকুর আমাতে জাগিয়ে
পাপ নাশো পৃথিবীর।
আমাকে কর গো ধীর॥

আমার বাড়ী

॥ শ্রীভারতী ॥

আমার চাই মস্ত একখানা বাড়ী।
জানতে চাইছ ক' তলা ?
না ভাই, খুব অনেকতলা নয়,
তবে দোতলা হলেই ভালো।
এত তলার মাটি আর দোতলার ছাত
আমি তাই এ দুটোকেই চাই।
তারপর শোনো, বাড়ীটাতে থাকবে
অনেকগুলো বড় বড় জানলা আর দরজা
আর মস্ত একখানা ফুলের বাগান না হলে তো
আমার চলবেই না।
হাসছো তো ?
আহা, হাসির কথা মোটেই নয় ;
ভাবছো গরীবের ঘোড়া রোগ একেই বলে—তাই না ?
ভুল করছো বন্ধু,
সখ সাধ তো গরীবেরই থাকে—
বড় লোকেরা তো পেয়েই আছে সব
মস্ত আকাশ ছোঁয়া সাত-তলা বাড়ীতে ওদের চিরকেলে
বাস।
কিন্তু মজা কি জানো !
তবু আকাশটাকে ওরা কিছুতেই ছুঁতে পারছে না।
এখানেই আমার চাওয়াটা একটু বড়।
আমার বাড়ী হবে আকাশের একেবারে কোল ঘেঁষে
পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ সব দিকের আকাশ থাকবে
আমার নাগালের মধ্যে।
মিষ্টি মধুর হাওয়া বইবে এপার থেকে ওপারে।
চাঁদ সুরুজ একটুও আড়াল পড়বে না।
তারাগুলো রাতভর খুশির ছটা ছিটিয়ে দেবে
আমার জানলা দিয়ে
ভাবছো যার পাক্কা জোটেনা তার পোষাওয়ের সাধ!
আহা, আজ না হোক কালও তো হতে পারে সেটা
হতাশ হবার কিছু নেই।
আমার ফুলের বাগানে বারোমাস ফুটে থাকবে
গুচ্ছ গুচ্ছ গন্ধ ভরা সাদা ফুলের রাশি
কামিনী আর শেফালি,
রজনীগন্ধা আর বেল যুঁইয়ের সুবাসে
আমার ঘরটি থাকবে সারাক্ষণ ভরে ;
সেই ফুলের সঙ্গে এক হয়ে থাকবে আমার ভাইবোন
ছেলেমেয়ে আর নাতি নাতনীদের মুখের
তৃপ্তি মধুর হাসি।
বাড়ীটার ভেতর আর বাইরেটা ফুটফুটে থাকবে
চাঁদের আলোর মত ফুটফুটে পরিচ্ছন্ন।
আমার রান্নাঘরে বসে ছেলে বুড়ো সবাই
পেট ভরে খাবে আর গল্প করবে খুশি মনে।
পরিবেশন করব আমরা মায়েরা মেয়েরা—কেমন ?
এবারে ভালো লাগছে তো ?
হাঁ, সবারই থাকবে পরিপাটি বিছানা
এ বাড়ীতে কেউ তাই শীতে বর্ষায় একটুও কষ্ট পাবেনা,
আচ্ছা, ভালো যখন লাগছে তখন আরো একটু বলি—
কেমন ?
বন্ধুত্ব আর মিষ্টি কথায়
সহযোগিতায় আর সহৃদয়তায়
বাড়ীর সব বাসিন্দারাই হবে আন্তরিক,
কেউ কাউকে ডিঙিয়ে যেতে চাইবে না
জ্ঞানে ও সৌন্দর্যে সবাই হবে ভারী ভালো।
সত্যি বলতে কি অমন একখানা বাড়ী আমার না হলেই
নয়,
কিন্তু বাড়ীটা শুধু আমার নয় গো, আমাদের ;
আমাদের সকলের
কি ভাবছো !
পছন্দসই তো ?
অপছন্দ ?
একটুও না—।
দেখেই নিয়ো।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি, নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন ধরার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্ণের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। † † †"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

Central Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No. 57-2540 UJJWALBHARAT

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে এক করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

One family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

18 MAR 1969

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ
১১। গীতাজয়ন্তী
১২। উদ্ধবভাগবত (পুস্তিকা)
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-মুক্তিকমিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মুদ্রিত হইতেছে)
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীপ্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির জন্মকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়ঋষি শ্রীনিত্যগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন
রবীন্দ্র-হৃদয়
প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

প্রতি সংখ্যা ৮০ পয়সা, বার্ষিক পাঁচ টাকা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৫-৭৬, ১৯৬৯ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুই-এর সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। অধির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পলগুলির নক্সাই এমন, হাতে হাওয়া খেলতে পায়, যাতে সারাদিন পায়ে থেকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আরাম [illegible] বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েই বুকোনো পায়ের স্বাস্থ্যরক্ষার কথা মনে রেখেই এরা তৈরি। পরলেই চলতে ফিরতে মনোরম স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভব। সুতোয় তৈরি চলার ফলে হালকা ও সাবলীল করে রেখে। আপনার প্রিয় বাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম স্যান্ডাল ও চপ্পলের যেন জোড়া ওরা রেখেছে—এখানে তার মাত্র কয়েকটি নক্সাই দেখানো। আসুন না, একবার পায়ে দেখুন।

সারাদিনের আরাম...
গরমে চলুন
হালকা পায়ে

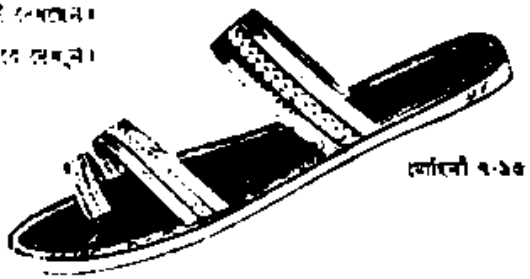

মোহনী ৭·১৫

বিজয় ৮·৫০

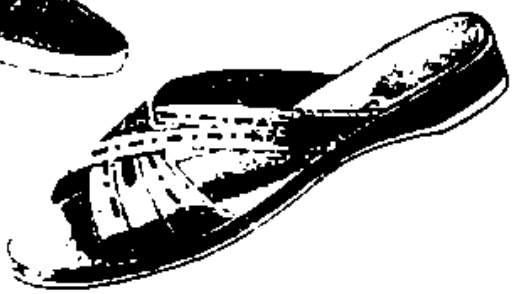

Bata

স্বপ্নীল ১৪·১৫

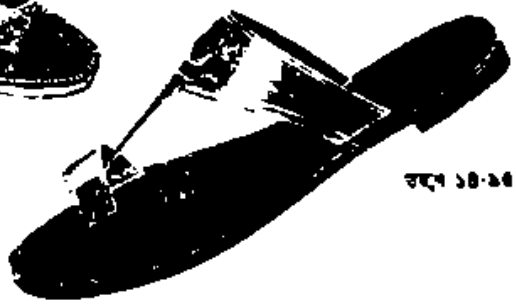

রংপে ১৪·১৫

রমা ১১·১৫

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		বাংলার ঋষি	৩·০০
শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০	বাংলার বিদুষী	২·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·০০	বাংলার মনীষী	১·৩০
কর্মবাণী	১·২৫	জীবন গড়া	০·৭৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০	আচার্য জগদীশ	২·৫০
Soul of India Speaks	৫·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
পকেট গীতা	৩·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ		**শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি**	
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	বিদ্যাসাগর	২·২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০		

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

UNIVERSITY

উদ্বোধন

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৫-৭৬ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৯ দ্বাবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

চোখ মেলিয়া চারিদিকে চাহিলে দেখি কত যে মানুষ। হাত পা চোখ কান লইয়া ইহারা সকলেই মনুষ্য পদবাচ্য। কিন্তু মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা ওঠে, সকলেই কি মনুষ্যত্বভূষিত মানুষ? সকলেই কি এক? সকলেই কি সমান? বাহিরের আকৃতিতে সকলেই মানুষ বটে, কিন্তু আর সবেতে? জীব-সত্তাও—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য অথবা আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন—সকলের মধ্যে এক রকমের নয়, আর মনুষ্যত্ব যাহাকে বলে তাহাতেও মানুষে মানুষে বিস্তর ফারাক। এই সমস্ত কিছুর প্রভেদে মানুষে মানুষে কতই না পার্থক্য! কাম ক্রোধ লোভে আচ্ছন্ন ব্যক্তিও আছে, সহজে কাম ক্রোধে নিজেকে হারাইয়া ফেলে না, এমন লোকও আছে। নিজের স্বার্থে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কিছু বোঝে না, এমন লোকেরও অভাব নাই, আবার অপরকে লইয়া অপরের মর্যাদা দিয়া চলিতে ভালবাসে এমন লোকও কম হইলেও আছে। 'য পচ্যতে আত্মকারণাৎ স্তেন এব সঃ'। কেউ কেউ একেবারে ব্যক্তি-সত্তার জন্য বাঁচে, কেউ কেউ দলের স্বার্থে। সকলেই চোর পদবাচ্য। বিছিন্ন ব্যক্তি বা দলের স্বার্থেও যাহারা বাঁচে তাহারা যদি নিজেরা বাঁচিবার জন্য অন্যকে পরাভূত করিবার প্রয়াস না করিত তাহা হইলেও বলিবার তেমন কিছু ছিল না—কিন্তু ইহারা সবাই নিজেদের জন্যই শুধু বাঁচে না—অন্যকে নিজের স্বার্থে পরাভব করিয়াই নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। অন্যকে পরাভব তাহারা ঠেকিয়া করে না, অন্যকে পরাভব তাহারা করা উচিত বলিয়াই করে। এই-ই হইতেছে সমাজ সংসার রাষ্ট্রের সাধারণ রূপ। ইহার মধ্যে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকিলেও মূল মনোবৃত্তিতে তাহারা এক।

কিন্তু কাহাকেই বা বলিব, কে-ই বা বিশ্বাস করিবে যে এই সমস্তর বিপরীতও আছে। এমন মানুষও এই আলোবাতাসের মধ্যে এই মাটির জগতে ছিলেন যিনি নিজের জন্যও বাঁচেন না, দলের জন্যও বাঁচেন না; যিনি এমন ভাবেই বাঁচেন যেটা সকলের জন্যই বাঁচা এবং সর্বোপরি কথা হইল অপরকে পরাভব করিবার মন লইয়া তিনি বাঁচেন না। যে বাঁচার পিছনে অন্য মানুষ বা অন্য দলকে পরাভব করার বুদ্ধি থাকে, সে বাঁচার মধ্যে মানবোচিত সৌন্দর্য নাই—সে শুধু মনের পশুর শুধু। তাহারা প্রত্যেকে চেষ্টা করে অপরকে মারিয়া নিজে বাঁচিবে, অপরকে হারাইয়া নিজে জিতিবে, অপরকে অপদস্থ করিয়া, ছোট করিয়া নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করিবে, অপরকে অপমান করিয়া নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই রকম বাঁচার কথা সাধারণ মানুষ বোঝে, জানে। কিন্তু আরও একটা বাঁচার রকম তিনি রাখিয়া গেলেন যিনি সকলকে লইয়া বাঁচিতে চাহিয়াছেন। যিনি সকলকে লইয়া বাঁচেন তিনি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই উপনিষদ-বাণীকে জীবনের সব কিছুকে মূর্ত করিয়া বাঁচেন। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জীব, প্রতিটি বৃত্তি যে ব্রহ্ম—বড়, কল্যাণময়, সর্বভূতহিতে রত—ইহা যেমন তাঁহার

সকল বাকো, সকল আচরণে, তেমনি প্রকাশমান বিশ্বের স্বতঃসিদ্ধ সত্য দুঃখ বেদনা লাঞ্ছনা অপমান সত্ত্বেও যে মানুষ আনন্দ হইতে জাত, আনন্দতেই জীবিত এবং আনন্দতেই প্রয়াণ করে সেই সত্যও তাঁহার জীবনে সুন্দরভাবে প্রকাশিত। আরও কথা এই যে, এই আনন্দ-পূর্ণ জীবন-চেতনাকে সকল মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার প্রেরণা লইয়াই তিনি জীবিত থাকেন।

এই রকম করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন এই সেদিনের শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল আজ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসের বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে যাঁহার ১১৪-তম শুভ আবির্ভাব তিথি। প্রেম-স্বরূপ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল এই আলো-আঁধারের পৃথিবীতে যে কয়েকটি বৎসর জীবিত ছিলেন, সেই সময়টুকু একটু নূতন রকম করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। সাতান্ন বৎসরের দিনগুলি তিনি যেমন করিয়া কাটাইয়া ছিলেন তাহা সেদিনের মানুষের পক্ষে তো বেশ দুর্বোধ্যই ছিল, এখন-কার মানুষ বিশ্বজোড়া বর্তমান নূতন পরিবেশে জীবন ও জগতের নূতন মূল্যায়নের চলমান কিছুটা শুধু বুঝিতে পারে বুঝি—অন্ততঃ আজ এটা বোঝা যায় যে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল একটা অনাগত অথচ আগতপ্রায় জীবন-সূর্য যাহার রশ্মিরেখা আকাশে সবে মাত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সাতান্ন বৎসর আগে এ সূর্যের প্রভায় আকাশ রাঙা হইয়াছিল বা, কিন্তু সে সূর্য-রশ্মি কোন্ বারতা বহন করিয়া আনিতেছে তাহা কেহই ধারণা করিতে পারে নাই।

কেমন করিয়া সেদিনের মানুষ তাঁহাকে বুঝিবে? আজই বা কতটুকু বোঝে? যিনি সন্ন্যাসী—তিনি বিশ্বভুবন হইতে শতহস্ত দূরে থাকিবেন, নিজেকে সমস্ত চেতন অচেতন বস্তুনিচয় হইতে সযত্নে সরাইয়া রাখিবেন, শত আচারের বেড়াজালে নিজেকে একটি অস্বাভাবিক দর্শনীয় সামগ্রী করিয়া মূর্খ মানুষের সামনে বিরাট বিস্ময় লইয়া প্রতিভাত হইবেন—বাস্তব-বিমুখ ভারতবর্ষ হাজার হাজার বৎসর সন্ন্যাস সম্বন্ধে ইহাই বুঝিয়াছে, বুঝাইয়াছে—ইহারই কৌলীন্যের আত্মগরিমায় নিজেকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। আর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল কি করিলেন? তিনি আড়াই বৎসর বয়স হইতেই নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কোন্ অসীমে চলিয়া যাইতেন অথচ তিনিই বলিলেন—'এই বিশ্বই আমার মহাপীঠ'। বিশ্ব ভুবনে তিনি ছিলেন আনন্দিত—তাই কোন ঘটনা বা বস্তুকেই তিনি ভয় পাইলেন না—সকলকে—সকল মানুষকে, সকল ঘটনাকে লইয়াই তিনি থাকিলেন অথচ কোন বস্তু বা ঘটনা তাঁহাকে আসক্তি বা বিদ্বেষের বন্ধনে বাঁধিতে পারিল না। আসক্তি বিদ্বেষ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই বলিয়া জীবনের আনন্দ তাঁহার নষ্ট হয় নাই। নারী ছিল ভারতবর্ষের সাধকের আছে ভীতির বস্তু—দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী; বর্ণাশ্রম-দুষ্টগ্রস্ত ভারতবর্ষ পুরুষ-কৌলীন্যপ্রধান জীবন-চেতনায় যে-নারীকে হজম করিতে না পারিয়া ঘৃণাবিদ্বেষে জীবনের বাধাস্বরূপ বলিয়া নারীকে মহত্তর জীবন যাপনের পরম অন্তরায় বলিয়া বুঝিয়াছিল, পরম মনোবিজ্ঞান পরম বৈজ্ঞানিক পন্থা সাধনার সহজ সিদ্ধ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল বহু-নিন্দিত সেই নারীকে সাধনা ক্ষেত্রে সমান স্তরে আনিয়া দাঁড় করাইলেন, সমান অধিকার দিলেন, তাঁহার মঠে নারীকে স্থান দিলেন। যে মনুষ্য-সমাজের স্পর্শ হইতেই সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ নিজেকে তফাৎ রাখিয়া বনে থাকিতে পারাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছে, সেই মানুষের নিম্নতম স্তরকেও শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল পরম আপন জ্ঞানে বুকে টানিয়া লইয়াছেন। কোন রকম মানুষের স্পর্শ বা কোন ঘটনাই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারে নাই। কোনো বিধিনিষেধ আচার ব্যবহারের দ্বারা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার সহজ জীবনকে অস্বাভাবিক করিয়া বিড়ম্বিত করেন নাই—সমস্ত রকম বিধিনিষেধ ছিল তাঁহার কিঙ্করমাত্র। সাংসারিক হিসাবে বংশ বা অর্থ বা পাণ্ডিত্যের কৌলীন্য কিংবা সন্ন্যাসের কৌলীন্য কোন কিছু দ্বারাই মানুষের নিকট হইতে গণতন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল নিজেকে দূরে রাখেন নাই। তাই কেহ তাঁহাকে ভাল কিছু খাইতে দিলেও তিনি তাহা ত্যাগ না করিয়া খাইতে পারেন নাই—বলিয়াছেন,—একেলা খাইব

সুখ না পাইব'। সন্ন্যাসীকেও মানুষকে লইয়া বাস করিতে হয় এবং করা উচিত—মানুষেরই খাইয়া পরিয়া সাধারণ মানুষ হইতে নিজেকে বিশিষ্ট জীব করিয়া লওয়াইয়া রাখিয়া এক অজ্ঞেয়বাদ প্রচার করিলে যে জীবনকে অস্বীকার করা হয় এবং সে অস্বীকৃতির পথে যে সমাজ নীচে নামিতে থাকে একথা জানিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তাহা সমূলে ভাঙিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি মানুষের জন্য বাঁচিয়াছিলেন, মানুষকে লইয়া বাঁচিয়াছিলেন, অথচ মুহূর্মুহু তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে কোন্ অসীমেও চলিয়া যাইতেন। তাই তো সহজ মানুষ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয়-মূর্তি, তাই তো তিনি এ যুগের মানুষের দ্বন্দ্ব-সমাধান মূর্তি। মানুষ যে একই সঙ্গে সব কিছু হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া নিতে পারে, আবার সব কিছুর মধ্যে অবতরণ করিয়া সব কিছুকে তাহাদের নিজস্ব মর্যাদা দান করিয়া সব কিছুকে জড়াইয়া থাকিতে পারে—এই উভয় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে না পারিলে যে মানুষের সমাজে মনুষ্যত্বের বাসস্থান থাকে না, উহা যে একদেশে হইয়া পড়িয়া এতদিনকার সাধুদের মতে বন্ধন-স্থান হয়—একথা জানিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল আজিকার দিনে immanent ও transcendent জীবন একই সঙ্গে যাপন করিয়া গিয়াছেন। যাহাদের পরস্পর বিপরীত বলিয়া জানিয়াছিলাম, জানিয়াছিলাম যে কিছুতেই উহাদের মেলান যায় না, উহাদের মধ্যে আসমান জমিনের ব্যবধান—সহজ মানুষ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেখাইয়াছেন যে বস্তু-ধর্ম সম্বন্ধে উহা ভুল ধারণা। বস্তুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ করার ধর্ম যেমন বিদ্যমান, তেমনি দূরে ঠেলিয়া দিবার ধর্মও একই সময়ে রহিয়াছে যে জন্যেই ভাগবত অন্বয় ও ব্যতিরেককে জীবনে একই সঙ্গে চালাইতে বলিয়াছেন। জীবনে অন্বয় অর্থাৎ সংযোগ ও ব্যতিরেক অর্থাৎ পার্থক্য, বিয়োগ—দুইটাই সমভাবে সত্য বলিয়াই জীবনে কিছুরই অনির্বচনীয়তা কোনদিন শেষ হইল না—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-জীবনে এইটি আজ আমাদের এই ধরা ছোঁওয়া কালের মধ্যে প্রমাণিত হইয়া আছে। আমি এই বিশ্বের সমস্ত কিছুর সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া আমি, আবার এই সমস্ত কিছু আমা হইতে পৃথক—এই দুইভাবে সাধনা করিতে পারিলে জীবনে পরা শান্তি পরা স্থিতি লাভ করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। ইহাই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল।

এই সহজ জীবনের সামগ্রিক ধর্ম সহজ বলিয়াই ঐকদেশিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ হয় নাই, আচরণ করাও সহজ হয় নাই; তাই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল আজও একরকম অপরিচিতই। এবং ঐ একই কারণে পাঁচ হাজার বৎসরাধিক কালের পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণও অদ্যাবধি অবোধ্য দুর্বোধ্য। পূজা তাঁহার অনেকই হয় বটে—কিন্তু দুই প্রান্ত—ঐশ্বর্য আর বৈরাগ্য, প্রজ্ঞা ও প্রেম, বিস্তীর্ণ ও গভীর গুণসমূহ, বিদ্যা ও অবিদ্যা, গতি ও অগতি, কাল ও পুরুষ—যাঁহার মধ্যে সমন্বিত হইয়াছে, সেই সহজ মানুষ, প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁহার মূল্যে 'বেদ্যবান্' হইয়াছেন? তাঁহার সমগ্র জীবনের এক একটি দিক লইয়া আমরা তাঁহার এক এক মূর্তি দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছি—নহিলে 'সমগ্রম্ মাম্' বলিয়া, সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া যিনি নিজেকে প্রকাশ করিয়া গেলেন, তাঁহাকে লইয়া আমাদের এত বিবাদ বিরোধ কেন?

সহজ হওয়া, মানুষ হওয়া—এই সহজ জীবন-ধর্ম আমরা ভুলিয়াছি বলিয়া এমনটি হইতে পারিল। শ্রীকৃষ্ণের সহজ জীবনকথা মনে করাইয়া দিতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব। আজিকার দিনের আকাশে বাতাসে এই সহজ হওয়ার কথা, মানুষ হওয়ার কথা। কে কতখানি মানুষ হইয়াছে, তাহাদ্বারাই তাহার পরিচয়—কোন জাত কুল পাণ্ডিত্য দিয়া নয়। 'মানুষ' হওয়ার মধ্যেই জীববৃত্তি ও মনুষ্যবৃত্তির সমন্বয় হয়—এই দুই বৃত্তির সামঞ্জস্য তাহার মধ্যে হওয়া সম্ভব বলিয়াই মানুষ এত সুন্দর, এত সম্ভাবনাময়, এত অনির্বচনীয়।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল সকলকে লইয়া চলিলেন, সকলকেই ভালবাসিলেন, মর্যাদা দিলেন—একথা বলিলেই যোগ্য অযোগ্য, অধিকারী অনধিকারী, ভাল মন্দ সবই সেই সকলের মধ্যে আসিয়া যায়। জীবনসাধনার আচরণ-বিধি তখন কি? গণতন্ত্রও এমনই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন। একটা নির্দিষ্ট বয়স হইলেই যদি সকলে সমান অধিকার

পায়, এবং সেই অধিকার পাওয়া মানেই যদি হয় সে সব বিষয়ে যোগ্য, তাহা হইলে সত্যিকারের যোগ্যতার স্থান থাকে কোথায়? যোগ্য হইবার জন্য চেষ্টাও থাকে না। আমি ভাল হই আর না হই, আমি মহৎ জীবনকে ভালবাসিয়া শুদ্ধ জীবন যাপন করি আর না করি, শ্রীভগবান অথবা মহান প্রাণ আমাকে ভালবাসিবেন, তিনি পরম করুণাময়, অনন্তবৎসল, আমাকে তিনি ফেলিতে পারিবেন না। তাহা হইলে আমার দিক হইতে করার কিছু থাকে না —এই রকম মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা একেবারেই সত্য নয়। অবতীর্ণ ভগবান পরম করুণাময় সন্দেহ নাই—তথাপি আমি যদি শুদ্ধচিত্ত না হই, আমি যদি যোগ্য না হই, আমি তাঁহাকে ধারণ করিব কেমন করিয়া? তাঁহার বিস্তীর্ণ গভীর জীবনকে আমি অবধারণ করিব, বুঝিব কেমন করিয়া? তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন, ফেলিবেন না—কিন্তু আমি যদি আসক্তি বিদ্বেষ হিংসা ক্রোধদ্বারা আচ্ছন্ন থাকি, আমি তাঁহার মহত্ত্বকে আমার জীবনে কেমন করিয়া প্রকাশ করিব? বিরাটকে ভাল বাসিয়া যদি বিরাট না হই, যদি আমার জীবন সকলের আশ্রয়-স্থল না হয়, তাহা হইলে মহানকে ভালবাসিয়া, পূজা করিয়া লাভ কি? আমার ব্যক্তি-জীবন, সঙ্ঘ-জীবন যদি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত না হয়—তাহা হইলে ভোগাকাঙ্ক্ষাসমাচ্ছন্ন সে জীবন কোন্ সৌন্দর্য বহন করিবে? সমাজের তাহাতে কোন কল্যাণ নাই। শ্রীনিত্যগোপাল যে-কোন স্তরের লোককে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে শুদ্ধতর কল্যাণময় জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। ইহাই গণতন্ত্র দিনের সাধারণ মানুষের জীবনেরও কথা। অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু অধিকারী হইয়া সে অধিকারের যোগ্য হইতে হইতেও চলিতে হইবে। তাহা হইলেই অযোগ্যের অত্যাচার হইতে সমাজ রক্ষা পাইবে।

সমস্ত দিক দিয়াই শ্রীনিত্যগোপাল বর্তমান যুগ-দেবতা। ভারতবর্ষের উপনিষৎ বেদান্ত গীতা ভাগবত তাঁহার জীবনে নূতন অর্থে নূতন রূপে প্রকাশিত হইয়াছে—এমন প্রচলিত অর্থে ধর্মের যে রূপ তাহা তাঁহার মধ্যে নাই, আবার ধর্মহীনতাও তাঁহার জীবন-চেতনায় অনুপস্থিত। তিনি সব কিছুকেই নূতন অর্থে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার কাছে ধর্মের এমন একটী রূপ আছে যেখানে ধর্মহীনতাও নাই, অপর কোন ধর্মের সঙ্গে বিরোধও নাই। শৃঙ্খলা সেখানে জীবনের সহজবৃত্তি; পুরাতনকে সেখানে ভাঙ্গিতে যেমন হয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কিছু গড়িয়া উঠিবে। কিছু গড়িয়া না তুলিলে—যাহা বৃহত্তর, মহত্তর, অধিকতর সৌন্দর্যময় তেমন কিছু গড়িয়া না তুলিলে শুধু ভাঙ্গা চলে না; যাহা কিছুই গড়ে না, তাহা সমাজকে, আনন্দকে, শান্তিকে রক্ষা করিবে কেমন করিয়া?

শ্রীনিত্যগোপাল সর্বসাধারণকে মর্যাদা দিবার পথ দেখাইয়াও সর্বসাধারণের স্তরগত ঔৎকর্ষের বৈশিষ্ট্যলাভ-প্রয়াসের পথ দেখাইয়া মনুষ্যত্বকে বিকাশোন্মুখ করিয়া রাখিয়া নূতন পথরেখা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পথ ধরিয়া চলিব—আমরা সর্ব মানুষকে ভালবাসিব, মনুষ্যত্বকে স্তরে স্তরে উদ্বোধিত করিয়া চলিব, অপরকে পরাভব করিয়া, ছোট করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিব না, অপরকে অপমান করিব না, নিজেকেও অপমানিত হইতে দিব না, বস্তুকে অধিগত করিতে চেষ্টা করিব, আবার বস্তু হইতে নিজেকে ঊর্ধ্বেও রাখিব, আমরা বিচার ও বিশ্বাসকে সমন্বিত করিয়া শৃঙ্খলাপূর্ণ সামগ্রিক জীবন-চেতনায় উদ্বোধিত হইব। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায় গড়িতে আসেন নাই; যে কোন দেশের যে কোন জাতির যে কোন মানুষ যদি সত্যকে চায়, কোন আংশিক দৃষ্টিভঙ্গিদ্বারা যদি নিজেকে ভুলাইতে না চায়—তাহা হইলে সহজ মানুষ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জীবন-চেতনার মধ্যে তাহার পথ-রেখা পাইবে। আজ যে সমস্ত পৃথিবী দ্বন্দ্ব-সমাচ্ছন্ন, সে শুধু সমস্তটুকু দেখিতে চাহিতেছে না বা দেখিতে পারিতেছে না বলিয়া। ধনই হউক বা শ্রমই হউক, জ্ঞানই হউক আর হৃদয়ধর্মই হউক—কোন কিছুকেই অপরকে পরাভব করিবার হাতিয়ার করা যাইবে না। ধন-নিয়ন্ত্রণ যেমন তুমি সমাজের, ব্যক্তি বা সঙ্ঘের—অত্যাচার

করিতে পারিবে না, শ্রমেরও সে অধিকার থাকিবে না—শ্রমকে হাতিয়ার করিয়াও তুমি অপরের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। সর্বত্র এই কথা গোড়ায় মানিয়া ধন ও শ্রম, জ্ঞান ও হৃদয় ইত্যাদি পরস্পরবিরুদ্ধ বৃত্তি বা ঘটনাসমূহের স্থান ও মাননির্দেশ কর—দেখিবে সমাজে শৃঙ্খলাহীনতাও আসিবে না, সমাজ সুস্থ হইবে। ইহাই শ্রীনিত্যগোপাল। তাই শ্রীনিত্যগোপাল শুধু আত্মজ্ঞানের পথ দেখাইতে আসেন নাই—তিনি সামাজিক মানুষের বহুধা সমস্যাকীর্ণ জীবনেও পথ দেখাইতে আসিয়াছেন। তাঁহার সামঞ্জস্যপূর্ণ সহজ জীবন আজ তাঁহার এই জন্ম-ক্ষণে আমরা ধ্যান করি, আমরা যেন ঐ সামঞ্জস্যের সুষমাদ্বারা ব্যক্তি-জীবনকে সুস্থ শৃঙ্খলাপূর্ণ করিয়া সঙ্ঘ-জীবনকে মহত্তর করিতে পারি, কল্যাণঘন করিতে পারি। শ্রীনিত্যগোপালের জয় হউক, মানুষের মনুষ্যত্বের জয় হউক যে মনুষ্যত্ব সর্বজনীন।

মহাত্মাজীর পুনরাবির্ভাব

(পুনর্মুদ্রিত)

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

[শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বর্তমান প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন মুক্তি বৎসরাধিক কাল আগে। মহাত্মা গান্ধী আসমুদ্র হিমাচল যে আলোড়ন ভারতির সর্ব স্তরে আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার বিরাটত্ব উপলব্ধি করিবার চেতনা বর্তমান ভারতের নাই। যাহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন তাঁহারাও সে কথা জনসমাজের কাছে তুলিয়া ধরিতে পারিতেছেন না দেখা যাইতেছে। গান্ধী-চিন্তাধারাকে দার্শনিকভাবে বিচার করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বর্তমান প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন বর্তমানকালে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে চিন্তাধারা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং গান্ধীজীর চিন্তাকে আরও কতখানি আগাইয়া নিলে উহা অধিকতর সামগ্রিকধর্মী হইয়া মানুষের বোধগম্য ও গ্রাহ্য হইবে। প্রবন্ধটী বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে আমরা সকলকে আহ্বান জানাইতেছি।—সঃ, উজ্জীবনভারত]

মানুষের কেহ সাধনা করিয়া পায় না, পাওয়ার পরই তাহাকে সকল সত্তা দিয়া চিনিয়া লইবার, তাহার মহিমা ও মাধুর্য্যকে জীবনের সবটুকু দিয়া আস্বাদন করিবার প্রয়োজন হয়। আলো বাতাস অযাচিতভাবেই মানুষের প্রয়োজনে আত্মনিয়োগ করে, কাহারও তপের অপেক্ষায় থাকে না। বড় বস্তুর ইহাই ধর্ম্ম। ছোট বস্তুকেই সাধনা করিয়া পাইতে হয়; বড় বস্তু তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সহজ প্রেরণায় অতি সহজ বেশে মানুষের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। সহজ জীবন মহাত্মাজীও তেমনি সহজ বেশে, সহজ কথা লইয়া এই জটিল কুটিল সভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন বিশ্বের বুকে একদিন অযাচিতভাবেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে ডাকে নাই, কেহ তাঁহাকে খোঁজে নাই; তিনি অনাহূতই আসিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের হৃদয়ের উপর সহজ আসন বিছাইয়া দিয়াছিলেন।

বসুদেব একদিন বেদনাতুর হইয়া নারদকে বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণকে তো পাইয়াছিলাম, কিন্তু মুক্তি তো আসে নাই"। হীরক পাইলেই পাওয়া হয় না, কাজে লাগান যায় না, যতক্ষণ না তাহাকে চেনা যায় ও তাহার মাহাত্ম্যকে বোঝা যায়। পাওয়া বস্তুকে চেনা, তাহার মাহাত্ম্যকে বোঝা ও তাহাকে জীবনে ফুটাইয়া তোলাই

সাধনা গান্ধীজী আনিয়াছিলেন, আমরা পাইয়াছিলাম। কেন তিনি আসিয়াছিলেন, কি লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা কি সমগ্রভাবে বুঝিয়াছি? গান্ধীজীকে অস্বীকার করিতে পারি নাই বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম, এই স্বীকৃতির মূলে জ্ঞান বিজ্ঞান ছিল কতটুকু? আজ তাঁহাকে চিনিতে হইবে, তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে হইবে, তাঁহাকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তাঁহাকে পাওয়ার পর আজ সাধনা সুরু হইবে।

দীর্ঘদিন ধরিয়া গান্ধীজী জাতিকে আত্মচেতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জাতিকে এতদূর পর্যন্ত আগাইয়া আনিতে তিনিই প্রথম ও প্রধান। এ প্রচেষ্টায় আঘাত তাঁহাকে বহুই সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু জাতির এই মেরুদণ্ড আপন সঙ্কল্পে দৃঢ় ছিলেন। কিন্তু সেদিন চরম আঘাত আসিল, তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার স্নেহ-বন্ধন হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া দিয়া গেলেন

মহাত্মাজীর সরিয়া দাঁড়ানোর ফলে যে শূন্যের সৃষ্টি হইল, সেই শূন্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া গীতার নিষ্কামযোগে যোগী এই ভারতবর্ষ মহাত্মাজীকে জীবনের সকল স্তরে জ্ঞানপূর্বক আয়ত্ত করিয়া জীবনযাত্রা সুরু করিবে, তাঁহারই অঙ্কিত বিশ্বপথ বহিয়া বিশ্বজাতিসঙ্ঘ রচনার দ্বারা বাস্তবের দেশে মোক্ষযোগের সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। যাঁহাকে না চিনিয়া পাইয়াছিলাম এবং সেই না চেনার ফাঁক দিয়াই যাঁহাকে হারাইয়াছি তাঁহাকে আজ অভিজিজ্ঞাসার ভিতরে নূতন করিয়া পাইতে হইবে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা পরস্পরকে কণ্বের আশ্রমে পাইয়াছিলেন সকলের এবং নিজেদেরও অজ্ঞাতসারে। তাই তাঁহারা দুইই আবার দুইয়ের কাছে হারাইয়া গেলেন। কিন্তু দুষ্মন্তের দেওয়া অভিজ্ঞান-আংটিটি ঐ হারাইয়া যাওয়াকে আবার নূতন করিয়া পাওয়ায় গড়িয়া তুলিয়াছিল। বিশ্ব ও মহাত্মাজী পরস্পরকে একবার পাওয়ার পর দুইয়ের কাছেই আজ দুই হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু মহাত্মাজী আমাদের জন্য অভিজ্ঞান আংটি রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্বরাষ্ট্র দরবারে তাঁহার দেওয়া ঐক্যানুভূতি, অহিংসা ও সত্যের সাধনাই মহাত্মাজীর এই অভিজ্ঞান-আংটি। রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক বিশ্বজনীন অদ্বৈতসিদ্ধি এবং তাহারই সাধনপন্থা হিসাবে অহিংসা ও সত্য এই ত্রিবিধ অভিজ্ঞানকে জাতির হাতে তিনি পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই অভিজ্ঞানকে কালের অতল সমুদ্রে আমরা একবার হারাইয়াও ফেলিব জানি; কিন্তু ইহাও নিশ্চিতরূপে জানি যে, প্রকৃতির সহজ বিধানেই একদিন এই ঐক্যানুভূতি, অহিংসা ও সত্যের দ্বারাই আমরা পরস্পরকে আবার লাভ করিব।

বিশ্ব যখন স্বাজাত্যের মোহে আচ্ছন্ন, এক জাতি যখন স্বজাতিদম্ভে অপরের স্বাজাত্যবোধকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য উদ্যত, তখনই মহাত্মাজী লইয়া আসিলেন স্বাত্মিক-জ্ঞানরূপ প্রথম অভিজ্ঞান। তিনি এই গীতাযোগীই সারা জীবন জপ করিয়াছেন, "হে অর্জুন, যে জ্ঞানদ্বারা পরস্পর বিভক্ত সর্বভূতে মানুষ এক অব্যয় ভাব ঈক্ষণ করে, তাহাকেই সাত্ত্বিকজ্ঞান বলিয়া জানিবে"। পরস্পর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত, রক্তাক্ত বিশ্বের বুকে দাঁড়াইয়া কে এমন একতানচিত্তে সকল বিভাগকে মিলাইয়া লইয়া এক অবিভক্ত 'রামরাজ্য' স্থাপনের দুঃসাহসিক কল্পনার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন? এই কল্পনার কিছুও যদি বাস্তবে পরিণত হয়, বিশ্বের জ্বালা ঘুচিবে, রক্তমোক্ষণ বন্ধ হইবে। ঐ কল্পনাকে বাস্তবে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টাই তো সভ্যতা।

এই 'রামরাজ্য' স্থাপন করিতে হইলে তাহার সাধনা হইবে অহিংসা। অহিংসার মূল অর্থ হইতেছে প্রতি বিশেষের স্বয়ং মর্য্যাদাকে প্রাণখোলাভাবে স্বীকার করা এবং বাস্তবের ক্ষেত্রে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার পথ প্রশস্ত করা। যেখানে রক্তের বদলে রক্ত লইবার নীতিই রাজাদের নীতি, রাজনীতি, সেখানে কৌপিনসর্ব্বস্ব ফকির মানুষটি বলিলেন, 'পরস্পরকে স্বীকার কর, মর্য্যাদা দাও, নিজের অঙ্গীভূত বলিয়া আস্বাদন কর'। এই অহিংসাকে কার্য্যোপযোগীরূপে সফল করিতে হইলে চাই যাহা কিছু সত্য তাহার প্রতি অবিচলিত মরণপণ নিষ্ঠা। ইহাই 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'-র রহস্য। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা করিব, না হয় মরিব। যাহা মহাত্মাজী সত্য বুঝিয়াছিলেন, তাহা করিবার জন্য তিনি শেষ রক্তবিন্দু

দিয়া গিয়াছেন। তিনি সত্যের জন্যই মরিয়াছেন উপাসনার বেদীমূলে সকলেই স্বাধীনভাবে যোগ দিবে, কাহারও প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা চলিবে না, কাহারও অঙ্গ তল্লাস করা চলিবে না—এই সহজ কথাটিতে একনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হইলেন। উপাসনা, উপাসক ও উপাসনা মন্দিরের সত্য মর্যাদা দিয়াই তিনি আমাদের মধ্য হইতে তিরোহিত হইলেন। আমাদের সত্য দৃষ্টি নাই, সত্য সাধনা নাই, সত্য সঙ্কল্প নাই। তাই তাঁহার মরণে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আমরা সত্যসন্ধ হইব।

কিন্তু মহাত্মাজীর তিরোধানের পর আরও একটি সত্য আছে, সেটা তাঁহার পুনরাবির্ভাবের। এই পুনরাবির্ভাব কোন্ স্তরে কেমন করিয়া সম্ভব, আজ আমাদিগকে তাহাই বুঝিতে হইবে। যে চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা মহাত্মাজী বিশ্বের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া গেলেন, যাহার পরীক্ষা তিনি সকল ক্ষেত্রে সারা জীবনব্যাপী করিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি খুব আশাবাদী থাকিলেও তাহার বর্তমান সাফল্য সম্বন্ধে তিনি যে মাঝে মাঝে নিরাশ হইয়া পড়িতেন, তাহা আমরা জানি। কেন এরূপ হইত?

বিশ্ব প্রকৃতির ইহা একটি নিগূঢ় সত্য যে, মহাপুরুষগণ যে স্তরে দাঁড়াইয়া যত বড় সত্যই ছড়াইয়া দিন না কেন, তাহা সেই স্তরে অনেক দূর পর্যন্ত বিশ্বকে অগ্রসর করাইয়া দিলেও অনন্তকাল তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে না। বিশ্ব সেই স্তরে আর তাহাকে পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে না। মানুষের মনের ও বাহিরের আবেষ্টন বদলাইয়া যাইবার ফলে তখন প্রচুর বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হইতে থাকে। ক্রমে সেই সত্য গতানুগতিকতার পর্যায়ে উপনীত হইয়া সাধকদের শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়া তোলে এবং তখনই সেই সত্যের পুনরায় সরিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন হয়। মহাত্মাজী বোধহয় অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন যে, ভগবদিচ্ছায় তিনি শীঘ্রই চলিয়া যাইতেছেন।

মহাত্মাজী যাহা দিয়াছেন এবং তাহা যতদূর চলিয়াছে, তাহার পরেও তাহার অনন্ত উপযোগিতা রহিয়াছে। তবে সত্যের ক্রমবিবর্তনে, দেশকালের পরিবর্তিত আবেষ্টনে পরবর্তী আর একটি উচ্চতর স্তরে মহাত্মাজীরই দেওয়া ঐ কর্মপ্রণালী সফল ও সার্থক হইবে। মহাত্মাজী রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে ঐক্য, সত্য ও অহিংসার প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা সত্ত্বগুণের স্তরের। বিশ্বসঙ্ঘকে অধিষ্ঠ দান করিতে সত্ত্বগুণই যে অগ্রগামী, ইহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। 'সত্তাতঃ বৈকল্পো মতঃ' বিশ্বমহাসত্তার বৈকল্প মহাত্মাজীর আসন তাই সুপ্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এই সত্ত্বগুণ সত্ত্বগুণের স্তরেই সার্থক হইবে না, হইতে পারে না। কেননা সত্ত্বগুণের স্তরে সত্ত্ব ও রজস্তমোগুণ পরস্পরবিরোধী, এখানে একে অপরকে ঘায়েল করিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। সাত্ত্বিক মহাত্মাজীও আছেন, রাজসিক শক্তিসম্পন্ন দলসমূহও লুপ্ত হয় নাই। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ ও ব্যবধান সেদিন ছিল, আজও তাহা মুছিয়া যায় নাই, ভবিষ্যতেও যাইবে না। প্রত্যেকেরই অস্তিত্ব সৃষ্টির প্রথম হইতেই ছিল, থাকিবেও। যখন রজঃ কিংবা তমোগুণের প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া সত্ত্ব শুধু নিজের মূল্যেই সমস্ত দেশকে সংগঠিত করিতে চায়, তখন অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাহার বিবাদ লাগিয়াই থাকে। সত্ত্ব ও রজস্তমোগুণ পরস্পরকে প্রতিপক্ষ মনে করিলে কেহই অপরের দ্বারা পুষ্ট হইতে পারে না এবং তাহার ফলে কেহই নিজের কাজও সম্পূর্ণভাবে করিতে পারে না। তাই গান্ধীজীর কর্ম যেমন অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, দেশের অন্যান্য রাজসিক প্রতিষ্ঠানগুলিও তাহাদের কর্মধারা সার্থক হইতে পারে না। 'এক-জগৎ' সংগঠনে মহাত্মাজীর সাত্ত্বিকতার অপরিহার্যতার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য রাজস প্রতিষ্ঠানগুলিরও তাহাকে পুষ্ট করিবার জন্যই পাশাপাশি থাকা উচিত। কেননা প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই জীবনের এক একটি দিককে প্রকাশ করে।

তাই আজ চাই সত্ত্ব ও রজস্তমের সমন্বয়। এই তিন গুণের সমন্বয়ের স্তরে দাঁড়াইয়া অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভবার্জুন'—হে অর্জুন, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমন্বয়ই কর্মক্ষেত্রে গুণাতীতের অবস্থা। কোন গুণকেই বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত হইতে বলেন নাই; জীবনের সকল কিছুতে, এমনকি যুদ্ধের

মধ্যেও তিনি গুণাতীত হইবার নির্দেশ দিয়াছেন। এই গুণাতীতের স্তর ছাড়া কিছুতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে সমন্বয় ও তাহাদের কাহার কোথায় স্থান তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইবে না। মানুষের জীবনে ত্রিগুণের দ্বন্দ্ব যেখানে বিদ্যমান, সেই গুণাতীতের স্তরেই মহাত্মাজীর সাত্ত্বিকতা বিশ্বের সব বিভাগকে অধিকাংশে গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তাঁহার ঐকান্তিক সাত্ত্বিকতা ক্রমপরিণামের সূত্র ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিগুণ সাত্ত্বিকতার স্তরে তাঁহার অসম্পূর্ণ সাধনাকে পরিপূর্ণ করিয়া লইবে। ঐ ক্রমবিবর্ত্তনের পথেই মহাত্মাজী নবকলেবর ধারণ করিবেন, সেইখানে আমরা তাঁহার পুনরাবির্ভাবকে (Resurrection) আস্বাদন করিব। তখনই ভারতবর্ষ বিশ্বভারত উদ্বোধনভারতরূপে সকল সম্প্রদায়ের দ্বারা বিভক্ত জগৎকে 'একজগতে' গড়িয়া তুলিবে, মহাত্মাজীর সাধনা অনুযুক্ত হইবে। বন্দেমাতরম্

একটি খবর

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালস্পর্শে যে জীবন-চেতনা তাঁহার বুকের মধ্য দিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা মানুষের কাছে উপস্থিত করিবার জন্য তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেই কথা বলিয়াছেন। ১৯৩০-এ তিনি বরোদাতে যাইয়া হিন্দী ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য শ্রীকুমারনাথ মৈত্র স্মরণে তাঁহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। একটী দিনের কথা এইখানে প্রকাশ করিলাম।

পুনরায় বরদারাজ্যে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী

(বরিশালের শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ)

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী সুরাট হইতে পুনরায় বরদাতে পদার্পণ করিয়াছেন। বরদাতে শিবরাত্রি উৎসব খুব ধুমধামের সহিত পালিত হইয়া থাকে। সেই উৎসবের সভাপতিত্ব করিবার জন্য উৎসব-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামীজি বরদাতে পদার্পণ করেন। গত ২৬শে এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী উৎসবের অধিবেশন হয়। ঐ দুই দিবসই তিনি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা দেন।

তিনি বলেন শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হিন্দুর অমূল্য গ্রন্থ। শ্রীশ্রীগীতা-জীবন যাপন করিলে মানব সকল ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে। পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রিক সকল জীবনের সমন্বয় মূর্ত্তি শ্রীশ্রীগীতা-জীবন।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গায়কোয়াড় মহারাজ প্রতিষ্ঠিত বিঠলজীর মন্দিরে তিনি "বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন—বর্ত্তমান জগতের ধারণা বৈষ্ণব হইলেই মানুষ হীনবীর্য্য ও ক্লীব হইয়া যায়। কিন্তু তিনি বলেন যদি বীর হইতে হয় তাহা হইলে বৈষ্ণবতার মধ্য দিয়াই সাধককে সে পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বৈষ্ণব ভক্তদের জীবনীর সহিত তিনি এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেন।

বহুসংখ্যক শ্রোতা নিস্পন্দভাবে তাঁহার সেই আলোচনা শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করেন। বক্তৃতা শেষে শ্রোতৃবৃন্দ বলেন "ধর্ম্মের মধ্যেও যে এরূপ তেজস্বিতা আছে তাহা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। আজ আপনি বরদাবাসীকে ধর্ম্মের এক নূতন পথ দেখাইয়া দিলেন"।

হিন্দু সভার পক্ষ হইতে সুরাটে আলোচনা করিবার জন্য অদ্য স্বামীজি পুনরায় সুরাটে রওনা হইলেন।

শ্রীকুমারনাথ মৈত্র

বরদা—তাং ১লা মার্চ্চ ১৯৩০

শিক্ষা দেবে কে ?

॥ শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস ॥

শিক্ষা দেবে কে ? যে কেউ কি পারে ? না। তবে ? যার দীক্ষা আছে, সেই কি এই মহান ব্রতের অধিকারী ? ঠিক তাও নয়। কেননা সে অধিকার সার্বজনীন নয়, বিশেষ ক্ষমতার অধিকারে সে অধিকার সীমিতও নয়; জন্মগত বলেই তা স্বতন্ত্র।

তা' হ'লে প্রকৃত প্রস্তাবে কে সেই যোগ্যতার অধিকারী ? কেবল সে-ই শিক্ষা দিতে পারে, যাঁর জীবনের একমাত্র কাজ সব অজ্ঞতার আবরণ মোচন করা। আর যে তাঁর বিচার বুদ্ধির দ্বারা চারদিকের কুসংস্কারের অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিয়ে নিজ অগ্রগমনের পথকে আত্মিক প্রেরণায় মুক্ত এবং প্রসারিত করে নিতে পারেন।

আর কেবল তাঁর-ই শিক্ষকতার যোগ্যতা আছে, যিনি পর-দুঃখ পরবশে অন্তরের দুঃখীর বেদনাশ্রু মুছে দিতে পারেন। অথবা যিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, অশেষ ব্যবহার নৈপুণ্যে হতাশার অন্ধকারে জেলে দিতে পারেন আশার আলো; অথবা যিনি এমনই ধার্মিক যে, যাঁর উপস্থিতি মাত্রই অপবিত্রকেও শুদ্ধ, প্রবুদ্ধ করে তুলতে পারে। অথবা যিনি এমনই উদারচেতা যে, স্খলিত পদ-দলিতদেরও তুলে ধরার জন্য সদাই তাঁর ভালোবাসার অভয় হস্ত প্রসারিত করে দেন, এবং দুষ্কর্মীদের ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখতে পারেন।

আর তিনিই শিক্ষা দিতে পারেন, যিনি এমনই আলোকপ্রাপ্ত যে,—যারা অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়াচ্ছে তাদের—সকলের প্রাণ-প্রদীপেই আলো জেলে দিতে পারেন। আর যিনি প্রকৃতই এমন কর্মঠ যে, নিষ্কাম কর্মীদের চিত্তে সত্যিকার কর্ম-প্রেরণা জাগ্রত করে তুলতে পারবেন। অথবা যিনি সর্ববিধ সংস্কার মুক্ত, যিনি ঘৃণিত কামনা কলুষতার বহু ঊর্ধ্বে, যিনি আধ্যাত্মিকতায় এত দূর অগ্রসর যে, তাঁর চারদিকে স্বর্গীয় স্মৃতি-বিজড়িত একটা আদর্শ সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে পারেন।

আর যিনি জীবন্ত জ্ঞানের প্রতীক, তিনিই শিক্ষা দানের অধিকারী। অথবা যিনি শিখতে এবং শেখাতে অসীম আগ্রহী। আর যাঁর হৃদয় এবং হাত, কর্ম আর জ্ঞান একই অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে গ্রথিত। অথবা যিনি এমনই অকৃপণ দাতা যে, তিনি যখনই যা পান,—অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই বর্জন করেন—তার চেয়ে বেশী বিলিয়ে দিতে পারেন।

যিনি সর্বতঃ ভাবেই মুক্তচিত্তান, যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে চোখ মেলে দেখেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন; সে অনুভূতিও সর্বব্যাপী। এমন কি প্রকৃতির একটি তুচ্ছতম ফুল অথবা মানুষের এক বিন্দু অশ্রু যাকে তাঁদের এমন গভীরে নিয়ে যায় যে, আবেগে তাঁর দু' চোখ ভরে আসে জলে। সেটা অবশ্য তাঁর আতিশয্য নয়, প্রকৃত ভাবাবেশ!

আর যিনি শিশুদের মধ্যে দেখতে পান ভাবী গৌরবের স্বপ্নকে, অথবা সেই ভগবানের অংশ শিশু ভোলানাথকে; তাই তিনি ভাবতে পারেন যে, ভাগ্যতে পরিবেশ হ'লো আমাদের গৃহ। অথবা যিনি তুচ্ছের মধ্যেও দেখতে পান সেই মহৎ উচ্চকে। আর যিনি মানুষের মধ্যে সুন্দরকে জেগে উন্নসিত হ'ন; এবং যিনি সেই মহৎ ধারণার উপলব্ধিকে অন্যের হৃদয়েও সহজে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন।

আর যাঁর উপলব্ধি ব্যাপকতর, জড়ে-জীবেও সমভাবে প্রসারিত। যিনি পাখীর কাকলীতে উপলব্ধি করতে পারেন সৃষ্টির আনন্দকে; এবং যিনি সৃষ্টির স্পন্দনকে খুঁজে পান গো-মেষ শাবকের নর্তনে। অথবা যিনি ঝড়

ও প্রাণনের মধ্যে দেখতে পান ক্রুদ্ধ প্রকৃতির উদ্যমকে; এমন কি যিনি দুর্গতের ক্ষতেও দেখতে পান সেই জীবন-কারুণ্যের রূপটিকে। অথবা যিনি প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উপলব্ধি করতে চান সেই অখণ্ড বিশ্ব-প্রকৃতিকে; যিনি নদী কল্লোলে পান সেই অনাহত সংগীতকে; গোধূলির অস্পষ্ট বর্ণ বিন্যাসের মধ্যেও যিনি উপলব্ধি করেন এক অনির্বচনীয় কাব্যিক অভিব্যক্তিকে। অথবা যিনি অনন্ত সমুদ্রের বেলা ভূমিতে দাঁড়িয়ে ঢেউ-এর শঙ্খে শুনতে পান সেই অনাদি কালের গান; যিনি ঋতু-বিবর্তনের ছন্দে নিজ মনের সুরটিকেও বিধৃত করতে চান; যিনি রাতের অন্ধকার ছায়া-পথে তারার মিষ্টি মিষ্টি আলোর কম্পন দেখে মনে করেন,—এ সমস্তই যেন ভগবৎ-চরণে নিবেদিত চিরকালের অর্ঘ্য এবং সবই তাঁর অহেতুক করুণার মাহাত্ম্য।

আর যিনি সর্বোপরি দ্রষ্টা। যিনি সামান্যতম এক ফোঁটা শিশির বিন্দুর মধ্যেও এক আশ্চর্য সুন্দর সুসঙ্গতের সমন্বয়কে দেখতে পান। এমন কি যিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে দেখতে পান সেই স্বর্গীয় আবির্ভাবকে। অথবা যিনি অব্যক্তকেও ব্যক্ত, অকল্পিতকেও কল্পনা করতে পারেন।

আর যিনি স্বভাবে, ব্যক্তিত্বে, আচার আচরণে, মহত্ত্বে, নিত্য-স্তুত্য একটি খাঁটি গোটা মানুষ। যিনি ছাত্রদের সুখ দুঃখের অংশীদার। তাদের হতাশায় যিনি আশা, তাদের দুর্বলতায় যিনি বল, তাদের নিরুৎসাহে যিনি প্রেরণা আর তাদের সকল তমসার আলো—কেবল তিনিই শিক্ষাদানের যোগ্য অধিকারী।

আলোকের দেশ

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

অনেক আঁধার আছে, থাক না, সে আঁধারের বুকে
পথ চলো, চলে চলে, সে আঁধার করে ফেলো ক্ষয়;
এই আঁধারের পারে আছে সেই তীর্থ জ্যোতির্ময়।

সূর্য আছে তো ঠিকই; চারিধারে এই কালো মেঘ
ঢেকেছে আকাশ তাই, দেখা যায় নাক আলো তারই;
সে আলো তেমনি আছে, দীপ্তিময় তিমিরবিদারী।

অনেক আঘাত আর অনেক যন্ত্রণা এইখানে,
পথের মাঝেই তাই—থেমে যায় ক্লান্ত পা দু'খানি,
চারিদিকে জেগে ওঠে হতাশার নিরাশার বাণী।

এই ক্লান্তি দূর করে যেতে হবে সেই স্বপ্ন নিয়ে;
সেই স্বপ্ন চির সত্য অনির্বাণ অমৃত আলোকে
নিয়ে যাবে এ মানুষে চিরন্তন দিব্য সূর্য্যলোকে।

সেইখানে চিরশান্তি, নিত্যজ্যোতি আলোকের দেশ,
সেইখানে জীবনের সব-চাওয়া, সব-পাওয়া শেষ।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় ভক্তই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচারসকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈতভাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়নির্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ত্রয়ীতি বহুধা শ্রুতি :" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

চতুশ্চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

শ্রুতি বেদান্তানুসারে আত্মজ্ঞানই অদ্বৈতজ্ঞান। শঙ্করাচার্যও তাহা তাঁহার অনেক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থের পূর্বোক্ত পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে—

তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নং জ্ঞানমঞ্জসা।

অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ॥"

বলিয়াছেন কেন? তত্ত্ব-স্বরূপানুভবই এক প্রকার জ্ঞান। অনুভবেরই অপর নাম অনুভূতি,—অনুভূতিই জ্ঞান;—তাহা শঙ্করাচার্যের গুরু ভগবৎ-গোবিন্দ-পাদাচার্য পরিব্রাজক-পরমহংস-স্বামী-রচিত অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেই বোঝা যায়। তাহা হইলে শঙ্করাচার্যের মতে কি তত্ত্ব-স্বরূপানুভবই ব্রহ্মজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান নহে? তাহা হইলে তৎকথিত তত্ত্ব-স্বরূপানুভবটী, তাঁহার মতে কি? সেটিকে অজ্ঞান বলা যায় না, তাহা পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে সেই তত্ত্ব বা স্বরূপানুভব-তত্ত্ব-স্বরূপ-জ্ঞান হইতে যে জ্ঞানোৎপত্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেটীই বা কোন্ শ্রেণীর জ্ঞান? উক্ত শ্লোকে শঙ্করাচার্য দ্বি-প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন দেখিতেছি। দুই প্রকার জ্ঞান স্বীকার করায় জ্ঞানও অদ্বিকৃত বলা যায় না; কারণ অদ্বৈতজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান যাহা, তাহা একই প্রকার। তাহার ত বহুতা বা বহু-প্রকার বিকাশ কোন শাস্ত্রানুসারেই নির্দেশিত হয় নাই? আর শঙ্করাচার্যের মতে তত্ত্ব-স্বরূপানুভব বা তত্ত্ব-স্বরূপ-জ্ঞান হইতে অন্য একপ্রকার জ্ঞানোৎপত্তির বিবরণ আছে। সুতরাং সেই জ্ঞান উৎপন্ন বলিয়া তাহা নিত্যজ্ঞান নহে, তাহা উৎপন্ন বলিয়া অনিত্য। কারণ শ্রুতি-বেদান্ত প্রভৃতি কোন শাস্ত্র-মতেই নিত্য-জ্ঞানের, অদ্বৈতজ্ঞানের, ব্রহ্মজ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয় না। নানা শাস্ত্রানুসারে যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে। শঙ্করাচার্যের মতে তত্ত্ব-স্বরূপানুভব বা তত্ত্ব-স্বরূপ জ্ঞান হইতে যে জ্ঞান, তাহা উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব যুক্তি-প্রমাণানুসারে তাহা নিশ্চয়ই অবিনশ্বর নহে। সেই জন্যই সেই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বলা যায় না, সেই জন্যই সেই জ্ঞানকে অদ্বৈতজ্ঞান বলা যায় না,

সেই জন্যই সেই জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞানও বলা যায় না। যে জ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে বেদান্তমতে তাহা নিশ্চয়ই অজ্ঞানেরই একপ্রকার বিলাস। সুতরাং সেই প্রকার অজ্ঞানোদয়ে অহং এবং মমতা নষ্ট হয়, কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? কোন কোন অদ্বৈতমতে আত্মজ্ঞান উদয় হইলেই অহং এবং মমতা থাকে না।

পঞ্চচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যোগী পশ্যত্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা॥

জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠই বুঝিতে হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্যের মতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানী-যোগী নিজ আত্মাতে অখিল জগৎ দর্শন করেন, এবং জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা এক-আত্মাকেই সমস্ত দর্শন করেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতেই জগৎ বা জগতের কিছুই অনিত্য এবং অসত্য নহে বুঝিতে হয়। নিজের আত্মাতে অখিল-জগৎ দর্শন হয়ই বলা হইয়াছে, কিন্তু অখিল জগৎকে অনিত্য বলা হয় নাই বলিয়া, অখিল জগৎ অনিত্য ও অসত্য নহে। উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণানুসারে সমস্তই আত্মা, সুতরাং অখিল জগৎও নিশ্চয় সমস্তেরই অন্তর্গত। তাহা হইলেও অখিল জগৎ, অনিত্য অসত্য বলা যায় না। জ্ঞান-চক্ষু স্বীকার করিলে, জ্ঞানকেও অনিত্য বলিতে হয়। কারণ চক্ষু, প্রাকৃত এবং অনিত্য। জ্ঞানকে চক্ষু বলিলে, সুতরাং জ্ঞানকেও প্রাকৃত এবং অনিত্য বলিতে হয়। অদ্বৈতমতানুসারে এক-আত্মা ব্যতীত অন্যান্য সমস্তই অনাত্মার বিবিধ-বিকাশ। সুতরাং অদ্বৈতমতে সে বিকাশ সকলকে অনিত্য অসত্যই বলিতে হয়। অদ্বৈতমতে আত্মার একতা। সে মতে আত্মার বহুতা নাই, আত্মার বহু-বিকাশও নাই। সুতরাং ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে 'সর্ব্বং' সেই একাত্মার বিবিধ বিকাশও বলা যায় না। সেজন্য 'সর্ব্বং' অনাত্মারই বিবিধ বিকাশ। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা ও 'সর্ব্বং' অভেদ, সুতরাং শঙ্করা-চার্য্যের মতে 'সর্ব্বং'কে অনাত্মার বিকাশ বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মনামাবলীমালা প্রভৃতি মতে জানা যায়—আত্মা, ব্রহ্ম ও জীব অভেদ সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে যোগ ও যোগীর প্রয়োজন নাই। জীবই আত্মাব্রহ্ম স্বীকার করিলে, সেই জীবের আর কাহার সঙ্গে যোগ হইবে? তবে জীব, যোগীই বা কি প্রকারে হইবে? যদি কেহ জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য যোগদ্বারা হয় স্বীকার করেন, তাহা হইলেও যোগকে অনাত্মার একপ্রকার বিকাশ স্বীকার করা হয়। কারণ কোন শাস্ত্রেই যোগকে আত্মা বলা হয় নাই। সেই জন্য যোগও অনাত্মার বিকাশ। যোগের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আছে। সেই নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল একপ্রকারও নহে। সুতরাং যোগেরও এক-প্রকারতা নাই, স্বীকার করা হইয়াছে। যোগের এক-প্রকারতা নাই বলিয়াই যোগকেও অনাত্মা বলিতে হয়। যোগ অনাত্মারই একপ্রকার বিকাশ বলিয়া আত্মার যোগী উপাধি হওয়াও সঙ্গত নহে. শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবের সহিত ব্রহ্মের যোগ আবশ্যকই নাই বলিতে হয়। কারণ তিনি জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়াছেন। সেইজন্য জীবের ব্রহ্মের সহিত যোগের প্রয়োজন নাই। অতএব সেইজন্য আত্মাকে, জীবাত্মাকে বা ব্রহ্মাত্মাকে যোগী বলা যায় না।

ষট্‌চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো ঘটবৎ ঘটাদীনি আত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে।"

উক্ত শ্লোকানুসারে দ্বৈতাদ্বৈত অভেদ বলা যাইতে পারে। কারণ উক্ত শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, যে প্রকার মৃৎ বা মৃত্তিকাই ঘট প্রভৃতি বিবিধ মৃৎ-পাত্র সকল, তদ্রূপ আত্মাই সমস্ত জগৎ। আত্মা ব্যতীত অন্য পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব সকল পদার্থই আত্মা দেখিতে হয়। আত্মাই সমস্ত জগৎ স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া, আত্মাকে প্রকারান্তরে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ 'জগৎ সর্ব্বং' ত অনাত্মারই বিকাশ। সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে আত্মা এবং অনাত্মা অভেদ বলিতে হয়। সেইজন্যই দ্বৈত এবং অদ্বৈত অভেদ বলিতে হয়। উক্ত সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকের মতানুসারে আত্মা ও অনাত্মা অভেদ স্বীকার করিতে হয়

বলিয়া আত্মা ও অনাত্মা উভয়েরই নিত্যতা এবং সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। কারণ শ্রৌত, উপনিষৎ, বেদান্ত দর্শন ও বেদান্ত সারমতে, আত্মা নিত্য-সত্য। সেই আত্মার সঙ্গে যাহা অভেদ, সুতরাং তাহাও নিত্য-সত্যাত্মা স্বীকার করিতে হয়। অথবা অনাত্মা, অনিত্য, অসত্য বলিয়া—আত্মাও সেই অনাত্মা বলিয়া,—সেই আত্মাকেও অনিত্য অসত্য বলিতে হয়; কিম্বা আত্মাকে নিত্য-সত্যও বলিতে হয়। এক্ষণে অনাত্মার সঙ্গে নিত্য-সত্য-আত্মার অভেদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া সেই অনিত্য-অসত্য অনাত্মাকেও নিত্য-সত্য বলিতে হয়। আর সেই অনাত্মা অদ্বৈত মতানুসারে অনিত্য অসত্য বলিয়া সেই অনিত্য, নিত্য-অসত্যও স্বীকার করিতে হয়। তবে এক্ষণে দেখিতে হইবে, ঐ দুই প্রকার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুর পরস্পর ঐক্য হইতে পারে কি না? ঐ প্রকার ঐক্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় কি না? পুরাণ প্রভৃতি অনুসারে দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু এবং পরস্পর অভেদ। নানা পুরাণানুসারে অগ্নি হইতেই জল বিকাশিত, সুতরাং অগ্নি এবং জল পরস্পর অভেদ। কিন্তু ঐ উভয় বস্তু দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত উভয় বস্তুতে পরস্পর বিশেষ পার্থক্য এবং বৈপরীত্য আছে। স্ত্রী ও পুরুষ আকারে পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু দেহের সমস্ত বস্তুই প্রায় উভয়ের একই প্রকার। তাঁহারা আত্মাতেও উভয়ে এক। কেবল পুরুষ-ভাব এবং স্ত্রী-ভাববশত পরস্পর আপনারা বিভিন্ন মনে করিয়া থাকেন।

সপ্তচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টচত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"জীবন্মুক্তস্য তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেদ্ভ্রমরকীটবৎ॥"

উক্ত শ্লোকীয় জীবন্মুক্ত-পুরুষ, আর স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য পরস্পর অভেদ বলা হয় নাই বলিয়া, উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতভাব প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য দ্বৈতবাদী নহেন, একথাও বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্যের সমস্ত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে, শঙ্করাচার্য্যকে দ্বৈতবাদীও বলা যায়, অদ্বৈতবাদীও বলা যায়। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবন্মুক্ত হইয়া তবে পূর্ব্বোপাধি ও গুণ সকল পরিত্যাগ করা যায়। সেইজন্যই তিনি তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টচত্বারিংশ শ্লোকের প্রথমাংশে বলিয়াছেন,—'জীবন্মুক্তস্য তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ'। কিন্তু আমাদের মতে জীবন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই ঐ প্রকার উপাধি এবং গুণসকল পরিত্যাগের প্রয়োজন; নতুবা জীবন্মুক্ত হওয়াই যায় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে প্রগাঢ় চিন্তাদ্বারা তৈলপায়িক যেমন ভ্রমর-কীট হয়, তদ্রূপ শঙ্করাচার্য্য-কথিত সেই জীবন্মুক্ত-পুরুষও প্রগাঢ় চিন্তাদ্বারা সচ্চিদানন্দ-রূপত্ব পাইতে পারেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবন্মুক্ত-পুরুষ ঐ প্রকার প্রক্রিয়াদ্বারা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন না, কেবল তিনি সচ্চিদানন্দ-রূপত্বই প্রাপ্ত হন্ তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের মতে সচ্চিদানন্দও কি রূপ? তাঁহার মতে তিনি কি স্বরূপ বা আত্মা নহেন? যদি বলা হয় 'সচ্চিদানন্দরূপত্বং' অর্থে উক্ত শ্লোকে সচ্চিদানন্দের রূপত্ব বা রূপতা, তাহা হইলে আমাদের মতে তাহাও বলা যায় না। কারণ শঙ্করাচার্য্যের এই আত্মবোধ গ্রন্থে আত্মা এবং আত্মবোধের প্রাধান্য-প্রদর্শনই প্রধান উদ্দেশ্য। উক্ত গ্রন্থে রূপের প্রাধান্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে। ঐ গ্রন্থের প্রধান টীকাকারগণ এবং ভাষ্যকারগণের মতে, রূপের অনিত্যতা ও রূপের অসত্যতা প্রতিপাদন করাই উক্ত গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। শঙ্করাচার্য্যের 'সচ্চিদানন্দরূপত্বং' লিখিবার উদ্দেশ্য না থাকিলে কি তাঁহার অগোচরেই ঐ প্রকার লিখিত হইয়াছে? 'সচ্চিদানন্দরূপত্বং' বলিলে কেহ উহার অর্থ সচ্চিদানন্দই রূপ বুঝেন। অপর কেহ বা অর্থ করেন সচ্চিদানন্দের রূপত্ব: তাঁহাদের মতে সচ্চিদানন্দই রূপত্ব নহে। উক্ত শ্লোকানুসারে তৈলপায়িকের রূপ ভ্রমর-কীটের রূপ হয় স্বীকার করিলে জীবন্মুক্তের রূপও সচ্চিদানন্দের রূপ হয়, স্বীকার করিতে হয় অথবা জীবন্মুক্তের রূপ সচ্চিদানন্দ—এই যে রূপ, তাহাই হয়। 'ভ্রমরকীটবৎ' বলায় বুঝিতে হয়,—ভ্রমর কীটের সমস্তই তৈলপায়িকের হয়; তাহা হইলে জীবন্মুক্তের কেবল সচ্চিদানন্দের রূপ প্রাপ্তিই হয়, স্বীকার করা হইবে কেন? তাহা হইলে উক্ত উদাহরণানুসারে

জীবন্মুক্তের সচ্চিদানন্দের সমস্তই হয় স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু 'সচ্চিদানন্দরূপত্বং' অর্থে সচ্চিদানন্দের রূপ, স্বরূপ এবং অন্যান্য সমস্ত বুঝিবার কোনই কারণ নাই। কারণ রূপ অর্থে বা রূপত্ব অর্থে ঐ সকল হয় না। তবে উক্ত শ্লোকের 'সচ্চিদানন্দরূপত্বং' অর্থে কি কেবল সচ্চিদানন্দের রূপত্ব বা রূপতা বুঝিতে হইবে? তাহাই বা কি প্রকারে বুঝা যায়। উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে—জীবন্মুক্ত সচ্চিদানন্দ রূপত্ব প্রাপ্ত হন্। অদ্বৈতমতের কোন গ্রন্থমতেই জীবন্মুক্ত অর্থে কোন প্রকার রূপ বুঝিতে হয় না। আত্মার জীবত্ব নাশ হইলেই তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। সেই জীবত্ব-বিমুক্তাত্মাই সচ্চিদানন্দের রূপত্ব বা রূপতা পানই বা, কি প্রকারে বলা যায়? কারণ অদ্বৈতমতের বহু গ্রন্থের মধ্যে কোন গ্রন্থেই বলা হয় নাই, জীবন্মুক্ত হইলে রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া অন্যরূপ হয়। কেহ জীবন্মুক্ত হইলে, নানা শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পূর্ব্ব রূপই থাকে। তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য কোন রূপ হয় না। সুতরাং উক্ত শ্লোকে বোধ করি জীবন্মুক্ত আত্মা সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হন বলা উদ্দেশ্য। তাহা হইলে অনর্থক 'রূপত্বং' এই শব্দ ব্যবহার না করিলেই হইত। কেবল মাত্র 'সচ্চিদানন্দত্বং' শব্দ ব্যবহার করিলেই চলিত। অথবা 'সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বং' শব্দ ব্যবহার করিলেই চলিত। শঙ্করাচার্য্যের নানা গ্রন্থমতে আত্মাই সৎ, আত্মাই চিৎ এবং আত্মাই আনন্দ। জীবন্মুক্তও আত্মা। তবে শঙ্করাচার্য্যের মতে সেই জীবন্মুক্তের সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হইবারই বা প্রয়োজন কি? অদ্বৈতমতানুসারে জীবন্মুক্ত এবং সচ্চিদানন্দ অভেদ। তবে সেই জীবন্মুক্তের সচ্চিদানন্দত্বেরই বা প্রয়োজন কি?

অষ্টচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,

"ত্যক্ত্বা মোহাদিকং হিত্বা রাগদ্বেষাদিরাক্ষসান্।
যোগী শান্তি সমাযুক্তো জ্ঞাত্মারামো বিরাজতে॥"

নানা যোগশাস্ত্র অনুশীলন করিলে জানিতে পারা যায়, যোগীর মোহ নাই, যোগীর রাগ-দ্বেষ প্রভৃতিও নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে—

"অপণ্ডিতোঽপণ্ডিতোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥"

৬ অঃ—৪৬ শ্লোঃ

উক্ত গীতা-শাস্ত্রমতে, জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। অনেক শাস্ত্রানুসারেই জানিলাম হইলে, মোহ এবং রাগ দ্বেষ প্রভৃতিও থাকে না। যোগী সেই মোহ-রাগ-দ্বেষ-বিহীন জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য সেই যোগীর মোহ এবং রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি থাকিতেই পারে না। তবে যোগ-সাধকের মোহ এবং রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি থাকিতে পারে, স্বীকার করা যায়। সেই যোগ-সাধককে ঐ সকল হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য নানাপ্রকার যোগ-সম্বন্ধীয় সাধনাও করিতে হয় সত্য। তিনি মোহ এবং রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি পাইলে, তিনি আর তখন যোগ-সাধক থাকেন না। তখন তাঁহাকে যোগ-সিদ্ধ বা যোগী বলা যায়। সম্পূর্ণরূপে যোগ-সিদ্ধ না হইলে, সেই যোগ-সাধককে যোগী বলা যাইতে পারে না। যোগ-সিদ্ধ বা যোগী হইলে তাঁহাকে শান্তি-সমাযুক্তও বলা যায়। তখন তাহাকে আত্মারামও বলা যায়। তখন বাস্তবিক তিনি সর্ব্ব-বন্ধন-বিমুক্ত-শান্তি-সমাযুক্ত-আত্মারামও ঘটেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে ঐ প্রকার যোগী কি আত্মজ্ঞানী নহেন? আত্মজ্ঞান হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান হয়। তবে সেই যোগী শান্তি সমাযুক্ত হন কি প্রকারে বলা হইয়াছে? আত্মজ্ঞানী যে 'কেবল'—তাঁহার সহিত কিছুরই যোগ থাকিতে পারে না। সেইজন্য তাঁহার সহিত শান্তিরও যোগ থাকিতে পারে না। প্রসিদ্ধ অদ্বৈতমতে ও বেদান্তানুসারে, শান্তির সহিত আত্মার ঐক্য বা অভেদত্ব প্রদর্শন করা হয় নাই। অতএব সেই কারণে আত্মা এবং শান্তি অভেদও বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়ানুসারে যোগী, আত্মা এবং শান্তি অভেদ হইলে তিনি যোগী শান্তি-সমাযুক্ত হইয়া আত্মারামরূপে বিরাজিত হন্ বলিতেন না।

একোনপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যাহানিত্যসুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্ব্বৃতঃ।
ঘটস্থদীপবৎ স্বয়ং স্বাত্মন্যেব প্রকাশতে॥"

উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতবাদ প্রকাশিত। কারণ উক্ত শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত অপর কোন যোগী উদাহৃত হইয়াছেন, এইরূপই বুঝিতে হয়। উক্ত শ্লোক, শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত অপর কোন যোগী-সম্বন্ধীয় বলিয়া, উহা দ্বৈতবাচক বলিতে হয়। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতেন না, বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য-কথিত উক্ত পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, যোগী বাহ্য-অনিত্য-সুখাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম সুখে বিরত হইয়া, ঘটস্থ দীপবৎ নিজ অন্তরে প্রকাশিত থাকেন। যোগী আত্ম-সুখে বিরত হন স্বীকার করিলে, যোগী আত্ম-দুঃখে হত হনও স্বীকার করিতে হয়। কারণ যেমন আলোকাভাব বলিলেই অন্ধকার বুঝিতে হয়, তদ্রূপ আত্মসুখের অভাব বলিলেই আত্ম-দুঃখের বিদ্যমানতা বুঝিতে হয়। সেই জন্যই শঙ্করাচার্য্যের উক্ত পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে যোগী আত্ম সুখে বিরত হন্ স্বীকার করিলে, সেই আত্ম-সুখ-বিরতি হইলে, তিনি অবশ্যই আত্ম-দুঃখে হত হন্। যদি বল, তিনি কেবল আত্ম-সুখেই বিরত হন্, তিনি সেজন্য আত্ম-দুঃখে হত হন্ না, তাহাও বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে উক্ত শ্লোকে তিনি আত্ম-দুঃখে হত হন্ নাও বলা উচিত ছিল। যদি বলা হয়, উক্ত শ্লোকে তিনি আত্ম-সুখে বিরত হইলে, তিনি আত্ম-দুঃখে হত, হন্ বলা হয় নাই, তবে কি প্রকারে তিনি আত্ম-সুখে বিরত হইলে, আত্ম-দুঃখে হত হন্ স্বীকার করা যাইবে? আমরা বলি, সেই যোগী আত্ম-সুখে বিরত হইলে, তিনি আত্ম-দুঃখে হত হন না, বলা হয় নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে, যে তিনি আত্ম-সুখে বিরত হইলে আত্ম-দুঃখে হত হন্। তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে অবস্থাও যোগীর আকাঙ্ক্ষনীয় হওয়া উচিত নহে। আর উক্ত শ্লোকানুসারে যোগীর নিজ-অন্তরে প্রকাশ হওয়াটাই বা কি,—তাহা অনেকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অতি দুষ্কর। ঘটস্থ-দীপ ও ঘট অভেদ নয়। যোগী এবং যোগীর দেহ-ঘট অভেদ নয়। সেইজন্য সেই যোগীর দেহটাকে, সেই যোগীর বহির্ভাগ বলা যায় না। তাহা হইলে সেই যোগীর বহির্ভাগ লোকটি, আর তাঁহার অন্তরই বা কোনটী? যোগী ও আত্মা। অতএব সেইজন্য অদ্বৈতমতানুসারেই তাঁহার অন্তর-বাহ্যের পার্থক্য কিছুই নাই। ঘটস্থ-দীপ যাহা,—তাহার অন্তরে কেবল প্রকাশকতা আছে বলা যায় না, তাহার বাহিরেও প্রকাশকতা আছে। যোগী-আত্মার সহিত ঐ ঘটস্থ-দীপের তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া, যোগী-আত্মার বাহিরেও প্রকাশ নাই বলা যায় না। যোগী-আত্মার অন্তরে-বাহিরে প্রকাশ। কারণ অদ্বৈতমতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী,—সুতরাং তাঁহার কোথায় না প্রকাশ? তিনি অন্তরেও প্রকাশিত, তিনি বাহিরেও প্রকাশিত, তিনি সর্ব্বত্রই প্রকাশিত

পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের এক-পঞ্চাশৎ ও দ্বি-পঞ্চাশৎ শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচার্য্য, মুনি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্নিলিপ্তো যোগবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদলকো বায়ুবচ্চরেৎ॥
উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা॥

উক্ত দুই শ্লোকও দ্বৈতবাদ প্রকাশক। উক্ত দুই শ্লোকের কোনটীতেই মুনির সহিত শঙ্করাচার্য্য নিজে অভেদ, তাহা স্বীকার করেন নাই। উক্ত দুই শ্লোকের প্রথম শ্লোকানুসারে মুনি এবং ব্রহ্ম অভেদ বুঝিবারও কোন কারণ নাই। তবে উক্ত দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম চরণানুসারে—

"উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।'

তাহা হইলেও মুনি ও বিষ্ণু অভেদ হন, বুঝিবার কোন কারণ নাই। উক্ত শ্লোকাংশে বলা হইয়াছে উপাধি বিষ্ণুতে লীন হইলে, সেই মুনিও সেই বিষ্ণুতে প্রবেশ করেন, এবং তজ্জন্য তিনি নির্ব্বিশেষ হন্। উপাধি বিষ্ণুতে লয় হয়, বলা হইল; কিন্তু মুনি বিষ্ণুতে লয় হন্ত বলা হইল না। উপাধিলয়ান্তে মুনিও সেই বিষ্ণুতে প্রবেশ করেন বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে 'বিলয়াৎ' এবং 'বিশেষ' একার্থে প্রয়োগ হইলে, ঐ উভয় শব্দের কেবল একটি থাকিলেও চলিতে পারিত। তাহা হইলে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইত, উপাধি এবং মুনি উভয়ই বিষ্ণুতে লীন হন্। উক্ত শ্লোকের অর্থানুসারে বোধ হয়, কেবল উপাধিই বিষ্ণুতে লীন হয়; কিন্তু মুনি বিষ্ণুতে লীন হন্ না, কেবল

প্রবেশ করেন মাত্র। নানা শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই পরমাত্মা, বিষ্ণুই ব্রহ্ম। আর অদ্বৈতমতে উপাধি বা উপাধিসকল, অনাত্মার নানা প্রকার বিকাশ। সেই কারণে ঐ সকলও অনাত্মা স্বীকার করিতে হয়। অনাত্মা-উপাধি উপাধি সকল আত্মাতে লীন হয়, স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ সত্যাত্মাতে অসত্য মিশাইতে পারে না, কারণ যাহা অনাত্মা ও যাহা অসত্য, তাহা ত প্রকৃতপক্ষে নাই বলিতে হয়। নাই যাহা, যাহা আছে, যাহা সত্য ও যাহা নিত্য, তাহা কি প্রকারে মিশিবে? আত্মা-বিষ্ণুতে অনাত্মা-উপাধি বা উপাধিসকল মিশ্রিত হইতে পারেও স্বীকার করা যাইতে পারে। জলে শর্করা মিশ্রিত হয় স্বীকার করিলে, অবশ্যই শর্করাতেও জল মিশ্রিত হয় স্বীকার করিতে হয়। অদ্বৈতমতানুসারে মুনিকেও অনাত্মা বলা যায় না। কারণ উক্ত একপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে নির্লিপ্ত-আত্মার লক্ষণসকলের কয়েকটি লক্ষণ মুনির বলা হইয়াছে। উক্ত একপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্মৈর্নির্লিপ্তো ব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ॥

সুতরাং আত্মা মুনি এবং আত্মা-বিষ্ণু পরস্পর অভেদ। তবে আত্মা-মুনির আত্মা-বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইবারই বা প্রয়োজন কি? অদ্বৈতমতানুসারে উভয়ে অখণ্ডাত্মা এবং অভেদ হইলে, আত্মা মুনির কিসে প্রবেশ বা লয় হইবে? আমি-আত্মার আমি-আত্মাতে প্রবেশ বা লয় কি প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং আত্মা-মুনি, আত্মা-বিষ্ণু বলিয়া, আত্মা-বিষ্ণুতে আত্মা-মুনির প্রবেশ বা লয় হইতে পারে, স্বীকার করা যায় না। আর শঙ্করাচার্য্য যদি বৈতবাদী হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই বিষ্ণু এবং মুনির পরস্পর ভিন্নতা বা পার্থক্য স্বীকার করিতে পারিতেন।

একপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

প্রাচীন কত শাস্ত্রেই কত মুনি, মহামুনিগণের উপাখ্যান ও উপদেশসকল পাঠ করা হইয়াছে। তাঁহাদের চরিত্র সর্ব্ববিৎ-মুনি নিজ ইচ্ছানুসারে মূঢ় বা অজ্ঞের ন্যায় থাকিলে, তাঁহাকে কখনই মূঢ় বা অজ্ঞ বলা যাইতে পারে না। ঐরূপ থাকিলেও তাঁহাকে সর্ব্ববিৎ বলিতে হয়। যে হেতু সর্ব্ববিৎ এবং অসর্ব্ববিৎ, এক ব্যক্তিকেই বলা যায় না। সর্ব্ববিৎ যিনি, তিনি কেবল সর্ব্ববিৎ,—তিনি তখন অসর্ব্ববিৎ নহেন; অসর্ব্ববিৎ যিনি, তিনি কেবল অসর্ব্ববিৎ;—তখন তাঁহাকে সর্ব্ববিৎ বলা যায় না। উক্ত উদাহরণানুসারে একজন মুনিকে, সর্ব্ববিৎ এবং অসর্ব্ববিৎ বলা যায় না। সর্ব্ববিৎমুনিকে কেবল সর্ব্ববিৎ বলিতে হয়। একজন মুনি এক সঙ্গে সর্ব্ববিৎ এবং অসর্ব্ববিৎ, উভয়ই হইতে পারে না। সকল আলোচনা করিয়া, তাঁহারা যে সগুণ সক্রিয় ছিলেন, তাহাই বোঝা গিয়াছে। যদি বল, তাঁহারা কখন কখন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইতেন, তাহা স্বীকার করিলেও তাঁহাদের কাহাকেও আত্মা-ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলিতে পার না। কারণ বেদান্তানুসারে আত্মা-ব্রহ্ম, নিত্য-নির্ব্বিকার এবং নিত্য-নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বুঝিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহাদের চরিত্র-সম্বলিত উপাখ্যানসকল পাঠে, তাঁহাদের কাহাকেও নিত্য-নির্ব্বিকার, নিত্য-নির্গুণ এবং নিত্য নিষ্ক্রিয় বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত একপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্মৈর্নির্লিপ্তো ব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ॥"

অজ্ঞান-ব্যোম স্বভাবতঃ সগুণ-সক্রিয় নহে। তাহা স্বভাবতঃ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়। সুতরাং স্বভাবতই তাহা কোন উপাধিতে লিপ্ত নহে। কিন্তু সজ্ঞান-সগুণ সক্রিয় মুনি উপাধিস্থ হইয়া বা উপাধিতে লিপ্ত হইয়াও সেই উপাধি ধর্ম্মে কি প্রকারে নির্লিপ্ত রহেন? উক্ত শ্লোকের শেষ চরণানুসারে, সেই মুনি সর্ব্ববিৎ হইয়াও মূঢ়বৎ থাকেন বলিলে, তিনি সর্ব্ববিৎ এবং মূঢ় উভয়ই, ইহা বুঝিতে হয় না, যেমন কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের বেশের মতন বেশ করিলে, তাহাকে স্ত্রীলোক বলা যায় না, তদ্রূপ কোন সর্ব্ববিৎ মুনি নিজ ইচ্ছানুসারে মূঢ় বা অজ্ঞের ন্যায় থাকিলে তাঁহাকে কখনই মূঢ় বা অজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

ক্রমশঃ

একখানি পত্র

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত ॥

জয়ন্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালঃ

বরিশাল

শ্রীযুত জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের বাসা

১১।১।১৬

নিত্য গরবিণী,

তুমি যার গরবে গরবিণী সেই প্রাণবল্লভ শ্রীনিত্যগোপালের শশধর-লাঞ্ছিত ভক্তজন-চকোর-পরিসেবিত রাতুল চরণযুগলে তাঁহারই অপরিসীম কৃপার সাক্ষীস্বরূপে যখন আমার এই জড়-মলিন পত্রিকা প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমাদিগকে তাঁহার জগতের শোকহারী শ্রীচরণ-চুম্বনে নিত্য সংশ্লিষ্ট হিরণ্ময় নূপুর বলিয়া মনে হয়। তিনি বিশ্বের প্রাণ মন অহংকার আকর্ষণ করিবার জন্য যে ভুবনপাবন নৃত্য বিস্তার করিতেছেন, সেই রসবর্ষী নৃত্যে তোমাদের মধুর মর্মের ভিতর দিয়া যে রাগিনী বাজিয়া উঠিতেছে তাহা জগতের বধির কর্ণে প্রবেশ লাভ না করিলেও তিনি পরানন্দে নিজ রাজবিহারী রূপের আস্বাদন করিতেছেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার ঐ সম্ভোগের পরিণতিতে প্রসাদীরূপে তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া জগৎ একদিন প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইবে। তোমরা তাঁহারই শ্রীচরণের নির্ম্মাল্য; তিনি নিজে অপ্রকট বটেন; তাঁহারই প্রসাদী নৈবেদ্য তোমরা তাঁহারই রসরসগন্ধস্পর্শময় মধুরাদপি মধুর মোহনরূপের পরিচয় প্রদান করিতে রহিয়াছ। তাঁহার মাধুর্য্য-প্রকাশই তোমাদের চরম সার্থকতা বিষয় জানিবে। তোমরা গৃহী নও, ব্রহ্মচারী নও, বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী নও, সন্ন্যাসী নও, তোমরা সকল গন্ধের ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীচরণচন্দনবিন্দু; মহানির্বাণময় শ্রীনিত্যগোপাল প্রেমে তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ধর্ম্ম ও সন্ন্যাস সকলই পরিত্যাজ্য। "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ"। শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয়-মূর্ত্তি; তিনি একাধারে যেমন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সমন্বিত মূর্ত্তি আবার উহাদের অতীতও বটেন। তিনি একাধারে গৃহী-ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী-সন্ন্যাসী, আবার সর্ব্বাশ্রমাতীতও বটেন। যিনি সর্ব্ব, তিনিই সর্ব্বাতীত। যিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ব্রহ্মবাণী স্মরণ রাখিও ও ধ্যান করিও—"মহাসিদ্ধাম্বোয় গাইয়া ও সন্ন্যাস এক বলিয়া মনে হয়"। তোমরা এই মহাসিদ্ধাম্বোয়ার অধিকারী। সামান্য বর্ণধর্ম্মের ও আশ্রমধর্ম্মের অহঙ্কারে ডুবিতে পারিবে না। শ্রীনিত্যগোপাল আমার মূর্ত্তিমান্ ভাগবত ধর্ম্ম। নিত্য ভাগবত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মত উচ্চনীচের পার্থক্য নাই, সহজ মধুর আদরই বেশী। অযোধ্যার জনসমাজ মূর্ত্তিমান ভাগবতধর্ম্ম শ্রীরামচন্দ্র ও মূর্ত্তিমতী ভক্তি শ্রীশ্রীসীতাদেবীকে আদর করেন নাই, কিন্তু শ্রীশ্রীসীতাদেবী আকৃষ্টা হইয়াছিলেন হনুমানের কাছে, শবরী চণ্ডালিনীর কাছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যাহারা পতিত তাহারাই শ্রীভগবান ও শ্রীশ্রীভক্তিবাণীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে পতিতা গোপনারী-প্রেমে বিভোর হইয়া নিত্য ভাগবত ধর্ম্মের মাধুর্য্য প্রকটিত করিয়াছেন; ভাগবতধর্ম্মই "অকৃত বৎসল"। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে স্ত্রী ও শূদ্রের স্থান নাই। ঐ দেখ নৈমিষারণ্যে সমস্ত মুনিঋষির ভিতরে সূত ভাগবতের বক্তা। নিত্য-ধর্ম্মে কে বড়, কে ছোট নির্দ্দেশ করিবার যো নাই। তিনি যখন অবতীর্ণ হন্ তখন সমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তর পর্য্যন্ত প্রত্যেকভাবে সকল স্থানেই তিনি স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া থাকেন। এই নিত্যধর্ম্মে ক্রমে ক্রমে একটি স্তরের পর অপরটী এমনভাবে সমস্ত স্তর অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানকে পাইতে হয় না;

এই নিত্য ভাগবত ধর্ম্মে ঠাকুর আমার জড় সর্ব্বতত্ত্বের অনুরূপ চিন্ময় সর্ব্বতত্ত্বময় নিত্যাকার ধারণ করিয়া সর্ব্বতত্ত্বের জড়ত্ব ঘুচাইয়া দিয়া চিন্ময়ত্ব প্রদানে নিত্য প্রেমলীলার উপযোগী করেন। "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"। এই সকল অঙ্গের মধ্যে কাহাকে বড়, কাহাকে ছোট নির্দ্দেশ করিবে? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যাহারা পতিত তাহারাই প্রেমলীলার অগ্রগামী ও মাধুর্য্যের প্রকাশক। কি মনোরাজ্যে কি প্রকৃতির ভিতর সর্ব্বত্রই ভাগবত ধর্ম্মের এই মধুর নিয়ম। তোমরা অবধূত, হৃদয়-গ্রন্থিমুক্ত। বর্ণ ও আশ্রমেরও এক একটী গ্রন্থি আছে; সাবধান ভাই, এই গ্রন্থিমোহ যেন তোমাদিগকে অবধূতের শ্রীচরণ হইতে দূরে না রাখে। তোমরা একের উপাসক; সেই এক নিত্যবস্তু জগতের সর্ব্বপদার্থে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। তাই তাই তোমরা সমভাবে সকল বস্তু আলিঙ্গন কর। গৃহী ও সন্ন্যাসীতে ভেদজ্ঞান করিও না। অনেক সম্প্রদায় এই দোষে দুষ্ট হইয়া নিত্যপ্রেম হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন। নিত্য সম্প্রদায়ের দুই দিক—গৃহী ও সন্ন্যাসী গৃহী লীলা, সন্ন্যাস কৈবল্য। তোমাদের ঠাকুর মূর্ত্তিমান লীলা-কৈবল্য। যে লীলা-কৈবল্যের চরণ-সেবক, গৃহী ও সন্ন্যাসী এক নিত্য-প্রেমে আলিঙ্গিত হইয়া নিত্য-লীলা-কৈবল্য আস্বাদন করাও। সাবধান ভাই, ভেদ করিও না। "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি।" সন্ন্যাস দক্ষিণাঙ্গ পুরুষ; গৃহ বামাঙ্গিনী প্রকৃতি। গৃহী ও সন্ন্যাসী একাধারে পুরুষ-প্রকৃতি। ইহাই শ্রীগৌরতত্ত্ব। একাধারে শ্রীরাধা (নিত্য-লীলা) ও শ্রীকৃষ্ণ (নিত্য-কৈবল্য) শ্রীনিত্যগোপালই শ্রীগৌরাঙ্গ—একাধারে লীলা-কৈবল্য। গৃহী সন্ন্যাসী, শূদ্র ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব ও সর্ব্বাতীত ইহাই সমন্বয় তত্ত্ব। মনে রাখিও শ্রীনিত্যগোপালের বেদবাণী "আমার সম্প্রদায়ের যেন মুখ না হাসে"। তোমরাই এই সম্প্রদায়ের মুখস্বরূপ; তোমাদের পরিপূর্ণ সুন্দর মুখ দেখিয়া যেন সকলেরই চুম্বন-লালসা বৃদ্ধি পায়। ইহাই শ্রীনিত্যগোপাল-পদান্তিকে সকল ঐকান্তিক প্রার্থনা।

তোমাদের প্রেমভিখারী

শ্রীশরৎকুমার ঘোষ দাস

কবি গালিব

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ॥

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আগ্রাতে তাঁর জন্ম—নাম মির্জা আসাদুল্লা খাঁ গালিব। পিতামহ মির্জা কুবান বেগ সমরখন্দের লোক। মহম্মদ শার আমলে তিনি দিল্লী এসেছিলেন নিছক ভাগ্যের অন্বেষণে। তাঁর এক ছেলে মির্জা আবদুল্লা বেগ পিতার মত সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং প্রথম লক্ষ্ণৌতে তারপর হায়দ্রাবাদে ও শেষ পর্য্যন্ত আলোয়ার-এর রাজার অধীনে চাকরী করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মির্জা আবদুল্লা বেগের মৃত্যু ঘটে। পুত্র গালিব তখন পাঁচ বছর বয়সের বালক।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। আরও খারাপ ছিল সামাজিক পরিবেশ। শহর ও গ্রামের মধ্যে কোন বন্ধন ছিল না। দেশের জন্য মানুষের মনে কোন অনুভূতি ছিল না। দিল্লী আগ্রা ও লক্ষ্ণৌর মত শহরে আমীর ওমরাওদের জন্য বিলাস ব্যসনের প্রচুর আয়োজন ছিল। অথচ জীবনের গভীরতর চিন্তার কোন ক্ষেত্রই প্রস্তুত ছিল না। এই পরিবেশের মধ্যে লালিত হয়ে বালক গালিব উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষার কোন সুযোগ পান নি, কিন্তু বালক বয়সেই বিলাস ব্যসনে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার অভ্যাস রপ্ত করেছিলেন।

গালিবের পিতামহ বেঁচে ছিলেন এবং তিনিই গালিবের

তার নিয়েছিলেন। পিতামহের আদরে গালিব বড়লোকের ছেলের মতই ঘুরে বেড়াতেন। বংশের কিছুটা গরম ছিল, তার ওপর গালিবের চেহারা ছিল সুন্দর। সাধ্যমিন খুশি উড়িয়ে বেড়ানোই ছিল তাঁর কাজ। চেহারা ভাল ছিল বলে' তেরো বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে হ'ল ওমরাও বেগমের সঙ্গে। কিন্তু কোন যোগ্যতাই তিনি অর্জন করতে পারেন নি। একমাত্র যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তিনি নিজেই বলেছেন সে কথা - I could eat and drink and make merry.

কিন্তু সেই বালক বয়সেই তিনি মুখে মুখে ছড়া গাঁথতেন। আর একটু বড় হয়ে 'আসাদ' এই ছদ্ম নামের আড়ালে তিনি সুরু করলেন কাব্য রচনা।

গালিব বেঁচেছিলেন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত। কিন্তু জীবন তাঁর কখনও সুখের হয় নি। ফিরোজপুরের নবাবদের কাছে পাওয়া বৃত্তিই ছিল তাঁর জীবন ধারণের উপায় অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অসংযমী ও মদ্যপ। সুরায় বিভোর হয়ে থাকাই জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল। অথচ গালিবের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল। তিনি মনে করতেন, মৃত্যুর পর সেই পরমেশ্বরের কাছেই ফিরে যাবেন।

গালিব প্রথমে উর্দুতে তাঁর কাব্য রচনা করতেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই ফারসীতে লিখতে সুরু করেন। শেষ জীবনে আবার উর্দুতে লেখেন। তাঁর রচনার ভাষা ক্রপদী পর্যায়ের; ছন্দমাধুর্য ও ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় অপরূপ। তাঁর গজল দুই বা চার পংক্তিতে সম্পূর্ণ। এখানে তাঁর গজল থেকে কয়েকটির অনুবাদ করেছি। যথাসাধ্য অনুবাদ করেছি এম, মুজীব-এর ইংরাজী অনুবাদ থেকে—

১। ক্লান্ত পথিক হাঁটে আর থামে,
যাবে আর ভেবে থ'কে।
তোমাকে না দেখে' মসজিদ গড়ে'
ওরা প্রার্থনা যাঁকে।
ঈশ্বর এক সে আমার প্রভাব,
ঘৃণা করি যত আচারের অভ্যাস।
ধর্মীয় প্রথা যখনই চরেছে ক্ষয়
তখনই কেবল বিশ্বাস পাই আমি।

২। বিশ্বাস যদি করো, ঈশ্বর প্রার্থনা মেটাবেন;
প্রার্থনা যেন তোমাকে না করে হীন।
তবু চাও যদি, তিনি যেন সেই হৃদয় তোমাকে দেন,
হও নির্ভয়, কামনা ও লোভহীন।

৪। যদি একবার চোখ তুলে শুধু চাই—
দু'চোখে দীপ্তি জ্বলে সহস্র দল;
চোখ তুলি নাকি, কেমন করে' যে বই
এ' ঐশ্বর্য করুণায় উজ্জ্বল!

"পুরুষোত্তম-বিশ্ব পড়া গেলা এই জগতের বাহিরে নয়; সেই বিশ্ব এই বিশ্বেরই পুরুষোত্তম-অগ্নিতে হজম-হওয়া পুরুষোত্তম-রূপ। পুরুষতন্ত্র-স্তরকে পুরুষোত্তম-স্তরের কাছে সমর্পণ করিলেই এই স্তরের সব বন্ধন খুলিয়া যায়, এই স্তরের সব কিছু মুক্তির অগ্নিতে জারিত হইয়া এই স্তরেরই বুক চিরিয়া (বুঝায়) ভাগবত রূপে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়, যেমন হংসীমাতার বুকের তাপ পাইয়া ডিম হইতে ছানা বাহির হয়।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—
(৭৮)

২২. ৩. ৫৭ ॥ ৮ই চৈত্র ১৮৭৯—নূতন বৎসর···কাল ভাগবতের প্রথম শ্লোকের কথা বলেছিলাম কি করে ভগবান জগৎ সৃষ্টি করলেন...। ধীমহি যেন সদা··· সত্যকে আমরা ধ্যান করি। পর সত্য থাকে বলে? যেখানে ব্যবহারিক সত্য আর পারমার্থিক সত্য মেলে সেটা পর সত্য। আচার্য শংকর দুটোকে পৃথক করে দেখেছেন। সেখানে ব্যবহারিক এই রোজকার জীবনের সত্য শেষ হলে পারমার্থিক সত্য প্রকাশিত হবে। ভাগবতের সুর তা নয়। ব্যবহারিক সত্যের দোষ এই যে, তারা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিতে কাজ করে। মুখে প্রীতির কথা যতই থাক, একটু গভীরে স্বার্থ ছাড়া কিছু নেই। শংকর বলেন এটা থাকতে পারে না। পারে না যে তাতো সত্যিই—কেননা আমি যদি আমার মত করে তোমাকে চাই—তোমাকে সত্যিকারের পাওয়া ত হবেই না—যেমন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ছিল। তেমনি পুরুষের পোষণ নইতে পারার ক্ষমতা নেই বলে নারী মোহিনী হয়...পোষক-পোষিতের এ সম্বন্ধ মিথ্যা।...Unless above himself he can erect himself, how poor a thing man is—Samuel Daniel। নিজের উপরে উঠতে হবে—না সো রমণ না হাম রমণী···unless above herself শ্রীরাধা can erect herself তেমনি unless above himself শ্রীকৃষ্ণ can erect himself তাহলে কেউই কাউকে সত্যিকারের পেতে পারে না—নিজের উপরে উঠলে তখনই সে মিলন সার্থক, সত্য—এ পারলেই ব্যবহারিক সত্য পারমার্থিক সত্যায় গড়ে ওঠে।···অস্মাদ্যস্য যতঃ ইতরতঃ—এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি লয় যাহা হইতে হইয়াছে সেই পরসত্যকে আমি ধ্যান করি—তাঁর সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ই .. তিনি জগতের মধ্যে, তিনি জগতের ব্যতিরেকে; জগৎ তাঁর মধ্যে, জগৎ তাঁর ব্যতিরেকে। কৃষ্ণ রাধা ব্যতিরেকে থাকিতে পারেন, রাধা কৃষ্ণ ব্যতিরেকে থাকিতে পারেন—তাই কৃষ্ণ রাধাকে রহিয়াছে একই সঙ্গে যুক্ততা ও দূরে থাকা।···জগৎ স্বভাব নিয়ে মানুষ এসেছে—মানুষের সেই স্বভাব দুটিকে তুলতে হবে। স্বামী to the power কৃষ্ণ, স্ত্রী to the power রাধা...। Power মানে শক্তি···। স্বামীকে কৃষ্ণ হতে হবে, স্ত্রীকে রাধা হতে হবে...সেই প্রচেষ্টার মধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর সত্যিকারের সার্থক মিলন সম্ভব ও সত্য।···তাইত ব্রহ্ম নামের ভিতর দিয়ে সংসারকে to the power কৃষ্ণ করার প্রচেষ্টা।...ব্যবহারিক সত্যকে rearrange করতে হবে তাকে পারমার্থিক হতে গেলে··। কেবল, only থাকতে পার কি না—onlyness-এর সাধনা—কেবলোঽহম্··। পরকীয় সত্তা অর্থই above himself can erect himself জগদাতীত সত্তায় যে নিজেকে উঠাতে না পারে সে পুরুষোত্তম-সত্যের সন্ধান পায় নি—আবার তাকে জগদানুগ হতেও হবে...অন্বয় ও ব্যতিরেক একত্র চালাতে হবে।...কেউ কারো নয় অথচ দুয়ে মিলে এক। ···স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও পরকীয় সম্বন্ধ রাখতে হবে—independent অথচ সেইসঙ্গেই interdependent। ভাগবতের এই প্রথম শ্লোকের দৃষ্টান্ত দর্শন অন্তে।··· সৃষ্টির বাইরে থাকতে পার কি না আসক্তি বিবেকের উর্দ্ধে থেকে—বিবেকানন্দ নাকি বলেছিলেন খুখুর মত বেলুড় মঠ ফেলে দিয়ে যেতে পারি...গান্ধীজী সবরমতি আশ্রম ভেঙে দিলেন—কৃষ্ণ নিজের বংশ লোপ

করলেন...। সব সময় মনে রাখবে অন্বয় ও ব্যতিরেক সাধনা একসঙ্গে চালাতে হবে।...ইউক্লিডের সরলরেখা হল সব distance বাদ দিয়ে···আর আইনষ্টাইনের সরলরেখা হল maximum distance is the shortest স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে রাখতে হবে বিশ্বকে।...বিশ্ব-সেবাবুদ্ধি বাদ দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কামুকতা।... সংসারের সঙ্গে চটাচটি করে ভগবানের দরবারে রোজ আমরা নালিশ করি তোমার সংসার আমাকে তেতো দেয়, তোমার সংসার আমায় ঠাট্টা করে।···কেন করবে না? তুমি সংসারকে সন্তুষ্ট কর নি কেন?···বিশ্বের মাঝে বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে যে বিষয় চায়, সে বিষয় সত্য—বিশ্বের মাঝে যে স্বামীপুত্রকে চায়, সে স্বামীপুত্র সত্য হয়—ব্যক্তিগতভাবে বিষয় বা স্বামী-পুত্র স্ত্রী-কন্যা চাইতে গেলে সংঘর্ষের মতবাদই সত্য।...হোয়াইটহেড বলছেন···It is as true to say that God transcends world as that world transends God...। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে —রাধাকৃষ্ণ দুইজন দুইজনকে পাওয়ার জন্য ছটফটি করছেন, কেউ কাউকে পাচ্ছেন না। দুইয়ের পিছনে ছোটার নাম দুইকে অতিক্রম করে যাওয়া—ব্যতিরেক সাধনা ···ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে এর দৃষ্টান্ত প্রচুর। —রামের সীতা হারাতে হল ব্যতিরেক সম্বন্ধকে আহ্বান করতে, হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যা, নল-দময়ন্তী পরস্পরকে হারিয়ে আবার পরস্পরকে পেয়েছিলেন—কেন? ইহা সৃষ্টির সত্য। এ কথাটা মনে রাখতে পারি না বলেই দুঃখের ঘটনা ঘটলেই আমরা দুঃখ পাই, ভগবানকে গাল দিতে থাকি।—ব্যতিরেক সাধনাকে যদি জীবনে সত্য করে তুলতে পারতাম বিচ্ছেদকে তাহলে ভয় করতাম না— অন্বয়কে সত্য হতে হলে ব্যতিরেককে সত্য রাখতে হবে— এই ট্রেনিং দেবার জন্য নর-নারায়ণ আশ্রমের উদয় হয়। ...কর্মের কাছে যদি কর্মী ধরা পড়ে যায়, কর্মীর কাছে যদি কর্ম ধরা পড়ে যায়—তাহলেই মিথ্যা হয়ে গেল...। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যদি কর্মীদের কাছে ধরা পড়ে যান, তাহলে তিনি বিশেষ অগ্রসর হতে পারবেন না, ব্যতিরেকে তাঁকে থাকতেই হবে—অথচ সকলের অন্তরে তিনি প্রবিষ্ট থাকবেন। দুইটি ব্রহ্মগোপী, মাঝখানে কৃষ্ণ—দুইটি শিশু মাঝখানে শুক এই রকম হলে জীবন সত্য হয়। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং।···বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে ছাড়া মিলন হয় না।...মিলন যেমন সত্য, বিরহও তেমনি সত্য···। শুধু পাওয়ায় আসে তামসিকতা—পাওয়ায় মাধুর্য না পাওয়ায় —অতি মাত্রায় না পাওয়াতেও আসে আর এক রকমের তামসিকতা।···প্রত্যেক দুটি বস্তু লুকোচুরী খেলছে— পাচ্ছে, পাচ্ছে না...।

২৫. ৩. ৭৭ বলির বাধা ও সাধনার ইঙ্গিত করে এসেছে যে ভাগবত, সেই ভাগবতের প্রথম শ্লোক আমরা আলোচনা করছি—ঔ অম্মাভক্ত...। যেই পরসত্য হতেই এই বিশ্বের তত্ত্ব স্থিতি লয়, সেই পরসত্য আমরা ধ্যান করি। সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিনটী জিনিষ ভগবানের সঙ্গে যুক্ততায় এবং বিযুক্ততায় চলছে...। এই কেবল ও কেবলা যেখানে পরস্পর পরস্পরের নিরপেক্ষ ও অপেক্ষমান, সেখানেই ব্রাহ্মীস্থিতি ...যা কিছু হলেও চলে, না হলেও চলে যায়, সে-ই সৃষ্টি করতে পারে।...যাঁর থেকে সৃষ্টি স্থিতি লয় হচ্ছে, তিনি অর্থে যুক্ত অভিজ্ঞ···কোন্ বস্তুর কি অর্থ, কি প্রয়োজন এ বোধ তাঁর আছে—তাই সৃষ্টি চলে...। কোন্ বস্তু কার প্রয়োজন, কতখানি প্রয়োজন, এ যিনি না জানেন, তিনি সৃষ্টি করবেন কি করে?...সৃষ্টি করতে গেলে কোন্ বস্তু কিসের জন্য প্রয়োজন তা জানতে হবে।...ক্ষুদ্র জিনিষেরও প্রয়োজন বোধ জানে না বলেই তা রক্ষা করার ইচ্ছা নাই...। লেখাপড়া করা আমাদের প্রয়োজন এ বোধ সত্যি থাকলে লেখা পড়া করত...। বর্তমানে এ রকমভাবে চললে ভবিষ্যৎ অন্ধকার···। শব্দের তিন রকম অর্থ আছে বাচ্যার্থ, ব্যঙ্গার্থ, ও লক্ষ্যার্থ। ···প্রত্যেক জিনিষের অনেক অর্থ—সে সব জানা না থাকলে সৃষ্টি করতে পারে না। টাকা উপার্জন প্রয়োজন রক্ষা করতে কৃপণ তার অর্থ বোঝে না, সে কেবল জমায়। ···টাকা না থাকলে উপবাস করে মরণ জেনেও আর একজন টাকা যা তা করে খরচ করে।···সে অর্থের প্রয়োজন বোধ নেইনি...। যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি, আর গৃহে তার

অনিবে না আর নিশীথ প্রদীপ জ্বালি। ...কখন মোমবাতি জ্বালাতে হবে সে ছন্দ-বোধ ভগবানের ছিল।...শরণাগত হতে হয় ভগবানকে কৃতার্থ করবার জন্য নয়, নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য...জ্ঞান বা বিদ্যা যিনিই আছে—শরণাগত হলেই জ্ঞান ফুটে বেরোয়।... অর্থের অভিজ্ঞ যে সে অর্থের অপব্যবহার করে না।...তৌমারে আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ ধর্মান্ ভাগবতান্ ইহ।...যথা সময়ে বস্তুর প্রয়োজন-বোধ বা ছন্দ না শিখলে ঘাবে ঘাবে ঘুরতে হবে পেছে।...অপচয় হতো না যদি প্রয়োজন-বোধ থাকত...কাঁঠাল পাতা আর কাঠের গুড়ো কাজে লাগান যেত। ..বিশ্বে সব ছন্দে ছন্দে গাঁথা—সূর্য চন্দ্র ছন্দে গাঁথা...বিষয়ের সঙ্গে চোখের ছন্দ গাঁথা...স্ত্রীকে যখন তখন যেখান সেখান দিয়ে ঢোকালেই কি ঢোকান যায়? যেহেতু স্ত্রী সেইহেতুই কি তাকে কেবল তোমার ইচ্ছামত ঢোকাতে পারবি? অর্থাভিজ্ঞ না হওয়ার জন্য শেষে মানুষ সংসার ছেড়ে যায়...। ঠাকুর বলতেন, ছেড়ে যে গেলি—আমি তো ও অর্থে সংসার সৃষ্টি করিনি। আমার অর্থে যদি স্ত্রীকে ঢোকাতে চাইতিস, বা সংসারকে নিতে চাইতিস, তাহলে ছেড়ে যেতে হত না; সবই রাখতে পারতিস। আমার জীবন-দর্শন শুনে রাজসাহীর শৈলেন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন—reorientation of every conception—অদ্ভুৎ, unique। ...প্রয়োজন-বোধ অর্থ-বোধ আছে বলে নিত্যগোপালের কাছে সব বিধিনিষেধ বিফল।... বিধির গোলাম হয়ে একাদশীতে জলও খেতে নেই বিধি থাকায় মরলেও জল মেয় না। ...কখন কতটুকু মানব আর মানব না এটা শিখতে হবে পুরুষোত্তম-সৃষ্টিকর্তার কাছে। ...সৃষ্টি স্থিতি লয় সবকিছুরই ছন্দ আছে—সেই ছন্দ-বোধ যদি জীবনে আনতে পার তাহলে বস্তুর অর্থ-বোধও জীবনে এসে যাবে। ...পুরুষোত্তমের কাছে অর্থ-বোধ একরকম, কবিদের কাছে তার অর্থ আর একরকম...। নাচেরও বটে, তা artও হবে বটে...। খাওয়ার ছন্দ আছে, প্রেমের ছন্দ আছে— সব কিছুরই ছন্দ আছে। ছন্দ একান্ত অন্বয়েও নেই, একান্ত ব্যতিরেকেও নেই। ...কৃষ্ণ জানবার ছন্দ জানতেন, তাই কুরুক্ষেত্রে তিনি জাগলেন। ...আমিও সেই দলের লোক ছিলাম...কোনদিকে চাইতামই না... অথচ সমাধিতেও কোমরের কাপড় খসে না যে মানুষের সেই শ্রীনিত্যগোপালের স্পর্শে আজ এক নূতন ছন্দ-জ্ঞান লাভ করেছি বলতে পারি। ...লীলাচঞ্চলতা লীলাকৈবল্য নিত্যগোপালে এক সাথে...। তিনটার সময় খেলে অম্লশূল ঠেকাবে কে?... অর্থাৎ খাওয়ার অর্থ বোধ হয় নি। ...পুরুষোত্তম অর্থেষু অভিজ্ঞ...। তোমাদের এ আশ্রম দেখে মানুষ যেন তৃপ্ত হয়, লোকে যেন এসে দেখে যায়, শিখে যায়...। সংসারের প্রত্যেক কর্মও কেমন করে সার্থক সম্বন্ধ নিয়ে করার কথা বলেছেন পুরুষোত্তম, নূতন যুগে সেইটাই তো শিখবার। ...নিত্যগোপালের এই দাবী...মানুষ হও। ...কথায় যেন ফাঁক না থাকে—কথা দিয়ে মানুষকে বশ কর—হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচ—বাক্ বৈ বশিষ্ঠঃ—সার্থক কথা কও...। কৃষ্ণকে মোহন বলে তাকত জটিলা কুটিলা—তাঁর বাক্যের মধুরতায়...। সার্থক কথা কও...। গান্ধীজী বিরুদ্ধ কথা কইলেও আত্মীয়ের মত শোনাত। ...আর এমন লোকও আছে যে পরম আত্মীয় হলেও এমন ভাবে কথা কয় যে মনে হয় সে শত্রু।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৭০)

ঠাকুর, 'ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে তুমি ছাড়া কেহ নাই'—আমার সকল দেহপ্রাণমনের আশ্রয় তুমি। কি আছে আমার যেখানে দাঁড়াইয়া আমি সংসারের মাঝে চলাফেরা করিতে পারি? কে যেন আমার পাগল এই প্রাণটাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ছুটিতে চাহিয়াও ছুটিতে পারিতেছি না। তবে কি ছুটিবার এই আকাঙ্ক্ষা একান্ত ভুল? তোমার যাহারা তাহারা চুপচাপ বসিয়া আছে। কোন বেদনাও নাই, সাড়াশব্দও নাই। বেশ আছে। যত দায় কি আমার? তোমার সমাধিরূপ ঐশ্বর্য ছিল, তুমি সামাল দিতে পারিয়াছ। আমার তো কোন ঐশ্বর্য নাই, আছে শুধু প্রাণ, প্রাণের বেদনা। মানুষ ঐশ্বর্যই বোঝে। কেমন করিয়া তোমাকে বুকে লইয়া এই সাগর পার হইব? প্রাণ? প্রাণ কেহই চায় না। আমি প্রাণ লইয়া বিপন্ন। বল দেও, বুদ্ধি দেও, ধন দেও, জন দেও।...প্রতিষ্ঠা ২।টায় এখান হইতে বাঁশবেড়িয়া রওনা হইয়া যায়।...৩টার পর মিশ্র ঘড়িদেখর হইতে আসে।...

২৩শে জুলাই

ঠাকুর, কিছুতেই যে আমার আবেষ্টনকে আমি পরিপাক করিতে পারিতেছি না। আমি কি ব্যর্থ হইব? যোঽসৌ অস্মিন্ আত্মনঃ সর্বং বেদ সর্বং তং পরাদাৎ'—যে আত্মা হইতে সর্বকে 'অন্য' বলিয়া বোধে, সেই সর্ব তাহাকে পরাস্ত করে। তবে 'সর্বকে' অন্যত্র না দেখিয়া আত্মস্বরূপ 'আমি' বলিয়া দেখিব? সেই দৃষ্টি আমাকে দেও। ঠাকুর, সেই দৃষ্টি আমাকে দেও, দিব্য চক্ষু আমাকে দেও। সর্বকে কৃপাও করিতে পারিব না, পরিপাকও করিতে পারিব না। কেমন করিয়া এমন 'সব' লইয়া আমি চলিব? তোমার দর্শন ও জীবন কি আমার মাঝে অবতরণ করিয়া সব-কিছু সহজ করিবে না? আমাকে পরিপাক করিবার দীপ্ত অগ্নি দেও, আমার মন্দাগ্নি ঘুচিয়া যাক তোমার জীবনের আগুন আমার জীবনে সঞ্চারিত হউক। তোময় হয় হউক।...বেদানন্দ আসে। ট্রাষ্ট বডি অনুরোধ করিয়াছে, তাহারাও জানে। আমি যাইব বলিলাম। পানিহাটী গেলে সে আমার সঙ্গে থাকিতে প্রস্তুত। সন্ধ্যায় নবশঙ্কর আসে। অনেক কথা—অরবিন্দের মত, অনুকূল ঠাকুরের কথা।...তীব্র সমালোচনা তাদের। Other side টা বেশ বলে। কথায় কিন্তুর সত্য আছে। নিতাগোপালের বড় ব্লক আনিবার জন্য রেণু সকাল ৭টায় গিয়াছিল। পায় নাই। সন্ধ্যার পর যায়। নিয়া আসে। যগেনবাবু রেণুকে যথারীতি কাজ করিবার জন্য অনুরোধ করে। নবশঙ্কর একদিন তার পিতাসহ সুরেশ মজুমদারের ওখানে গিয়াছিল। আমার কথা হইয়াছিল। উচ্চ প্রশংসা নাকি করিয়াছেন...। মহানির্বাণ মঠ যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহাও বলেন। মাখন বাবু বৈকালে আসেন।

২৪ শে জুলাই

ঠাকুর, তুমি-আমি যখন দুই, একান্ত দুই, তখনই সমস্যা-সঙ্কুল এই বিশ্ব-সৃষ্টি, জীবন-সৃষ্টি। যখন তুমি আমি দুই দুই থাকিয়াও এক ঈশ্বর হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠি, তখন সমস্যা গলিয়া যাইতে থাকে। এক নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন দিনই কি এই অদ্বৈতানুভূতি একান্ত (absolute) হইবে? তাহা হইলে তো সৃষ্টি স্তব্ধ হইবে। মায়াও যে অনাদি অনন্ত, অবিদ্যাও... সৃষ্টিও তাই অনন্ত। তুমি চৈতন্য, তুমি অচৈতন্য, চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বিত। শঙ্করাচার্য এবং পরে বর্ত্তমান সময়ে শ্রীঅরবিন্দ 'চৈতন্য' হইতে রওয়ানা হইয়াছেন। কিন্তু

চৈতন্য কি করিয়া 'অবগুণ্ঠন' সরিয়া 'আত্মবিস্মৃত' হইয়া জড় হইলেন? এই 'অবগুণ্ঠন' বা 'আত্মবিস্মৃতি' কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল? তাহা হইলে অচৈতন্যও ছিল, তাই চৈতন্য তাহা দ্বারা অবগুণ্ঠিত হইতে পারিলেন। অচৈতন্য কি তবে চৈতন্যের co-existent নয়? অচৈতন্য বাদ দিলে একান্ত চৈতন্যদ্বারা কোন সৃষ্টিই হয় না। নিতাগোপাল, তুমিই মূর্ত্তিমান চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। শঙ্করাচার্য বা অরবিন্দ কেহই 'অচৈতন্যকে' যথার্থ মূল্যে স্বীকার করিতে পারেন নাই। তুমি করিয়াছ তাই তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম মাখনবাবু সকালে আসে। এই সঙ্কলন করা যাবে ১৫০ টাকা দিয়া যায়। প্রবন্ধের জন্য হরেনমণি, চারু ভাণ্ডারী, গোপাল ভট্টাচার্য প্রভৃতির নামে চিঠি দেওয়া হয়। পূর্বে আমি প্রতিভা বেণু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিলাম। এখন সর্বতোভাবে এক স্থানে, এক কর্মে, একই খাওয়া-পরায় জড়িত হইয়াছি। জীবনের সঙ্গে জীবনের closer contact হইয়াছে। অধিকতর পরিচয়ের সুযোগ বাড়িয়াছে। এখন সম্পূর্ণ 'coincidence' হইবার পথে দাঁড়ানো গিয়াছে। এখন যদি জীবনে সার্থকতা আনা যায়, তবেই উৎযাপনো গেল। এখন গোঁজামিল চলিবে না। সামগ্রিক সৃষ্টি ছাড়া, প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ছাড়া, ভাগবত জীবন (দিব্য-জীবন) যাপন করা ছাড়া, 'ঐক্য পারস্পরিকতা সামঞ্জস্য' (অরবিন্দের ভাষায়) ছাড়া উপায় নাই।

২৫শে জুলাই

নিতাগোপাল, তুমি জীবন, জীবন-বল্লভ। জীবনে আগে পাওয়া, পরে তত্ত্বের দ্বারা চেনা। তাই আগে কৃষ্ণ, পরে তাঁহার ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব ও ভগবত্তা। আগে অনুরাগ, পরে বিবেক। যাহাকে সমগ্রভাবে পাইলাম, তাহাকে তত্ত্বের ভিতর চিনিয়া লওয়া। অর্জুন পাইয়াছিলেন সখারূপে পূর্বে জীবনে, পরে মহিমার জ্ঞানে, তত্ত্বজ্ঞানে। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে জীবনের পাওয়ার মধ্যেও ফাঁক পড়িয়া যায়। অথচ জীবনের বাহিরে তত্ত্ব bloodless category ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রজ-গোপীগণ 'গোপিকানন্দন' রূপে যাহাকে জানে, তাঁহাকেই পরে 'অখিলাত্মানম্ অন্তরাত্মদৃক্' পরমাত্মা বলিয়া চিনিয়াছিলেন। বসুদেবও পুত্ররূপে পান, পরে তত্ত্বদ্বারা চিনিয়া লন আগে শ্রীকৃষ্ণ, পরে তাঁহার ব্রহ্মত্ব; আগে শ্রীনিতাগোপাল, পরে তাঁহার ব্রহ্মত্ব। এই ধারার প্রবর্তন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ জীবনমন্ত্র দিয়াই শ্রীনিতাগোপালের 'এক ব্যক্তি গীতার পাইয়াছে' ইত্যাদি বাণীর তাৎপর্য আগে concrete, পরে abstraction। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জীবন ব্রহ্ম প্রভৃতি abstraction। জীবনেই জড়-অজড় সমন্বয়, চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয় '... বেণু ছাড়ার পর বাহির হইয়া'''আমার খাবার পর ফেরে। সুদর্শনের জন্য বেণু একটী প্রবন্ধ লেখে সন্ধ্যার পর ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। 'মহাভারতের বিরাট পর্ব' নামে পূর্বাভ্যুক্তি স্বরূপ একটী প্রবন্ধ দেন। পূর্বার্দ্ধ পড়িয়া শুনান। ইহার পর ধীরেন ডাক্তার আসে। মঠের কোন খবর নাই। কাহারও কোন মাথাব্যথা নাই—অতর্কিত হউক বা না হউক। সব চুপচাপ। তারিণীবাবুরও আমার কোন নাম নাই। বেশ আছেন। ...মঠের — সেদিন মিশুর কাছে আমি কোথায় যাই... ইত্যাদি খোঁজ নিয়াছে। পরের ঘরে উঁকি দেওয়ার কি নীচ প্রবৃত্তি ইহাদের। নিন্দা করাই ইহাদের প্রয়োজন। যতটা পারিয়াছি আমি —র সুখসুবিধা করিয়া দিয়াছি, টাকাও দিয়াছি।...

২৬শে জুলাই

শ্রীনিতাগোপাল, তুমি আমার—ইহাই তোমার আমার সার্থক সম্পর্ক। আমি তোমাকে আমার পরিচ্ছিন্ন জীবনের সকল 'মমতা' দিয়া আবরণ করিয়া রাখিব, বাঁচাইয়া রাখিব, পুষ্ট করিব, বিশ্ব-দরবারে চরম প্রদর্শনী রূপে উপস্থাপিত করিব—ইহাই ছিল আমার পরম লোভ। কিন্তু তোমাকে 'আমার' করিতে হইলে তো প্রথমে আমাকেই তোমার করিতে হইবে, তোমার প্রেম-সাগরে ডুবিয়া যাইতে হইবে, মিশিয়া যাইতে হইবে, এক অদ্বৈত হইয়া যাইতে হইবে। আমার 'স্থান' তুমি, তুমিই আমার 'নির্বাণ', কেননা তুমিই যে অব্যয় বীজ। তোমার হৃদয়েই আমার জুড়াইবার একমাত্র স্থান, নিশ্চিন্তে স্থিত

থাকিবার 'স্থান'। আর কোথায় যাইব, তাহার মধ্যে খুঁজিব আমার স্থান? আমার সার্থক স্থান মিলিয়াছে। আমার স্বামিন্, তুমি আমি, আমি তুমি।···শ্রীমেহের বলিয়াছেন,—'আরাম .হারাম হ্যায়'—যাঁহারা বর্তমান যুগে গঠনের কাজে আছেন, তাঁহাদের আরাম কোথায়? বামনদী এক তরুলোক ও সুচেতা কৃপালনী বাঁশিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, রাশিয়ায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু নাই। তাহাতবর্ষে অনেক বেশী। সেখানে গান্ধীজীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর এখানে কম্যুনিজমের বই-এর ছড়াছড়ি, দলের অন্ত নাই। ···প্রতিভার চিঠি আসিয়াছে।

২৭শে জুলাই

ঠাকুর, আমার নিকটতম, আমার বিশ্ব-জীবন যাত্রার পথে তুমি আমার সখা সঙ্গী বন্ধু। আমার আমা'তে আমাতে জর্জরিত জীবনের তুমিই আশ্রয়। ওগো আমার প্রাণাধার, বিশ্বাধার, তোমারই জীবনে বিশ্ব জনমিছে, ভাসিছে, ডুবিছে, আবার লীন হইতেছে। আপনার হইতে তুমি আপনার। কে আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে? তোমার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিবার জন্ত পথে বাহির হইয়াছিলাম। দিন গেল, কৈ তাহার তো কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তোমাকে দিয়া বিশ্বের বড় প্রয়োজন। ঠাকুর, আমি কি তোমাকে আমার খেয়াল মত উপস্থিত করিতেছি? আমাকে বুঝাইয়া দেও। না, আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তুমি সত্যই সেইরূপ? ঠাকুর, বিশ্বমানবের সামনে প্রকাশিত হও তোমার বিশ্বদর্শন, বিশ্ব-জীবন লইয়া, ওগো বিশ্বাধার। রেণু ১১টার পর বাহির হয়—ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান, সি এইচ বোস-এর ওখানে হইয়া ফেরে। সি এইচ বোস এ মাসের জন্ত···বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বৈকালে হঠাৎ বলাই দেবশর্মা উপস্থিত। সে কেমন করিয়া পুত্রদের সাহায্য-নিরপেক্ষ না হইয়া চলিতেছে, তাহার কথা বলিল। ছেলেরা তাহার কৃতবিদ্য। চতুর্দিকের আবেষ্টন দেখিয়া তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, cynic হইয়াছে বলিল। বলিলাম, সন্দর্ভ সমন্বয়ের পূর্বাভাসই। রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের আগামী মাসের লেখা পড়িয়া শুনাইলাম। গত মাসের অড়াঙ্গসমন্বয় প্রবন্ধ নাকি তাহাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। ঐরূপ প্রবন্ধ নাকি অনেকদিন পড়ে নাই। বলিল, আপনি সদ্‌গুরু পাইয়াছেন, আমি পাই নাই। আমি বলিলাম, সদ্‌গুরু না পাইলে 'আমি' বাঁচি না, প্রত্যক্ষ কোন 'আমি'র কাছে মাথা না নোয়াইলে egoism কোন না কোন রকমে থাকিয়াই যায়। সন্ধ্যায় চলিয়া যায়। ধীরেন ডাক্তার আসে।···নগেন মুখার্জীর ছাত্র ছিলেন আগে তাহার এক বন্ধুসহ প্রায় ৪টায়। রেণু প্রেসেও গিয়াছিল।···সকালে চৈতন্ত আসিয়াছিল মঠ হইতে আগামী রবিবার কার্যকরী সমিতির এক সভা হইবে, তাহার বিজ্ঞপ্তি দস্তখত করাইতে। এজেন্সী সম্বন্ধে আমাকে পূর্বে জানান হয় নাই। আইন কি জানি না। জানিবার দরকারই বা কি? আমি চিরদিনের ছাপলা, কবে আইন মানিয়া চলিয়াছি? বেশ হাবলা আমি।

২৮শে জুলাই

ঠাকুর, যাহা পাইয়াছি, যাহা পাই নাই, সব কিছু সঙ্গে করিয়া তোমাকে বুকে লইয়া তোমার পানে চলিবার শক্তি দাও। তোমার আহ্বান 'চরৈবেতি চরৈবেতি' প্রাণে বাজিতেছে। আমি আগাইব। ওগো আমার অগ্রগামী দেবতা, কে আমার কে তোমার আছে? তুমি একা, আমিও একা—এই দুই একায় এবার বুকে বুক লাগাইয়া চলিব। কেউ দেখিবে না, কেউ শুনিবে না। চতুর্দিকের সন্দর্ভ দেখিয়া বলাই দেবশর্মার হুঁস ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আমি দেখিতেছি সেই সংঘর্ষের নিংড়ান ঘনরূপ সমন্বয়ঘন তুমি। সন্দর্ভেরই অপর দিক সমন্বয়। আমার তো ঘাবড়াইলে চলে না। যে আবেষ্টন আসুক না কেন, আমাকে পরিপাক করিতেই হইবে। 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে'। Face nature—আমার জীবনের মন্ত্র। তুমি আমার, আমি তোমার; তুমি আমি, আমি তুমি। বস্ আর কি? রেণু ১১টায়···ফেরে ৪টার পর। আজ ছুটার পর মঠে যাই। ···৮॥ টায় পর চলিয়া আসি। ফিরিয়া দেখি প্রভুর চক্রবর্তী·····বসিয়া আছেন।···

ছাড়া বরিশাল যাহাতে অশ্বিনীবাবুর আদর্শ বুকে লইয়া এখানে দাঁড়াইতে পারে, তাহারই উদ্দেশ্যে প্রফুল্লবাবুর প্রচেষ্টা বলিলেন। সাধু উদ্দেশ্য। আমি যাহা পারি এখনও বরিশালের জন্য করিব বলিয়া দিলাম। মাঝে মাঝে আসিতে বলিলাম ···সন্ধ্যার পর উষাদিদী নীচে গিয়া রেণুর সঙ্গে অনেক কথা বলে।

২৯শে জুলাই

ঠাকুর, তুমি আর আমি যখন জ্ঞানে ভক্তিতে এক অদ্বৈত হইব, প্রেমে অদ্বৈত হইব। আমার ছোট বিশ্ব তোমার হউক, তোমার বিরাট বিশ্ব আমার হউক। তুমি আমি এক হইয়া বিশ্ব গড়িয়া তুলিব। আমি 'ছোট অনন্ত', তুমি 'বড় অনন্ত'; এই দুই অনন্তের মহা যোগ-মিলনে বিশ্ব গড়িয়া উঠুক। তোমার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শান্তিনিকেতনে'র 'ছোট ও বড়ো' প্রবন্ধে এই 'ছোট অনন্ত' ও 'বড় অনন্তে'র কথা লিখিয়াছেন। তুমি তাহাই লিখিয়াছ 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ' এই ভাষায়। তুমি আমি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান থাকিব—ইহাই আমার দিনরাত্রির ভাবনা। আমার পৃথক-বুদ্ধি ঘুচাইয়া দেও, পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি মুছিয়া ফেল। আমি আমি, তুমি তুমি; আমি তুমি, তুমি আমি—ইহা জপ করিব, ধ্যান করিব। ইহাই আমার জীবনের মহাসাধনা। রেণু ব্যাঙ্ক ··হিন্দুস্থান·· প্রেস···সুহৃৎবাবু প্রিয়রঞ্জনবাবুর বাড়ীতে প্রবন্ধের কথা বলিয়া আসে। আমি বৈকালে ৬টার পর মঠে যাই। একাই একরূপ বসিয়া ছিলাম। নীলরতনবাবু আসেন নাই। আরতির পর রমাপতিবাবু আসেন। কোন কথা হয় নাই।···একান্ত আদর্শের ছাঁচে পড়িলেই যে মানুষ মানুষ হয় না, শরৎচন্দ্রের 'অপব্যয়ের আনন্দ', রবীন্দ্রনাথের 'ত্রুটির আনন্দ', যাহে যতটাও যে জীবন বাড়াইবার পক্ষে প্রয়োজনীয়, ইহা রেণুর সঙ্গে আলোচনা হয়। এই জন্য ঠাকুর অতিভোগকে ত্যাগের সমকক্ষ বলিয়াছেন। শুধু বিদ্যাতে মানুষ যান্ত্রিক হয়, আবার একান্ত অশিক্ষিতও মানুষ উজ্জ্বল হয়। দুইয়েরই আবশ্যক চাই ···এই মাসে ১০ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন হইল। প্রিয়রঞ্জনবাবুও বলিয়াছেন যে পত্রিকা বেশ হইয়াছে।

গিয়াছে। তাই ঐরূপ হইয়াছে।

৩০শে জুলাই

ঠাকুর, তুমি স্ব-প্রকাশ, আমি অ-প্রকাশ। তোমার 'স্ব' হইয়া তোমার প্রকাশকে বহন করিয়া আমি অ-প্রকাশ এই সংসারের বুকে প্রতিষ্ঠিত হইব। তুমি কায়া, আমি ছায়া। ছায়াই তো কায়ার সৌন্দর্য-জ্যোতি। তুমি আমি সহাসনে সমাসনে সমাসীন থাকিয়া কায়ার সঙ্গে যেমন ছায়া থাকে তেমন করিয়া স্বর্গ গড়িয়া তুলিব এই ধরার বুকে। আমি অপ্রকাশ না হইলে তোমার সৃষ্টি অসমাপ্ত থাকিবে, বাষ্পের মত ভাবময় থাকিবে। যাহা ভাবে অপ্রকাশ, তাহাই তো রূপে প্রকাশ। আমি রূপ-প্রকাশ দিয়া তোমার স্বর্গ-কল্পনাকে বাস্তবে গড়িয়া তুলিব। ওগো আমার পরাপর-পুতলী শ্রীরাধা-শ্রীনিতাগোপাল, তোমার প্রাণশক্তি আকাশ বাতাস জলে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে। তোমার স্পর্শে ছোটও অনন্ত হইল, বড়ও অনন্ত। তাই তুমি পরাশক্তি। তোমার পরশে অণুও পূর্ণ, ভূমাও পরিপূর্ণ। আমার জীবনের আরাধনার ধন শ্রীরাধা। তোমার সুষমামণ্ডিত জীবন আমার সামনে জল জল করিতেছে। তোমার জয় হউক। তুমিই এক-বিশ্বের মহা সংগঠনী শক্তি।···হরিদাসী নিজের ঝামেলার কথা বলিয়া খুব বেদনা প্রকাশ করে। দুঃখ হয়। বলিলাম, ঠাকুরের শ্রীচরণে লাগিয়া থাক, তাহাতেই আবেষ্টন বদলাইতে পারে। তিনি ছাড়া আর গতি নাই।...আমি মঠ হইতে ফিরি ৯টায়। নিত্যাত্মানন্দের গীতাপাঠ শুনি। ঠাকুরের দর্শন পায় নাই। তবে কিছু জানে বুঝিলাম। বলে মন্দ নয়। রমাপতিবাবু, নীলরতনবাবু, সুধাংশু ও তাহার ভাইয়ের সামনে কোন্ প্রাণ নিয়া সেবা করিয়াছি তাহা ও ঠাকুরের বিশ্বনাগরিক রূপের কথা বোরের সহিত বলি। পানিহাটীতে 'রামকৃষ্ণ' নাম বিশেষভাবে বলার বিরুদ্ধে পার্বতীবাবু অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাকুর নিজ হাতে ঐ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় লিখিয়াছিলেন।...

৩১শে জুলাই

ঠাকুর,...তোমার বিশ্বনাথরূপ, বিশ্বনাগরিকরূপ আমাকে দেখাইয়াছ। তুমি শুধু আমাদের গুরু নও—মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগৎগুরুঃ। সকল দল মিলাইয়া তোমার এক অখণ্ড দল। তুমি সকল দলের ঊর্দ্ধে, অথচ সকল দলের। মহা ঐক্য বিধাতা তুমি, তোমারই চরণতলে সারা বিশ্ব এক-বিশ্বে গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে. ওগো নিরঞ্জন, নিষ্কলঙ্ক, কোনও সাম্প্রদায়িক অঞ্জন তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমি তোমাকে বুকে লইয়া চলিব। ইহারা তোমাকে ইহাদের করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, তোমাকে দিয়া একটী বিশেষ 'দল' করিতে চাহিতেছে। তুমি তাই আগে তত্ত্ব, পরে জীবন। নিত্যগোপাল-তত্ত্ব বিশ্ব নিবে, নিত্যগোপাল নাম, নিত্যগোপাল-রূপ কয়জন নিবে? তাহা না হইলে সকল দল লইয়া এক অখণ্ড দল কি করিয়া গড়িয়া উঠিবে? এস ঠাকুর, তুমি এস, আমার স্বামী। ৪॥টার পর মঠে রওয়ানা হই। ৬টা মত সময়ে সভা আরম্ভ হয়। চিদানন্দ যে তাহাকে ভাতা দেওয়ার সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহা না-মঞ্জুর হইয়াছে টাকা নাই বলিয়া। আরও একটী ঘটনা ঘটিল। চিদানন্দ পূর্বে ৫০ টাকা নিয়াছিল তাহার নিজের খরচের জন্য, আর খীতার করিল যে সে আরও ৫০ টাকা নিয়াছে। প্রফুল্লবাবু বলিল, ইহা criminal breach of trust। খগেনবাবুকে চিদানন্দ ধরিয়া পড়িয়াছিল। সে-ও ইহাতে চটিয়া গিয়াছে। টাকা দিয়া রাখা হইবে না ইহা সকলেরই মত। বীরানন্দ, বেণু সোম, চৈতন্য, অমূল্য চৌধুরীও এই মত দিয়াছে। চিদানন্দ বার বার বলে যে ইহা আমার অন্যায় হইয়াছে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, ভাইসপ্রেসিডেন্ট-এর অনুমতি নেওয়া হইয়াছিল কি না। সে বলিল না। ইহা গুরুতর অপরাধ। অথচ সে-ই একমাস পূর্বের আমার প্রতি লাঞ্ছনার মূল।...সে টাকা নিয়া কি মাথা গরমই যে এই কয় মাস করিয়াছে, আর আমি তাহাকে কি ভাবে আগলাইয়া আসিয়াছি, তাহা সে না জানে এমন নয়। অথচ সে আমার প্রাণের উপর আঘাত হানিয়াছে। কেউ তো তাহাকে রাখার পক্ষে ছিল না। শুধু আমিই তাহাকে রাখিয়াছিলাম সকলের অমত সত্ত্বেও। দুঃখ হয় তাহার জন্য।...আমার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে আমি সামলাইয়া নিতে পারিতাম।...

১লা আগষ্ট

ঠাকুর, সত্যই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ; তোমার 'ভয় কি, টেনে তুলব' বাণী অমৃতেরই বাণী। যে দুর্যোগের মাঝে পড়িয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল বুঝি বা তোমার সেবার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, আর আগাইতে পারিব না। মহানির্বাণ মঠের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কি করিয়া কাজ করিব? গত কল্যকার ঘটনায় দেখিলাম যে, আবহাওয়া ধীরে ধীরে বদলাইয়া যাইতেছে, যাহার যাহা খুশী করিয়া এড়াইবার পথ আর নাই। তুমি সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। নিজের হাতে তুমি বিচার করিতেছ। তুমি প্রতিষ্ঠিত হও তোমার স্বরূপে; তোমার বিশ্বরূপ আমার হৃদয়ে, বিশ্ব হৃদয়ে। আমি তোমার যোগে যোগী হইব। ...৫॥০ টার পর মঠে যাই। কাল রাত্রিতে মঠ হইতে আসার পর চিদানন্দ ও রমাপতিবাবুর মধ্যে বচসা হয়। চিদানন্দ বলিতেছিল ইহারা অকৃতজ্ঞ, মহানির্বাণ মঠ ধ্বংস হইবে ইত্যাদি। এত বড় অন্যায় করিয়াও এই আস্ফালন—এতো বেশ বাও! মতিলাল শীল স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোটালী পাড়ার যোগেন্দ্রনাথ বেদশর্মা মঠে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট মতিলাল শীলের বদান্যতার অনেক কথা শুনিলাম। তিনি বলিলেন, মহাকায়তে আছে, বিভব ও জ্ঞানশক্তি, ভোগ্য ও ভোজন শক্তির সমন্বয় অতি অল্প লোকের মধ্যেই আছে। মতিলাল শীলে বিভব ও জ্ঞানশক্তির সমন্বয় হয়। একটি বিধবাকে কেমন করিয়া তাহার নিলামে খরিদ করা বাড়ী (৫ লক্ষ টাকা মূল্যের) ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, আরও ঘটনার বর্ণনা করেন। স্কুলে ছাত্র free। দানের খরচ মাসিক ১৫০০০৲ টাকা। প্রপৌত্র ও বৃদ্ধপ্রপৌত্রগণও ইহা মানিয়া লইয়াছেন চিদানন্দ গত কল্যকার না-জানাইয়া লওয়া ১০০ টাকা খগেনবাবুর কাছে ফিরাইয়া দিয়াছে।

২রা আগষ্ট

ঠাকুর, তোমাকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে

পারিব কি না বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা না হইলে যে দর্শনের ছাঁচে বিশ্ব গড়িয়া উঠিলে তাহার বুক জুড়াইত, বিশ্বে শান্তি নামিয়া আসিত, তাহা বিশ্ব পাইবে কোথা হইতে? শ্রীঅরবিন্দ বা শ্রীরামকৃষ্ণ কেহ তো এই দর্শন এতখানি ব্যাপকভাবে ও গভীরভাবে দিয়া যান নাই, অন্যের আর কথা কি? অনুকূল ঠাকুরের তো কোন দর্শন নাই, তা তাঁহারা লোক-সংখ্যায় যতই ভারী হউন না কেন। কাহার দিকে তাকাইব তুমি ছাড়া? বিশ্ব কাহার জীবন ও কাহার দর্শন স্পর্শে সুস্থ হইবে? সঙ্ঘশক্তি সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিবে? তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য তাই সারাজীবন হাপাহাপি করিলাম। কৈ তেমন তো কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পথ দেও, সুযোগ দেও, ধন জন দেও। আমার বুক ভরা বেদনা আর কত সহিব? মাঝে মাঝে মনে হয় এ বুঝি আমার অতি ইচ্ছা এবং প্রার্থনা করি 'অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে হতে বাঁচাও মোরে'। ঠাকুর, এস, আমার প্রাণবল্লভ। ...রেণু খাওয়ার পরই বাহির হইয়া পোস্টাফিস, ব্যাঙ্ক, প্রেস সিণ্ডিকেট, মনোরঞ্জন বসু, মন্মথ রায় প্রভৃতি জায়গা ঘুরিয়া ৫টায় আসে। আমি ৬টায় মঠে যাই। ...রবি বাবের সভায় 'মহাভারত' পাঠের জন্য কাল ভোরে সেবানন্দকে যীরেন বাবুর ওখানে রেণুর পত্র লইয়া পাঠানো স্থির হইল। ...পানিহাটি হইতে সুশীলা আজ আসিয়াছে। সেখানের লোকেরা এখান হইতে কাহাকেও পাইবার জন্য অস্থির। ইতিপূর্বে ২০ জন একটি দরখাস্তও করিয়াছিল। কে যাইবে?...আজ আমার একটি পুরাতন রসিদ বইয়ের শেষ অংশ আনি। তাহার মধ্যে চিদানন্দ অবধূতের স্বাক্ষর। ও নাম তো থাকা উচিত নয়। নীলরতন বাবু জুন জুলাইর বাবদ ৫টাকা দিয়াছেন। ...

৩রা আগষ্ট

ঠাকুর ১৩১১ সনের ১৫ই অগ্রহায়ণ তুমি আমায় দীক্ষা দিয়াছিলে, শ্রীচরণে স্থান দিয়াছিলে—নবদ্বীপ আমপুলিয়া-পাড়া মঠে। আমি তো ডুবিয়া যাইতেছিলাম, তুমি হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়াছ। আমি অকৃতজ্ঞ হইব না। নিমকহারামী করিব না। সারা জীবন তুমি যাহা যাহা করিয়াছ, তাহা আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে। তাহা আমি প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিব তোমার সংস্পর্শ লাভের পর আজ আমি যাহা তাহা কি তোমার গুণেই নয়? কি আমার ছিল, কি আমি ছিলাম, কি হইতে পারিতাম, তাহা কি আমার বন্ধুদের দিকে চাহিয়া অনুমান করিতে পারি না? আজ যে আমি তোমার দর্শন ও জীবন-চরিত শুনাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে পারিতেছি তাহা কি তোমারই কৃতিত্ব নয়? ৪০টাকা মাহিয়ানার ব্রজমোহন স্কুলের মাষ্টার আজ একটা নূতন দর্শনের কথা বলে, মানুষ তাহা শোনেও। ঐ যে নগেন মুখার্জী বলে যে, ইহার পাণ্ডিত্য বুঝিবার মত পাণ্ডিত্যই বা কয়জনের আছে, তাহা কি তোমারই জন্য নয়? আমি যাহা তাহা তুমিই, তোমারই মহিমা। আমাকে যন্ত্র করিয়া তুমি বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হও। রেণু...ফেরে প্রায় ৬টায়। ৭টার পর আমি মঠে যাই। ...ধীরেনবাবু এ রবিবার পারিবেন না। পরের রবিবারে পারিবেন। আমি কাজে আবার লাগিয়াছি বলিয়া সেবানন্দ এখানে থাকিবে, কাজকর্ম করিবে, উহার হৃদয় আছে। নূতন রসিদ বই ছাপানো স্থির হয়। নগেনবাবুর খুব উৎসাহ দেখিতেছি।...

৪ঠা আগস্ট

ঠাকুর, তোমারেই প্রাণের আশা কহিব, সুখে দুঃখে শোকে—সকল দ্বন্দ্বের মাঝে—ঐ চরণে চাহিয়া রহিব। আমার জীবনে তুমি কোন্ খেলা খেলিতে চাও, কোন্ রস তুমি জীবনে আস্বাদন করিতে চাও আমাকে বুঝিতে দাও। আমি তোমার খেলার যন্ত্র হইব, লীলা-সাথী হইব। আমার জীবনের মধু তুমি পান কর, ওগো মধুসূদন। আমার জীবন তোমারই হউক, তোমারই ছন্দে সে নৃত্য করুক; আমি মুছিয়া যাই, তুমি প্রকাশিত থাক আমার ছন্দে ছন্দে। আমি তুমিময় হইব যেমন অগ্নি-সংযোগে লৌহ অগ্নিময় হয়, আমি তেমন করিয়া এক হইব যেমন এক বিন্দু কালী জলে পড়িলে সে জল হইয়া যায়। তোমার জয় হউক আমার জীবনে।...রেণু প্রথমে ফিয়ন ল্যাম্প, এ্যাডভারটাইজিং ডেভেলাপমেণ্ট, এস দরকার, এম বি দরকার-এ যায়; ফেরে ৫টায় পর। ...আগামী রবিবার

মঠে 'শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা হইবে বলিয়া পত্রিকাগুলিতে খবর দেওয়ার জন্য চিঠি লেখা আরম্ভ হয়। ...নীলমাধবের সঙ্গে বেণুর আমার নীলমাধবের পিতা নগেন গাঙ্গুলীর সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধের কথা আলোচনা হয়। কত মানুষের সঙ্গে যে কত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। আজ আমি একা নিত্যগোপালকে লইয়া পড়িয়াছি। কেউ নাই সঙ্গে। ঠাকুর, ঠাকুর, তোমার প্রতিষ্ঠা যে জীবনের কামনা ছিল। পারিলাম না তো কিছু করিতে। তোমাকে লইয়া যে ঝড় বহাইতে পারিতাম। আমার সিংহ-গর্জন কি চিরদিনের জন্য থামিয়া গেল? তাওব আমার বুকের মাঝে আবার সেই সিংহ, সেই নরসিংহ জাগাইয়া পড়ুক নর-সমুদ্রের মাঝে। ঠাকুর, নরসিংহ আমার!

৫ই আগস্ট

ঠাকুর, তুমি আমার জীবনের সকল শুভের সাক্ষী, সকল পদবিক্ষেপে, সকল স্পন্দনে সাক্ষী। তোমাতে আমাতে নিত্যানন্দ, নিত্যযোগ স্থাপিত হউক। নিজেরে করিতে গৌরবদান নিজেরেই শুধু করি অপমান আপনারে শুধু ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে। সকল অহংএর যে আমার ডুবাও চোখের জলে। মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে। তোমার ভিতরেই আমি সত্য আমার বাহিরে তুমিও । 'তুমি আমি আমি তুমি'—নিত্য কাল এই সম্বন্ধ অটুট হইয়া থাকুক। তোমার আমার অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ স্থাপিত হউক। প্রতিটি কর্মের মধ্যে তোমার আমার নিত্য সঙ্গ অব্যাহত থাকুক। তোমাকে হারাইয়া যেন আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও না বহে। ইহাই আমার সারাদিনকার প্রার্থনা। আমার সারা দেহ প্রাণ মন ব্যাপিয়া ছাপাইয়া তুমি বিরাজিত থাক। মেয়েমানুষ হজম করা বড় সহজ নয়। মঠে ৬টার পর যাই।...সত বাহিকীর জন্য সেবানন্দের প্রয়োজন আছে। একটি মানুষ হাতের মধ্যে না থাকিলে চলা অসম্ভব হইবে। তাহাকে মঠে রাখিতে হইবে।...

৬ই আগস্ট

নিত্যগোপাল, আগে আমি তোমার, পরে আমি আমার। তোমার সঙ্গে এক হইয়াই আমি আমাকে চিনিব, পাইব; তোমার বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়া একাত্ম হইয়া আমি তোমাকে জানিব, পাইব ও আস্বাদন করিব। তোমার বাহিরে আমার কাণাকড়ি মূল্যও নাই। তোমার শ্রীচরণতলেই আমি সুন্দর, সত্য, শিব। বিশ্বের আমি কি অসত্য কি অশিব, কি অসুন্দর! বিশ্বের সঙ্গে তোমার সঙ্গে যখন 'এক' হই, তখনই আমি দিব্যসুন্দর আমি সত্য শিব সুন্দর হইব তোমার স্পর্শে। অসত্য হইতে সত্যে, অশিব হইতে শিবে, অসুন্দর হইতে সুন্দরে লইয়া চল। যেখানে অসত্য অশিব ও অসুন্দরের অন্ত, সেখানে অনন্ত কাল ধরিয়া সত্য শিব সুন্দর হইবার মত শক্তি যোগ্যতা আমাকে দেও। সত্য অসত্য, শিব অশিব, সুন্দর অসুন্দরের সমন্বয়ই তুমি। আমার জীবনে তোমার জয় হউক। যেণু ৯টার পর বাহির হইয়া...১২।০টায় ফেরে।...মঠে নীলরতনবাবু ও অগেনবাবু ছিলেন। কাল সভা হওয়ার কথা সকলকে জানাইতে বলিলাম।... মঠের ভবিষ্যৎ কি?...না আছে ঠাকুর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান, না আছে তাহাদের চরিত্রবল বা জীবনের কোন গৌরব। ইহারা কেমন করিয়া ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিবে? ভাবিবার বিষয় বটে। ইহাদের গুরুদেরই কি ইহারা কিছু করিতে পারিতেছে? কোথায় ভাসিয়া গেলেন কেশবানন্দ, নিত্যানন্দ, মহেশ্বরানন্দ, প্রণবানন্দ? ঠাকুর, ঠাকুর রক্ষা কর। তোমার যে বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন বোধ করি। ইহা কি তোমার সম্বন্ধে বেশী করিয়া ভাবি? মিথ্যা করিয়া ভাবি?...বিকালে মাখনবাবু আসিয়াছিল।

৭ই আগস্ট

ঠাকুর, তোমার এই বিশ্বয় নাচিবার সম্ভাবনাকে কে শিব হইয়া বক্ষে ধারণ করিবে? তোমার দর্শন ও জীবন তো ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িবার প্রয়োজন ছিল, সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু শিব কই, শিবত্ব প্রাপ্ত সিদ্ধদল কই, কিম্বা শিবত্ব লাভের জন্য পাগল সিদ্ধ সম্প্রদায় কই? ...পরস্পর মারামারি হইবে। কে তাহা রোধ করিবে? তুমি কি সত্যই প্রকাশিত হইবে না? আমার স্বপ্ন কি বাস্তবে পরিণত হইবে না? আমার বুকের মধ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত

করিবার দুঃসাহস বা দুরাশা কেন হইল? ঠাকুর, পথ দেও, শক্তি দেও, সুযোগ করিয়া দেও, সকলকে মানুষ্ইয়া চলিবার মত শক্তির অধিকারী কর। ...৩টায় অপর্ণা বসু (৺ধীরেন্দ্রনাথ বসুর—আমাদের গ্রাহক—জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ) আসে।...উদ্বোধন আমার বুঝিবার মত বিষয় মেয়েটির মধ্যে আছে? রাধারাণী, কি ইচ্ছা তোমার বুঝি না। সারা জীবন তোমার type-এর মেয়ে খুঁজিলাম। পাইলে তো তোমার পুরুষোত্তমের সেবা হইত। আর কোনও আশা-সন্ধি তো ছিল না। সীতার পর রাধার স্তরের কথা সে বুঝিল। ...মঠে যাই। ছটায় একটু পূর্বে লতা আরম্ভ হয়। আরম্ভ করি—আত্মানকাছেসোচোমি...শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ণ কলি-যুগকে পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির মধ্য দিয়া বর্তমান যুগের সামনে এক দর্শন দিয়া গিয়াছেন। যিনি কৃষ্ণ তিনিই নিত্যগোপাল। পরে গিরিবারণ, 'অহম্ বৈলোহস্মি', ঠাকুরের বর্তমান ভজন ও 'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাস-যোগ্য নয়' বাক্য, ত্রিলীলা creative দর্শন রাখিয়া গিয়াছে, 'spiritual life is at the same time a fact and a task', মানুষ না হইলে ভগবানের দিব্য সৃষ্টি হয় না—রবীন্দ্রনাথের এই সকল উক্তি আলোচিত হয়। অপর্ণা 'শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' ১৯০টাকা দিয়া নেয়।

৮ই আগস্ট

ক্রমশঃ

সাময়িকী

পেট, প্রেম, প্রতিষ্ঠা—পেট, প্রেম, প্রতিষ্ঠা—কথাটা শুনতে ভাল শোনাচ্ছে না, বোধ হয় 'পরশোপাড়া মড়াদাহে' দোষ হয়ে গেল। কিন্তু এই তিনটি মানুষকে জানিয়ে তোলে। আমাকে বেঁচে থাকবার জন্য পেটে খেতে হয়, হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে হয়, দশ জনার মধ্যে আমি যে আছি, একথা নিজে জানতে হয়, অপরকে জানাতে হয়।

কিন্তু ভাবনা হচ্ছে এই নিয়ে যে, খাব কি রকম করে, ভালবাসব কি রকম করে, দশজনের মধ্যে যে আমি আছি একথা নিজেকে ও অপরকে জানাবই বা কি রকম করে? শিশু যখন নিজে খেতে আরম্ভ করে, তখন তাকে আমরা এ-রকম করে খেতে হয়, ও-রকম করে বসতে হয় ইত্যাদি শিখিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা যখন খাই, আমরা যখন ভালবাসি, তখন তারও কি একটা রকম থাকবে না, সেখানে কি শেখবার কিছু নেই? দশজনের নিমন্ত্রণে কিংবা বিলিতি ডিনারের টেবিলে কি রকম করে খেতে হয় সে কৌশল শিখবার কথা বলছি না। কিংবা কতটুকু এবং কি খেলে শরীর রক্ষা হয়, তা-ও নয়। তবু মনে হয় খাবে তো মানুষ নিশ্চয়ই, কিন্তু খাবে কি রকম করে?

কথাটা বুঝিয়ে বলি। একরকম করে ভাবলে দেখি, আমি খেতে চাইলে তোমার খাওয়া হয়, তুমি খেতে চাইলে আমার খাওয়া বন্ধ হয়—তোমার আমার মধ্যে কেবলই ঠোকাঠুকি। আজকের পৃথিবীতেও এরই পরিচয় পাই। কিন্তু এমন কি হতেই পারে না যে, এ ঠোকাঠুকির ব্যাপার না ঘটিয়ে তুমিও খাও, আমিও খাই? আচ্ছা, তুমি যদি না খেতেই পাও, আমি কি তাহলে সত্যিই খুব সুখী হই? তোমাকে না খাইয়ে রেখে যদি আমি বেশ খেয়ে যাই, তবে কি আমার সত্যিই আনন্দ হয়? কিংবা আমাকে উপবাসী রেখে যদি তুমি শুধু খাও, আমি কি তবে কিছুই প্রতিবাদ করি না কিংবা আমি কি তবে তোমার ঘাড় মটকে দেই? তোমাকে বঞ্চিত করে নিজেই খাওয়ার মধ্যে একবার মনে হয়, বেশ তো ভাল লাগছে। কিন্তু মানুষেরই মধ্যে আছে একটা কিছু—সেটা কি শুভ প্রীতি?—যেখানে তোমাকে বঞ্চিত করায় আমার প্রাণ ব্যথিত হয়।

আর হৃদয়ের এই ব্যথাকে ছেড়ে দিলেও তোমাকে না দিয়ে আমিই যদি শুধু খেয়ে যাই, তবে কিছুদিন তা চালাতে পারব বটে, কিন্তু একদিন তা বন্ধ হবেই। কেননা আমার খাওয়াটা তো আকাশ থেকে টপকে পড়ে না, সমাজের বুক চিরেই তা বিষকর্ষণরূপে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই তোমাকে না দিয়ে খাওয়ারও যেমন একটা গর্ব আছে, আবার তোমাকে দেবার জন্যও বুকের মধ্যে খোঁচা আছে। এ দুটোকে সামলাই কি করে, মেলাব কি করে?

এমনি সব ক্ষেত্রেই প্রশ্নের আর অন্ত নেই। মানুষকে ভালবাসতে ভাল লাগে। কিন্তু কেমন করে ভালবাসলে প্রাণ তৃপ্ত হয় সেই কথাটিকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। ভালবাসি বললেই কি ভালবাসা হয়, প্রাণে আনন্দ আসে, জীবন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে?—হয় না। যাকে ভালবাসব তার সাথে আমার সম্বন্ধটা কি রকম হবে? তাকে আমারই করে নিয়ে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা ভাললাগা মন্দলাগা দিয়ে যদি তাকে জড়িয়ে ধরি, তাহলেও ঠিক ভাল তো লাগে না। যে সম্পূর্ণভাবে সব রকমেই আমার, তাকে ভালবাসায় আমার প্রভুত্ববোধ তৃপ্ত হতে পারে, কিন্তু আনন্দের জন্ম সেখানে হয়ই না। যে আমার নয় একেবারেই, তাকে আবার ভালবাসাও যায় না।

আর ভালবাসাই বা বলে কাকে? এর সঙ্গে জীবনের ধর্মের কি কোন সম্বন্ধ আছে, না বিরোধিতা আছে? এ জীবনে কর্ম এক বস্তু, ভালবাসা অপর বস্তু? নরনারীর মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক পরস্পর বৈপরীত্য থাকার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মধ্যে পরস্পরকে আকর্ষণ করবার একটা স্বাভাবিক প্রেরণাও রয়েছে। তাই সংস্পর্শ বা সঙ্গ সেখানে একটা ভাললাগার সৃষ্টি করে। কিন্তু সে কুয়াশায় ভাল সত্তা হলেও বাস্তব জীবনে তার স্থান কতটুকু ও কোথায়, তা বিচার করে নেব আমরা কোন্ বিবেচনা দিয়ে? ঐ ভাললাগাটুকুই যখন ভালবাসায় পেছনের কথা হয়, তখন তার প্রতিক্রিয়া বড় ভাল হয় না। কেননা জীবনবস্তুটি একটা ভারী অদ্ভুত বস্তু। এর ভাইনে বাঁয়ে আশেপাশে কত কথাই যে আছে! এর গভীরতারও তল পাওয়া গেল না, এর বিস্তৃতিরও সীমা মিলল না। তাই ভাললাগা ও ভালবাসাকে জীবনের অনেক খানি কাজ দিয়ে জড়িয়ে না নিলে দুর্নিরীক্ষ্য পরমাত্মার মত তাকে সঘন, বীর্যবান ও সুন্দরতর করে তোলা যায় না। তারই ফলে আজ যাকে সহজেই ভাল লাগে কাল তাকে সহজেই ভাল লাগে না, মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ঈর্ষা বিদ্বেষ, জটিলতা জট পাকিয়ে তোলে। কেউ যায় ছেড়ে, কেউ না গেলেও প্রেমকে কোথাও খুঁজে পায় না, ছাড়ায় থেকেও তা যেন বাড়াই হয়। এমনি অবস্থাই চলছে আজ সমাজের সর্বত্র, বিবাহবিচ্ছেদ চলে যেখানে সেখানেও, চলে না যেখানে সেখানেও। আর বিবাহপূর্ব জীবনের ঘটনাতেও এই দৌরাত্ম্য। যারা একদিন সহজে ভালবেসেছিল, তারা আর একদিন সহজে ছাড়ল কি করে? মানুষ তো পশু নয়। তাই ভাবি ভালবাসব কেমন করে যাতে জীবনকে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করবে, যা আমাকে আমার বাইরে নিয়ে গিয়ে আমাকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডী থেকে মুক্তি দেবে?

আর প্রতিষ্ঠা? সেখানেও ভাবনা অনেক। প্রতিষ্ঠা মানুষ চায়, কেবল বয়স্ক মানুষই নয়, প্রতিষ্ঠা শিশুও চায়। প্রতিষ্ঠা মানে কি? —স্বীকৃতি; আমি যে দশজনার মধ্যে আছি, দশজন যে আমার মধ্যে আছে, এই কথাটির স্বীকৃতি, আমার যে ব্যাপক জীবন আছে তারই স্বীকৃতি। একেই বলে যশ। কিন্তু দশজনার কাছ থেকে আমার সে অস্তিত্বের স্বীকৃতি কেমন করে আদায় করে নেব, প্রশ্ন সেইখানেই। গলার জোরে কিংবা গায়ের জোরে কিংবা অর্থের জোরে কিংবা ধাপ্পাবাজি দিয়ে যে সত্যিকারের স্বীকৃতি বা যশ পাওয়া যায় না, একথা সত্য, কথা হিসাবে জানি আমরা সবাই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে করি আমরা ঐ-ই। কিন্তু সত্যিই তো ওতে তৃপ্তি নেই নিজ অন্তরের মধ্যে সে ফাঁকি নিজেই তো আমরা টের পাই। আমি চাই সত্যিকারের স্বীকৃতি। কান্নার জোরে স্বীকৃতি আদায় করে ঘটে শিশু, কিন্তু শিশুর পক্ষেও তো সেটা খুব সুস্থ অবস্থা নয়।

অতীতে বা বর্তমানে যারা যশ অর্জন করেছেন, তাঁদের পথ ছিল কি? সংক্ষেপে, তাঁরা মানুষের হৃদয়ে

আপন আসন বিস্তার করে নিয়েছেন। নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েই, বাড়িয়ে তুলেই স্বীকৃতি অর্জন করব উপনিষদে যে একটি মুক্ত আকাশ আছে যেখানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিশে গিয়ে বিশ্বের 'সবে'র সঙ্গে আমার যোগ সাধন করেছে, সেইখানে তারই মধ্য দিয়ে জীবনকে যে বাড়িয়ে তোলা—সেই সদর রাস্তাতে পাওয়া স্বীকৃতিই চাই। মনের জন্যই শুধু যখন যথাকাঙ্ক্ষ', তখন সেখানে 'যেন তেন প্রকারেণ' ব্যাপারটা এসেই যায়। এমনি সব ক্ষেত্রেই। ভাল লাগে বলেই যখন ভালবাসা, আর কোন প্রশ্নই যখন সেখানে স্থান পেতে পারে না, তখন তার উগ্রতা সব বিবেচনাকেই ছাড়িয়ে যায়; আবার তার প্রতিক্রিয়াও একদিন অমন জোরালো হয়েই আসে। খাই পরি যখন শুধু খাওয়াপরার জন্যই, তখন আমার সে খাওয়াপরা কেমন করে সংগ্রহ করা গেল তার কোন বিচার থাকে না। খাওয়াপরাটাই শুধু লক্ষ্য হওয়ার জন্য সে খাওয়াপরার কোন শেষ পাওয়া যায় না এবং যেনতেন প্রকারেণই তাকে সংগ্রহও করতে হয়, মেটানোও হয়। কিন্তু এতে তো সৌন্দর্য নেই। কিন্তু আমি যে সৌন্দর্য চাই।

তাহলে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ভালবাসতে ভাল লাগে বলেই ভালবাসি একথার একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র স্থান ও সত্যতা রয়েছে যাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না, তথাপি প্রত্যেকের এই self value-র বাইরে আর আর একটি বিশ্ব-মান (cosmic value) আছে 'সবে'র সঙ্গে যেখানে সে বিধৃত, যা দিয়েও তাকে বিচার করতে হবে। তা নইলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অন্তহীন দ্বন্দ্ব থেকে কিছুতেই রেহাই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ আমার খাওয়াপরা, আমার ভালবাসা, আমার প্রতিষ্ঠার একটি নিজস্ব মূল্য থাকবে, আবার একটি সার্বজনীন মূল্য থাকবে অথচ কারো দ্বারা কেউ পীড়িত হবে না। আমার খাওয়াপরাদ্বারা তোমার খাওয়াপরা নষ্ট হবে না, আমার ভালবাসাদ্বারা আমার জীবনের অন্য কথা উপবাসী থাকবে না, আমার প্রতিষ্ঠা তোমার দ্বারা অপিত হবে না।

বুদ্ধি দিয়ে এই স্ব ও বিশ্ব-মানের সমতা আনতে গেলে কিছুতেই তাকে পেশ করা যাবে না। বুদ্ধির সামর্থ্যের বাইরে সে বস্তু। আর প্রথম থেকেই যদি তোমাকে আর আমাকে একেবারে পৃথক গোত্রীয় বলে ধরে নেই, তাহলে তোমার স্বার্থের সঙ্গে আমার স্বার্থের সংঘাতকে ঠেকান যাবে না কিছুতে। তাই তুমি আর আমি একই সমাজগোষ্ঠীর অন্তর্গত, আমাদের পারস্পরিক সুখদুঃখ একটি অখণ্ড বস্তু, এই কথা মেনে নিলেই তোমার সঙ্গে আমার লাঠালাঠির সম্বন্ধের মধ্যেও সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই আমার কোনকিছুই যেন আমি এমন করে না করি, যাতে বিশ্বের সব-কিছু থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। সে সব কিছু আমার বাইরেও, আমার ভেতরেও। আমার ভালবাসার বৃত্তিকে মেটাতে গিয়ে আমারই অন্য বৃত্তিগুলিকে যেন না আমি আহত করি বা নিষ্পেষিত করি। ভালবাসাকে আমার বিকৃত কল্পনার খেয়াল না করে তাকে বাস্তব করতে চেষ্টা করাই সুস্থ ভালবাসার লক্ষণ। ভালবাসা জীবনের কোন বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়, সমগ্রজীবনের সঙ্গে, জীবনের সব-কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে আছে যে ভালবাসা, তা-ই বাস্তব ভালবাসা। তেমনি খাওয়াপরা, তেমনি প্রতিষ্ঠা। এদের প্রত্যেককেই তার স্ব-মূল্যে মূল্যায়ন করেও 'সবে'র সঙ্গে তাদেরকে গেঁথে তুলতে হবে—এই-ই হচ্ছে এদের সম্বন্ধে জীবনের বিজ্ঞান।

এই দুইয়ে যখন মিলে যায়, তখনই তা সেবা হয়ে দাঁড়ায়। এবং এই সেবা ছাড়া আর কিছুতেই মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত কল্যাণ আনতে পারে না, আনন্দও দিতে পারে না। বিশ্ব-সভ্যতার বর্তমান মূর্তির দিকে চেয়ে মনে হয় এ কল্যাণের প্রয়োজন আছেই। আমার খাওয়াপরা দিয়ে, আমার ভালবাসা দিয়ে, আমার প্রতিষ্ঠা অর্জন দিয়ে যখন আমি আমার সেবা করি, বিশ্বের সেবা করি, বিশ্বাতীত সত্তার সেবা করি, তখনই আমার ভালবাসা খাওয়াপরা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ভালবাসা খাওয়াপরা প্রতিষ্ঠা হিসেবেও সত্য, তাদের বিশ্বমূল্যেও সত্য।

নরনারায়ণ আশ্রমে সঙ্ঘ সংবাদ—বিগত ২৬শে মাঘ ১৩৮৯ রবিবারে নরনারায়ণ নিয়ন্ত্রনিয়ামী বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় অধিবাসী বন্ধুবর শ্রীমোহিত কুমার ভট্টাচার্যের একমাত্র কন্যা চার

বৎসর বয়স্কা কন্যার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার বেদনাহত পিতা শ্রীরামধন শাস্ত্রী তাঁহার পৌত্রীর স্মরণার্থে নবনারায়ণ নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রথম হইতে পঞ্চম প্রতি শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারীকে (কম বেশী ৫০ টাকা মূল্যের) পুরস্কার দেন এবং ১৫০ শত শিশুকে কমলালেবু সাবান বই ও অন্য শিশু-প্রিয় দ্রব্যে পুরস্কারগুলি ভরা হইয়াছিল। এই পুরস্কার তাঁহারা প্রতি বৎসর দিবেন বলিয়া প্রস্তাব রাখিয়াছেন। বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণীতে তৃতীয় স্থানাধিকারী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীকে ভালভালেই পুরস্কার দেওয়া হয়, এবং দশম স্থানাধিকারী পর্যন্ত সকলকে বাঁধান খাতা দেওয়া হয়। অন্য বিষয়ের জন্যও পুরস্কার দেওয়া হয়। কলিকাতাবাসী বন্ধুবরেষ শ্রীকেশব লাল মিত্র ও শ্রীমাধব চন্দ্র বিশ্বাস যথাক্রমে ১৫খানা শিশু-পাঠ্য বই ও ৫০খানা বাঁধান খাতা পুরস্কারের জন্য দিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের এই পুরস্কারের জন্য শিশুরা লেখাপড়ায় উৎসাহিত হইবে বলিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীরামধন শাস্ত্রী ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

উহার কিছুদিন পূর্বে বিশ্ব-শিশু-দিবস উপলক্ষে বিগত ২৯শে নভেম্বর সোমবার (১৪ই নভেম্বর প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই) নবনারায়ণ নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়, স্থানীয় অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাগুইপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলিয়া এক ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন রকম খেলাধূলা অন্তে শিশুদের জলযোগ করান হয় এবং বৈকালে সমস্ত রকম ক্রীড়ার জন্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ-কল্যাণ-বিভাগ কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ। তৎকালীন ২৪ পরগণা জিলার সমাজ-কল্যাণ অধিকারিক শ্রীসুধীর চন্দ্র সামন্ত উপস্থিত থাকিয়া শিশুদের পুরস্কারগুলি প্রদান করেন। এই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা গান, কবিতা, নাচ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া সকলকে আনন্দ দান করিয়া থাকে।

বিগত ২রা মার্চ ১৯৬৯ নবনারায়ণ মহিলা শিল্পকেন্দ্রের বার্ষিক প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সেলাই ব্লাউজ ও সাধারণ স্কুলের মেয়েদের তিন জাতীয় সেলাই—ছাটকাট, সূচী ও উল—উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং পরীক্ষাতে তিন বিভাগেই তিনটি করিয়া পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসী বন্ধুবর শ্রীনির্মলকুমার গুপ্ত সভাপতিরূপে পুরস্কার বিতরণ করিয়া ছিলেন।

একটি পাখীর দুইটি গ্রীবা

॥ শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস ॥

চিত্র-বাঘের একটি পাখীর
স্বর্ণ শুভ্র দুইটি গ্রীবা :
শুভ্র গ্রীবাই দু'চোখে শুধু
লক্ষ্যই করে বিশ্ব-বিভা।

স্বর্ণ গ্রীবার ভাবনা মানা,
কাজেই সুখী সে বদ্ধ ঘরে :
তখন উধাও শুভ্র-গ্রীবাই
মুক্ত ভানায় দিগন্তরে।

স্বর্ণ গ্রীবার জঠরে আগুন
সদাব্যস্তে আহার খোঁজে ;
অথচ তখন শুভ্র গ্রীবাই
মগ্ন গভীর রূপের ভোজে।

খাঁচা ও মাটির উর্ধ্বে উঠেই
পেয়েছে যে ঐ আকাশটাকে,
কেমনে সে পারে ফিরতে সাবেক
জীর্ণ জড়ায় শীর্ণ বাঁকে।

তাই সে মাটি ছুঁয়েও ছাড়া,
কেননা সে তো জেনেছে ঠিক,—
দেহের অনেক উপরে স্বভাব,
সবার উপরে জীবন-রসিক।

পরিণাম

॥ শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

অসূর্য অসুর-লোক অজ্ঞানের অন্ধ তমসায়
পরিবৃত, রুদ্ধদৃষ্টি—নিহত-আলোক
সে আকাশ শোকে ম্লান, অশুভ ছায়ায়
পরিকীর্ণ দশদিক,—আত্মজ্ঞানহীনতার শোক
কী করুণ রুদ্ধশ্বাস নীল যন্ত্রণায়।
আত্মহা যে, অবিদ্যায় সমর্পিত জন
সে লোকে প্রয়াণ করে জীবনের শেষে;
অন্তিম অস্থির আলো মুছে গেলে মহা মৌনতায়
সে এই অসুরলোকে নিঃসঙ্গ চারণ।

মোহের সঙ্গমে মৃত, সহজাত উজ্জ্বল নিঃশেষে
সমস্ত হারিয়ে ফেলে—পরাজিত রুগ্ন হীনতায়
সমর্পিত আত্মঘাতী,—নারকীয় পিশাচের মূঢ় সহবাস
অন্ত্য উপজীব্য তার। আত্মার বিকাশ
জীবনে হয় নি যার—অন্তরহীন সেই অক্ষম জীবন
আত্মঘাতী, অসহায় জীবনে মরণে
তার কোনো মুক্তি নেই। তার নিতে হবেই শরণ
অন্ধকার অচলায়তনে ॥

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

ঈশোপনিষদ্ ॥ ৩ ॥

সূচীপত্র : চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৫-৭৬, ১৯৬৯

১। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ৩৩
শ্রীরেণু মিত্র
মহাত্মাজীর পুনরাবির্ভাব
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
একটী খবর
শিক্ষা দেবে কে
শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস
আলোকের দেশ (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ
৬ সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি)
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
একখানি পত্র
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত
কবি গালিব
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৭৮)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (পূর্বানুবৃত্তি) ৫৫
সাময়িকী : পেট প্রেম প্রতিষ্ঠা ;
আশ্রম-সঙ্ঘ সংবাদ
একটি পাখীর দুইটি গ্রীবা (কবিতা)
শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস
পরিণাম (কবিতা)
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাজেআটি, পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি, নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন ধরার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীরাজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্গমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্গের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ
১১। গীতাজয়ন্তী
১২। উদ্ধবসংবাদ (পুস্তিকা)
১৩। "অহিংসাত্মক" গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
পুস্তক ,ঐ-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)

17 MAY 1969

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মুদ্রিত হইতেছে)
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

অপ্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির ভ্রমকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিষ্য নিত্যগোপাল
ও শিক্ষা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়ঋষি শ্রীনিত্যগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন
রবীন্দ্র-হৃদয়
প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৬, ১৯৬৯ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুই-এর সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

সূচীপত্র : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬, ১৯৬৯

আঠারো বৎসর আগে ৬৭
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত
পাকালী (কবিতা)
শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভাষ্যতীর্থ
দেশ-নায়ক গোবিন্দবল্লভ পন্থ
৺সুশীলকুমার ঘোষ
৪। সাম্যবাদের কবি নজরুল
শ্রীশান্তশীল দাশ
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (পূর্বানুবৃত্তি) ৮১
সিদ্ধান্ত দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি) ৯১
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
সাময়িকী : সুতাকাটা ৯৮

জলে, কাদায়, দুর্যোগে নিশ্চিন্ত সহায় বাটা ভালকান

বৃষ্টি-বাদলের দিনে অথবা দুর্যোগে, নিশ্চিন্তে পথ চলার সহায় বাটা ভালকান। আসমানা ছুতো এই ভালকান, নকশায়-উপাদানে একেবারে নতুন। বাহাই রবারের মজবুত ছিমছাম আপার, সব ঋতুতেই সামলাতে পারে, ওয়াটার প্রুফিংয়ের সুবিধে. ছলে অটুট জুতোর গড়ন, আর পি ভি সি সুক্তোলি দহন ইচ্ছে হোয়া যায়।

যেমন সুঠাম গড়ন, তেমনি নমনীয় পায়ের অরাম ফেলে আসা। তাছাড়া ফোমের আলগা উল্লাস, জলে ভিজুক, কাদা লাগুক— সাফ করতে কামেলা নেই।

ছেলে আপড়ে ছুতো নিজেই নিজের নতুন। ফরমায়ি ছুতে আর মনোহর নকশায়, বাটা ভালকান জুতো ধরকার পাবে নিশ্চিন্তে ভরসা।

বাটা ভালকান ভরসায়, ভরসায়, ছিমছামে।

দুর্যোগের দিনে
মুশকিল আসান
বাটা ভালকান

Bata

VULCAN

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	২·৫০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

UNIVERSITY

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৯ ত্রাবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

আঠারো বৎসর আগে

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত

[শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীশ্রীনিতাগোপালদেবের বিপরীতধর্মী বস্তুর অর্থাৎ সর্ব সমন্বয়ের চিন্তাধারায় যে প্রকাশ রাখিয়া গিয়াছেন সেই ১৯১৯ খৃঃ হইতে, সেই বিরুদ্ধকে, বিপরীতকে হজম করার বীর্যবান ভাবনার অংশ-বিশেষ আমরা মাঝে মাঝে প্রকাশ করিব। কোন বিরুদ্ধ বা বিপরীত শুধুই, একান্তভাবেই বিরুদ্ধ বা বিপরীত নয়, তাহা একই সঙ্গে একই সময়ে complementary বা পরস্পর পরিপূরকও বটে। ইহাই বস্তু-ধর্ম। কিন্তু এ কথাটা আমরা মনে রাখিতে পারি না বা জানি না বলিয়াই ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে এত বিভ্রান্ত হই, বিপর্যস্ত হই। যাহাকে আমরা বিরুদ্ধ বলিয়া জানি তাহা কেবল বিরুদ্ধই নয়, তাহার বিরুদ্ধত্বটুকুকে পরিপাক করিয়া তাহাকে কি করিয়া জীবনের পক্ষে পরিপূরক করিয়া তোলা যায় সেই চিন্তাধারা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে। আমরা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার অর্থাৎ আজ হইতে আঠারো বৎসর আগে লিখিত কম্যুনিজমকে পরিপাক করিবার চিন্তাধারা এইখানে আজ প্রকাশ করিলাম। কংগ্রেস-এর করণীয়ও এইখানে লিপিবদ্ধ আছে যাহা করিতে পারে নাই বলিয়াই আজ সে পর্দার আড়ালে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।—সঃ উঃ তাঃ]

নির্বাচন যখন আরম্ভ হয়, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে অনেকেরই মনে হইয়াছিল যে, কংগ্রেস এবার আর সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না, কংগ্রেসের পতন অনিবার্য। কিন্তু যখন কংগ্রেসবিরোধী দল যুক্তফ্রন্ট গঠন করিতে পারিল না, তখন জনসাধারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট অংশ ভাবিতে বসিলেন, তবে কাহাকে ভোট দিব? ইহারা যুক্ত হইলে কংগ্রেসের পরাজয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু যে কারণে ইহারা 'এক' হইতে পারিল না, সেই একই কারণে কংগ্রেস বাঁচিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস-বিরোধীরা সকলেই কংগ্রেস-বিরোধের উপরই স্ব স্ব দল দাঁড় করাইয়াছিল; তাঁহারা সবাই নেতিবাদের উপাসক। জার্মানিকে শেষ করিবার জন্য একদিন ইংরেজ আমেরিকা এক হইয়াছিল; সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর আজ নিজ রূপ ধারণ করিয়াছে। নেতিবাদের উপরে মিলনের শেষ পরিণাম ইহাই। শেষ পর্যন্ত দুইটি দলই কার্যক্ষেত্রে থাকিবে—কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট। কংগ্রেস ৭০ বৎসরের প্রতিষ্ঠান, তাহার ঐতিহ্য আছে, ভারতের রক্তে ইহা পুষ্ট; তাই কংগ্রেস বাঁচিবে। কম্যুনিস্টদেরও একটি দর্শন আছে, তাহারা এদেশে ওদেশে সঙ্ঘবদ্ধ, তাহারাও বাঁচিবে। কিন্তু যাহারা এই দুই দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে চায়, তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবেই। জনসঙ্ঘ, কৃষক প্রজা প্রভৃতি দল মূলতঃ কংগ্রেসই; ইহাদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য একরূপ নাই বলিলেই হয়। কম্যুনিষ্টরা ইহাদিগকে 'বামপন্থী' মনে করে না, বিশ্বাসও করে না; তবে তাহাদের অগ্রগমনের পথ সুগম করিবার জন্য তাহাদের কংগ্রেসবিরোধী প্রচার কার্যের সহায়করূপে ইহাদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চাহিবে

ছিল, আজও চাহিবে। কংগ্রেসবিরোধী প্রচার কার্যের ফল ভোগ করিয়াছে কম্যুনিষ্ট, জনসঙ্ঘও নয়, কৃষক-প্রজা দলও নয়। এতবড় বিরোধের সামনেও কংগ্রেস যে কেন একেবারে ধরাশায়ী হয় নাই, কোন রকমে মান বাঁচাইয়াছে আজ ইহার অন্তর্নিহিত শিক্ষা গ্রহণ করিবার সময় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আসিয়াছে। কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যবর্তী এই জনসমূহ স্থির জানিয়া রাখুন, এই দুই দলের চাপে তাহাদিগকে আজ হউক, কাল হউক যে-কোনও এক দলের অন্তর্ভুক্ত হইতেই হইবে। সুসংবদ্ধ দুইটি দলের মাঝখানে কেহই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, যদি না তাহাদের এমন যোগ্যতা থাকে, যাহার দ্বারা দুই দলের অতীত থাকিয়া দুই দলকেই পরিপাক করিতে পারে, দুইকে দুইয়ের সঙ্গে সমন্বিত করিতে পারে। সে যোগ্যতা ইহাদের কাহারও নাই। বিরোধ করিয়া কেহ আগাইয়া যায় না; আগাইয়া যাইতে হইলেই চাই বিরুদ্ধকে অঙ্গীভূত করিয়া বিরুদ্ধদের অতীত হওয়া। সোশ্যালিষ্টরাও এ যাত্রা কিছুই করিতে পারে নাই।

নির্বাচনের পরে তাই দেশবাসীকে আজ স্থির করিতে হইবে, সে কাহাকে বাছিয়া লইবে—কংগ্রেস না কম্যুনিজম্। বিধান সভায় কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেস-প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া জনসাধারণকে ভারতীয় ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব তাহাদিগকেই লইতে হইবে। কম্যুনিজম্ যদি দেশকে ডুবাইয়া দিতে পারে তবে সেজন্য দায়ী কংগ্রেসই হইবে। এত বিরুদ্ধ প্রচারের ফলেও জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয় নাই। তাহারা ভারতীয় 'প্রজ্ঞা' সম্বল করিয়া এবারও কংগ্রেসকে গদীতে বসাইয়াছে। এবার কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট উভয়েরই পরীক্ষা আরম্ভ হইল, উভয়ে আজ মুখামুখী শক্তিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইবার লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া দেশে সন্ত্রাসবাদের দ্বারা অরাজকতার সুযোগে রাষ্ট্রপতন আনয়ন করা তাহাদের পক্ষে আজ আর সহজ হইবে না, যতটুকুও এতদিন যা তাহারা পারিয়াছে। কোনও কনষ্টিটিউশান-এর মধ্যে থাকিয়া মানুষ বিদ্রোহ বা বিপ্লব করিতে পারে না তাই বিপ্লবী গান্ধীজী কাউন্সিল বয়কট আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্টরা এতদিন এই কাঠামোর মধ্যে মাথা দিতে আসে নাই। এই নির্বাচনের মধ্যেও একদল উগ্রপন্থী কম্যুনিষ্ট নির্বাচন বয়কট করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে, পথে পথে প্ল্যাকার্ড ছড়াইয়াছে। কিন্তু বিধান-সভার বাহিরে থাকিয়া তাহারা তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছিল না বলিয়া তাহারা এইবার চেষ্টা করিবে বিধান সভার ভিতর ও বাহির হইতে বিদ্রোহ জমাইয়া তুলিবার জন্য। তাহারা সকলে মনে খোলা প্রাণে বিধান সভায় আসে নাই, আসিতে পারেনা। বিদ্রোহ ও কনষ্টিটিউশান দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ। বিপ্লবী শ্রীকৃষ্ণ কোনও দিনই 'রাজদ্রোহী' করেন নাই, অথচ তিনিই ছিলেন kingmaker। মহাত্মাজীও ছিলেন এই তত্ত্বের রাজা, তিনি কনষ্টিটিউশান-এর বাহিরে থাকিয়াই তাহাকে বদলাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আজ দল হিসাবে কম্যুনিষ্টরা বিধানসভার ঠিক ভেম কনষ্টিটিউশানের মধ্যে প্রবেশ করিল। এইবার তাহাদের সত্যিকার রূপ ধরা পড়িবে। তাহারা কি চায়, কোন্ পন্থায় চায়—ইহা তাহাদিগকে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ভারতবাসীর কাছে ব্যক্ত করিতে হইবে। নির্বাচনে অবতীর্ণ করিয়া তাহারা সত্যই জিতিয়াছে কিনা, তাহাদের পথ সুগম হইল কিনা, তাহা ভবিষ্যৎ স্থির করিবে। আজ ভারতীয় সংবিধানে অংশ গ্রহণের ফলে তাহারা ভারতীয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহাদের রাশিয়ান নীতি ও সাধনা এদেশে কতদূর চলিবে তাহারই পরীক্ষা আজ সুরু হইল।

কংগ্রেসকে আজ সুচিন্তিত আদর্শ, সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও সুদক্ষ দল লইয়া ধীর স্থিরভাবে অচল অটল হইয়া থাকিয়া কম্যুনিজমের প্রভাব প্রতিপত্তিকে পরিপাক করিয়া চলিতে হইবে। আজ কালের বিধানে কংগ্রেস কম্যুনিষ্টদের পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে, কম্যুনিষ্টরাও কংগ্রেসের পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কেহ আজ কাহাকেও এড়াইয়া চলিতে পারিবে না। কম্যুনিষ্টরা আজ আইন সভায় স্থান লইয়াছে। তাহাকে শাসন করিলেই সে শাসিত হইবে না, তাহাকে মুছিয়া ফেলিলেই সে মুছিয়া যাইবে না কেননা তাহার যে বিশ্বসত্যতার রূপদানে

একটা একান্ত যোগ্যতা রহিয়াছে। যোগ্যতাকে কেহ কোনও দিন শক্তির চাপে দমন করিতে পারে নাই, অধিকতর যোগ্যতা দিয়া অল্পতর যোগ্যতাকে পরিপাক করিতে হয়। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'শেষ প্রশ্নে' লিখিয়াছেন —'মন্দ তো ভালোর শত্রু নয়, ভালোর শত্রু তারচেয়ে যে আরও ভালো—সে; সেই আরো ভালো যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে, সেদিন তারই হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে ওকে সরে যেতে হবে'। কম্যুনিজম্ একেবারে মন্দ নয়, সেও ভালো। কিন্তু এই ভালোকে হটাইয়া দিতে হইলে আরো ভালোর সাধনা কংগ্রেসকে নিতে হইবে, তবেই সে বাঁচিবে। একান্ত শাসনের পথে কম্যুনিজম্‌কে হটানো অসম্ভব। চাই এমন ব্যাপকতর ও গভীরতর আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মপন্থা, যাহার ফলে কম্যুনিজম্ আপনা-আপনি তাহার মধ্যে হজম হইয়া যায়। মহাত্মাজীর সময়ের কংগ্রেসের চেয়েও আজিকার কংগ্রেসকে অধিকতর যোগ্য হইতে হইবে। ভরসা আছে শ্রীনেহরু তাহা পারিবেন। ভারতীয় জনসাধারণ আরও পাঁচ বৎসরের মত কংগ্রেসের হাতে শাসন কর্তৃত্ব দিল, কংগ্রেস তাহার যোগ্য হইবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে চাহিয়া, বিশ্বসভ্যতার একটি সংগঠনাত্মক বাস্তব রূপের প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবর্ষের কংগ্রেসকে কম্যুনিজম্ অঙ্গীকার করিতে হইবে। আমরা বহুবার বলিয়াছি, ভারতের মাটিতেই কম্যুনিজম্ দিব্যরূপে ফুটিয়া উঠিবে, রাশিয়ায় নয়। রাশিয়ার যাহার আভাস, ভারতেই তাহার পরিপূর্ণ রূপ। কম্যুনিজম্ এদেশে আজ নূতন হইলেও ইহারই পরিপূর্ণ জীবন্ত আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ও শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্টির মধ্যে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি। বর্তমানে ইহাকে সফল করিতে হইলে প্রথমে অনুধাবন করিতে হইবে, কোন্ কোন্ যোগ্যতায় কম্যুনিজম্ এদেশে দেহ-মন-প্রাণ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, এবং আরও খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে কেন এদেশের গীতা-উপনিষৎ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া এদেশের যুবক-যুবতীর দল কম্যুনিজম্ বরণ করিতেছে। ইহা কোনও আকস্মিক ঘটনা নহে। ইংরেজ শাসন করিয়া ভারতবর্ষকে রাখিতে পারে নাই, শুধু শাসন করিয়া কংগ্রেস-সরকারও কম্যুনিজম্‌কে চাপিয়া রাখিতে পারিবেনা। চাই নিজেদের জীবন ও দর্শন দ্বারা কম্যুনিজম্‌কে শোষণ ও অঙ্গীভূত করা। কম্যুনিজম্ একটি সমগ্র দর্শন দিয়াছে, যাহা এ দেশের অজড়কৈন্দ্রিক ধর্ম-ঈশ্বর-সমাজ-পরিবারের পাশাপাশি জড়কৈন্দ্রিক আদর্শবাদ স্থাপন করিয়াছে। অন্যত্র এত দিন শোষণ করিয়াছে এদেশের ধর্মকে, ঈশ্বরকে, নরনারীর সম্বন্ধকে; তাহার জ্বালা হইতে মুক্তি পাইবার আশাতেই তাহারই প্রতিক্রিয়ায় এখন এদেশের লোক from frying pan to fire-এর কবলে, গভীর শোষণের কবলে পতিত হইয়াছে।

কংগ্রেস সরকারের প্রথম কর্তব্য হইবে, প্রথমে কম্যুনিজমের জবাব হিসাবে এ দেশের গীতা-উপনিষদের জড়াজড়িসমন্বিত ব্যাখ্যার প্রচার। আইডিওলজি-কে আইডিওলজি-র দ্বারাই আয়ত্তাধীনে আনা যায়। প্রথমে আইডিওলজি শিক্ষিত মনকে অভিভূত করে, পরে তাহাদের দ্বারা তাহা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সরকার কি লক্ষ্য করিয়াছেন, কলেজের কত অধ্যাপক, বিশিষ্ট বিশিষ্ট কত শিক্ষাবিৎ কলেজ মারফৎ কম্যুনিজম্ প্রচার করেন? আইন করিয়া ইহা ঠেকানো যাইবে না। এ দেশের এতদিনকার আইডিওলজি, যাহা প্রচলিত বর্ণাশ্রমধর্মে রূপ পাইয়াছে তাহা নিতান্ত স্থিতিধর্মী। উহার মধ্যে জৈব প্রয়োজনের লেশমাত্র সমাধান লাভের সম্ভাবনা নাই। এখানে জৈব প্রয়োজনকে শুধু স্মৃতির ব্যবস্থা দিয়া লাঠি মারিয়া নিগ্রহ করিবার কথাই আছে। অথচ প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী উহারা একান্তভাবে নিগৃহীত হইবার নয়। এই প্রতিক্রিয়ায় জৈব প্রয়োজনের দাবীই আজ সর্বাগ্রে স্থান লাভ করিয়াছে। অজড়ের দাবী কোন্ অতলে ডুবিয়া গিয়াছে।

সরকারী প্রচার বিভাগকেই এই দর্শন প্রচারের ভার নিতে হইবে। মূলগত ত্রুটির সংশোধন না করিলে ডাল-পালায় সংস্কার আনা সম্ভব হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম স্বীকার করিলে ভারতের অতীতও থাকিবে এবং সেই অতীত যে কেমন করিয়া বর্তমান জৈব প্রয়োজনকে

পরিপাক করিয়া নূতন রূপে বিবর্তিত হইতে পারে তাহারও সন্ধান মিলিবে। বাস্তব শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন স্বীকৃত ও প্রচারিত হইলে নারীর পুরুষনিরপেক্ষ একটি স্বয়ংমূল্য সত্তা ফুটিয়া উঠিবে, দলে দলে নারীদের কম্যুনিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ করা সম্ভবপর হইবে। 'হিন্দু কোড বিল' পাশ করিতে কংগ্রেস সরকার আর যেন বিলম্ব না করেন। যে মেয়েরা রাস্তায় নামিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই কম্যুনিজমকে অল্পাধিক পরিমাণে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

কৃষকদের কথা বিশদভাবে ভাবিতে হইবে। শ্রীবিনোবা ভাবের পন্থা অনুসরণ করিয়া সরকারকে অচিরাৎ ভূমিদান করা আরম্ভ করিতে হইবে জমিদারগণ সহজে ইহাতে রাজী হইবে না। এখানে আইনের প্রয়োগে জমি হাস্তান্তরিত করিয়া সরকার জনসাধারণের মধ্যে অচিরাৎ বণ্টন করুন। কৃষকদের হাতে জমির দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিলে তাহারা সুস্থ হইবে, কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইবে, দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে। এইভাবে সর্বক্ষেত্রে 'বিপ্লব' ছড়াইয়া দিতে হইবে।

একান্ত শ্রেণী-সংগ্রাম যে মনস্তত্ত্ব অনুমোদন করে না, তাহা যুক্তিসহকারে কড়ের মত প্রচার করা প্রয়োজন। প্রতি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের যে 'দ্বন্দ্ব' রহিয়াছে, অর্থাৎ যুগপৎ সংগ্রাম ও মৈথুন রহিয়াছে, মনস্তত্ত্বের এই তত্ত্বটি প্রচার করিতে হইবে। দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ ঝগড়া ও মৈথুন দুই-ই। ইহা ভারতীয় সভ্যতার একটি মহান্ অবদান। তাই এ দেশের সংবিধান সালিশীর উপর জোর দিতেছে, মধ্যপন্থাকে অনুসরণ করিতে চাহিতেছে। এতদিনের Law of Excluded Middle আজ অচল। হয় ধনিক, নয় শ্রমিক—ইহা আজ অ-দার্শনিক, ন্যায়বিরুদ্ধ, অসামাজিক সিদ্ধান্ত।

সকলেই যে স্বরাট, মহাত্মাজীর এই মহাসত্যকে সামনে রাখিয়াই কংগ্রেসকে চলিতে হইবে। এখানে চলিবে 'স্বরাজ'—ধনিকরাজও নয়, শ্রমিকরাজও নয়, পুরুষরাজও নয়, নারীরাজও নয়, হিন্দুরাজও নয়, মুসলমানরাজও নয়। এই স্বরাজের বার্তা কংগ্রেসকে ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ কর্মীর ভিতর দিয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে। তবেই জনসাধারণের বিরুদ্ধে আত্মা শান্ত হইবে।

সুবিধার লড়াইতে কোনও দলই কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। কেননা, তাহাদের মূল দর্শনই যে সুবিধাবাদের দর্শন। জীবনের ব্যবহারিক দিকটাকেই, সুবিধাগুলিকেই দার্শনিক ভিত্তিতে তাঁহারা দাঁড় করাইয়াছেন। আদর্শের বালাই তাঁহাদের নাই। যুগ-যুগান্তরের সাধনালব্ধ ভারতীয় অহিংসা-সত্য-ব্রহ্মচর্যের মহিমাকে সুবিধাবাদের ছাঁচে ঢালিয়া নিজেদের সুবিধায় লাগানো ছাড়া আর তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান নাই। এবং রাশিয়ার সুবিধাতেই যে বিশ্বের সুবিধা, ইহা তাঁহারা অন্ত মনে প্রমাণ করিবার জন্য আজ বদ্ধপরিকর। বিশ্বের সব জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের তীব্রতার চরম অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া তাঁহারা গায়ের জোরে 'সুবিধা' আদায় করিবেন—ইহাই তাঁহাদের গূঢ় সাধনা। তিব্বতে আজ তাহাই চলিতেছে। সকলের সুবিধা সমান ভাবে মানিয়া লওয়ার নামই তো আদর্শ; এবং সকলের সুবিধা সমঞ্জসিত করিয়া নিজের সুবিধা বাহাল করার সাধনাই সুবিধাবাদ। সারা দুনিয়াকে তাঁহারা এই সুবিধাবাদের বেড়াজালে ফেলিবার চক্রান্ত করিয়াছেন। সাধু সাবধান! এখনও সময় আছে। • • •

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ: কিন্তু এই কম্যুনিষ্টদের লইয়া কংগ্রেসকে অনেক কিছু বেগ পাইতে হইবে। কংগ্রেসের সামনে এক বিরাট অন্তরায় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এত বড় সঙ্কটের মধ্যে কংগ্রেস কোনও দিনই পড়ে নাই। ৬০ বৎসরের কংগ্রেস নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এক রূপ মর্যাদার সঙ্গেই মাথা উঁচু করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। আটকাইয়া সে যায় নাই। মহাত্মাজীর জীবনের ছাঁচে গঠিত কংগ্রেস 'নিমিত্তমাত্র' হইয়া চরম বাধা যারা ব্রিটিশকে এদেশ হইতে সরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু এইবার যে বাধা তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা কি সে সামলাইতে পারিবে? কম্যুনিষ্ট পার্টি এতদিন বাহিরে বাহিরে থাকিলেও সে আজ সংবিধানের পূর্ণ সুযোগ লইবার জন্য বিধান-সভাগুলিতে ও লোকসভায় প্রবেশ করিয়াছে। এ-দেশে তাহাদের কথা শুনিবার লোকও আছে। এ-দেশের

আদর্শবাদ ব্যবহারিক জীবনের খাওয়া পরার দাবী, জৈব সম্বেগের দাবী পূরণ করিতে অক্ষম বলিয়া বহু শিক্ষিত নর-নারী এ-দেশের বস্তুবাদ আদর্শনিষ্ঠার প্রতি বিমুখ। পক্ষান্তরে, মার্কসীয় দর্শন জীবনের চাপা-পড়া এই তীব্র সম্বেগের দাবীকে এমন স্থূলভাবে দার্শনিকতার ভিতর দিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, দলে দলে নরনারী ইহাদের সন্তাবাদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা প্রকৃতির বিধান। কংগ্রেসের সাধনা হইবে ইহাদের পরিপাক করিবারই সাধনা।

এই সাধনার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রাণেপ্রাণে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং গত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের আকারে সেই সাধনার কার্যক্রমও দিয়াছেন। শ্রীনেহরুর দৃষ্টি বর্তমানের এই সমস্যা সম্বন্ধে জাগ্রত। শ্রীনেহরুর এই দৃষ্টিকে কার্যে রূপ দিবার উদ্দেশ্যে গত ১৭ই এপ্রিল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সমুদয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নিকট এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহাতে নূতন লোক যাহাতে ঢুকিতে পারে, কর্মকর্তাগণকে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বলা হইয়াছে। যে সকল নূতন লোক অন্য কোন দায়িত্ব লইয়া নাই, কিম্বা কংগ্রেসের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে চাহে, এই প্রকার লোককেই আনিবার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেসের আজ নূতন লোকের সত্যই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা কংগ্রেসকে আবার চালিয়া সাজিতে পারিবেন। কংগ্রেস যদি তাহার 'নাম-রূপে'র নেশা পরিত্যাগ করিয়া সত্য সত্যই আদর্শনিষ্ঠ, মহাত্মাজীর জীবন-অনুসরণকারী অথচ কংগ্রেসের মধ্যে নাই, এমন লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিত, লোক পাইত। এমন তাজা একদল লোক পিছনে ছিল বলিয়াই বাঙ্গলাতে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয় নাই। কংগ্রেসের কর্মকর্তা ও কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রিবর্গের উপর দেশের কিরূপ আদর, তাহা কি তাঁহারা আজিও ঠিক পান নাই? কেন এতগুলি মন্ত্রী নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন? ফাঁকি চলিবে না, দীর্ঘদিন কোনও ফাঁকিই চলে নাই। আজ 'নূতন রক্তে'র সঞ্চার করিবার কথাই সার্কুলারে বলা হইয়াছিল। কংগ্রেসের 'বাহিরে' এখনও লোক আছে, যাহারা কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লব আনিয়া কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আজিও কংগ্রেসকে চায়। তেমন লোক কংগ্রেসের বাহিরে আছে বলিয়াই না বাঙ্গলায় আবার কংগ্রেসী শাসন প্রবর্তিত হইতে পারিল? তেমন লোকের খোঁজ করিবার 'অবসর' বোধহয় বাঙ্গলার কংগ্রেস কমিটির হয় নাই। নূতন যে কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, নূতন লোকের প্রয়োজনীয়তাবোধ তাহাদের নাই। ইহারা 'সনাতন' ধারায় কংগ্রেসকে চালাইয়া লইতে চান। কিন্তু নব-গঠিত এই সনাতনী কংগ্রেসকর্তাদের কি সাহসে ফুলাইবে জনসাধারণের মধ্যে গিয়া কাজ করিবার? তাঁহারা কি পরাজিতের মনোবৃত্তি ঝাড়াইয়া নূতন প্রেরণা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারিবেন? অসম্ভব। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশও তাঁহারা মানিলেন না। কংগ্রেসকে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক করিয়াই রাখিতে চান। জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ আজ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে নাই। জনসাধারণের হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া যাঁহারা জনসাধারণকে স্বরাট-রূপে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন, তেমন 'নূতন' লোকের কথাই সার্কুলার বলিয়াছে। তেমন নূতন লোকই কম্যুনিজমকে পরিপাক করিতে পারিত।

দেশের মধ্যে পুরাতনের প্রতি একটা বিদ্বেষ এবং যা-কিছু নূতনের প্রতি একটা অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে মন্থন করিয়া রূপ দিবার মত কোন যোগ্য নেতা কম্যুনিষ্টদের মধ্যে নাই বলিয়াই এতদিনেও কম্যুনিজম এ-দেশে তেমন করিয়া জনচিত্তকে দখল করিতে পারে নাই। জনসাধারণ আজ শিশু, ঘরের নারীরাও আজ স্ব স্ব অধিকার রক্ষার জন্য ঘরের বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটি মহাশক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য যে ধৈর্য ও সংযমের প্রয়োজন, তাহা নূতনের উপাসক নেতাদের মধ্যে নাই বলিয়াই তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছেন না। শিশু এই জনশক্তি ও নারীশক্তিকে যদি আজও সংযত ও সংহত করা না যায়, বেশীদিন ইহাদের দিয়া 'কাথ' হাসিল করিবার সুযোগ

প্রগতিপন্থীরা পাইবেন না। ইহাদের মরণের পথ প্রশস্ত করিবেন। ভূতের হাতেই ভূতের ওঝা মারা যায়। ভূতনাথ ছাড়া কে ভূত লইয়া খেলা করিতে পারিবে? গণশক্তি যে মহা অগ্নি। এই অগ্নিকে লইয়া খেলা করিবার দুঃসাহস যেন কোনও অসংযমী না করেন। জনসাধারণকে 'কাজে' চিরদিন লাগানো যায় না, সুবিধাবাদীদের ধরিয়া ফেলিতে জনসাধারণের বেশী দিন লাগে না। জনসাধারণের হাতে সুবিধাবাদীদের মৃত্যু অনিবার্য এই মহাসত্য প্রগতিবাদীদের আমরা শুনাইয়া রাখিতেছি। মহাত্মাজীর মত সংযমী, বিবেকী, সেবাদীক্ষিত পুরুষকেও কিন্তু জনসাধারণের কাছে আত্মবলি দিতে হইল, তুমি আমি কোন্ ছার! গণশক্তি ও নারীশক্তিকে কাজে লাগাইতে চাও, সেবক বনিয়া যাও, অভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তাহাদেরই তো দেশ, তুমি-আমি কে? জনসাধারণের মধ্যে লহ-নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া জনসাধারণ বনিয়া গিয়া জনসাধারণের সেবা কর। তেতলায় বসিয়া একতলার মানুষদের সেবা করা যায় না। তেতলা হইতে কায়মনবাক্যে একতলায় অবতরণ কর, এক হও, তবেই জনসাধারণের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। তুমি-আমি সেবকমাত্র, দেশ তাহাদের। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সমবায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিশনারদের সম্মেলনে শ্রীনেহরু বলিয়াছেন,—'যদি আমাদিগকে কাজ করিতেই হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে উপর হইতেই কাজ করিতে হইবে; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় ভিত্তি থাকা চাই। সৌধের ভিত্তি এবং নীচের তলার লোকজনদের সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আমাদের পক্ষে বিরাট সাফল্যলাভ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই উভয় শ্রেণীর লোকদের একত্রিত করাই সমস্যা।...নিজ নিজ কক্ষে বসিয়া জনসাধারণের যাহা আমরা কল্যাণ মনে করি তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথেষ্ট নহে। জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা ও বৌথ চেষ্টার প্রয়োজন জাগাইতে হইবে। জনসাধারণের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যাহাতে ইহা গড়িয়া উঠিতে পারে, তদুপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে। ...সমবায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত কর্তৃবৃন্দ এবং অধস্তন কর্মীদের মধ্যে এইবার সম্মেলনের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। বস্তুতঃ এইরূপ উচ্চ নীচ ভেদাভেদ করাও বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীনেহরু আরও বলিয়াছেন,—ভারতে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং যথাযোগ্য সমন্বয়ের ব্যবস্থা না থাকায় ভারতে জনশক্তির উন্মেষের ফলে সময় সময় সুফল এবং অনেক সময়ে কুফলও হইয়াছে।

আজ নিরভিসন্ধি হইয়া, শুদ্ধ সেবাবুদ্ধি লইয়া জনসাধারণকে দিয়া জনসাধারণকে স্বরাজের দিকে আগাইয়া যাইবার সাধনা কর্মকর্তাদের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত কর্মীবৃন্দের গ্রহণ করিতে হইবে। মহাত্মাজী ইহা পারিয়াছিলেন বলিয়াই সারা ভারতবর্ষ তাঁহার ডাকে রাত্রার উথলিয়া উঠিয়াছিল। অথচ সে ছিল সুসংযত। সত্যই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও যথাযোগ্য সমন্বয়ের ব্যবস্থা না থাকার ফলে জনশক্তির উন্মেষ কখনও কখনও কুফল আনিয়া দেয়, ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা। প্রগতিপন্থীরা যেন এ বিষয়ে অবহিত হন। যাহাকে এক দিন মাথার মুকুট করিয়া রাখে, তাহার গলায় আর একদিন জুতার মালা পরাইয়াও জনসাধারণ দিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত এ দেশেও আছে। জনসাধারণকে লইয়া সুবিধাবাদের খেলায় কি কংগ্রেসী কি প্রগতিবাদী কেহ যেন মত্ত না হন। জনসাধারণের মত মারাত্মক অস্ত্র যেন নেতৃবৃন্দ খুব হুঁসিয়ার হইয়া ব্যবহার করেন। জনসাধারণ বেদান্তের ভাষায় "অব্যবহার্য"—তাহাদিগকে দিয়া দীর্ঘদিন প্রয়োজন সিদ্ধি করাইয়া লওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই তো সত্যদ্রষ্টা বলিয়াছেন,— 'Voice of the people is the voice of God', নরলক্ষ্য ও নারায়ণ একই মহাসত্যের দুই দিক।

এই জনসাধারণের সেবার জন্যই কংগ্রেস-সম্পাদকের সাকুলার নির্দেশ দিয়াছে: (১) যে সকল জমি অনাবাদী রহিয়াছে, ঐগুলিকে কোন মতেই অনাবাদী রাখা চলিবে না। (২) ছোট ছোট সেচের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ; এবং জনগণকে দিয়া কুঁয়া, পুকুর ও খাল প্রভৃতি বিপুলভাবে খননের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) গ্রামের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ—যেমন রাস্তা নির্মাণ, বৃক্ষ-রোপণ, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ করিতে হইবে। কার্যক্রম হিসাবে এইগুলি বিশেষ নূতন নহে। কিন্তু যে

প্রাণ লইয়া কর্মিবৃন্দকে এই সেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, তাহার মধ্যে নূতনত্বের অনুপ্রবেশ প্রয়োজন। মূল প্রয়োজন জনসাধারণের জীবনে জীবন মিলাইয়া অদ্বৈত-জীবন লাভ; উহার অন্য প্রয়োজন, কিংবা উহারই আস্বাদন হইবে ঐরূপ গঠনমূলক কর্মপন্থা। সেবাবৃদ্ধি ব্যতীত কোনও অভিসন্ধি লইয়া জনসাধারণকে পাওয়া যাইবে না, ইহা কংগ্রেসকর্মী বা তথাকথিত প্রগতিপন্থী দুই দলকেই আমরা স্মরণ রাখিতে বলি। রাশিয়া বা লেনিনকে সামনে রাখিয়া ভারতবর্ষকে গঠন করা এ-দেশ দীর্ঘদিন বরদাস্ত করিবে না। যে এ-দেশের অভিসন্ধিহীন সেবায় লাগিয়া থাকিবে, তাহাকেই দেশ মানিবে। কংগ্রেস একদিন দেবা করিয়াছে, তাই সে জনসাধারণকে সস্তা করিয়াই পাইয়াছিল। আজ এ-দেশের প্রকাণ্ড একদল কংগ্রেস চায় না; কেননা কংগ্রেস-কর্তাদের ভিতর জনসাধারণ অভিসন্ধির গন্ধ পাইয়াছে। মনস্তত্ত্বের এই মোটা কথাটিই সকল কর্মীদের স্মরণ রাখিতে বলি। ভারতবর্ষ ও তাহার বুকের রক্ত চুষিয়া যাঁহারা এ দেশে বাস করেন, তাঁহারাই থাকিবেন দেশকর্মীদের সামনে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে উর্ধ্বে অধে; রাশিয়াও নয়, লেনিন-মার্কসও নয়, কংগ্রেসও নয়। কম্যুনিষ্ট পার্টি এ সাধনা গ্রহণ করিতে অক্ষম। তাহাদের দর্শনই তাহাদের পক্ষে অন্তরায়। ...বন্দে মাতরম্।

পাঞ্চালী

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

মহর্ষি ব্যাসের মহতী সৃষ্টি দ্রুপদ-দুহিতা দ্রৌপদী সতী;
ক্ষত্র-নারীর শৌর্য সাহসে ভাস্বর তুমি দীপ্তিমতী।
বজ্রানলেতে জন্ম তাইতো তেজবহ্নির অলেছে শিখা;
তব আখ্যান যুগযুগ ধরে অমৃতাক্ষরে রহিবে লিখা।
সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথ যবে আসিল হরিতে দর্প ভরে
বিক্রম তার ভেঙে দিলে দেবি হেলি তুমি পরে আপন করে।

বৃকোদর সাথে করি কৌশল বধিলে কামুক কীচক-প্রাণ—
সত্যই তব চরিত্রখানি দুর্লভ গুণে দীপ্যমান।
দ্যূত সভার মহাসঙ্কটে কণ্ঠে তুলিয়া বজ্রবাণী—
ধৈর্য সাহসে জাগালে সভায় ক্ষাত্রধর্মের সরখানি।

দুঃশাসন আদি দিল টান যবে অঞ্চলে তব সভাস্থলে;
রাখিলে আপন নারী-মর্যাদা ভাকি ভগবানে ভক্তিবলে।
ভুবন-বিজয়ী গাণ্ডীবধারী পার্থের তুমি যোগ্য সতী;
পুণ্যপ্রাণা তব পাশে আসে বার বার তাই অখিল-পতি।

ভারত-নারীর কোথা সে ভক্তি তব সম কোথা বহ্নি বাণী
বসনে ভূষণে পুতুলের সম সাজাইতে চায় অঙ্গখানি।
হউক দীপ্ত ললনার মূল তব অন্তর-অগ্নিতেজে—
চিত্রতারার আদর্শ-ত্যজি পাঞ্চালী সব উঠুক সেজে।

দেশ-নায়ক গোবিন্দবল্লভ পন্থ

॥ সুশীল কুমার ঘোষ ॥

যে সকল দেশ-কর্মী ভারতমাতার সেবার জন্যে স্বকীয় স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক কৃচ্ছ্র বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, দেশনেতা গোবিন্দবল্লভ পন্থ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইয়া থাকিবেন।

নীরবে সাধনা করিয়া দেশ-মাতৃকার মুক্তি-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া নির্ভীক-হৃদয় গোবিন্দবল্লভ যে কারণে অমর হইয়া থাকিবেন তন্মধ্যে প্রতিভার বিকাশ, চিন্তাশীলতা এবং ধৈর্য্যের অনুশীলন উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত মনোরথ পন্থের সুযোগ্য সন্তান রূপে তিনি যেদিন জন্ম গ্রহণ করেন সেদিন ভারত ভূমির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বহু তত্ত্ব নিহিত ছিল, নানা আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন তখন সূচিত হইয়াছিল ভাগ্যাকাশে। হিমালয়ের চিরতুষার মণ্ডিত শোভার আধার ও ঐশ্বর্য্যময় সৌন্দর্য্যকোলে আলমোরা জেলার কোন নিভৃত গ্রামের পল্লীতে যখন তিনি জন্ম লাভ করেন তখন সরকারী কর্ম কুশলী পিতৃদেব স্বকীয় আলয়ে উপস্থিত ছিলেন না। যখন পরে এই সুখের বারতা গৃহে প্রবেশ করিল তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। গোবিন্দবল্লভের জন্ম লাভের কিছুকাল পরে তাঁহার স্নেহময়ী জননী এই শিশু পুত্র ও তদীয় জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মাতুল সদনে চলিয়া যান। মাতুলালয় ছিল নৈনীতাল হইতে নয় মাইল দূরে অবস্থিত সুষমা মণ্ডিত কোনতালের নিকটবর্ত্তী চাক্রাতা পল্লীতে। এই সুন্দর পরিবেশ ও স্নিগ্ধ জলবায়ু যেমন স্বাস্থ্যকর, মাতা ও শিশুর মনস্তত্ত্বি বিধান পক্ষে তেমনই উপযোগী।

তরুণ গোবিন্দবল্লভের শিশুকাল বেশ মনোরম স্থানে অতিবাহিত হয়। চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে শিশু গোবিন্দ সুবিখ্যাত সুষমার খনি আলমোরা পার্ব্বত্য সহরে তদীয় মাতামহ রায় বাহাদুর বদ্রিদত্ত জোশীর ভবনে মাতার সহিত বাস করিতে আসিলেন। রায় বাহাদুর ছিলেন কুমায়ুনের একজন বিচারপতি। সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে লালিত এই অপরূপ পুরুষের হৃদয়বৃত্তি ক্রমশঃ বিকশিত হইতে লাগিল প্রকৃতির সম্মোহন স্পর্শে। যে স্থানকে বলা যায় কবির ভাষায় A meet nurse for a poetic child, তাহার উদার ও চিত্তাকর্ষক কোলে পালিত হইয়া শিশু গোবিন্দের অন্তঃকরণ বাল্যকাল হইতে গড়িয়া উঠিল সরল ও কোমলতার আদর্শে। তরুণ-কান্তি গোবিন্দবল্লভ ধীরে ধীরে অর্জন করিতে লাগিলেন সৌন্দর্য্য সুষমার আধারের কোমলতা ও শান্তির প্রভাব। সুধীর ও অচপল হৃদয়ে অগোচরে প্রাপ্ত হইল সু-সামঞ্জস্য বোধ, করুণা ও নিষ্ঠা। যে সৌন্দর্য্যরাশির অনির্বচনীয়তা মধ্যে হৃদয় বিকাশের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তথায় প্রকৃতি রাণী তাঁহার সর্বপ্রকার কর্কশতা ও রুক্ষভাব হইতে মুক্ত ছিলেন, এজন্য তরুণ গোবিন্দের আচরণে কেহ কর্কশ ও রুক্ষ মূর্ত্তি লক্ষ্য করে নাই। আজীবন এই মাধুর্য্যের প্রভাবে তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ কোমলতা ও নম্র স্বভাব আপামর জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিবাদ কালে বা আইন আলোচনায় তিনি ধীরতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাঁহার বিচার-বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ-প্রবণতা ছিল স্থির মস্তিষ্ক-প্রসূত। উত্তেজনা, ক্রোধ ও অধৈর্য্য বর্জন করিতে তিনি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের এই মহান সম্পদের জন্য তিনি দেশবাসী ও শিক্ষিত সমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে তাঁহার জ্ঞান-পিপাসার দৃষ্টান্ত দর্শনে সকলেই

প্রীত হইয়া ছিলেন। বিদ্যানুরাগ ও তন্ময়তা ছাত্র-জীবনের বিশেষ গুণ ছিল বলিয়া তিনি জ্ঞানার্জনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন।

তরুণ গোবিন্দবল্লভ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে মাধ্যমিক পরীক্ষা ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবর্গের প্রাণে প্রীতির সঞ্চার করেন। তরুণমতি ছাত্র সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভে যখন প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহার মেধা ও বিবেচনা শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকাশে ভাস্বিমান। জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে উদ্যম ও উৎসাহ বন্যা-প্রবাহের উচ্ছ্বসিত গতির ন্যায় শক্তিধর ও বেগবান। অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রতিভা ও একাগ্রতা দর্শনে মুগ্ধনেত্রে সপ্রশংস আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মহামতি গোবিন্দবল্লভ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। পুলকিত চিত্তে পিতামাতা গুণধর পুত্রকে এলাহাবাদের Muir Central Collegeএ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে প্রেরণ করা সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া মনস্থ করিলেন। ভবিষ্যৎ নেতা ও প্রতিভাবান কর্মী গোবিন্দবল্লভ গণিত শাস্ত্র, রাজনীতি, ইংরাজী সাহিত্যের সহিত গ্রহণ করিয়া অটুট উৎসাহে অধ্যয়ন ব্রতে নিমগ্ন হইলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গোপালকৃষ্ণ গোখলে যখন এলাহাবাদ পরিদর্শন করিতে আসেন তখন যুবক গোবিন্দ নানা ভাবে প্রেরণা লাভ করিলেন। তিনি তখন বি.এ ক্লাসের শেষ পর্য্যায়ে পাঠ করিতে ছিলেন। দেবোপম চরিত্র মহাপ্রাজ্ঞ গোখলের আগমন তরুণ প্রাণে সঞ্জীবতার সঞ্চার করে, তাঁহার জীবনের গতি বদলাইয়া যায়। জনপ্রিয় নেতা দেশপূজ্য গোখলের অগ্নি-শিখা তুল্য স্বদেশ প্রেম ত্যাগ ও নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য সাধন গোবিন্দবল্লভের তরুণ প্রাণে উৎসাহের নবীন হিল্লোল তুলিয়া তাঁহার জীবন-পথ কুসুমাকীর্ণ, উজ্জ্বল ও আদর্শমূলক করিয়া গঠন করিতে প্রয়াস পায়। গোখলে প্রাণস্পর্শী তেজোময়ী ভাষায় একটি সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অন্যতম ভারত-নেতা পূজ্যপাদ মতিলাল নেহরু সেই উল্লেখযোগ্য সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। ঐ বিশেষ বক্তৃতা যুবক গোবিন্দবল্লভ পন্থের তরুণ অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া দেশ-প্রেমের প্রচণ্ড তরঙ্গে আলোড়িত করিয়া তোলে। সেই নূতন জ্ঞানের আলোক, স্বদেশ প্রেমের বহ্নিশিখা পন্থের হৃদয় স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে নূতন চেতনা আনিয়া দিল। তিনি পাইলেন নবীন জীবন, জীবন্ত আশার বাণী, পবিত্র কর্ম প্রেরণা। সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবক-হৃদয়ে যে সঞ্জীবনী শক্তির উদয় হইয়াছিল তাহার তুলনা হয় না। অতুল বিক্রমে তাহাই তাঁহাকে বহুকাল কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে পরিচালিত করিয়াছিল। সংশয়-তিমির রাত্রে সেই উদাত্ত বাণী ও কর্ত্তব্য বিধি ধ্রুবতারার মত পথ-নির্দ্দেশ করিয়া ছিল। দেশ-প্রীতির সঞ্জীবন স্পর্শে তরুণ পন্থ নব জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার প্রেম-প্রীতি সেবার কার্য্যে নিয়োজিত হইল, কার্যকুশলতা সাধনায় পর্য্যবসিত হইল, স্বাদেশিকতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিল। সেই আলাময়ী বক্তৃতায় অমর নেতা গোখলে তরুণ ছাত্রবর্গকে বলিয়াছিলেন, দেশ-মাতৃকার সেবা সর্ব্বোপরি উচ্চ-স্থান তাহাদের জীবনে গ্রহণ করা উচিত—ইহাই হইবে তাহাদের জীবন সাধনার আদর্শ। তিনি আরও বলেন, ছাত্র সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক দেশ সেবার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করা। তাহাদের আদর্শ হইবে ত্যাগ-স্বীকারের মন্ত্র গ্রহণ করা।

পন্থের জীবন-প্রবাহ নানাদিকে প্রধাবিত হইলেও তিনি কখনও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে ডেপুটি কালেক্টারের পদে আসীন দেখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু দেশ সেবক গোবিন্দবল্লভ পন্থজী আইন ব্যবসায় পন্থা অনুমোদন করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে তিনি জন-সভায় বক্তৃতা প্রদান করা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্য ছিল সংযত, ভাষা সুগভীর ভাবব্যঞ্জক, মৃদুতা ছিল জীবনের সাথী।

সেই বৎসর পন্থজী আইন ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হইলেন। ব্যবহার-জীবের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা তাঁহার মনোমত হইয়াছিল

বলিয়া পাঠানুরাগ অসাধারণ আকার ধারণ করিল। মর্ম্ম-উদ্ঘাটনে তিনি বহু ছাত্রকে সাহায্য করিতেন, শুনা যায়। মর্ম্মার্থ গ্রহণে তিনি যে বিবেচনার পরিচয় দিতেন তাহা প্রশংসার্হ। তৎপরতা, শীঘ্র বোধগম্য হইবার শক্তি তাঁহার ছিল। স্বজ্ঞান (intuition) তাঁহার তীব্র বলিয়া সহজাত বুদ্ধি সহযোগে যুক্তিগুলি অচিরে পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছিল। গোবিন্দ বল্লভ আইন শাস্ত্রের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন, এ কারণ তিনি Lumsden স্বর্ণ পদক লাভ করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তৎকালে আলোচনা সভায় তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেন; তাঁহার যুক্তি, বাক্‌পটুতা বহুলোকের মনে আশার সঞ্চার করিত। এই ভাবে তরুণ পন্থজী বহুবিধ শিক্ষিত লোকের হৃদয়ে পরিণত বয়সে সুযশের চিত্র মুদ্রিত করিতে পারিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবন তাঁহার যে উজ্জ্বল, দিব্যদৃষ্টিতে অগণিত মনীষী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অসংখ্য তরুণ যুবকের অন্তরে তিনি যে রেখাপাত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা স্বল্প কৃতিত্বের পরিচয় নয়। পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে এই শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী সভার অধিনায়ক রূপে, প্রথমে প্রধান-সচিব হইয়া বসিয়াছিলেন। নূতন Reform bill প্রবর্ত্তনের পর তিনিই এই পদ প্রথম অলঙ্কৃত করেন। পূর্ব্বকালের শুভ মুহূর্ত্তে উচ্চারিত ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয় নাই, বলিতে হইবে। সমগ্র ভারতের সচিব সভার সুযোগ্য মন্ত্রীত্ব তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি।

শুনা যায়, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চির-প্রসিদ্ধ সুললিত উপন্যাস 'আনন্দ মঠ' তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গভীর মানসিক বল সঞ্চয় করেন। এই সমুজ্জ্বল গ্রন্থে বর্ণিত "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি তাঁহার মানস ক্ষেত্রে দেশ-প্রেমের বহ্নিশিখায় ইন্ধন যোগায়। পঠদ্দশায় জ্ঞান-যোগী পন্থজী নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য তালিকার বাহিরের বহু জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেন। পাঠের নেশা তাঁহার ছিল প্রচুর, জ্ঞান-সাধনা ছিল অব্যাহত। তৎকালে তিনি কলিকাতা মহানগরীর অমৃত বাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলী নামক সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া শ্রেয়ঃ লাভ করিতেন—লক্ষ্ণৌ নগরীর "পায়োনিয়ার" পাঠ করিয়াও তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতেন বলিয়া এই কাগজগুলি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। অমৃত বাজার পত্রিকা দেশ-নায়ক মতিলাল ঘোষের অনুবর্ত্তনে সারগর্ভ নীতি-মূলক স্বদেশ সেবার উগ্র আদর্শ প্রচার করিয়া আসিয়াছে বহুকাল যাবৎ। ভারতের অন্যতম নেতা জগৎ প্রসিদ্ধ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ, ভারত মাতার একনিষ্ঠ পূজারী। তিনিই Bengali সংবাদ পত্রের সম্পাদক হিসাবে সমগ্র ভারতে জাতীয়তা বোধ ও স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করিয়াছেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া কর্ম্মজগতে প্রবেশ করিবার কালে দেখা গেল জন-কল্যাণ কার্য্যে পন্থজীর অটুট উৎসাহ ও অসীম অধ্যবসায়। পরামর্শ গ্রহণ করিতে বিচিত্র সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার নিকট আসিয়া বুঝিলেন পন্থজীর জ্ঞানের গভীরতা অনন্যসাধারণ, উপদেশ দিবার প্রণালী রমণীয়, বুঝাইবার শক্তি হৃদয়গ্রাহী। কুমায়ুন বিচারালয়ে তরুণ ব্যবহারজীবের জ্ঞান প্রতিপত্তি অচিরে প্রসার লাভ করিল। বিবাদী ও প্রতিবাদী দল একযোগে স্বীকার করিলেন নবীন উকিলের যুক্তি অকাট্য, বিশ্লেষণ রীতি অভ্রান্ত এবং আক্রমণ রীতি প্রখর হইলেও কঠোর বা স্নেহপূর্ণ নহে। তীব্র বিদ্রূপাত্মক বা দুর্নীতির আশ্রয় কখনও লইতেন না। সরল মিষ্ট ভাষা ও মৃদু ভর্ৎসনায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। বহু পণ্ডিত, গণ্য মান্য ব্যক্তি ও সাধারণ সম্প্রদায় বিচারপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিতে লাগিলেন। ওকালতিতে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া সকলে প্রীত হইলেন। বহু জটিল মামলা তাঁহার হস্তে আসিল, ধনী মক্কেল তিনি বহু পাইলেন।

পরে তিনি সুপ্রসিদ্ধ নৈনিতাল শহরে আসিলেন। শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন ও সুষমায় ধনি নৈনিতালে তিনি স্বকীয় ব্যবসা গঠন করিতে বিলম্ব করেন নাই। সুচতুর উকীল হইয়াও রাজনীতির আকর্ষণ সুবিশাল মক্কেল গোষ্ঠি প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কুমায়ুন

পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। Southborough committeeতে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া সুবিজ্ঞ পন্থজী মণ্টফোর্ড রিফর্মের অন্তর্গত করিয়া সুযাদুন জেলাকে আনিয়া বিস্তর সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই সময় হইতে নূতন পন্থায় প্রধাবিত হইতে অবকাশ পায়। নূতন জীবনী শক্তির বিকাশ সকলে দেখিতে পাইলেন, ভারত-বাসীর মনে প্রকাশ পাইল দৃঢ়তা ও কর্মনিষ্ঠা। বহু ভারতীয় নেতাকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেন। সাম্রাজ্যবাদীগণ হিন্দু মুস্লিম বিরোধের বীজ-বপন করিলেন। সুক্ষ্মবুদ্ধি উদিল গোবিন্দবল্লভ স্থির বুদ্ধিতে এই সকল রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখিতে লাগিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমেদাবাদ নগরীতে কংগ্রেস মহাসভার যে অধিবেশন বসিয়াছিল তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তখন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইলেও কারাগারে যাওয়ার হেতু আসিতে পারেন নাই। হাকিম আজমল খাঁ তৎস্থানে অস্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সুচারু-রূপে সেই কার্য হইল।

মৌলানা হসরত মোহানী ছিলেন তেজস্বী পুরুষ। তিনি কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্য থাকিলেও All India Muslim Leage-এর সভাপতি ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের নীতির পরিবর্ত্তন চাহিলেন। সে প্রার্থনায় কঠোরতা ছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আংশিক পরিবর্ত্তন চাহিলেন তাহাতে নরম পন্থা (moderate policy) প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন Think fifty times before you take a step which may not to your credit, not to your advantage but which may cause irrepairable injury। সুবুদ্ধি পন্থজী গান্ধীজীর কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এই উপদেশ তাঁহার মর্ম্মদেশ স্পর্শ করিল। তিনি ফিরিয়া বিপুল উপার্জ্জনের সম্ভাবনা সহ আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন।

অচপলমতি পন্থজী সোল্লাসে কাউন্সিলে গিয়া বিবিধ পন্থায় দেশের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হইলেন। বিশিষ্ট জননেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ নগরীতে কর্ম্মাধিনায়ক নিয়োগ করিতে আসিলেন। স্বরাজদলের কর্ম্ম-প্রণালী তিনি দ্বিধীকৃত করিতে যুক্ত প্রদেশের কার্য পদ্ধতি কাউন্সিলে গিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, মনোযোগ পূর্ব্বক বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন এবং যুক্তপ্রদেশের (উত্তর প্রদেশের) স্বরাজদলের নেতৃত্বরূপে পণ্ডিত পন্থকে বরণ করিলেন।

সৌন্দর্য্যনিকেতন আলমোরা নৈনীতালের সম্মোহন সুষমার কোলে তাঁহার রুচি পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেইজন্য পরিণত বয়সে জীবনের কোন স্তরে রুচিবিগর্হিত কার্য্য করিতে কেহ দেখে নাই। সমস্ত জীবন তাঁহার ছিল মাধুর্য্যরসে ভরা। পরুষ বচন কখনও ব্যবহার করেন নাই। কোমলে কঠোরে সাত্ত্বিক ব্যবহারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে পণ্ডিত পন্থজী মণ্টেগু-চেমলফোর্ড রিফর্ম্ম অনুসারে প্রথম নির্ব্বাচন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দেশসেবার আদর্শ তাঁহাকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া অন্তরে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহাতে অর্থ উপার্জ্জনের নেশা কাটিয়া গিয়াছিল। দেশসেবার আদর্শ বিপুল বন্যাপ্রবাহের ন্যায় তাঁহার মন-প্রাণ-চিন্তা প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেসের মনোনয়নের অভাবে তিনি সেবায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহাত্মাজীর নির্দ্দেশে কংগ্রেস নাগপুরের উল্লেখযোগ্য অধিবেশনে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব পরিহার করিতে স্থির সংকল্প হইয়া ছিল। প্রথমে তিনি দলের সিদ্ধান্ত মানিয়াছিলেন, দলীয় মতবাদে অবাধ্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু লীডার সংবাদ পত্রের মাননীয় ও জনপ্রিয় নেতা ও সম্পাদকের সনির্ব্বন্ধ বারংবার অনুরোধে তিনি অবশেষে অনুমোদন পত্র পেশ করিলেন।

দেশপূজ্য নেতা চিন্তামণি বুঝাইলেন তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য সন্তান কাউন্সিলে বা আইন সভায় গিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিবেন। সেই সেবার কার্য্য হইতে দেশবাসীকে ও দেশকে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

এবিষয়ে অন্যান্য প্রখিতযশা কংগ্রেস নেতা হইতে তাঁহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে কংগ্রেসকে মহাত্মাজী একটি সমিতি বা club হইতে বহুমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার পূর্ব্বে তিনি কংগ্রেস মহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পুণ্যধাম বারাণসী নগরীর খ্যাতনামা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিয়া অন্তরে অতুল বল পাইয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রবর্ত্তিত স্বরাজ পার্টির কার্য্যে যোগদান করেন। উহার অনুমোদন লইয়া উত্তর প্রদেশ আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। কর্ম্মকুশলতাগুণে তিনি ইহার অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মযোগী পন্থ উত্তর প্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইয়া যোগ্যতার সহিত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ও পণ্ডিত নেহরু সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে লক্ষ্ণৌ নগরীতে এক প্রতিবাদ সভা ও শোকযাত্রার আয়োজন করেন। বিষম প্রহৃত হইয়া তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পন্থজী সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন। দেশমাতৃকার পূজায় কল্পে তিনি যে নির্য্যাতন ভোগ করেন তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন কেন না নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতা বয়কট করিবার সিদ্ধান্ত ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। স্বনামধন্য নেতা মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দলে যোগদান করিয়া কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই নূতন দল সমগ্রজাতির অনুমোদন লাভ করিল। বিদেশী শাসকবর্গ এই অবস্থায় লাভবান হইয়া কংগ্রেসের ভিতর বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রধান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যেও পার্থক্য বৃদ্ধি পাইল। অগৌণে দুইটি দল আবির্ভূত হইল। পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠায় গান্ধীজী ভবিষ্যৎ বিপদ দেখিতে পাইলেন। তজ্জন্য অবশ্যম্ভাবী অঘটন প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে তিনি দৃষ্টি প্রভাবে তিনি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে চাহিলেন। দিল্লীতে কতিপয় প্রধান কংগ্রেস নায়কের আহ্বানে এক বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল। ইহার সভাপতিত্ব করিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। মহাত্মাজী তখন কারাপ্রবেশ করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তখন দিল্লী অধিবেশনে যোগদান করিলেন না, সে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন। সেই বিশিষ্ট অধিবেশনে মৌলানা মহম্মদ আলি স্বরাজ্য দলের সহিত যোগদান করিয়া চাতুর্য্যপূর্ণ ভাষা প্রয়োগে ও রাজনৈতিক কৌশলে সকলকে বুঝাইলেন যে গান্ধীজী কাউন্সিল প্রবেশ সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কিছুক্ষণ উত্তেজনা-মূলক বিতর্কের পর ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসসেবী কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন এই রূপ নির্দ্দেশমূলক প্রস্তাব গৃহীত হইল। এইভাবে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদল অনুমোদন পাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাকার্য্যে সাফল্যলাভ করিল। তাঁহারা বিপুল ভোটাধিক্যে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিলেন। নৈনীতাল হইতে পন্থ উত্তর প্রদেশ (তৎকালীন যুক্ত প্রদেশ) কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত হন।

ক্রমশঃ

সাম্যবাদের কবি নজরুল

।। শ্রীশান্তনীল দাশ ।।

রবীন্দ্র-যুগে জন্ম গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের অলোক-সামান্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েও যে-কয়জন কবি আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, কবি নজরুল ইসলাম তাঁদের অন্যতম। বিদ্রোহী কবি রূপেই নজরুলের খ্যাতি এবং বাংলা কাব্য সাহিত্যে ঠিক নজরুলী ধরণের বিদ্রোহাত্মক কবিতা রচনা ইতঃপূর্বে কোন কবি করেন নি। এই হিসাবে নজরুল এ পথের অগ্রদূতও।

সমগ্র নজরুল-সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে এই বিদ্রোহের সুর। অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের বেদনায় ব্যথিত কবি-মন। নানা ভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি এই বেদনা।

বহু যুগ পূর্বে মানবপ্রেমী চণ্ডীদাসের কণ্ঠে যে সুর বেজে উঠেছিল, সেই 'সবার উপরে মানুষ সত্য' ধ্বনিও নতুন করে রূপ নিয়েছে এ যুগের কবির কণ্ঠে :

গাহি সাম্যের গান,
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে কিছু মহীয়ান।

নজরুল-কাব্যে এই সুরটি নানাভাবে ধ্বনিত হয়েছে। কখনো সে সুর বেদনা-মথিত, কখনো বা বিদ্রোহে রণিত। মানুষ যখনি আপন দম্ভে বিভেদের সৃষ্টি করেছে, মানুষের মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে, শক্তিমত্ত মানুষ দুর্বলকে আঘাত হেনেছে, নারীত্বকে লাঞ্ছিত করেছে, সেইখানেই বেজে উঠেছে কবি-কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর। শুধু তাই নয়। মানুষ যেখানে মানুষকে অবহেলা করে তার ধর্মকে, তার দেবতাকে বড় করে দেখেছে, সেখানেও কবির কণ্ঠ সোচ্চার :

তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম,
সকল পুণ্যতীর্থ,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-মেউল
সকলের দেবতার।

কারণ কবি বিশ্বাস করেন

এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন
মন্দির কাবা নাই।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষ অনেক কিছুই অর্জন করেছে তার জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য। কিন্তু সেই সঙ্গে সে অনেক কিছু হারিয়েছেও। তার জীবনের জটিলতা অনেক বেড়ে গেছে। মানুষে মানুষে সৃষ্টি হয়েছে বিভেদের। সৃষ্টি হয়েছে নানা ধর্মের, সৃষ্টি হয়েছে পাপ-পুণ্যের। ভগবানকে পাবার পথ কতটুকু সহজ হয়েছে বলা যায় না। কিন্তু সেই পথে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর।

সহজ জীবন মানুষ হারিয়েছে। ধর্মান্ধতা অনেক অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছে। পাপ পুণ্যের চুলচেরা হিসাব করতে গিয়ে মানুষ সত্য পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আত্যাভিমান ও কাঞ্চনকৌলীন্য মানুষে মানুষে বিরাট বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু কেন ?

সহজ জীবনের মাঝে কেন এ জটিলতা ? চারদিকে কেন এত অনাচার, অবিচার ? মানুষের হাতে মানুষের কেন এত লাঞ্ছনা ?

মানুষের এই বেদনায় কবির অন্তঃকরণ আকুল হয়ে ওঠে। কবির লেখনীতে সেই বেদনার জ্বালাময়ী প্রকাশ :

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না,
বড় বিষ জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি,
তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে নাক'
মাথায় বন্ধু, বড় দুখে !

অমর কাব্য তোমরা লিখিও,
বন্ধু যাহারা আছ সুখে।

কবি নাস্তিক নন। তাঁর দেবতা মানুষের মাঝে এসে ধরা দিয়েছে। মন্দিরে মসজিদে সে দেবতা আবদ্ধ নয়। 'মোল্লা-পুরুত' তার দরজায় চাবি-লাগাতে পারে না।

তিনি দেখেছেন চণ্ডালের মাঝে মিশে আছে হরিশ্চন্দ্র, রাখালের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ, মেষপালকের মাঝে যিশু। ঘৃণা করবে মানুষ কাকে? জগতে নিষ্পাপ কে? মুনি ঋষি, এমন কি স্বর্গের দেবতারাও স্খলনের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তবে কেন মানুষের স্খলন-পতনকে এত বড় করে দেখে তাকে ঘৃণার আঘাতে জর্জরিত করা? প্রেমেই তো সহজ সমাধান রয়েছে। সেই প্রেমের মন্ত্র কবির কণ্ঠে

যত পাপী তাপী সব মোর বোন,
সব হয় মোর ভাই।

পতিতা নারী যারা সমাজে চিরলাঞ্ছিতা, মানুষের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্রী হয়েই যাদের জীবন কাটে অনাদরে, কবির পূজার অর্ঘ্য থেকে তারাও বঞ্চিতা নয়। তিনি দেখেছেন জগতের অনেক মহাপুরুষ, ত্যাগী, কর্মী, বীর, ঋষিও জন্মগ্রহণ করেছেন এই পতিতারই গর্ভে।

স্বর্গ বেশ্যা ঘৃতাচীপুত্র
হল মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্বপূজ্য
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
কানীন পুত্র কর্ণ হইল
দানবীর মহারথী

সুতরাং

কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল,
কেহ যে ঘৃণ্য নহে।

মানুষের প্রতি কবির সুগভীর প্রেম এমনি ভাবেই প্রকাশিত কত কবিতায়।

মানুষের প্রথম পরিচয় সে মানুষ। তারপর স্থান কাল ভেদে সে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, সে বিভিন্ন ধর্মের।

সুখে দুঃখে আনন্দ বেদনায়, বিরহ মিলনে, পুণ্যে-পাপে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল জাতির মানুষের সমান।

মিথ্যা ভেদের গণ্ডী টেনে, মানুষ যে ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে, সে বিভেদ কৃত্রিম ও তার মূলে কোন সত্য নেই। স্বার্থ-প্রণোদিত এই বৈষম্য। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছে উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, ছোট বড় ভেদাভেদ।

শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পুরুষ করেছে নারীকে তার ক্রীতদাসী। নানা বিধি নিষেধের জাল বেঁধে নারীকে তার সহজ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মানুষ নারীর মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। মনুষ্যত্বকে সে অপমানিত করেছে।

মানবপ্রেমী কবি উভয়কেই দেখেছেন সমদৃষ্টিতে। উভয়ের মহত্বকে তিনি শ্রদ্ধায় স্বীকার করেছেন;

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি
চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী,
অর্ধেক তার নর।
জগতের যত বড় বড় জয়,
বড় বড় অভিযান,
মাতা, ভগ্নী ও বধূদের দানে
হইয়াছে মহীয়ান।
কোন কালে একা হয়নিক জয়ী
পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে—
বিজয়লক্ষ্মী নারী।

কবি আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন, সকল কৃত্রিমতার আবরণ ঘুচে গিয়ে একদিন নতুন প্রভাত সূচিত হবে এই পৃথিবীতে। মানুষ বড় হবে তার অন্তর মাধুর্যে, সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ এসে রচনা করবে মাটির পৃথিবীতে মিলনের স্বর্গ। বেদনার মধ্য দিয়ে মহামিলনের দিন আগতপ্রায়। যে শয়তানের ছলনায় প্রলুব্ধ হয়ে মানুষ পৃথিবীতে শয়তানের কারখানা সৃষ্টি করেছে, তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। সেই স্বপ্নের দিনগুলি কবিদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।

মহামানবের মহাবেদনায়
আজি মহা উত্থান,
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে
কাঁপিতেছে শয়তান।

কবির স্বপ্নের সেই দিনগুলি কবে আসবে?

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৭১)

ঠাকুর, 'তত্ত্বমসি'—তুমিই আমার আমি আছি, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই মহাবাক্য আমার জীবনে আস্বাদিত হইবার পরই আমি সংসার হইতে যাইব, ব্যর্থ হইয়া যাইব না। তোমার আমার এই একীকৃত হওয়ার মধ্যে সকল বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে, তোমার আমার মিলনানন্দের কিতর দিয়া এই পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব দিব্য রূপান্তরিত হইবে। আমাকে তো এই প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ আস্বাদন করিতেই হইবে। 'এত যদি দিলে নাথ আরো দিতে হবে যে, তোমারে না পেলে আমি ছাড়িব না, ছাড়িব না'। তোমার সাথে 'এক' হইয়া, সার্থক হইয়া বিদায় নিব এই সংসার হইতে। রেণু সকালে ঢাকুরিয়া হইতে লালবিহারীবাবুর ২ বৎসরের ৮ টাকা নিয়া আসে। নির্মলবাবু সন্ধ্যার পর দিয়া যাইবেন বলিলেন। ৬টার পূর্বে ডাক্তার মুখার্জীর ওখানে যাব, দেখা হয় না। বাটা-পূজার চতুর্থ প্রচ্ছদপটে বিজ্ঞাপন দিয়াছে। ৬টার পর মঠে যাই। রমাপতিবাবু, নীলরতনবাবু, আশুবাবু, সুধাংশু শেষে প্রভুর ছিলেন। ঠাকুর যে বর্ত্তমান যুগে একমাত্র অগ্রগামী অগ্নিদেবতা, যিনি প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন ধরার বেদ ও তদুপযোগী 'বিচিত্র' জীবন-ভেলা লইয়া আসিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মাটি-টাকা টাকা-মাটি ও মাতা সারদামণিকে দেখিয়া ভীতির আদর্শ যে অচল —তাহা সকল জোর দিয়া বলি। আশুবাবু ঠাকুরের সঙ্গে থাকার সময় তাঁহারা যে সকল ভুলিয়া তাঁহাকে লইয়া বিভোর ছিলেন, তাহা বর্ণনা করেন। প্রশ্ন করি, আজ কি সে অবস্থা আমাদের আছে? যে প্রবৃত্তি সে সময়ে চাপা পড়িয়াছিল তাঁহার লাম্পট্যে, আজ তাঁহার অবর্ত্তমানতার ফাঁক দিয়া সেগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে সময়ের মানুষ কি আজ আমরা আছি? ঠাকুর প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন। প্রবৃত্তি তিনি মূলপ্রয়োজনে বাদ দিতে পারেন না। কিন্তু যে কৌশলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সমন্বয় হয় সেই কৌশল না শিখিবার ফলে সম্প্রদায়ভুক্ত আজ আমরা প্রবৃত্তির ঘাতে মার খাইতেছি। 'যত পার আর না পার'—ইহার অর্থ বুঝিয়াছি কিছু না করা, অলস জীবন যাপন করা, কোন্দল করা, পর-নিন্দা করা ইত্যাদি। প্রবৃত্তির sublimation হয় নাই। অন্য সব সম্প্রদায়ই কিছু না কিছু করে, আমাদের এই সম্প্রদায় ছাড়া। কিছু না করার সাধন তো ইহারা পাইয়াছিল, কিন্তু নিল কৈ? প্রভুরঞ্জনকে দিয়া এইবারকার উজ্জলভারতের 'শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীরবীন্দ্র-শ্রীঅরবিন্দ' প্রথম অংশটা পড়াইয়া শুনি। .....

১ই আগষ্ট

আমার কৃষ্ণগোপাল, গৌরগোপাল, নিত্যগোপাল, 'প্রলয়পয়োধি জলে' তুমিই 'ধৃতবানসি বেদম্'। এই 'মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় যা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ'-এর দেশে যখন যুবক-যুবতীর অবাধ মিলন-পথ শুধু খুলিয়াই যায় নাই, প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ, কামিনী-কাঞ্চন ভীতির আদর্শ মানুষের কোন্ কাজে লাগিবে? একজন নিষ্কিঞ্চন পুরুষ ৫ হাজার বৎসর পূর্বে 'যুবতীশতযুত' হইয়া এই আদর্শের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, আর নিত্যগোপাল, বর্ত্তমান যুগে একমাত্র তুমিই তাঁহার বেদ লইয়া ও 'বিহিত বহিত্র চরিত্র' লইয়া আসিয়াছ এই প্রলয় পয়োধি জলে নিজ জীবন-ভেলা ভাসাইয়া। তুমি আমি এই

প্রলয় গর্জনের মাঝে, ধ্বংসদূতদের বিরাট চিৎকারের মাঝে, চতুর্দিকে ভাঙনের ছবির মাঝ দিয়া চলিয়াছি। Cultural deluge is come. কে দিবে বর্তমান যুগে এর আদর্শ তুমি ছাড়া? চতুর্দিকে ত্রাহি ত্রাহি রব! রক্ষা করো রক্ষা করো কামার্ত ভীত নরনারীকে! এই কামার্ত উদ্ধারের mission কি তোমার সম্প্রদায় নিবে না? প্রায় ১০টায় দুর্গামোহনবাবু ও নলিনী আসে। দুর্গামোহনবাবু 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' বইখানি পড়িবার জন্য নিয়া যান, আর 'শ্রীশ্রীতাপোপাল-দর্শনে ও জীবনে' তাহাকে দিয়া যেই। ৯টার পর গীতাভবনে যাই। শরৎচন্দ্র গুহের স্মৃতি-সভা, দুর্গামোহনবাবু সভাপতি। কল্যাণ, দেবপ্রসাদ, সুমুদবন্ধু সেন, প্রবোধ কর, অতুল সেন, লক্ষ্মীকান্ত সেন, হীরালাল দাস ও আমিও বলি। অতুল সেন বলে—বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত। তবুও বরিশালের একটু কথা ছিল, আজিও আছে। সেই কথাটি ধরিয়া থাকিলে এখানে থাকিয়াও বরিশালের দেখা করা যায়। প্রবোধ বাবু বলেন—শরৎবাবু ছিলেন 'nature's gentleman'। শরৎবাবু মধ্য পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ছিলেন moderte, তবুও দেশকে ভালবাসিতেন। আমাকে উপবাসের সময় পশা ডাব পাঠাইয়া দিয়াছেন। জেলে যাবার পর মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর মঠে যাই। ক্ষিতীশবাবু আসিয়াছেন। নীলরতনবাবুর সামনে, 'যদা সংহরতে চায়ং' শ্লোকের পর 'ব্রাহ্মণের-বিদুষ্টেক্ত' শ্লোকের তাৎপর্য এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে অহি শত্রু বলার পর চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানের নিজের কথা বলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। শত্রু কামের উপর সাম দান ভেদ দণ্ড উপদেশ অচল। 'অন্ত রসঃ পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'। 'বিক্রীড়িতম্ ব্রজবধূভিঃ...' শ্লোক্য ব্যাখ্যা করি। 'Similia similibus curante'।...

১০ই আগস্ট

ঠাকুর, তোমার তত্ত্ব, তোমার কথা, তোমার জীবন-চরিতের আলোচনা ব্যাপকভাবে করিবার কি কেহ নাই? কেহ তো ছুটিয়া আসিল না তোমার সর্ব-সম্প্রদায়-সমন্বয়কারী এই তত্ত্ব-জীবনের খোঁজে? সারা জীবন তো তোমার দর্শনের কথা বলিয়াছি। লক্ষ লক্ষ লোকের কানও লাগিয়াছে। ঘণ্টার ঘণ্টা নিশ্চল হইয়া শুনিয়াছে। কেহ তো পাগল হইয়া আসিল না প্রচার করিবার এই গুরু-ভার বহন করিতে। আমি যে বড় একা, দুঃখিতের মত একাই চলি ফিরি। প্রাকৃতিক কোন আনুকূল্যই নাই। সে কি আজিকার কথা—দুর্যোগ ঠেলিয়া চলিয়াছি! আগাইতে পারিতেছি কই? তোমার দর্শন লইয়া ঝড় তুলিতে চাই, সব ভাঙিয়া চুরিয়া তোমার ভাবে ভাবিত হইতে চাই, কিন্তু হয় হয় করিয়া যেন হইয়া উঠিতেছে না। ঠাকুর, দয়া কর, দয়া কর। সকাল হইতেই বৃষ্টি...। রেণু ১১টার পর বাহির হয়—সোহাফিস, প্রেসসিন্ডিকেট, ঘমঘম গ্রামোফোন কোম্পানী, পরে যুগান্তরে দক্ষিণারঞ্জন বসুর ওখানে, তার পরে গড়িয়াহাটায় জগদীশ প্রেস হইয়া প্রায় ৮টায় এখানে ফেরে। আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া ছিলাম।... প্রতিক্ষার কোন সাড়া শব্দ নাই, কখন আসিবে বুঝি না। ৮টার পর বিনয়কৃষ্ণ পাল (কর্পোরেশনের ইঞ্জিনীয়ার) আসেন। ইনি তাহার নিকট হইতে অবধূত-তান্ত্রের তান্ত্র প্রদীপের নাম শোনেন। আরও একদিন রেণুর কাছে আসিয়া ছিলেন। তিনি এই বই পাইবার জন্য insist করেন। উদ্বোধন ভারতে যে গীতা বাহির হইতেছে, তাহা পড়িতে বলি। তাঁহাকে বাঁধানো প্রথম খণ্ড যেই। ৯॥০টা পর্যন্ত আলোচনা হয়। গত শ্রাবণ সংখ্যার রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়িয়া শোনান হয়—'অধিমানায় টাকা শুধে দিতে বন্ধে' ইত্যাদি ক্ষেত্রে হোয়াইটহেডের লেখাটাও শুনাই। ভাল তো অনেক মানুষেরই প্রথমে লাগে, কিন্তু কেহ তো সংস্কার-মুক্তি চায় না। এতবড় revolution কেহ পরিপাক করিতে পারে না। বুদ্ধিতে বোঝে, কিন্তু জীবনে আনিবার কাছেই ঘাবড়াইয়া যায়, তাই পলাইয়া যায়। ইনিই বা কয়দিন থাকিবেন? ওরিয়েন্ট হইতে 1st form (প্রাথমিক শিক্ষা) 4th reading দিয়া যায়।... রেণুর দেরীতে আসার জন্য আমার আজ আর মঠে যাওয়া হয় নাই। গত রবিবারের সকার

বিবরণী হাতে হাতে যুগান্তরে এবং তাকে আনন্দবাজারে ও বসুমতীতে দেওয়া হইয়াছে। আগামী সভার জন্যও যুগান্তরে ও অমৃতবাজারে বেশু দিয়া আসিয়াছে।

১১ই আগষ্ট

রাধারাণী আমার, হৃদয়-পুত্তলী আমার, তুমি বিশ্ব-রূপিণী, প্রতিটি অংশের অনন্তত্ব বিধায়িনী, পুরুষোত্তম-বিশ্বের পরম সংগঠনশক্তি, পরাশক্তি, তোমাকে বুকে লইয়া চলিব। হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া চলা তুমি চাও না বুঝিতেছি। নইলে যে ঝড় আমার বুকে বহিতেছে তাহাদ্বারা সমাজের সকল ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সংস্কার উড়াইয়া ফেলিয়া সেখানে পুরুষোত্তম-সংস্কার গড়িয়া তুলিতে পারিতাম। তাহা হইবার নয়। সকল দিক দিয়া, ধন-জনের দিক দিয়া আমার হাত-পা বাঁধা। তুমিই বর্তমান কালের আবরণে কালের বরণ গায়ে মাখিয়া নিত্যগোপাল-রূপে আসিয়াছ। আমার জীবন মরণের বিধাতা, তুমিই আমার আমি। আমি শুধুই জপ করিব আমার আমি নিত্যগোপাল, আমি নিত্যগোপাল, নিত্য-গোপাল। আজ নৃপেন্দ্র পত্রিকা আসিয়াছে। নলিনীকুমার চৌধুরী লিখিত 'অবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ' প্রবন্ধটী খুব আপত্তিকর। তিনি অবতার-শ্রেষ্ঠ হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণও যে নিজের দেহের দিব্য রূপান্তর করেন নাই, কাজেই তাহার খোঁজও দিয়া যাইতে পারেন নাই তাহা লিখিয়া শ্রীঅরবিন্দ তাহাই করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহা মানিতে পারা যায় না। তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের লেখাও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ কি জানেন না যে, দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ? 'দেহদেহিবিভেদোঽয়ম্ নেবরে বিদ্যতে কচিৎ'। শ্রীকৃষ্ণ বৈকল্পশাস্ত্রে অবতারী, স্বয়ং ভগবান; ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গের আভা, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; 'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে'-বাণী তিনি বলিয়াছেন, শুধু দিব্য মানবের নয়। তাঁহাকে মানুষ দেব অসুর পশু পক্ষী বনের বৃক্ষলতা যমুনা ব্রজের ধূলি পাইয়াছে। মহাপ্রভু 'তুমি' বৃন্দাবন গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছেন। ইহা কি বিশ্বের transformation-এর কথা নয়? অরবিন্দের লেখা 'Arabinda on myself and mother বইটা কেনা দরকার। কোন্ কোন্ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরও পরের কথা বলিয়াছেন। দেখা দরকার। অনুকূল ঠাকুরের নিজেরাও তাহা বলিতে চান। মদন মোহন তত্ত্বের ঘনীভূত আস্বাদন বিশ্বের একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যাহা unconscious mind-এর sublimation। শ্রীকৃষ্ণে অতিমানস-অধিমানস-মানস সব সমন্বিত। কোন hierarchy তাঁহার জীবনে নাই। প্রত্যেকটি স্তরের সঙ্গে তাঁহার সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। Centre everywhere. circumference no-where, মাত্রই বিশ্বের কেন্দ্র নয়। বিশ্বের কেন্দ্র সব। Evolution-এর এই খবর শ্রীকৃষ্ণ পৌঁছাইয়া গিয়াছেন। —রাসেলের উক্তি (?) মানুষের দর্শন মার্কস দিয়াছেন? ঠিক সেইরূপ মানুষের দিব্য রূপান্তরের কথা অরবিন্দ বলিয়াছেন, বিশ্বের দিব্য রূপান্তরের কথা বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ।

১২ই আগষ্ট

শ্রীনিত্যগোপাল, তুমি বিশ্বের মদনমোহন-তত্ত্বের অবতার। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে মদনমোহন-তত্ত্ব আস্বাদিত, তোমাতে তাহার বিশ্বজনীনতার প্রত্যেক স্তরে প্রয়োগ-কৌশল; জমিয়া উঠিয়াছে। কিরূপ মনস্তত্ত্বসম্মত কাঠামো দাঁড় করাইলে বিশ্ব-জীবন, সামাজিক জীবন, পরিবার-জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনে 'মদন'-বিকার জন্মাইতেই পারিবে না একটি equilibrium, একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টির ফলে, তোমার জীবন তাহারই ঘন বিগ্রহ। তোমার স্পর্শে বিশ্ব-জীবন সুস্থ হইবে, সুখ হইবে, মদন মদন থাকিয়াও মদনমোহন হইবে, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মহামিলন সম্ভব হওয়ার ফলে দিব্য ভাগবত সৃষ্টি গড়িয়া উঠিবে। শ্রীঅরবিন্দ চান মানুষের ভিতরে অতিমানস সৃষ্টি, নিত্যগোপাল—তোমার জীবনে দেখিয়াছি বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর মাঝে অতিমানস সৃষ্টি।...বন্ধু সুরেশ মজুমদার (আনন্দবাজারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর) গত রাত্রিতে বুকের চাপে দেহরক্ষা করিয়াছেন ... । দিনটাই ভাল লাগিতেছিল না। সেদিন শতবার্ষিকীর জন্য শেষ

দেখা করিয়া আসিলাম। দিল্লীতে যখন no-changer ও pro-changer-এর ঝগড়া, এই সুরেশ মজুমদারই আমাকে টেলিগ্রামদ্বারা বরিশাল হইতে আনাইয়া টাকা দিয়া দলবলসহ নিজে হাওড়া স্টেশনে গিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মনমন জেলে দেখা করিয়াছিলেন।··· বিজয়কৃষ্ণ মল্লিক আসেন। তাঁহার কাছে গীতার অনুক্রমণিকা—প্রকৃতি তাল ও বর্মের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করি। ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান-পুরুষোত্তমের পার্থক্য আলোচিত হয়—বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ শ্লোকটি ব্যাখ্যাত হয়। বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ mechanical নয়, organic। কাব্যের একটি positive meaning আছে। 'নাই' বলিলেই এই বিশ্বের কিছু 'নাই' হইয়া যায় না।

১৩ই আগস্ট

ঠাকুর, তুমি ছাড়া আমার কিছু নাই, ইহা আমি স্থির বুঝিয়াছি। তোমাকে লইয়া আমি সব-কিছু হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি। কাহারও সঙ্গে ঠিক ঠিক আমার মনে না—চিন্তায় আচরণে চালচলনে। মঠের উহাদের কত দৈন্য। ওখানে যে অনাচার···প্রভৃতি করিতেছেন, তাহা মুখ বুজিয়া অথচ অন্তরে অন্তরে বিরক্ত হইয়া যেন সহিয়া যাইতেছি। সমস্ত মঠ আজ বিশৃঙ্খলায় ভরা। শুচিতার নামগন্ধও নাই। বাহিরের শুচিতাই আছে যথেষ্ট। তোমার প্রতিষ্ঠা কি ওখানে সম্ভব হইবে না? আমার বুক যে বেদনায় ভরিয়া ওঠে। আসক্তি—আসক্তি—আসক্তি! এত ক্ষুদ্রতা লইয়া ইহারা দিন কাটায়! কোথায় তুমি, তোমার দর্শন, কোথায় তোমার জীবন? ঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর! আজ সকাল হইতে খুব বৃষ্টি। খিচুড়ি হয়। ৫টার পর প্রতিভা আসে। কতদিন পর ফিরিয়া আসিল। উষাদিদি প্রায় ৭ দিন মঠে ওখানে ছিল। কাছে না থাকিলে কেমন ফাঁকা লাগে। অসহায় মনে হয়। সকলেই তো ছাড়িয়া গিয়াছে। একাই চলিব—ইহাই হয়ত ভাগ্যবিধান। কাছে থাকিয়াই বা কয় জন শান্তি দেয়। ৬॥ টায় মঠে যাই। তারিণীবাবু কাল আসিবেন শুনিলাম। তাহারও সঙ্গে প্রাণখোলা মিলন নাই। সব ভুল বজায় রাখিয়া তারিণীবাবু চলিতে চান, সবই যাইবে। যাহারা এখানের কেহ নয়, তাহারা যদি তাহাদের আচরণের প্রাণখোলা স্বীকৃতি পায়, তবে তাহারা পাইয়া বসিবে, এখানকে আরও শোষণ করিবে। ইহা কি তারিণীবাবু প্রভৃতি সোঝেন? অসহযোগও করিতে হয়। মুখে থাকিয়া এই সব শোষকদের সঙ্গে না মিলিলে দুই পক্ষেরই বিপদ। শুনি,— এখান হইতে ৩। হাজার টাকা নিয়া গিয়াছেন, অথচ এখানের মন্দিরের জল-হাত হয় না অর্থাভাবে। ইহার মানে কি? আমি এসব বুঝি না। ৮॥ টায় আসি।

১৪ই আগস্ট

নিত্যগোপাল, মহাজীবন মহামরণ আমার, মহামরণের ভিতর দিয়া মহাজীবন লাভ করিব। তোমার মাঝে মরিয়া আমি বাঁচিব; আমি আমাকে দিয়া যতই বাঁচিতে চাহিব, ততই আমি বীভৎস জীবন লাভ করিব। পাইয়াছি তো সব অযাচিত করুণায়, কিন্তু তোমার মাঝে যতক্ষণ না নিভিয়া যাইতেছি, ততক্ষণ পাইয়াও কিছু পাইব না। আমার মরণের ভিতর দিয়া আমার স্বতঃসিদ্ধ পাওয়াই স্পষ্ট হইয়া আত্ম প্রকাশ করিবে, তখনই আমি বলিতে পারিব 'আমি সত্যই পাইয়াছি'। তুমি আমার জীবনের প্রতি স্তরে প্রতি স্পন্দনে রহিয়াছ, তবুও তো আমি বঞ্চিত। অহম্ নাহম্ হওয়ার ভিতর অহম্ হইব। তোমাকে আমার সব কিছু দিয়া পাইব। আজ ১৫ই আগস্ট। ভারতের যাদব বিজয়া, দীর্ঘ পরাধীনতার পরে সত্যিকার বিজয়া। ভারতের প্রতিটি নরনারীকে, বিশ্ববাসী সকলকে আমার বিজয়ার আলিঙ্গন জানাইতেছি।...৬টায় ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠ আরম্ভ হয় মঠের বারান্দায়। কিছু বাহিরের লোকও হইয়াছিল। বিষয়—বিদুর-চরিত্র। মহাভারতের বৈশিষ্ট্য, বিদুরের জন্মকথা, বিদুররূপ ধর্মের জন্য, রাজ-রোষ উপেক্ষা করিয়া সব সময় বিদুরের প্রকৃত বক্তব্য কি তাহা বলা বিদুর-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পাঠ সকলের ভাল লাগিয়াছে।

১৫ই আগস্ট

ঠাকুর, তোমার প্রতিষ্ঠার 'আয়ত্ত' তুমি নিজেই করিয়া গিয়াছ—কলিকাতা মহানগরীর বুকে কয়েক বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছ, অন্যান্য মঠগুলিকে প্রয়োজন হইলে বিক্রয় করিবার নির্দেশ দিয়া কলিকাতার এই মঠকে রাখিবার কথা লিখিয়া গিয়াছ। কয়েক সহস্র টাকা রাখিয়া গিয়াছ, প্রচুর গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছ যাহার ভিতর তোমার বক্তব্য, তোমার দর্শন রহিয়াছে। প্রতিষ্ঠার জন্য যাহা প্রয়োজন সবই করিয়া গিয়াছ। আমরা 'সর্বাবয়ব পরিত্যাগী' হইয়া তোমার ভিতরে মহানির্বাণ লাভ করিয়া, তোমার ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী হইয়া যদি সেবা করিয়া যাইতে পারি, তবেই তোমার প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। তোমার জীবন ও দর্শনের ধারক ও বাহক হইব—ইহাই সারা জীবনের কামা। আমি তোমার 'ইচ্ছা' বনিয়া যাইব—এই অধিকার দেও।…গত রবিবারে যুগান্তরে একটি প্রবন্ধে আছে যে ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা শ্রীঅরবিন্দের আত্মশক্তির ফলেই হইয়াছে, ইহার মধ্যে গান্ধীজী বা সুভাষবাবু কাহারও কোন কৃতিত্ব ছিল না। যেখানে জড়-সাধনা অর্থাৎ বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া এবং অজড়ের সাধনা বা ভিতর হইতে বাহিরে আসা (ascent ও descent) যুগপৎ মিলিবে, বিজ্ঞান ও আত্মবিদ্যা যুগপৎ মিলিবে, তাহাই আমরা মানি। শ্রীকৃষ্ণের শুধু আত্মিক শক্তিতে কংস-বধ হয় নাই, বাহিরের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। দেহ-হীনের আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। যুগান্তরে ঐরূপ প্রবন্ধ বাহির হইতে পারে—এ দেশের মানুষ ইহা পড়ে আশ্চর্য!…

১৬ই আগস্ট

ঠাকুর, আমার সকল স্তরের সকল ক্ষেত্রের বিঘ্ন তুমি। এই মহা বিঘ্নের মাঝে আমি আমাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমার সকল ব্যাপিয়া তুমিই রহিয়াছ। প্রলয় পয়োধি জলে নিমগ্ন এই পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের বুকে বেদ ও দিব্য জীবন লইয়া অবতীর্ণ। তুমি সহজ-জীবন মূর্তিমান। সকল সংস্কার-মুক্ত তুমি—তাই তুমি অবধূত। আমাকে 'সহজ' বনিয়া দেও, সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত করিয়া দেও, সর্বসংস্কারবর্জিত করিয়া দেও। আমি নিরঞ্জন হইয়া তোমার সঙ্গে পরম সাম্য লাভ করিব। তুমি আমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধে আবদ্ধ ও আমার সর্ব ক্ষেত্রের বন্ধু তুমি। তোমার মাঝে হারাইয়া আমি সত্য, আমার মাঝে হারাইয়া, বিশ্বের মাঝে হারাইয়া তুমি সত্য। দুইয়ের মাঝে জীব ও ঈশ্বর দুই-ই তুলাভাবে সত্য।… যে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটিয়া জন্ম উৎসব করিয়াছি, তাহা ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া হইয়াছিল বলিয়াই সার্থক হইয়াছিল। ইহারা যেরূপ শিথিল, এই উৎসাহে কি কর্ম হয়? অপরিচিত একটী মানুষকে…প্রভাবিত, চিন্তাশক্তি-হীন মানুষদের মধ্যে পরিচিত করা কি কঠিন কাজ, তাহা ইহারা কি বুঝিবেন? অথচ নির্ভরতা নাই। সকলেই সব পারেন।…

১৭ই আগস্ট

শ্রীনিত্যগোপাল, আমি তোমার মাঝে তেমনি ভাবে তোমাময় হইব যেমন 'পয়োঃ তন্ময়ো ভবেৎ'—পয় যেমন কোন বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তন্ময় হয়। আমার দেহপ্রাণমনবুদ্ধি তোমাময় হউক—এই বর। আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিব, আত্মহারা হইয়া আত্মবান হইব, ব্রহ্ম হইব। ব্রহ্ম হওয়া ছাড়া আমার হওয়ার আর কি সার্থকতা আছে? তোমাকে পাইতে গেলে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, তোমাকে পরিজ্ঞির করিয়া আমার আয়ত্তের মধ্যে আনা যাইতে পারে—তাহাও আংশিক। তোমাকে সত্যিকার পাওয়া অর্থই তুমি হইয়া যাওয়া। তুমি হইয়া গিয়াই তোমাকে পাইতে হইবে। পাওয়ার আর পথ নাই। কোনও প্রয়োজনের সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে নাই। তোমার সম্বন্ধ নিজের গৌরবেই গৌরবান্বিত। তোমার জন্যই তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ। আমার সারা জীবনে তোমার জয় হউক। সারাদিনই আজ বুকটার মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব, বুকের মধ্যে যেন একটা কি বাধ বাধ ভাব। Specific no. 1 কয়েকবার খাই। রেণু পৌনে দুইটায় বাহির হইয়া…৪টার মধ্যে ফেরে। শনিবারের সভার খবর প্রেসগুলিতে দেওয়া হয়। মঠে ৬টার পর যাই। মঠে আলোচনা হয়—আমার জীবনে ভগবানের যা ইচ্ছা,

তাহাই আমার আত্মা। সেই আত্মাকে জানিবার কথাই শাস্ত্র বলেন। What part am I to play? 'পাওয়ায়' কোন অর্থ হয় না, পাইয়াই তো মানুষ আছে। তবু শরণাগত হওয়ার মধ্যেই 'পাওয়ার' অর্থ নিহিত—রবীন্দ্রনাথের মাকে স্বপ্নে দেখা ও মায়ের 'তুমি এসেছ' ইত্যাদি বাক্য,···। সকলের মতবাদ নিত্যগোপালের মতবাদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বুঝিতে হইবে।...রাত্রি ১১॥ টার পর বুকের ব্যথাটা যেন বাড়ে। নিত্যব্রত সুবোধ ডাক্তারকে নিয়া আসে। বুক পরীক্ষা করে, তেমন বেশী কিছু নয় বলিল।···

১৮ই আগস্ট

ঠাকুর, আমার জীবন নরদেবের দেবতা, আমি তোমার হাতের যন্ত্র। তোমার ইচ্ছা আমার জীবনে পূর্ণ হউক। তোমার ইচ্ছা-মূর্তি আমি হইব। তোমার প্রতিষ্ঠা তুমি নিজেই পত্তন করিয়া গিয়াছ—আমি তাহাকে ধারণ করিব, পুষ্ট করিব, বিস্তার করিব—ছড়াইয়া দিব—এই সুযোগ ও অধিকার আমাকে দাও। তোমার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা না হইলে যে বর্তমান বিশ্ব অপ্রতিষ্ঠ অবস্থায় থাকিবে। 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা'—তোমাকে পুচ্ছরূপে পাইয়া এই জগৎ স্বাভাবিকভাবে বিচরণ করিবে, তোমার প্রতিষ্ঠাতেই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। সকল প্রতিষ্ঠা আজ হাওয়ায় বিলীন। প্রতিষ্ঠা-মূর্তি ঠাকুর আমার, তোমার প্রতিষ্ঠা আমি জীবন মন দিয়া গড়িয়া তুলিব—ইহাতেই আমার সার্থকতা। সকালে আজ আর প্রার্থনায় যোগ দিতে পারি নাই। উহারাই করিয়াছে। সচ্চিৎবাবু হাওলাতী ৫ টাকা ফেরত দিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের জন্য ভদ্রলোক একদিন অনেক কিছু করিয়াছেন। আজ এত থাকিতেও মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্য খুব কষ্ট পাইতেছেন। এত বড় বাড়ী বাঁধা দিয়া ২০ হাজার টাকা আনিয়াছেন। অথচ এই বাড়ীর ভিত্তি পত্তন একদিন আমিই করিয়াছিলাম।···৭॥ টার পর তারিণীবাবু ও সুশীলা আসে। পানিহাটীতে রাধারাণীকে আর থাকিতে দেওয়া চলে না। কিন্তু ওখানে একটা কিছু প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন না করিয়া তাহাকে বিদায় দিলে সে বাহিরে বল করিতে পারে। কেহ একজন উপযুক্ত লোক ওখানে থাকিলে, পরে সুশীলা ও রাধারাণী দুইজনকেই বিদায় দিলে এবং দুইজন চলিয়া যাওয়ায় কিছুদিন পরে সুশীলা গেলে বাহিরের কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না। দুই জনের ঝগড়া কেহ চাহে না। তাহারা চাহে ওখানে 'কাজ হউক'। প্রায় ৯টায় উহারা যায়।...

১৯শে আগস্ট

ঠাকুর, মানুষের সঙ্গে, বর্তমান সমাজের সঙ্গে, বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে যে সম্বন্ধ আমার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তুমি। ছাড়া আমার এক পা অগ্রসর হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যে আদর্শ, যে বিধান আমাকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা তো বর্তমানে গড়িয়া তোলা যাইতেছে না, অথচ উহাদের মধ্যেই আছি। কাজেই আমি একেবারে একা হইয়া রহিয়াছি। ইহাদের সঙ্গে আমার চিন্তাগত পথচলাগত কোন সাদৃশ্য নাই। অথচ আমি আছি এই সংসারেই। আমার অবস্থা রাধারাণীর অবস্থা। আছেন রাজার সংসারে, অথচ মেলেনা কাহারও সঙ্গে। ঠাকুর, তুমি ছাড়া গতি নাই। একটা closed circle-এর মধ্যে আছি। তোমাকে বুকে লইয়াই গুটিপোকার মত পথ কাটিয়া বাহির হইব।···৮টার পর ক্ষিতীশ আসে।...ক্ষিতীশকে কিছু পুরাতন উদ্বোধন যাহার মধ্যে 'তারা-গড়া' ও 'সমন্বয়ের পথ পর্যায়' আছে, তাহা দিয়া দেওয়া হয়।···নীলু 'নিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' ও কপি হিসাব বাবদ ৫ টাকা M. O. যোগে পাঠাইয়াছে। ৭॥ টার পর মি, দে, পাল আসেন। অনেক কথা হয়... ব্রজলীলার তাৎপর্য, মদন-জ্বালায় জর্জরিত বিশ্বের সামনে divine মদনের জন্য এক বিস্ময়কর ব্যাপার। যাহার দিব্য জন্ম কর্মের তত্ত্ব জানিলে দেহ-ত্যাগও হয় না, তাহার দেহ যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তিনি যে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, অধিমানসেরই তবু নয়, ইহা কি শ্রীঅরবিন্দ মানিতেন? প্রকৃতির ষড়্‌বিকার পরিশাক করিয়াই তিনি ব্রহ্ম। যে দেহ পরিণাম-প্রাপ্ত না হইয়া নিত্য, সে দেহ কি অদ্বৈতবাদীর দেহ? তাহা তো idealist-দের ভাবদেহ। ইহাতে কি অন্নের যথামূল্য রক্ষিত হয়?

শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে অতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনিত্যগোপাল যে একই তাহা বি, কে, পালকে বলি। সাড়ে ৩ শত বছর পূর্বে যিনি, তিনিই ৪৫০ বছর পরে শ্রীনিত্যগোপাল। 'মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী'—প্রভৃতিও বলি। বর্তমানে নর-নারীর অবাধ মিলনের মধ্যে ব্রহ্মচর্য কে শিখাইবে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া? যুবতী-পরিবৃত ব্রজ-গোপাল কে কৃষ্ণ ছাড়া? ১টার পর তিনি যান। আজ specific ২৪ ও ১০ নং খাই। বি, কে, পাল ৪ টাকা দিয়া যান।

২০শে আগস্ট

জন্মাষ্টমী

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং। তুমি অযাচিত করুণায় আমাকে আকর্ষণ করিয়াছ, একটা বিপ্লবের মাঝে টানিয়া আনিয়াছ। জাতি-ছাড়া, কুল-ছাড়া, শীল-ছাড়া করিয়াছ, আধি-ছাড়া করিয়াছ, আমার বাহিরে বিশ্বের বাহিরে টানিয়া আনিয়াছ। এই ঝড়-বাদলের মধ্যে, বজ্র-নির্ঘোষের মধ্যে সবাই যখন মোহনিদ্রায় নিদ্রিত, আমি মধুরার বুক চিরিয়া একা চলিয়াছি। কেউ বুঝি আমার সঙ্গে নাই। কোথায় রাখিব তোমায়? কৃষ্ণ-নিত্যগোপাল, আমার সকল স্নেহ, সকল মমতা, সকল আদর, সকল সোহাগ দিয়া তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিব। আমার ভিখারীর রাজা, রাজ-রাজেশ্বর, আমার চোখের জল তোমার পাদ্য, হৃদয়ের ব্যথা নৈবেদ্য। আমার ভিতরে তোমার জন্ম সার্থক হউক। জন্ম ৮টার মধ্যে আসে। হরিদাসী ২৲টাকা দেয়। বীরেন ডাক্তার আসে ১০টার পর। তাহার নিকট শ্রীনিত্যগোপাল কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করিলেন, তাহার পর রাধা আসিলেন, বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণ এক হইলেন, প্রথম-বার বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বের ও বৃন্দাবনের ঘটনা, বর্ষণের ঘটনা, নিকুঞ্জ বনে পান-প্রসাদ ও বর্ষানে মালা-প্রসাদ পাইবার, চোখ মুদিলেই সুরসুর করিয়া তত্ত্ব-বৃষ্টি হওয়ার কথা, গৌর-নিতাই-এর দর্শন-দানের পর বাদলায় আসিবার কথা, বাদলায় চলিয়া আসা, মালা ও টিকি কাটিয়া ফেলার কথা প্রভৃতি বলি। বীরেন এক সময় আমার সঙ্গে কাঁথি বর্ডমান, শিবাংশেখর, রাণীগঞ্জ গিয়াছিল, তাহা সে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি ৪টার পর জয়া-সহ মঠে যাই। তাহার পর প্রতিষ্ঠা নিত্য রেণু ও গোপা যায়। নিত্যানন্দানন্দ গান গায়, পরে একটী প্রবন্ধ পাঠ করে ঠাকুরের নিত্যানিত্য সমন্বয়ের কথা শেষের দিকে বলিয়াছে বটে কিন্তু 'তথাপি' দিয়া যাহা বলিয়াছে, তাহাতে ঠাকুরকে খণ্ডন করাই হইয়াছে, শঙ্কর-মতকে স্থাপন করা হইয়াছে। বীরানন্দ বলে, মামুলী। বৃষ্টি আরম্ভ হয়। মন্দিরের বারান্দায় সভা হইতেছিল। আরতি হয়। পরে আবার সভায় কাজ সুরু হয়। দাশরথিবাবু বলেন—যথা যথাহি···শ্লোক ব্যাখ্যা করেন তাহার পর আমি বলি। শ্রীকৃষ্ণ পোষণ-মূর্তি। পোষণই ধর্ম। বৃন্দাবনে আকাশ, দেবতা, মানুষ, পুরুষ, ক্লিং-এর কৌলীন্য চূর্ণীকৃত; মাটি, মানুষ, তরুলতা, নারী, মুং-এর মান প্রতিষ্ঠিত। যে-আবেষ্টনে 'রাসক্রীড়া' হইয়াছিল, সেই আবেষ্টন আজ উপস্থিত। 'যুবতীশতবৃত' ব্রজগোপাল শ্রীকৃষ্ণ-নিত্যগোপাল ছাড়া কে বর্তমানের ঘর-ছাড়া মেয়েদের পুরুষোত্তম-মন্ত্র দিবে? রাসলীলার সামাজিক দিক আজ বুঝিবার দিন আসিয়াছে। শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় (বঙ্কিমবাবুদের মত) চলিবে না 'ক্ষেত্রজ্ঞকাপি মাং বিদ্ধি'। আমি রিকসায় আসি উহারা খরচ দেয়। ক্ষিতীশের কথামত সকালে প্রার্থনার পর আজ হইতে আসন করি।

২১শে আগ

নিত্যগোপাল, পরম আশ্রয় আমার, আমার দেহপ্রা মন বুদ্ধি অহঙ্কারের তুমিই শরণ। আমার সব কি তুমি অঙ্গীকার কর, স্বীকার কর, তোমার করিয়া লও আমার দেহ তোমার হউক, প্রাণ মন তোমার হউক তোমার অনন্ত মন লইয়া আমি মনন করিব, আমা মন নির্বিকল্প হউক, সকল জল্পনা কল্পনা সকল খেয়া গলিয়া যাউক, তোমার প্রাণ লইয়া আমার যাবতী চিত্তবৃত্তি স্পন্দিত হউক, আমার দেহ তোমার দেহে

প্রণাম্বিত হউক। আমি তুমি বলিয়া যাই। তোমাকে কি ধরার ধূলিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না? বিশ্ব তাহা হইলে কি করিয়া সত্য শিব সুন্দরে গড়িয়া উঠিবে? আমার সব-কিছু সত্য হউক, শিব হউক, সুন্দর হউক। আমার মনন সত্য হউক, শিব হউক, সুন্দর হউক। ...আজ যে 'সংহতি' আসিয়াছে (আষাঢ়) তাহাতে বেণুর লেখা 'সমন্বয়-মূর্তি নিত্যগোপাল' ছবিসহ বাহির হইয়াছে। বেশ প্রবন্ধ হইয়াছে। মঠে তারিণীবাবু, ক্ষিতীশবাবু, সুধাংশু, নীলরতন ও রমাপতিবাবুকে প্রবন্ধটি পড়িয়া শুনানো হয়। সকল ক্ষেত্র স্পর্শ করিয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণের পর আর কে এমন আছেন? তাঁহাকে মানুষ নিবে না? হইতেই পারে না। বিশ্বকে তাঁহার তত্ত্বকে নিতেই হইবে। এই শতবার্ষিকী শুধু আরম্ভ মাত্র।...

২২শে আগষ্ট

ঠাকুর, সর্বধর্মসমন্বয়, সর্বদর্শনসমন্বয়-মূর্তি, তোমাকে আমি কি করিয়া এই বিশ্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিব? কলিকাতার পথ-ঘাট চিনিতাম, তোমার তত্ত্বও তোমার কৃপায় কিছু কিছু বুঝিয়াছি। বলিবার শক্তিও পাইয়াছিলাম। কিন্তু ধন ও জনের এত অভাব যে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ধন-জন-ঐশ্বর্য—ইহা থাকিলে short cut হয়—ইহা সত্য। তাই সহজ স্বাভাবিক organically তোমার প্রতিষ্ঠাই কি তোমার কাম্য? আমার জীবনে কি লাগ পাইব ঠাকুর? আর যে কেহ তোমার কথা কয় না? সকলেই যে যাহার ধান্দায় ব্যস্ত। তোমাকে লইয়া তো কেহ নাই। যাহা হয় করিও। দিন গেল। আয়ু গেল আমার।...কিছু পরেই অর্পণা (কালী সিংহ লেনের) তাহার খুড়শ্বশুরসহ এখান হইয়া মঠে গিয়া হাজির। আরতি দেখে। তাহার পর কিছু কথা হয় ঠাকুরের সম্বন্ধে—ঠাকুর কর্ম জ্ঞান ভক্তির সাগর—'কামরেহহং গতিম্' শ্লোকটী ব্যাখ্যা করি। কলিতে অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস। অবধূত তাই সংসারী ও সন্ন্যাসী দুইই হইবে। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সন্ন্যাসী হইবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা বিশ্বের 'আতি' নিবার জন্য যোগ্য, তাহারাই শুধু সন্ন্যাস নিবেন। নিত্যগোপাল এই অবধূত আশ্রমের কথা বলিয়াছেন। অপর্ণার গাড়ীতে চলিয়া আসি।...

২৩শে আগষ্ট

রাধারাণি, মানিনি আমার, মান পরিত্যাগ কর, কথা কও, আমার পানে তাকাও, ক্ষমা কর। স্বর-গরল আমাকে বিষাক্ত করিয়াছিল, তাই তোমার 'মান' পুরুষ-কৌলীন্য দমন করিয়া ছিল। তুমি তাই মানিনী হইয়াছ। আমার শিরে তোমার স্মরগরল-খণ্ডন ঐ পাদপল্লব প্রদান কর। আমার মস্তকে উহা শোভা পাউক। আমি আজ শরণাগত। কথা কও হাসি মুখে। আজ বিশ্বপ্রকৃতি বক্রা, অনুকূল হও, বাম্য পরিত্যাগ কর, প্রতিকূলতা পরিত্যাগ কর, বিশ্বরক্ষার অনুকূল হও। জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে। তোমার মান বাড়াইবার জন্য আমি তোমার নিকট মহানির্বাণ লাভ করিব, তোমাকেই প্রকাশ করিব। তোমার মহিমা ও দ্যুতি বিশ্বে ছড়াইয়া তুলিব। তুমিই থাকিবে, আমি তোমার মাঝে আত্মগোপন করিব। জয় রাধে জয় রাধে ধ্বনিতে বিশ্ব মুখরিত হইবে, প্রকৃতি আনন্দে অধীরা হইবে। ব্রহ্ম-বিলাসিনীর জয় জয়কার হইবে। সেবানন্দ আসে আমি কেমন আছি জানিতে। সুশীলা গত রাত্রির অন্নপূর্ণার প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছে। ৪৸টায় মঠে যাই। আজ সাধারণ সভা। ৫৷৷০ টার পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিষগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য ট্রাষ্টীবর্গকে অনুরোধ, চিদানন্দের পদত্যাগ-পত্র বিবেচনা করা হয়, উহা গৃহীত হয় না; তাহাকে ৩ মাস সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হইল মাত্র। কার্যকরী সমিতির সভ্যগণের মাসিক অনূন ১৲ টাকা সংগঠন বন্ধ কিসাবে অবশ্য দেয় বিবেচনা করা যাইতেছে। তাহাদিগকে উহা শীঘ্র দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। শ্যামসুন্দরানন্দের চিঠি পঠিত হয়। দাশরথি বাবু প্রতিবাদ করেন। ঠাকুরের মধ্যে সব দেবদেবীর সমন্বয় যখন ছিল, তখন তাহার মধ্যে দেবদেবীর অর্চনা করা সঙ্গত নয়। আমি বলি—এত বড় প্রকাণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তির সামনে ঠাকুরের মূর্তি pigmy-র মত, ৫ দিন

ব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিতাগোপালের শতবার্ষিকী উৎসব ডুবিয়া যাইবে। প্রথমে খগেনবাবু পক্ষে মত প্রকাশ করিলেও শেষে উহার বিরুদ্ধে মত দেন। কার্যকরী সমিতির উপর বিবেচনার ভার দেওয়া হয়। প্রায় ১টায় ফিরি। ধীরেন আমার ব্লাড প্রেসার দেখে, ব্লাড প্রেসার নাই, হার্টটা দুর্বল।

ঠাকুর, তুমি আমার দেহমনপ্রাণবিজ্ঞানআনন্দ ও আত্মার সকল ক্ষেত্র সকল স্তরকে স্পর্শ করিয়া আলিঙ্গন করিয়া আছ, রমণ করিতেছ। আমি তোমার রমণী, তুমি আমার সকল স্পন্দনের স্বামী। বিশ্বেরও তুমি সকল ক্ষেত্রকে অধিকার করিয়াছ—'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত'। সেই ৫ হাজার বৎসরের পূর্বের শ্রীকৃষ্ণ, আর তুমি সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। এমন করিয়া সকল হৃদয়ের রাজা আর কে আছে? প্রাণবল্লভ আমার, তুমি আমার সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী, সকল-আলিঙ্গনকারী, সর্বরমণকারী, আমি তোমার সঙ্গে এক হইয়া রহিব। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি।...রেণু ১১টার পর বাহির হয়—বাটা, নলিনী বোসের আফিস, মন্মথ বাবু, সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া ৫টার মধ্যে ফেরে। ৬টার পূর্বে মঠে যাই। সকালে 'নারীর নিজস্ব' প্রবন্ধটী একরূপ শেষ করি।...এক কপি 'সংহতি' মঠে রাখিয়া আসি 'সমন্বয়মূর্তি নিতাগোপাল' প্রবন্ধটী ওখানের লোকদের পড়িবার জন্য। ৮টার মধ্যে ফিরি।... পূজার পূর্বে কিছু কিছু লোকের সঙ্গে দেখা করিয়া পুস্তক দেওয়া ও আলাপ আলোচনা করা দরকার। কে করিবে? কেউ তো নাই। ঘরে বসিয়া ঝগড়াঝগড়ি করিবার লোক আছে অনেক। কি এক অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছি, ঠাকুর, তোমাকে লইয়া। কেহ তো আগাইয়া আসিল না তোমার রথ-রজ্জু ধরিয়া টানিবার জন্য? তোমার জগন্নাথের রথ চলিয়াছে। রোধ করিতে কেহ পারিবে না। আমি সকল বুক দিয়া টানিব।

২৪শে আগস্ট

ঠাকুর, সারা জীবন একরূপ তোমাকে লইয়াই কাটিল—আমি আর কি করিয়াছি তোমা ছাড়া? ছুলে যখন পড়াইয়াছি, তখন ছেলেদের কাছে 'নিতাগোপাল লাইফ ইনস্যুরেন্স' করিয়াছিলাম—এক এক মাসে এক একটী সৎ গুণ অভ্যাস করাই ছিল এই ইনসিওরেন্স কোম্পানীর প্রিমিয়াম। ছেলেরা কত আগ্রহ করিয়া শুনিত। তোমার নামও তাহাদের কাছে করিতাম। আজ তোমার কথা তোমার জনদের কাছে বলিয়াও নাজেহাল হইতেছি। তারিণীবাবু স্বীকার করেন যে, ব্রহ্ম-মায়া সমন্বয়ের কথা তোমার পুস্তকে থাকিলেও উহা এতদিন পুস্তকেই ছিল। আমি উহা সকলের সামনে উপস্থিত করিয়াছি। তোমার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হউক, আর তো আমার কোনও অভিসন্ধি নাই। তোমাকে যে বিশ্ব (?) রূপ পাইয়াছি, সেই রূপ সকলে পাউক, ইহাই তো আমি চাই। বিশ্ব তাহা হইলে জুড়াইত। প্রার্থনার পর ব্যায়াম করি। শ্রীসুদর্শন পত্রিকায় আমার 'শ্রীনিত্য-গোপাল' ও রেণুর 'সর্ববাদবিবাদপ্রতিরোধশীল' ছাপা হইয়া আজ তাকে আসিয়াছে। মঠেও দেখাইয়া আসি।... তুলালী একখানি 'সমন্বয়-মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল' চাহিয়াছিল, আমার নাম লিখিয়া তাহাকে দেই।...রেণু ১১টার পর বাহির হইয়া কুমারেশে যায়...৫ টায় ফেরে। আমি ও সে ট্রামে যাই—আমি মঠে যাই, সে প্রেমে যায়।... শিশিরের (হরিসাধনানন্দের শিষ্য) সঙ্গে অনেক কথা হয়। শরণাগত হওয়াই যে পাওয়া, তাহা বলি। নদী-সাগরের যোগ স্বাভাবিক, বাঁধ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। বাঁধ ভাঙিয়া দিলেই সাগরের জল নদীতে ঢুকিয়া নদীর জলকে বিশুদ্ধ করে। বাঁধ বজায় রাখিয়া হাজার বছর সাধনা করিলে কি হইবে? নীলরতনবাবু 'তন্ময়তা' সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। বহু প্রকারের তন্ময়তাই পরাভক্তির মধ্যে সমন্বিত হয়—লৌহপিণ্ড ও অগ্নি, মণী ও জল প্রভৃতি তন্ময়তার দৃষ্টান্ত।...প্রফুল্ল গত শনিবারের জন্মাষ্টমীর বক্তৃতা ইংরাজীতে লিখিয়া আনিয়াছিল। বিশেষ হয় নাই। রেণুকে একটা লিখিতে বলি।

২৬শে আগস্ট

ঠাকুর, পরম প্রেমাত্মিকা পরাভক্তি যোগে শর যেমন লক্ষ্য বস্তুর মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া 'তন্ময়' হয়, 'পরবৎ

তন্ময়ো ভবেৎ' আমি তদ্রূপ তন্ময় হইব। কালী যেমন জলের মধ্যে, দৌহশিও যেমন অগ্নির সঙ্গে, নির্বাপিত আত্মা যেমন বায়ুমণ্ডলের মাঝে—এই সর্বপ্রকার তন্ময়তা আমার হউক। সর্বতোভাবে আমি তোমার হইব। তোমার আমার সম্বন্ধে তন্ময়তা প্রতিষ্ঠিত হউক। একান্ত বিচ্ছেদ বা একান্ত অবিচ্ছেদ—কোনও একটাই আমি চাই না। তোমার আমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অবিচ্ছেদময়ী পরা ভক্তি সম্বন্ধ স্থাপিত হউক। একান্ত বিচ্ছেদও মানসিক, একান্ত অবিচ্ছেদও মানসিক। বিচ্ছেদ অবিচ্ছেদের সমন্বয়ে যে তন্ময়তা তাহাই আমার হউক। রেণু ৮।টায় ভাতেভাত খাইয়া বাহির হয়, ফেরে ৩।টার পর—সুহৃৎবাবু, সাধনা ঔষধালয়, সুলেখা, এন, সি, গুহ, আশুবাবু, ঢাকেশ্বরী প্রভৃতি জায়গায় যায়। তারিণীবাবু আসেন ৩।টার পর। রমাপ্রসাদবাবু ও নরেশ মুখার্জীর ওখানে যাইবার কথা হয়। ইহাদের কাহারো সামনের দিক খুব স্পষ্ট নয়। ঠাকুরের প্রতি একটী অনুরাগ আছে এই মাত্র। ৮টায় হি, কে, পাল আসিবেন, তাই আজ মঠে যাই না। ৮টায় আসেন। ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান ও পুরুষোত্তমের বিশেষত্ব কি কি, অংশের পূর্ণত্ব, দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে বায়োলজির সমন্বয়ে যে organic philosophy-র সৃষ্টি হইয়াছে, কার্য কারণ সম্বন্ধ যে একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে, ব্রহ্ম হইতে বিকাশশীল জগৎসৃষ্টি যে organically সম্ভব, কোনও অচিন্ত্যশক্তির আমদানী (বাহির হইতে) করিবার প্রয়োজন নাই, নিস্ত্রৈগুণ্য কি, 'প্রকাশক প্রবৃত্তিক' শ্লোকটীর ব্যাখ্যা, শিবের সতী-বিরহে উন্মত্ততা যে divine, মাত্রা-জ্ঞানই যে নিস্ত্রৈগুণ্যের লক্ষণ—এই সকল আলোচিত হয়। আজও ১ টাকা রাখিয়া যান। কেন উপনিষদের ভূমিকা পড়িবার জন্য দেওয়া হয়।...

২৭শে আগস্ট

নিত্যগোপাল, শ্রীগৌরসুন্দর যে ব্রজভাবকে ধরার ধূলিতে ছড়াইয়া দিবার জন্য সারাজীবন ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছেন, তুমি সেই ব্রজভাবকে দার্শনিকতার দিক হইতে ও বর্তমান যুগের উপযোগীভাবে অধিকতর বিস্তৃতি ও গভীরতার মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া পথ করিয়া গিয়াছ। আজ ব্রজভাবে বিশ্ব ভাবিত হইবে—ইহা নিবৃত্তির আগুনে পরিপাক পাওয়া প্রবৃত্তির ঘনীভূত প্রকাশ ছাড়া আর কি? আমি তোমাকে ধারণ করিব, বহিয়া বেড়াইব—এই অধিকার আমাকে দেও। গৌরকে যেমন গদাধর ধারণ করিয়া ছিলেন, আমি তোমাকে তেমনি ধারণ করিব। তোমার জয় হউক।...১০।টায় রেণু লীলাময়বাবু প্রভৃতির ওখানে যায়, ফেরে ৩টার পর।... মঠে বর্তমান ধর্মসঙ্কটে ও ঠাকুরের সর্বসমন্বয়-তত্ত্বময় জীবনই যে ইহার একমাত্র সমাধান, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। ভগবানের শ্রীচরণকে ভবসমুদ্র-পারের 'তরী' বলা যে মায়াবাদ, তাহাতে যে তাঁহার শ্রীচরণের অহৈতুক স্বয়ংমূল্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাহা আলোচনা করি। ৮৷০টার পর ফিরি। দেখি নলিনী ঘোষ ভাকব্যাঙ্কের একটী পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন লইয়া আসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন।...ইহার পর ডাঃ জে সি মুখার্জী আসেন রেণুর কাছে, তাঁহার কি অনুষ্ঠান হইবে তাহাতে যোগ-দানের নিমন্ত্রণ করিতে। ৯৷০টায় যমুনা আসে।...

২৮শে আগস্ট

নিত্যগোপাল, সারা বিশ্ব যখন অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেছে, সমস্ত সাধন-পন্থা তখন মুছিয়া গিয়াছে, 'কঃ পন্থা'—কি পথ, কোথায় পথ, কোথায় ধর্ম-মীমাংসা, ধর্ম-সমন্বয় যখন আজ ধার্মিক সমাজ বিব্রত তখন তুমি আসিলে ধর্মের প্রতিষ্ঠা-রূপ, মূর্তিমান ধর্মরূপ। তোমার জীবনে বিশ্ব পথের খোঁজ পাইবে, পথ চলিবার কৌশল শিখিবে, বিশ্বধর্ম গড়িয়া তুলিবে। আমি তোমাকে লইয়া বড় বিপদে পড়িলাম। তোমার যেখানে যৈশিষ্ট্য সেখানের সঙ্গী যে আমার কেহ নাই। তুমিই আমার সখা সাথী শরণ, সুহৃৎ, স্বামী। কেউ সাথী না থাকে, তোমাকে বুকে লইয়াই চলিব।...ভবনাথ দেবশর্মা (পণ্ডিতিয়া রোড) আসেন। বারীন ঘোষ তাঁহাকে আমার কথা বলিয়াছেন, আমাদের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়।...রেণু ডাঃ মুখার্জীর নিমন্ত্রণে folk dance দেখিতে যায়।...ঠিক ৬টায় ধীরেনবাবুর 'বিদুর-চরিত' আলোচনা আরম্ভ হয়, ৭টায় শেষ হয়। লোক মন্দ হয় নাই।...আজ ধীরেনবাবু 'ওমমেতৎ প্রবৃহৎ মে' শ্লোকটী বলেন। ঐ শ্লোক সঞ্জয় যখন দৌত্যকার্যে উপপ্লব নগরে যান, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দেন।

২৯শে আগস্ট

ক্রমশঃ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিতাগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি-)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় ভক্তই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচারসকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত দিক রক্ষণে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। আদৃত-গীতাতন্ত্রসারে ভগবান ব্যাসদেব-নির্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং শ্রুতীনাং বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অদ্বৈত-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত

একপক্ষাশৎ সিদ্ধান্ত

প্রাচীন কত শাস্ত্রেই কত মুনি, মহামুনিগণের উপাখ্যান ও উপদেশসকল পাঠ করা হইয়াছে। তাঁহাদের চরিত্র সকল আলোচনা করিয়া তাঁহারা যে সগুণ সক্রিয় তাহাই বোঝা গিয়াছে। যদি বল, তাঁহারা কখন কখন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইতেন, তাহা স্বীকার করিলেও তাঁহাদের কাহাকে ও আত্মা-ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলিতে পার না। কারণ বেদান্তানুসারে আত্ম-ব্রহ্ম নিত্য-নির্বিকার এবং নিত্য-নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বুঝিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহাদের চরিত্র সম্বলিত উপাখ্যানসকল পাঠে, তাঁহাদের কাহাকেও নিত্য-নির্বিকার, নিত্য-নির্গুণ এবং নিত্য-নিষ্ক্রিয় বলা যাইতে পারে না। পূর্বোক্ত একপক্ষাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্মৈর্নিলিপ্তো যোগবন্মুনিঃ।
সর্ববিন্মুচবদ্বিচেষ্টসক্তো বায়ুষচ্চরেৎ ॥"

অজ্ঞান-যোগ স্বভাবত সগুণ-সক্রিয় নহে। তাহা স্বভাবত নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়। সুতরাং স্বভাবতই তাহা কোন উপাধিতে লিপ্ত নহে। কিন্তু সজ্ঞান-সগুণ-সক্রিয় মুনি উপাধিস্থ হইয়া বা উপাধিতে লিপ্ত হইয়াও সেই উপাধি-ধর্মে কি প্রকারে নির্লিপ্ত রহেন? উক্ত শ্লোকের শেষ চরণানুসারে, সেই মুনি সর্ববিৎ হইয়াও মূঢ়বৎ থাকেন বলিলে, তিনি সর্ববিৎ এবং মূঢ় উভয়ই, ইহা বুঝিতে হয় না। যেমন কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের বেশের মতন বেশ করিলে তাহাকে স্ত্রীলোক বলা যায় না, তদ্রূপ কোন সর্ববিৎ মুনি নিজ ইচ্ছানুসারে মূঢ় বা অজ্ঞের ন্যায় থাকিলে তাঁহাকে তখনই মূঢ় বা অজ্ঞ বলা যাইতে পারে না। ঐরূপ থাকিলেও তাঁহাকে সর্ববিৎ বলিতে হয়। যে হেতু সর্ববিৎ এবং অসর্ববিৎ, এক ব্যক্তিকেই বলা যায় না। সর্ববিৎ যিনি, তিনি কেবল সর্ববিৎ—তিনি তখন অসর্ববিৎ নহেন; অসর্ববিৎ যিনি, তিনি কেবল অসর্ববিৎ,—তখন তাঁহাকে সর্ববিৎ বলা যায় না। উক্ত উদাহরণানুসারে একজন মুনিকে, সর্ববিৎ এবং অসর্ববিৎ বলা যায় না। সর্ববিৎমুনিকে কেবল সর্ববিৎ বলিতে হয় একজন মুনি এক সঙ্গে সর্ববিৎ এবং অসর্ববিৎ উভয়ই হইতে পারেন না। উপাধিস্থ সর্ববিৎ-মুনি যিনি তাঁহাকে সোমবৎ নির্লিপ্ত বলা যায় না। তাঁহাকে লিপ্তই বলিতে হয়। সেই কারণে তাঁহাকে সগুণ সক্রিয় বলিতে হয়। সগুণ-সক্রিয় সম্পূর্ণ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় না হইলে নির্লিপ্ত হইতে পারেন না। যে মুনি বায়ুবৎ বিচরণ করেন, তাঁহাকে সর্ব-বিষয়ে আসক্তি-শূন্যও বলা যায় না। কারণ বায়ুকে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের সঙ্গে লিপ্ত হইতে হয়। প্রত্যক্ষ দর্শন করা হইয়াছে, পুষ্পোদ্যান দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে যে বায়ুতে সুগন্ধ লিপ্ত হয়, সেই বায়ু বিষ্ঠা-রাশির উপর

দিয়া প্রবাহিত হইলে তাহাতেই দুর্গন্ধ লিপ্ত হয়। অতএব ঐ প্রকার বায়ুর সঙ্গে যে মুনির তুলনা হইয়াছে, সে মুনিকে সম্পূর্ণ আসক্তি-বিহীন কি প্রকারে বলা যাইবে? তাঁহাকে কি প্রকারেই বা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় এবং নির্লিপ্ত বলা যাইবে?

ঐ-শঙ্করোক্ত-সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থে ব্রহ্মের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, সে সকলের কতকগুলি শ্লোক নিম্নে বলা হইতেছে;—

"যন্নাতোন্নাপরো লাভো যৎ সুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্ জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।৩৩
যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং ভবেৎ পশ্চান্ন পুনর্ভবঃ।
যল্লব্ধ্বা নাপরং লভ্যং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।৪৪
ত্রির্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।।৪৫
অতর্ক্যাবৃত্তিরূপেন বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ম্।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।৪৬
অনবদ্যমরূপাদ্যমনাখ্যমজমব্যয়ম্।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।।৭৩
যদ্ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাস্যৈরেতৈস্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।।৬০

উক্ত সকল শ্লোকানুসারে পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম কি, এবং সেই ব্রহ্মের লক্ষণ সকল কি, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বোঝা যাইতে পারে। উপরোক্ত শ্লোকের মধ্যে কোনটিতেই শঙ্করাচার্য্য নিজেই ব্রহ্ম বলেন নাই। ঐ সকল শ্লোকানুসারে তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু বুঝিতে হয়। সুতরাং ঐ সকল শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদ ছিল বুঝিতে হয়। ঐ সকল শ্লোকের অনেক স্থলেই শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মে দৃঢ় বিশ্বাস, বিশেষ অনুরাগ, বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশেষ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে 'যন্নাতোন্নাপরোলাভো', কি না যাঁহাকে লাভ করিলে অপর লাভের বাসনা থাকেনা। একথা প্রকৃত কৃষ্ণানুরাগীরই কথা। সেই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলে যথার্থই অন্য সকল লাভকে তুচ্ছ ও অতি হেয় বোধ হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে "যৎ সুখান্নাপরং সুখম্," কি না যে সুখ অপেক্ষা অন্য সুখ শ্রেষ্ঠ নহে। বাস্তবিক যথার্থ কৃষ্ণ-প্রেমিকের পক্ষে সেই পরমব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণই সুখ। কৃষ্ণ-সুখাপেক্ষা সেই কৃষ্ণ-প্রেমিকের অন্য সুখকে যথার্থই হেয় বোধ হয়। তাঁহার যথার্থ অন্য সুখকে নিকৃষ্টই বোধ হয়। সুখ অর্থে, আনন্দ। অদ্বৈতমতের অনেক গ্রন্থেই ব্রহ্মকে আনন্দ বলা হইয়াছে। গৌরাণিক মতে শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। সেইজন্য সেই কৃষ্ণ-ব্রহ্মই আনন্দ। কোন কোন পুরাণে ও কোন কোন তন্ত্রে, শিবকে সদানন্দ বলা হইয়াছে, সেইজন্য শিবও আনন্দ। মাণ্ডুক্যোপনিষদের মতে, সেই শিবই ব্রহ্ম। সুতরাং সেই শিবই কৃষ্ণ-ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের মতে, 'যজ্ জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং' অর্থাৎ যে জ্ঞান অপেক্ষা অন্য জ্ঞানই নহে। প্রকৃত কৃষ্ণ-প্রেমিকের পক্ষে, যে জ্ঞানদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়, সেই জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। কত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলায়, সেই শ্রীকৃষ্ণই চিৎ বা জ্ঞান স্বীকার করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং', অর্থাৎ যাঁহাকে দর্শন করিয়া অন্য কোন পদার্থকেই দর্শনযোগ্য বোধ হয় না। পুরাণ-মতে যাঁহারা কৃষ্ণ-হরিকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর অন্য কোন ব্যক্তিকে, তাঁহারা আর অন্য কোন পদার্থই দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণে নির্হেতু প্রগাঢ় প্রেম হইলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া অপর আর কিছুকেই দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত নানা পুরাণে আছে। শঙ্করাচার্য্য 'যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং,' বলায় বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম দর্শন করা যায়। ঐ কথায় বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম আকার। ঐ কথানুসারে ব্রহ্ম আকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আকারই দর্শন করা যায়। ঐ কথানুসারে ব্রহ্ম সাকার না বলিবার কারণ,—সাকারই নিরাকার; এবং তাহা দর্শন করা যায় না বলিয়া, সাকারের অস্তিত্ব, কেবল অনুভূতির দ্বারা অবধারিত হয়। উক্ত প্রমাণানুসারেই আকার শালগ্রামকে ব্রহ্ম-শিলা বলা যাইতে পারে। উক্ত প্রমাণানুসারেই আকার-জগন্নাথকে দারু-ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। উক্ত

প্রমাণানুসারেই গঙ্গাকারকে ব্রহ্ম-বারি বলা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'যজ্ঞাত্বা ন পুনর্ভবঃ,' অর্থাৎ যাহা হইয়া পুনরায় অন্য কিছু হইতে হয় না। উক্ত শ্লোকাংশে 'যৎ' শব্দ ব্রহ্ম শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম হইলে অন্য কিছু হইতে হয় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে দেখিতেছি, অব্রহ্মও ব্রহ্ম হইতে পারেন। প্রকৃত কথায়, মহর্ষি-ব্রহ্মবিৎ-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, অষ্টাবক্র, পরমহংস-গোবিন্দ-ভগবৎ, শঙ্করাচার্য্য ও প্রসিদ্ধ পঞ্চদশী নামক গ্রন্থ রচয়িতার মতে, অব্রহ্মই অনাত্মা। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে অব্রহ্ম-অনাত্মাও আত্মা-ব্রহ্ম হইতে পারেন। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে অব্রহ্ম-জীব ব্রহ্ম হয়, বলা যায় না; কারণ তাঁহার মতে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' সেই জন্য তাঁহারই মতে, জীবকে আর ব্রহ্ম হইতে হয় না। তাঁহার ব্রহ্মনামাবলী-মালা গ্রন্থে, তিনি যে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'যজ্ জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং,' অর্থাৎ যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে অন্য কিছুকেই জানিবার যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না; অথবা যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে অন্য কিছু জানিবার আর অবিশিষ্ট থাকে না, কারণ জ্ঞেয় ত সেই একমাত্র ব্রহ্মই। শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম যে কি,—ইহা যে ভক্ত, ইহা যে কৃষ্ণ-প্রেমিক বুঝিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জ্ঞেয় বা জানিবার যোগ্য আর অন্য কি হইতে পারে? তাঁহার আর অন্য কিছু জানিবার আশাই থাকে না, তাঁহার আর অন্য কিছু জানিবার প্রয়োজনই থাকে না। শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রি-পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে ব্রহ্মই জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে সেই ব্রহ্মই জ্ঞেয়। অথচ শঙ্করাচার্য্যের উক্ত গ্রন্থেরই চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে' তাহা হইলে সেই পরাত্মা বা পরমাত্মা-ব্রহ্মকে আত্মবোধের ত্রি-পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে জ্ঞান ও চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে জ্ঞেয় কি প্রকারেই বা বলা যায়? শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে, সেই শ্রুতি, বেদান্ত, স্মৃতি ও পুরাণ-সম্মত নির্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, শুদ্ধ, অপরিবর্ত্তনীয় ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যদি কখন জ্ঞান এবং কখন বা জ্ঞেয় বলিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরাণানুসারে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বলিবারই বা কি আপত্তি হইতে পারে? তাহা হইলে মহাভাগবতানুসারে, সেই ব্রহ্মকে মহাকালী বলা সম্বন্ধেই বা কি আপত্তি হইতে পারে? তাহা হইলে সেই ব্রহ্মকে স্কন্দ-পুরাণ, শিব-পুরাণ, লিঙ্গ-পুরাণ ও সৌর পুরাণ প্রভৃতি অনুসারে শিব বলিলেই বা কি দোষ হইতে পারে?—কি আপত্তি হইতে পারে? যিনি জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, এই দ্বি-প্রকার ভেদ হইতে পারেন, তিনি ঐ দুইও হইতে পারেন। আবার বহু হইতে পারেনই বা স্বীকার করা যাইবে না কেন? তাঁহাকে জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বলিলে, যদি তাঁহার অদ্বৈততার হানি না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে রাম, কৃষ্ণ, মহাকালী, শিব প্রভৃতি বলিলেই বা তাঁহার অদ্বৈততার হানি বা বাধা হইবে কেন? একই বীজ বৃক্ষ হইলে, সেই একেই কি বহু প্রকাশিত হয় না? ঐ প্রকারে সেই একই ব্রহ্ম বহু-রূপে পরিণত হইলেই বা ক্ষতি কি? কারণ শ্রুতিতেই আছে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। পঞ্চ-পঞ্চাশৎ শ্লোকীয় 'তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্' স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম যে সান্ত বা অন্ত-বিশিষ্ট, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ উক্ত শ্লোকাংশে তাঁহাকে বা ব্রহ্মকে ঊর্দ্ধভাগে, অধোভাগে এবং চতুর্দ্দিকে পূর্ণ বলা হইয়াছে। সেই জন্যই ত তাঁহাকে সান্ত বা অন্ত-বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে—বলা হইতেছে। কারণ—প্রাকৃত ঊর্দ্ধভাগের, অধোভাগের এবং চতুর্দ্দিকের অন্ত আছে। তজ্জন্য সেই ব্রহ্ম ঐ তিনে পরিপূর্ণ বলা হইয়াছে বলিয়া, তিনি যে অনন্ত নহেন, ইহাও প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। তবে পুরাণানুযায়ী সেই ব্রহ্ম কোন পরিমিত দেহ-বিশিষ্ট হইলেই বা শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীগণের কি আপত্তি হইতে পারে? সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর-ব্রহ্ম যিনি, তাঁহার পক্ষে কি অসম্ভব? তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারেন। সামান্য জীব তাঁহাকে কোন কথা বলিয়া বাড়াইতেও পারে না, সামান্য জীব তাঁহাকে কোন কথা বলিয়া কমাইতেও পারে না। জীবের প্রতি কৃপাবশত তিনি কত কি করিয়া থাকেন।

জীবের প্রতি কৃপা-বশত তিনি কত কি হইয়া থাকেন। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের প্রথম ভাগে বেদান্তসারে, বেদান্তের অদ্বৈততা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং পূর্বোক্ত ষট্‌পঞ্চাশৎ শ্লোকীয় 'অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেন বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ম্' বলিলেই বা কি হইতে পারে? আমি আর 'আমি'র আনন্দ, কখনই অভেদ বলা যাইতে পারে না। তদ্রূপ ব্রহ্ম আর ব্রহ্মের আনন্দ, কখনই অভেদ বলা যায় না। সেই কারণে অখণ্ডানন্দ— ব্রহ্মকে না বলিয়া ব্রহ্মেরই অখণ্ডানন্দ বলা উচিত। অখণ্ডানন্দার্থে, অখণ্ডানন্দবিশিষ্টও বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ব্রহ্মকে অখণ্ডানন্দ বলিলেও বলিতে পারা যায়। ষট্‌পঞ্চাশৎ শ্লোকের 'একম্' শব্দকেও নিত্য বলিতে পার না। কারণ 'একম্' শব্দও সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত ভাষাতেও বহুতা আছে। সেইজন্য সে ভাষাও আত্ম-ব্রহ্ম নহে। বহু সংখ্যার মধ্যে 'একম্' শব্দও একটি সংখ্যা। সেইজন্য 'একম্' প্রাকৃত। সেই জন্য 'একম্' অনাত্মারই এক প্রকার বিকাশ। সেইজন্য ব্রহ্ম 'একম্' নহেন। 'একম্' শব্দ আত্মা নহেন বলিয়া, 'একম্' শব্দকেও নিত্য বলা যায় না সুতরাং 'একম্' শব্দের অর্থ যাহা, তাহাও ব্রহ্ম নহেন স্বীকার করিতে হয়। তুমি এক ব্রহ্ম বলিলেই কি তিনি বাড়িবেন? কারণ সেই 'এক' ত কেবল তাঁহাকেই বলা হয় না। এক চন্দ্র, এক সূর্য্য, একাকাশ প্রভৃতিও বলা যায়। একোনষষ্টি শ্লোকে ব্রহ্মকে 'অনণু,' 'অস্থূলম্,' 'অহ্রস্বম্,' 'অদীর্ঘম্,' 'অজম্,' 'অব্যয়ম্' ও 'অরূপগুণবর্ণাখ্যং' বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বোক্ত সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকে আত্মা-ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"আত্মৈবেদং জগৎ সর্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্বমীক্ষতে॥"

সুতরাং উক্ত শ্লোকানুসারে সেই আত্মা-ব্রহ্মকে 'অণু,' 'স্থূলম্,' 'হ্রস্বম্,' 'দীর্ঘম্,' 'জম্,' 'ব্যয়ম্,' ও 'রূপগুণবর্ণাখ্যং' বলিতে পারা যায়। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালার একোনবিংশ শ্লোকও উক্ত সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকের পোষকতা করে। ব্রহ্মনামাবলী-মালার সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"ঘটকুড্যাদিকং সর্বং মৃত্তিকামাত্রমেবহি।
তদ্বদ্ব্রহ্ম জগৎ সর্বমিতি বেদান্ত ডিম্ ডিমঃ॥"

ত্রি-পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যদ্ভাসা ভাসতেঽর্কাদির্ভাস্যৈস্তু, ন ভাসতে।
যেন সর্বমিদং ভাতি তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥"

উক্ত শ্লোকের 'যদ্ভাসা' অর্থে, যে প্রভা অথবা যাঁহার প্রভাও বলা যাইতে পারে। 'যদ্ভাসা' অর্থে যে প্রভা স্বীকার করিলে, অবশ্যই সেই প্রভা যাঁহার, তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হয়। উক্ত 'যদ্ভাসা' অর্থে, যাঁহার প্রভা বলিলেও ত অসঙ্গত হয় না? সুতরাং উক্ত 'যদ্ভাসা' অর্থে যে ব্রহ্মের প্রভা এবং যে ব্রহ্ম-প্রভা, উভয়েই বলা যাইতে পারে। কারণ ব্রহ্ম অর্থে, শক্তি ও শক্তিমান উভয়ই। কারণ ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই। অদ্বৈতমতের গ্রন্থসকলে ব্রহ্ম-শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্রহ্ম-শব্দ সে অর্থে সকল স্থলে ব্যবহৃত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থমতে ব্রহ্ম অর্থে যোনি বা প্রকৃতি। নানা শাস্ত্রানুসারে—সেই প্রকৃতি-ব্রহ্মই শক্তি। সুতরাং সেই শক্তি-ব্রহ্ম আর শক্তিমান-ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতির মতে, ব্রহ্ম সগুণ-সক্রিয়। সগুণ-সক্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মই সর্বশক্তিমান। কিন্তু শ্রুতি-বেদান্ত মতে, ব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত ষষ্টি শ্লোকানুসারে, সেই ব্রহ্মকে সগুণ-সক্রিয়ই বলিতে হয়, কারণ উক্ত শ্লোকানুসারে যে ব্রহ্মকে 'যদ্ভাসা' অর্থাৎ যে প্রভা, যে জ্যোতি কিংবা যে আলোক বলা যায়, আবার ঐ শ্লোকানুসারেই সেই ব্রহ্মকে 'যদ্ভাসা' না বলিয়া, কেবলমাত্র 'যৎ'ও বলা যায়। তিনি কেবল মাত্র 'যৎ' স্বীকার করিলে, 'ভাসা'টী তাঁহারই স্বীকার করা হয়। আবার উক্ত শ্লোকানুসারেই অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্মের ভাসা বা প্রভায় সূর্য্য প্রভৃতি ভাস্বর জ্যোতিষ্কগণও প্রকাশিত রহিয়াছে। কিন্তু যিনি নিজে ঐ সূর্য্য প্রভৃতি ভাস্বর-জ্যোতিষ্কগণ কর্তৃক প্রকাশ পান

না,—যিনি প্রকাশ স্বীকার এই সমস্তই প্রকাশ রহিয়াছে,—তিনিই ব্রহ্ম. ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্ব-প্রকাশক ব্রহ্মকে সগুণ সক্রিয়ই বলিতে হয়,—কারণ কোন কিছু প্রকাশ করাও ত ক্রিয়া ও গুণের পরিচায়ক।

চতুঃপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,

"অখণ্ডানন্দরূপস্ত তত্তানন্দলাশ্রিতাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনো ভবাঃ॥

'অখণ্ডানন্দরূপস্ত' বলিলে, যাঁহার অখণ্ডানন্দ-রূপ, ইহাই বুঝিতে হয়। সুতরাং যে ব্রহ্মের অখণ্ডানন্দ-রূপ, তিনি নিশ্চয়ই সাকার। কারণ নানা শাস্ত্রানুসারে বলা হইয়াছে, যাঁহার রূপ আছে, তিনিই সাকার। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্মের অখণ্ডানন্দরূপ, সুতরাং ব্রহ্ম সাকার। এবং অখণ্ডানন্দই সেই ব্রহ্মের রূপ বা আকার। অখণ্ডানন্দ রূপার্থে যিনি অখণ্ডানন্দ-রূপও বুঝিতে হয়। ব্রহ্মকে অখণ্ডানন্দ-রূপ বলিলে, ব্রহ্মও রূপ স্বীকার করা হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে, ব্রহ্মঅখণ্ডানন্দ-রূপ। অপরোক্ষানুভূতির মতে, ব্রহ্ম সাকার। উক্ত সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যাহার অখণ্ডানন্দ-রূপ, ব্রহ্মা প্রভৃতি তারতম্যানুসারে, তাঁহারই অত্যল্প-আনন্দাশ্রিত হইয়া আনন্দী হন্। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্মই অখণ্ডানন্দ-রূপ। ব্রহ্মা প্রভৃতি, সেই অখণ্ডানন্দ-রূপ-ব্রহ্মের অত্যল্প আনন্দাশ্রিত। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই অখণ্ডানন্দ-রূপ নহেন্; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই অখণ্ডানন্দরূপ-ব্রহ্ম নহেন্। তাঁহারা সেই অখণ্ডানন্দ-রূপ-ব্রহ্মের অত্যল্প আনন্দাশ্রিত। উক্ত শ্লোকানুসারে তাঁহারা সেই অখণ্ডানন্দ-রূপ-ব্রহ্মেরও আশ্রিত নহেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে তাঁহারা অব্রহ্ম, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। অদ্বৈতমতানুসারে অব্রহ্মই ত অনাত্মা-বিদ্যা। সুতরাং উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্মা প্রভৃতিকেও অনাত্মা বলিতে হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্যের মতে, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলেই এক প্রকার নহেন্। তাঁহারা সকলে এক শ্রেণীরও নহেন্। তাঁহাদের মধ্যেও তারতম্য আছে। সেই তারতম্যানুসারে তাঁহাদের আনন্দ-সম্ভোগেরও তারতম্য আছে। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক শ্রেণীর আনন্দী নহেন্। সেই জন্যই তাঁহাদের পরস্পরের অদ্বৈততা স্বীকার করা হয় নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্যের মতে, কথিত ব্রহ্মা প্রভৃতির এবং অখণ্ডরূপ-ব্রহ্মেরও অদ্বৈততা স্বীকার করা যায় না। সেই জন্য বলিতে হয়, উক্ত শ্লোকটীও সম্পূর্ণ দ্বৈতবাচক।

পঞ্চপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্ট পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়া

"তদ্যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদন্বিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে"॥

'তদ্যুক্তমখিলং বস্তু,' অর্থাৎ সেই ব্রহ্মে অখিল-বস্তু-যুক্ত। এস্থলে ব্রহ্মের ন্যায় অখিল-বস্তুরও অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এস্থলে ব্রহ্ম সত্য এবং অখিল-বস্তু মিথ্যা বুঝিবার কোন কারণ নাই। এস্থলে সেই ব্রহ্ম এবং অখিলবস্তু অভেদ বুঝিবারও কোন কারণ নাই। এস্থলে বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মে অখিল-বস্তু-যুক্ত। অখিল-বস্তু এবং সেই ব্রহ্ম অভেদ স্বীকার করিলে, সেই ব্রহ্মে অখিল-বস্তু যুক্ত, বলাই যায় না। শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থের অনেক শ্লোকানুসারে অখিল-বস্তু এবং ব্রহ্ম অভেদ বুঝিতে হয়। তিনি পূর্ব্বোক্ত সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে।"

'তদ্যুক্তমাখিলং বস্তু' বলার পরেই বলা হইয়াছে, 'ব্যবহারস্তদন্বিতঃ,' অর্থাৎ ব্যবহারও সেই ব্রহ্মে সম্মিলিত। সেই ব্রহ্মের সহিত ব্যবহারও অন্বিত বা সম্মিলিত বলিয়া, সেই ব্যবহারকেও অসত্য বলা যায় না। কারণ ব্যবহার কখন ব্রহ্মে অন্বিত থাকে এবং কখন থাকে না, এ কথা বলা ত হয় নাই। সুতরাং সেই জন্য ব্রহ্মে অন্বিত-ব্যবহারেরও নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়, ঐ প্রকার বলার পরে বলা হইয়াছে, 'তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে'। দুগ্ধে ঘৃত-ব্যাপ্ত সত্য,—কিন্তু ঘৃত, দুগ্ধব্যতীত অপর কিছু নহে। দুগ্ধের বিদ্যমানতা-বশতই ঘৃতের বিদ্যমানতা। কিন্তু অখিল-বস্তু এবং ব্যবহারের বিদ্যমানতা-বশত ব্রহ্মের বিদ্যমানতা নহে;

বহুক শঙ্করাচার্য্যের কোন কোন শ্লোকে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের বিদ্যমানতা-বশতই অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু আছে, সে সমস্তের বিদ্যমানতা। সেই ব্রহ্ম, অখিল-বস্তু ও ব্যবহার, পরস্পর অভেদ বুঝিবারও কোন কারণ নাই। সেইজন্য ক্ষীরে ব্যাপ্ত সদি বা ঘৃতের সহিত সেই ব্রহ্মের তুলনাই হইতে পারে না; কারণ উক্ত শ্লোকানুসারে ক্ষীর এবং সদি পরস্পর যেমন অভেদ, তদ্রূপ অখিল-বস্তু, ব্যবহার ব্রহ্ম পরস্পর অভেদ নহেন।

ষষ্ঠপক্ষাপৎ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের একষট্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যথমস্তর্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ত্যখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহিঃ প্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে, বহ্নি যেমন প্রতপ্ত লৌহ-পিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়া নিজে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ব্রহ্ম নিখিল জগতের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়া স্বয়ং প্রকাশ হওত ঐ নিখিল জগৎকেও প্রকাশ করেন। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম কেবল নিখিল জগতেরই অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত। সেইজন্য তাঁহাকে অনন্ত বলা যায় না। কারণ তিনি যে নিখিল জগতের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত, সে জগতেরও সীমা আছে। তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জগৎ অপেক্ষা বৃহৎ নহেন্। সুতরাং তিনি জগৎ যত বড়, তত বড় বলিয়াও তিনি অনন্ত নহেন্। উক্ত শ্লোকানুসারে সেই ব্রহ্ম ঐ নিখিল জগতে যখন ব্যাপ্ত হইয়া, আপনি প্রকাশ হওত, ঐ নিখিল জগৎ প্রকাশিত করেন, বুঝিতে হয় না। উক্ত শ্লোকে সেই ব্রহ্ম কতকালের জন্য নিখিল-জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া আপনি প্রকাশ হওত, ঐ নিখিল জগৎ প্রকাশ করেন? সেই জন্যই বুঝিতে হয়, নিয়তই ঐ প্রকার ব্যাপ্ত হইয়া, সেই ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশ হওত ঐ নিখিল জগৎ প্রকাশ করেন। সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় ঐ নিখিল জগৎকেও নিত্য সত্য ও অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। লৌহ প্রতপ্ত না হইলেও, আপনি প্রকাশিত থাকে। অগ্নি দ্বারা প্রতপ্ত হইলেই যে লৌহ প্রকাশিত হয়, এরূপ বোধ করিবার কোন কারণ নাই। তবে নিখিল জগৎ সেই ব্রহ্মের প্রকাশে প্রকাশিত, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে। নিখিল-জগৎ প্রকাশ করেন যে ব্রহ্ম,—তাঁহাকে সগুণ-সক্রিয়ই বলিতে হয়। সেই ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত স্বীকার করিলেও তাঁহাকে সগুণ-সক্রিয় বলিতে হয়। উক্ত একষট্টি শ্লোকানুসারে নিখিল-জগতে ব্রহ্ম চির-ব্যাপ্ত স্বীকার করিলে, নিখিল-জগতেরও নিত্য-সত্যতা স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে নিখিল-জগতের নিত্য-সত্তাও স্বীকার করা হয়। তাহা স্বীকার না করিয়া, যদি মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে তিনি এই নিখিল-জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মের স্পষ্টই সগুণত্ব ও সক্রিয়ত্ব স্বীকার করিতে হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে নিখিল-জগৎকে অনিত্য বুঝিবারও কোন অভ্রান্ত কারণ নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে যেমন লৌহ এবং অগ্নি একই পদার্থ বুঝিবার কোন কারণ নাই, তদ্রূপ নিখিল-জগৎ এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ বুঝিবারও কোন কারণ নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে নিখিল-জগৎ, ব্রহ্ম এবং স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য পরস্পর অভেদ, ইহা বুঝিবারও কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই।

সপ্তপক্ষাপৎ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ছি-ষট্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,

"জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽন্যত্র কিঞ্চন।
ব্রহ্মাতন্ত্রাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা।"

উক্ত শ্লোকানুসারে 'জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম' স্বীকার করিলে, এই আত্মবোধেরই 'আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যত্র কিঞ্চন' এই শ্লোকাংশের সহিত অনৈক্য প্রকাশ পায়। 'ব্রহ্মণোঽন্যত্র কিঞ্চন' স্বীকার করিলে, বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থানুসারে অবিদ্যার অনাদিত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ উক্ত গ্রন্থানুসারে অবিদ্যার অনাদিত্ব স্বীকার করিলে, সেই অবিদ্যার নিত্য-সত্যত্বও স্পষ্টই স্বীকার করা হয়। যাহার আদি নাই, তাহা নিশ্চয়ই নিত্যসত্য। শঙ্করাচার্য্যের বিবেকচূড়ামণির মতে, অবিদ্যারও ব্রহ্মের ন্যায় আদি নাই। সুতরাং তাহাও ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি স্বীকার করিতে হয়। অনাদিই নিত্য-সত্য,—তাহা

আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সুতরাং কেবল 'ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে' কি প্রকারেই বা বলা যায়? শঙ্করাচার্য্যের মতে নিত্য-সত্য-অনাদ্য-বিদ্যাও রহিয়াছেন। সুতরাং ঐ শঙ্করাচার্য্যেরই মতানুসারে, ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কিছুই নাই বলা যায় না। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যেরই বিবেকচূড়ামণির মতানুসারে—'ব্রহ্মানাদ্যসত্যে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা'ও বলা যায় না।

অষ্টপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রি-ষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্যদ্ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে যাহা দর্শন করা যায়, তাহাকে যদি ব্রহ্ম বলিতে হয়, তাহা হইলে শ্রুতি বেদান্তানুসারে নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মকেও অনাত্মা বলিতে হয়, কারণ অনেক প্রকার পদার্থই দর্শন করা হইয়া থাকে। শ্রুতি বেদান্ত এবং অন্যান্য অদ্বৈত মতের গ্রন্থানুসারে যাহা দর্শন করা যায়, তাহাই অনাত্মা। যাহা দর্শন করা যায় তাহা অনেক শাস্ত্রমতে এবং অনেক অদ্বৈতবাদীর মতেই জড়। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্ম দৃশ্য স্বীকার করা হইয়াছে। সেইজন্য অবশ্যই ব্রহ্মও আকার প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে। বেদান্তানুসারে আকারের নিত্যতা স্বীকার করা হয় নাই। এই আত্মবোধানুসারেই যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহাকেও ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, সেই ব্রহ্মকে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহাকে কোন শাস্ত্রেই আত্মা-ব্রহ্ম বলা হয় নাই। বিশেষত অদ্বৈতমতানুসারে তাহা অনাত্মাই বটে। কেবল একপ্রকার কিছুই ত শ্রবণ করা হয় না, কত প্রকার কত কি শ্রবণ করা হয়। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের বহুত্ব এবং বহু প্রকারতা নাই। সুতরাং সেই ব্রহ্মকে নানাপ্রকারে শ্রোতব্যও বলা যায় না। যাহা দর্শন করা যায় ও যাহা শ্রবণ করা যায় তাহা ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না স্বীকার করিতে হইলে, বিবেক-চূড়ামণি-কথিত সেই অনাদ্য-বিদ্যাকেও ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহা দর্শন করা যায়, তাহা ব্রহ্ম,—যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা ব্রহ্ম স্বীকার করিলে, ব্রহ্মকে অনাত্মাই স্বীকার করা হয়। কারণ শ্রুতি-বেদান্ত প্রভৃতি মতে, দৃশ্যসকল এবং শ্রোতব্যসকলও, সেই একই অদ্বিতীয় নানাপ্রকার বিকাশ। উক্ত ত্রি-ষষ্টি শ্লোকের শেষ চরণে বলা হইয়াছে, 'তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্' তত্ত্বজ্ঞানদ্বারাও কি যাহা দর্শন করা হয় ও যাহা শ্রবণ করা হয় তাহাকে অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে? আমাদের মতে তাহা কখনই পারা যায় না; তাহা যদি পারা যাইত, তাহা হইলে শ্রুতি-বেদান্তে অনাত্মাকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার করা হইত। শ্রুতি বেদান্তের মতেই আত্মা এবং অনাত্মা অভেদ নহে। কেহ যদি,—যাহা দর্শন করা যায় তাহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহা হইলে বেদান্তমতে অবশ্যই সেই ব্যক্তির সেইটি ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হয়। কিন্তু তাঁহার ঐ প্রকার ভ্রমকে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বলা হইবে না। কেহ যদি,—যাহা শ্রবণ করা যায় তাহাকেও ব্রহ্ম বলেন, তাহা হইলে অবশ্যই বেদান্তমতে সেইটী সেই ব্যক্তির ভ্রমই বলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার ঐ প্রকার ভ্রমকে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বলা হইবে না। নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞান যাহা তাহার সহিত ভ্রান্তির কোন সংস্রবই নাই। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অভ্রান্তিরই সম্বন্ধ। অভ্রান্তিই সত্য, ভ্রান্তিই মিথ্যা। যাহা দর্শন করা যায়, তাহা শ্রবণ করা যায় না। যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহাও দর্শন করা যায় না; সুতরাং দ্রষ্টব্য এবং শ্রোতব্য একই প্রকার নহে। শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত ত্রি-ষষ্টি শ্লোক স্বীকার করিলে, ব্রহ্মকে দ্রষ্টব্যও বলিতে হয়, শ্রোতব্যও বলিতে হয়; সুতরাং ব্রহ্মকে অনাত্মাই বলিতে হয়।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

সুতাকাটা : ১৯২৪ খৃঃ-এর ১৮ই জানুয়ারী ষাবিংশ গান্ধী পুণ্যাহ উপলক্ষে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (তৎকালীন শ্রীশচীকুমার ঘোষ) যে স্বরাজসূত্র যজ্ঞ হিসাবে অহোরাত্র চরকা উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহার এক বিবরণ যাহা 'ধরিত্রীর হিতৈষী' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে স্বামিজীর কিছু বক্তৃতাংশও ছিল। উহার কিছু কিছু এইখানে প্রকাশ করা গেল।

"সুতাকাটা নারীর সতীত্বের রক্ষা করচ, দুর্ভিক্ষের অপেক্ষা নাশে মহা অস্ত্র, স্বরাজ নিহিত ঐ সুতাকোটার মধ্যে; সুতাকাটারূপ যজ্ঞই স্বরাজ প্রসব করে। সেই কর্মই যজ্ঞ যা মনুষ্য-কল্যাণের জন্য প্রত্যেকের মিলিত কর্মের ভিতর দিয়া ফুটিয়া ওঠে এমন কর্ম, এমন যজ্ঞ সুতাকাটা ছাড়া আর কোথায় পাবে?...স্বরাজ জাতির তারুণ্য সৃজনে অধিকারী। স্বরাজ স্ত্রীত্বের পরিচয়। কোন্ সৃষ্টি সকলের সেরা? বেঁচে থাকতে হলে যা গণ-দেবতার চাই-ই এমন অন্ন ও বস্ত্র ছাড়া জগতে দ্বিতীয়টী নাই। রেল লাইনের সৃষ্টিই বল, আইন আদালত সৃষ্টিই বল আর অস্ত্র-সৃষ্টিই বল—সব গৌণ। হলেও হয়, না হলেও বাঁচা যায় এবং সকলে মিলে এগুলি তৈয়ার করবারও যো নাই। অন্ন ও বস্ত্র-সৃষ্টি সকল সৃষ্টির মধ্যে গুরুতম। কিন্তু অন্নের চেয়েও বস্ত্র গুরুতম; না খেয়েও বরং কিছুকাল চলে, কিন্তু কাপড় না পরে সভ্য জাতির মুহূর্তও চলে না। বস্ত্র-সৃষ্টিই একমাত্র গণতন্ত্র সাধন। এই বিষয়ে প্রয়োজনে ও উপায়ে সব জাতি এক হতে সক্ষম। খাওয়াও সকলেরই চাই, কিন্তু নিজের হাতে অন্ন সৃষ্টি করা ধনী, নারী, বালক ও দুর্বলের পক্ষে অসম্ভব। এমন বস্ত্র কাপড় ছাড়া দ্বিতীয় কি আছে যা সকলেরই প্রয়োজন অথচ যা ধনী-দরিদ্র, কুলীন-অকুলীন, পণ্ডিত-মূর্খ, নর-নারী, বালক-বৃদ্ধ, সবল-দুর্বল সকলে মিলিয়া 'উপায়' করিতে পারে? 'চাওয়ার' একতাও স্বরাজ নয়, পাওয়ার 'উপায়' এক হওয়াই বস্তুতঃ স্বরাজ। যাহা আমরা সকলে মিলিয়া একত্র হইয়া তৈয়ারী করিতে পারি, অথচ যাহা না হইলেই চলে না—তাহাই স্বরাজের মূর্তি। খদ্দর সৃষ্টি খুব সহজ, সরল, খুব নিকট, অথচ গুরুতম। যোগী চান সমগ্র সৃষ্টির উপর অধিকার বিস্তারে, সকল ছেড়ে তাই বেছে লন প্রাণ। একবার প্রাণ আয়ত্তের কৌশল জানতে পারলে অন্য সব সৃষ্টি তো অনেক সহজ। সুতাকাটার চেয়ে মহত্তর আর কি আছে? এই একটী সার্বজনীন কর্মকে কেন্দ্র না করলে জাতি গড়ে উঠবে কোন্ কল্পনাবিলাসের উপর? দরিদ্র যা করতে বাধ্য, তাই আমরা মাথা পেতে বরণ করে নেব, তবে না হবে দরিদ্রের সঙ্গে অভিন্ন হওয়া? এই ভাবে দরিদ্রের মধ্য দিয়ে মনুষ্য জাতির সঙ্গে এক হব। চরকার অপেক্ষা বড় কোন ভগবৎ সেবা নাই। এ যে দরিদ্রের সঙ্গে অদ্বৈত ভাব-সাধনার মহামন্ত্র। চরকা পৃথিবীর অন্ন সমান ভাবে বণ্টন করেই আমাদের মা অন্নপূর্ণা।"

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগাইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি, নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন করার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেহেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেহের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্ণের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবান্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ
১১। গীতাজয়ন্তী
১২। উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

৺প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির ভয়কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিল্প নিত্যগোপাল ও শিল্পী সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়ঋষি শ্রীনিত্যগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন
রবীন্দ্র-স্মরণ
প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (তায়া—দেশবন্ধুনগর) ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

CALCUTTA UNIVERSITY

উদ্ভাস ভারত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৬, ১৯৬৯ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র দ্বাবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহার-দ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুই-এর সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও সুষ্ঠু ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-কৃত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অবধূত-ভাষ্য

প্রকাশিত হইল

দক্ষিণা—বারো টাকা

জীবনকে সত্যিকারের বিপ্লবী অর্থাৎ শৃঙ্খলাপূর্ণ, গঠনাত্মক, সঙ্ঘবদ্ধ এবং সামগ্রিক করিতে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রস্থাপিত বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে সদ্য প্রকাশিত এই ভাষ্যখানার সাহায্য গ্রহণ করুন।

নরনারায়ণ আশ্রম

২৪ পরগণা

বাগুইআটি/অশ্বিনীনগর

সূচীপত্র : শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৬, ১৯৬৯

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি
শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
শ্রীরাধা
শ্রীরেণু মিত্র
৩। দেশ-নায়ক গোবিন্দবল্লভ পন্থ (পূর্বানুবৃত্তি)
৺সুশীলকুমার ঘোষ
জন্মাষ্টমী (কবিতা)
শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ
১১ ৬। সিদ্ধান্ত-দর্শন (পূর্বানুবৃত্তি)
শ্রীশ্রীনিতাগোপাল
দুইটী সেবাশ্রমের কথা
(প্রত্যক্ষদর্শী)
অঙ্কুর (কবিতা)
শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (পূর্বানুবৃত্তি) ১২৩
সাময়িকী : জাতীয় সভাকার বাণী ১২৮
বিবেক অনুসারে ভোট
দানের স্বাধীনতা

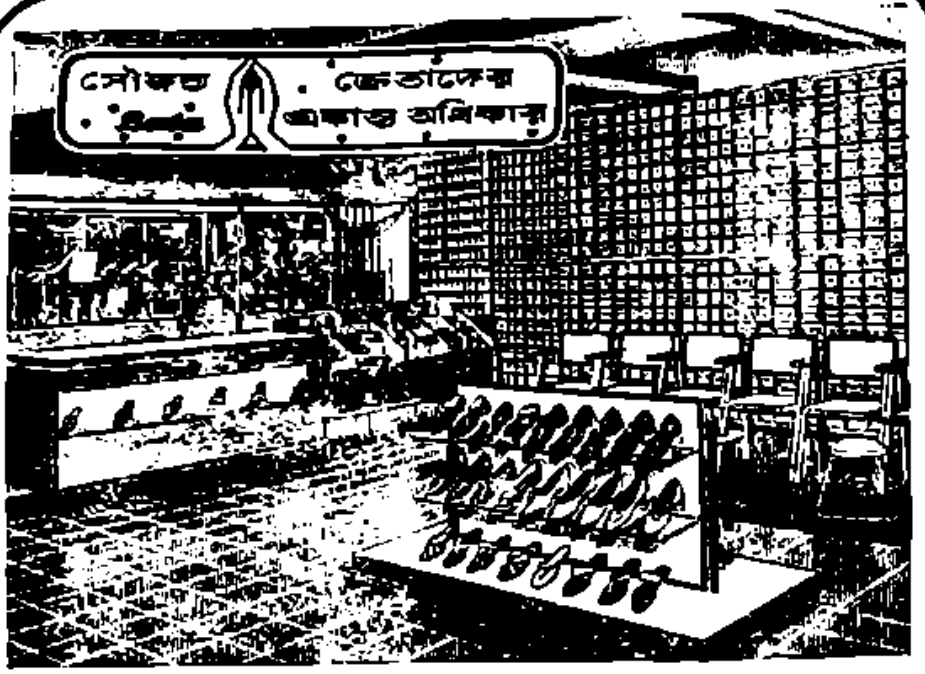

আপনি কি সম্প্রতি কোনো বাটার দোকানে গিয়েছিলেন ?

নিয়ে থাকুন বা না-ই থাকুন, আপনার কাছে আমাদের কিছু নিবেদন আছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের ব্যবহার কেমন, আমরা তা ইমনটি খতিয়ে দেখছি—খুঁজে বেরোচ্ছি একটি সৌজন্য অভিযান। কেন? কারণ সৌজন্য যেকো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সেইজন্যই আমরা এই স্লোগানটি বেছে নিয়েছি : 'সৌজন্য—ক্রেতাদের একান্ত অধিকার।' আমাদের প্রতিটি দোকানেই দেখতে পাবেন এই কথাটি লেখা আছে। আমাদের অনুরোধ এই সৌজন্য অভিযানকে সফল করে তুলতে অনুগ্রহ করে আপনারা সাহায্য করুন। কীভাবে, বলছি।

সৌজন্য : ক্রেতাদের একান্ত অধিকার

বাটার যে-কোনো দোকানে অত্যন্ত সহজভাবে পায়ের মাপ দিতে পারেন; আপনি কিছু কিনুন, চাই না-ই কিনুন, এমনকি যদি কেবল সাজানো জুতোগুলোই আপনি দেখতে চান, তবু জানবেন আপনি আমাদের কাছে সব সময়েই স্বাগত।

Bata

এটা করে মনে রাখবেন, জোরজবর বা কর্কশতা কোনোকালে আমাদের নেই। আমরা বরং সর্বপ্রকারে আপনাদের সেবায় লাগতে পারি, সেজন্য আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

যদি আমাদের ব্যবহারে এমন-কিছু দেখেন যা আপনার ঠিক পছন্দ হয়, তবে করে আমাদের তা জানাতে ভুলবেন না। আপনার মন্তব্য থেকেই আমরা বুঝতে পারবো কীভাবে আমাদের ব্যবহার আরো ভালো করা যায়।

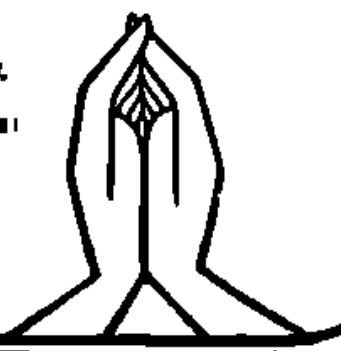

এই অভিযান অল্পদিনের, কিন্তু আমরা চাই সৌজন্য ও শিষ্টাচারের এই আবহাওয়া যাতে সব সময়েই বজায় থাকে—যাতে আমাদের যে-কোনো দোকানে আপনি সব সময় সহজ, স্বাভাবিক, ভরোসা ও স্বাগত বোধ করেন।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·০০
কর্মবাণী	১·১৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	১·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	১·৫০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	
বিদ্যাসাগর	

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

'দ্বন্দ্ব-বুদ্ধিই যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্বনির্ণয়ে একমাত্র সারথি, তখনই ব্রহ্ম ও জগৎ কেবল একটী mechanism। 'All is given'—কোন কিছুরই আর ফাঁক নাই, ইহাই mechanism-এর প্রাণকথা। প্রতি দুইটী কণার মাঝে মাঝে যে ফাঁক রহিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্যই ব্রহ্মে 'আকাশ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ব্রহ্ম ও জগতের 'already made' 'closed' মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াই নানা সম্প্রদায় দলাদলির সূত্রপাত করিয়াছে। ব্রহ্ম ও জগৎ মিলিয়া একটী living unity, তাহাতে মড়ার বুকে ছুরি চালাইবার মত বিশ্লেষণ প্রণালী চলিতেই পারে না। কোন মতকেই একমাত্র সত্যজ্ঞানে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলে all is given ও closed ভাবা ছাড়া গত্যন্তরও নাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহুবিধ কল্পনা যে ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহা উপনিষৎ পাঠ করিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মের যে-কোন কল্পনাদ্বারাই কতগুলি জাগতিক ঘটনা যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তাহাও সত্য। জগতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার মূর্ত্তিও বদলাইয়া গিয়াছে, যাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও যাইবে। এই সম্ভবমূর্ত্তি (probability) ব্রহ্মে না থাকিলে উহার দ্বারা জগতের বিশেষ কোন লাভই হইত না। ব্রহ্ম বস্তুত অনন্ত probability-র সমন্বয়। কোন সম্প্রদায়ই নিজে দাঁড়াইতে পারে না, যদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সকল তত্ত্বগুলিই সে অনুপলব্ধভাবেও ভিত্তিস্বরূপে মানিয়া না লয়। আস্তিক, নাস্তিক, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ই যেন 'অনন্তকালের হওয়া' ভগবানের একটি ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে চান। ব্রহ্মও যে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হইতেছেন, তাহা তাঁহারা ভাবেন না। ইহাদের ধারণা, ব্রহ্ম যেন স্বতন্ত্র স্থানে localised হইয়া সৃষ্টির আদি হইতেই স্বতন্ত্রভাবে আপনা আপনি ফুটিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহ হইলে সেখানে গিয়াই তাঁহাকে পাইব; আমার জীবন যে ভাবেই চলিতে থাকুক না, তাঁহার মূর্ত্তি যেন ঠিকই আছে। তাঁহার ভাব জীবের জীবন-নিরপেক্ষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বলিতেছেন; 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। জীবের গৌরবও তো ইহাই। আমি আমার ভগবানকে সৃষ্টি করিব, আমার ভগবানের জন্মদাতা আমিই, এবং তিনি আমার ভিতর দিয়া প্রকাশিত না হইয়া কখনই পূর্ণ হন না—ইহাতেই না তাঁহার ও আমার গৌরব?···জীবের শরণাগতিও যে তাঁহার ভজনীয়, উহাই তো তাঁহাকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিবে। তাঁহাকে জীবন দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাঁহার আমার সৃষ্টি-ব্যাপারে তিনি ও আমি 'অর্দ্ধ' এক। তিনি 'given', ইহা স্বীকার করিলেই জীবন হয় নিরর্থক।'

—ব্রহ্মসূত্র—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

উদ্বোধন

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৯ ষাবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি

।। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ।।

[মানুষ-কৃষ্ণের জন্মোৎসব এই ভাদ্র মাসের অষ্টমীতে। তাঁর সম্বন্ধে কোন কথাই পুরাণো হয় না। আর শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর যে সামগ্রিক রূপ তুলে ধরেছেন, তা তো এখনও খুবই নূতন। তাই উনিশ বৎসর আগের লেখাটি এইখানে যা পুনর্মুদ্রিত হল, তা আজও নিতান্ত নূতন বলেই প্রতিভাত হবে।—সঃ, উঃ ভাঃ]

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া। ভাগবত ১০.১৪.৫৫

—শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মার আত্মা। তিনিই এই জগতের হিতের জন্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় করুণাশক্তির উদ্রেকে 'দেহী ইব' প্রতিভাত রহিয়াছেন। শ্লোকের প্রথম চরণে বিশ্বমানবের 'সাধ্য' নির্দ্দেশ করিয়া পরবর্তী চরণে তাহার 'হেতু' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

'মানুষ' শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মার আত্মা হইলেন কোন্ যুক্তিতে ও যোগ্যতায়, এবং ভারতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণকে আত্ম-স্বরূপে ভজন করিয়াই বা কোন্ যোগ্যতার অধিকারী হইয়াছে, আজ তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। ভারতের ভাগবত বিশ্বাস করেন এবং চুল-চেরা যুক্তি-দ্বারা প্রমাণও করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই অখিলাত্মার আত্মা। কিন্তু কি তাঁহার যুক্তি? ভাগবত স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণজীবনদ্বারাই জগতের পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম ও বস্তুসমূহের—আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম, ইহলোক-পরলোক, দেব-মানব-পশুপক্ষী, সর্ব্ব-ধর্ম্ম, সর্ব্ব অধর্ম্ম, 'সত্যং চ অনৃতং চ', 'বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ', বিদ্যা অবিদ্যা, সব কিছু ও সব কিছু, সব কাম ও সব অকামের ব্যাখ্যান ও আস্বাদন বাস্তবের দেশে বাস্তবের আলোতে সম্ভবপর। ভগবান বেদব্যাস এই কৃষ্ণতত্ত্বকে সামনে রাখিয়াই তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন, 'এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ।' শ্রীকৃষ্ণ-জীবনই সর্ব্বব্যাখ্যানমূর্ত্তি। শ্রীরূপগোস্বামী ঠিকই বলিয়াছেন, 'ওগো রাধারাণী, হে শ্যামসুন্দর, তোমাদের অবতরণ যদি জগতের বুকে সম্ভব না হইত, বিশ্বের কোনও ঘটনারই কোনও অর্থ মিলিত না, বিশ্বমোহনকারী কামের কোনও ব্রহ্মরূপ কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না'।

জীবের দিক হইতে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার, বিশ্বময় কামের মাতামাতির যে ব্যাখ্যা এতদিন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সৃষ্টির ব্যর্থতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনেই তাহার একটী সুষ্ঠু ব্যাখ্যান মিলিয়াছে। কামের এবং মানব জীবনের যাবতীয় ভালমন্দ বৃত্তির যে একটী ভাগবত রূপ আছে, সেই ভাগবত রূপ আস্বাদন করিবার জন্যই যে মানুষ স্বর্গ-নরক, দেবযান, পিতৃযান ছুটাছুটি করিতেছে, ভালমন্দ সমস্ত বৃত্তির ব্রহ্ম রূপ আস্বাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে মানুষের কিছুতেই রেহাই নাই, কোনও রকমে বৃত্তিনিচয়কে চাপা দিয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠে বা ব্রহ্মলোকে পলাইয়া বাঁচিতে চাহিলেও যে সেখান হইতে একদিন 'ক্যামাখ্যা' বিশ্বশক্তি তাহাকে টানিয়া আনিয়া আবার প্রকৃতির খেলার ভিতরে ছাড়িয়া দিবেনই, আজ শ্রীকৃষ্ণ-জীবনালোকে তাহা স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।

কি যে ভাল, কি যে মন্দ, কেন যে ভাল, কেন যে মন্দ —ইহার বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক জীবন্ত মীমাংসা কি কেহ আজ পর্যন্ত দিতে সাহসী হইয়াছেন? কেহ বলিয়াছেন—ভালর মহিমা প্রকাশের জন্যই মন্দ; যাহা জীবনের স্থিতিসহায়ক, তাহাই ভাল। কিন্তু মন্দের এই ব্যাখ্যায় কি বিশ্বের কিছুই হিত হইয়াছে? মন্দকে ভালর সহায়করূপে, সিঁড়িরূপে স্থাপন করিলে কি শেষ পর্যন্ত ভালর চরম অনবস্থানই প্রতিষ্ঠিত হয় না? মন্দ যদি ভালর সিঁড়ি, পাপ যদি পুণ্যের সিঁড়ি, অসৎ যদি সতের সিঁড়ি, অন্ধকার যদি আলোর সিঁড়ি, তাহা হইলে তাহাদ্বারা কি অন্ধকারের আপেক্ষিক আলোর স্বাতন্ত্র্যই সিদ্ধ হয়? আপেক্ষিক অন্ধকারের পর যদি আপেক্ষিক আলো থাকে, তবে আপেক্ষিক এই আলোর পরও তো আপেক্ষিক অপর অন্ধকার থাকিতে বাধ্য। কেননা আলো-অন্ধকার দুই-ই আপেক্ষিক। হয় আলো-অন্ধকার দুই-ই সমান ভাবে আছে, নয় কিছুই নাই, নিছক শূন্য —যুক্তি ইহার অতিরিক্ত আর যাইতে পারে না। কিন্তু আলো 'নাই', অন্ধকার 'নাই', অসৎ 'নাই', সৎ 'নাই' —শুধু এইরূপ সব 'না'-এর মধ্যে কি positive জীবনের দাঁড়াইবার কোনও স্থান মিলিবে? তাই আজ আসিয়াছে সৎ-অসৎ সমন্বয়ের তত্ত্ব।

ভারতবর্ষ যে একটী দার্শনিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় শূন্যবাদের ভিতর 'নেতি নেতি' বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে ডুবিয়া যাইতেছিল, সেখান হইতে আকর্ষণ করিয়া তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ 'কৃষ্ণ'। যিনি আকর্ষণ করেন, যিনি জীবনকে বর্ষণ করিয়া একটী positive সৃষ্টি গড়িয়া তোলেন, তিনিই 'কৃষ্ণ'। 'অন্ধেনৈব নীয়মান' অন্ধ বিশ্বকে শ্রীকৃষ্ণই চক্ষু দান করিলেন। তিনি সত্যই 'জগদ্ধিতায়'। 'জগতের', জাগতিক বৃত্তিনিচয়ের, গতিধর্মের সত্য বাস্তব 'হিত' শ্রীকৃষ্ণ-জীবনেই বিশ্ব স্পষ্ট দেখিয়াছে। ভারতবর্ষ জগতের 'গতি'কে স্থিতির চাপে নিষ্পেষিত করিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ সেই গতিধারাকে পুনরায় মুক্ত করিয়া দিলেন, গতির চতুর্দ্দিকের প্রাচীর-দেওয়া স্থিতি ভাঙিয়া স্থিতি-গতির সমন্বয় আনিয়া দিলেন। তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি স্থিতি-গতি সমন্বয়, সত্য-অনৃতের সমন্বয়, হিংসা-অহিংসার সমন্বয়, কাম-অকামের সমন্বয়। বিশ্ব তাঁহারই জীবনে মূর্ত্ত; তিনি তাই বিশ্বাত্মা। বিশ্বের সকল সম্ভাবনার মূর্ত্ত বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। পরিমাণ হিসাবে তিনি ছোটই বটেন, কিন্তু ব্রহ্মের মানবও তো পরিমাণ নয়, সংখ্যাও নয়। ব্রহ্মের মানবও নিরতিশয় জীবন, যে জীবন ভাঙিয়া গড়িতে পারে, গড়িয়া ভাঙিতে পারে।

বিশ্ব-জীবনের প্রতি স্পন্দনের এক অর্দ্ধেকে রহিয়াছে হিংসা-প্রবৃত্তি, অপরার্দ্ধে রহিয়াছে অহিংসা-প্রবৃত্তি। যে কুকুর হাঁস খায়, সেই কুকুরেই কি নিজের সন্তানকে মরণ বরণ করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে না? সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার গোড়ায় রহিয়াছে 'অদিতি'র খেলা, 'অদন'-এর খেলা; এখানে সকলেই সকলকে অদন করে, ভক্ষণ করে। কিন্তু ইহাই কি সবখানি সত্য? আর একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, বিশ্ব-প্রাণী আবার নিজের বুকের রক্ত অপরকে দান করিয়া নিজে নিশ্চিহ্ন হইতেও চায়। 'And animate nature···presents other aspects than of a relentless struggle for a scanty subsistence. It has its aspects of beautiful plenty and of peaceful happiness. But, above all, animal life is not expressible in terms of the economics of modern commercialism. Its foundation are laid···on the facts of sex and parenthood. In the attraction of mate for mate and in the care of offspring, as well as in the further acts of association and co-operation in flocks and herds, we can see prefigured the altruistic virtues which form the staple of our human morality.'—The Idea of God. p, 84.

কেহ কি বিশ্বের মহাসত্য এই দুইটী জীবনধারার সত্য বাস্তব জীবন্ত ব্যাখ্যান দিয়াছেন? ঋষিগণ একান্ত

স্থিতিধর্মী অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির গুণ গাহিয়াছেন। কিন্তু স্থিতিধর্মী এই অহিংসা ও সত্য কি বিশ্বের বাস্তবীয় ঘটনার ব্যাখ্যা দানে সমর্থ? যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ঋষিদের পরে আবার ঋষিদেরও সৃষ্টিকর্তা অনাকী শ্রীভগবানের পাশ্ব বলিবার প্রয়োজনই হইত না।

সৃষ্টিধারার এক অংশ যেমন হিংসাময় এবং অপর অংশ অহিংসাময়, তেমনি হিংসাধারারই অপর অংশ অহিংসা এবং অহিংসাধারারও অপর অংশ হিংসা। হিংসা-অহিংসা সৃষ্টির প্রতিটী অণুর মধ্যে ওতপ্রোত। হিংসা ছাড়া অহিংসা হয় না, অহিংসা ছাড়া হিংসা হয় না। হিংসার অপরার্দ্ধ অহিংসা, অহিংসারও অপরার্দ্ধ হিংসা। হিংসাই যে সব সময়ে হিংসা, তাহাও নয়, আবার অহিংসাও যে সব সময়ই অহিংসা তাহাও নয়। হিংসা করিয়াও অহিংসাব্রত রক্ষা করা যায়, অহিংসাদ্বারাও হিংসা করা যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে আমরা হিংসা ও অহিংসার দ্বন্দ্ব দেখিয়াছি। যিনি হিংসার মধ্যে অহিংসা এবং অহিংসার মধ্যে হিংসা দেখেন, তিনিই হিংসা-অহিংসার কৃৎস্নদর্শন লাভ করিয়াছেন। তিনিই বলিতে পারেন, 'যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবঃ বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে'। 'ইমান্ লোকান্' হনন করিয়াও কোন্ কৌশলে মানুষ হনন না করিয়া পারে, বদ্ধ না হইয়া পারে, তাহারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত বাস্তবের দেশে স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্য বাস্তব জগদ্বিতায় হইয়াছেন। 'যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবঃ বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে'—এই অর্দ্ধাংশ যখন 'হত্বাপি স ইমান্ লোকান্' এ যুক্ত, তখনই কৃৎস্নদর্শন ফুটিয়া উঠে।

মুনিঋষি-প্রবর্তিত ব্রহ্মচর্যেরও ক্রমবিবর্তিত রূপ আমরা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে দেখিয়াছি। গোপালতাপনী শ্রুতিতে ব্রজগোপীগণ গান্ধর্বিকা (রাধা)-কে সামনে রাখিয়া মুনি দুর্বাসাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'কথং কৃষ্ণঃ ব্রহ্মচারী'? আজ যখন প্রাকৃতিক নিয়মেই গৃহের কোণে লুকানো ভারতের অসূর্যম্পশ্যা নারীকুল পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, সর্ব্ব কর্মক্ষেত্রকে অধিকার করিয়াও বসিয়াছেন, পুরুষের সঙ্গে তাঁহাদের অবাধ মিলন যখন কিছুতেই আর রোধ করা সম্ভব হইবে না, তখন ব্রহ্মচর্যের নব রূপের খোঁজ করা ছাড়া উপায় আছে কি? বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত আবেষ্টনে ব্রহ্মচর্যের কি রূপ হইবে, আজ সেই প্রশ্নই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ব করিতেছে। খাঁচায় পুরিয়া আহার না দিয়া বাঘকে যখন আর বশে আনা চলিবে না, বাঘ যখন খাঁচা ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেই, তখন খাঁচামুক্ত বাঘকে কি করিয়া বশে আনা যায়, ইহাই তো ভারতবর্ষের সনাতনীদের কাছে প্রশ্ন। নারীকে কি আর খাঁচায় পুরিয়া রাখা সম্ভব হইবে? অসম্ভব। সে 'বাহির' হইয়া পড়িয়াছে। এই বাহির হইয়া পড়াকে ভারতবর্ষের এমন কোন্ বান্ধব আছেন, যিনি 'ঘরে'র সঙ্গে সমন্বয় করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন? মুনিঋষি কালত্রয়ে সনাতন; নারীর আকর্ষণকে তাঁহারা স্ত্রীতিবিহ্বল চিত্তে এড়াইয়াই চলিতে চাহিয়াছেন। নারী-প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাঁহারা নারী-প্রকৃতিকে জয় করেন নাই। একমাত্র 'অতী' মন্ত্রের ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই কামাখ্যা প্রকৃতির এই challenge গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিজয়ী হইয়াছিলেন। তাই 'কথং কৃষ্ণঃ ব্রহ্মচারী' এই প্রশ্নের উত্তরে গোপালতাপনী শ্রুতি শুনাইতেছেন, 'যো হ বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি। যো হ বৈ অকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি'—'যিনি কামদ্বারা কাম কামনা করেন তিনি কামী; পক্ষান্তরে যিনি অকামদ্বারা কাম কামনা করেন, তিনিই অকামী'। ঋষিরা কাম-কামনা ত্যাগ করিয়া অকামী হইবার উপদেশই দিয়া গিয়াছেন। তাহার ব্যর্থতা আমরা বহু বড় বড় জীবনে দেখিয়াছি। কাম কামনার উপর চাপ না দিয়া অকামদ্বারা কাম কামনা করাই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের 'অকামী' হওয়া। যে-সৃষ্টির গোড়ায় রহিয়াছে 'কাম'—'সোঽকাময়ত', সেই সৃষ্টির মধ্যে বসিয়া কামের সঙ্গে লড়াই করা ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। স্রষ্টা যিনি, তিনি তো কাম-কামনাদ্বারা 'কামী' হইয়া পড়েন নাই, অথচ কাম-কামনা ছাড়িয়া আমাদের মত অকামী হইতেও চাহিতেছেন

না। কাম-কামনা ত্যাগ করিলে যে তাঁহার সৃষ্টিই মুছিয়া যাইত। তাই তিনি যে-কৌশলে কাম-কামনা করিয়াও অকামী, আজ সেই কৌশল শিখিবার দিন আসিয়াছে, যদি সৃষ্টিকে কামভোগ বা কামত্যাগের বীভৎস ক্লৈব্য হইতে রক্ষা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এই কৌশল বাস্তব রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই তিনি বিশ্বস্রষ্টা। স্রষ্টাই সৃষ্টির কৌশল জানেন। বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কামপ্রবৃত্তির বাস্তব কৌশলকে বাস্তবের দেশে কোন্ পুরুষ স্থাপন করিয়াছেন? তিনিই মূর্তিমান সুস্থ 'কাম', যাহার কামে জগৎসৃষ্টি কামবিকারের মধ্যে পড়িয়া কাদিয়া চৌচির হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হইতেছে না। কাম কেমন করিয়া অব্যাহত সুস্থ সুন্দর সৃষ্টি করে, সৃষ্টি রক্ষা করে এবং সময় মত প্রয়োজন মত সার্থকতার সহিত সংহারও করে, তাহার বাস্তব চিত্রই শ্রীকৃষ্ণ-জীবন।

বিশ্ব-জীবনের যাহা কিছু সার্বজনীন, শ্রীকৃষ্ণ তাহারই ঘন ব্যাখ্যান। কাম সার্বজনীন; কৃষ্ণ তাহারই ঘনীভূত ব্যাখ্যান। শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই সাম্প্রদায়িক নন। 'কাম' নাই এমন কোনও জীব আছে কি? ভাল বাসে না এমন কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব কি? বিশ্বজনীন কামতত্ত্ব, বিশ্বজনীন প্রেমতত্ত্বেরই ঘন 'অর্থ' হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই নিজেকে, নিজের কাম ক্রোধকে, নিজের হিংসা অহিংসাকে যেমন সকলেই ভালবাসে, তেমনি ঐ সব মানবীয় পরস্পরবিরোধী বৃত্তিনিচয়ের মূর্তিমান পরম ব্যাখ্যানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম জ্ঞানে কে না ভালবাসিয়া পারেন? হউন কেহ ভারতবাসী, হউন ইংরেজ, হউন কেহ রাশিয়ান, হউন কেহ কোল ভিল, মূর্তিমান কামব্যাখ্যান শ্রীকৃষ্ণকে কে অন্তরে অন্তরে ভাল না বাসিবেন? যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বজীবের সর্ব-তত্ত্বেরই ঘন অর্থ ও ঘন আস্বাদন, সেখানে তিনি বিশ্বমানবেরই। কৃষ্ণের 'নটবরবপু'ই মানবমাত্রের নটবরবপু, কৃষ্ণের 'বংশী' বিশ্বমানবেরই বংশী, কৃষ্ণের গোপ-জীবনই বিশ্বমানবের গোপ-জীবন, কৃষ্ণের রাসবিলাস বিশ্বমানবের ঘনীভূত প্রকাশ ও আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণকে তাই সমস্ত বিশ্ব নিজ আত্মা বলিয়া জানিতে থাকে, যদি না ঐক্য-দেশিকতার সঙ্কীর্ণতায় সে আটকাইয়া পড়ে। মানুষ নিজের জীবনের গূঢ়তম প্রদেশের একটি 'পরম অর্থ' রাধাকৃষ্ণ জীবনে পায় বলিয়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'রাই উন্মাদিনী', 'গোষ্ঠলীলা', 'মুরলী মিলন' প্রভৃতি লীলার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চায়।

শ্রীকৃষ্ণ 'অখিলরসামৃতমূর্তি'। তাঁহার জীবনে কোনও কোঠাবিভাগ নাই; তিনি প্রতিটী ক্ষেত্রকে তাহার স্বয়ংমূল্যে অর্থবান করিয়া উহাদের পরস্পরাগমনের ভিতর দিয়া সমগ্র গড়িয়া তুলিয়া চলিয়াছেন। তাই তিনি জগদ্ভিত্তার রূপে 'অত্র' (এই বিশ্বের বুকে) 'আজাতি' (প্রতিভাত হইতেছেন)। কিন্তু তাঁহার এই 'জান' সম্ভব হইতেছে 'মায়য়া', মায়াশক্তির উপাশ্রয়ে। এই মায়াই যোগমায়া, এই যোগমায়াই organic nature। মায়ার অর্থ কৃপাও হয়। করুণাঘন এই মায়াশক্তি দ্বারাই তিনি 'দেহী ইব' (যেন দেহী)। কামাসক্ত যে-সব দেহী দেহ নিয়া, কাম নিয়া বিব্রত, কাম যাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া হৃতবীর্য্য করিয়া ঘুণধরা বাঁশের মত করিয়া দিয়াছে, সেই সব দেহীদের সামনে তিনি যেন তাহাদের মত দেহী হইয়া, তাহাদের মতই তাহাদের একজন হইয়া তাহাদের আকর্ষণ করিয়া নিজ মদনমোহন-ধর্মে, আকাশধর্মে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

'অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ'।
ভাগবত।

এমন ক্রীড়াই তিনি করিয়া গিয়াছেন, যাহা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ লাভ করিয়া মানুষকে তৎপর করিয়া তুলিবে, মদনমোহন করিয়া তুলিবে। তাই রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভাগবত লিখিয়াছেন,

'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ'॥
ভাগবত ১০।৩৩।৩৯

—'ব্রজবধূদের সঙ্গে বিষ্ণুর (ব্যাপকতম মানুষ-কৃষ্ণের)

বিশেষ ক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শ্রবণ করেন, এবং তৎপর বিশ্বজনের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ ঐ কামকে আশু দূর করেন।'

রাধাকৃষ্ণের ব্রজ-ক্রীড়াশ্রবণে কামের চর্চ্চাই আরম্ভ করা সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিকুণ্ঠরূপ, বিশ্বরূপ। যিনি বিশ্বরূপ হন না, তিনি মদনমোহনও হন না। বিশ্বরূপই মদনমোহন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ দেহকে বিশ্বদেহ বলিয়াই জানিতেন, বিশ্বদেহেরই নিংড়ানো রসরূপে নিজ দেহকে আস্বাদন করিতেন। মানুষ নিজ দেহকে বিশ্বদেহের ভিতর গড়িয়া তুলিয়া ভাগবত বিশ্বরূপ লাভ করিবার জন্যই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ভ্রমণ করিতেছে। ব্রহ্মবধূ বিচরণ করাই তাহার সর্ব্বভূত-বিচরণের মুখ্য প্রয়োজন। মানুষের দেহও নিত্য। সে সর্ব্বদেহের ভিতর দিয়া তাহার নিত্য-দেহ, সর্ব্বরসের ভিতর দিয়া নিত্যরস, সর্ব্বস্পর্শের ভিতর দিয়া নিত্যস্পর্শ, সর্ব্বগন্ধের ভিতর দিয়া নিত্যগন্ধ, সর্ব্বশব্দের ভিতর দিয়া নিত্যশব্দ লাভে সমগ্র, বিশ্বরূপ দেহী হইবার জন্য কি উন্মাদ লালসাই না ছুটিয়াছে!

একটী বাস্তব মূর্ত্ত আদর্শ (আকাশের নয়) জীবের সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে কে তাহাকে বাস্তবের টান, মর্ত্ত্যের টান সামলাইয়া আগাইয়া নিয়া যাইবে? উপনিষদের ব্রহ্ম intellectual, ভাগবতের ব্রহ্ম practical। উপনিষদের ব্রহ্মই যখন ঘন হইয়া বাস্তবের দেশে বাস্তব পশুপক্ষী দেবমানবের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখনই তিনি 'কৃষ্ণ' হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে নমস্কারদ্বারা বন্দনা করিল; মানুষ সজাতীয় সগোত্র বলিয়া পা ধরিল, গা' ধরাইল, কাঁধে উঠিল, কাঁধে উঠাইল; গো-সকল তাঁহার গা' চাটিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইল; যশোদা নিজ ক্ষীরধারে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিল; প্রেমময়ী গোপীকুল তাঁহাকে মান করিয়া তৎসেবা করিল; অর্জ্জুন স্বরূপে সারথ্য বরণ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে গীতা শ্রবণ করিল; উদ্ধব বিদুরের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল,—

'অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম'॥ ভাগবত ৩।২।২৩।

শ্রীকৃষ্ণ তাই 'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা'। সর্ব্বভূতের আত্মভূত (আত্মতুল্য) হইয়াছে যাহার আত্মা (দেহ), তাঁহারই চরণস্পর্শে পৃথিবী শিহরিত হয়, যমুনা উজান তরঙ্গ তুলিয়া উজান বয়। তাঁহারই গায়ে গা' লাগাইবার জন্য বিশ্বমানবের প্রতি অঙ্গের কান্না আজ দিকে দিকে জমিয়া উঠিয়াছে। তিনিই আজ আবার সচ্চিদানন্দাকার দেহ লইয়া, দেহ-দেহীর ভেদ ঘুচাইয়া দেহের সম্ভাবনা ও আত্মার সম্ভাবনাকে সার্থক মূর্ত্তি দান করিয়া 'দেহী ইব' প্রকট হইতে চাহিতেছেন। আজ তিনিই বিশ্বমানবের সামনে নৃত্য বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছেন। কে তাঁহার এই নৃত্যগতি রোধ করিবে?

যে-ভারতবর্ষের বুকেই একদিন সর্ব্বদেহের ব্রহ্মনৃত্য ঘন হইয়াছিল, সেই ভারতবর্ষই তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গে আস্বাদন করিয়া বিশ্বদেহকে, বিশ্বসমাজকে, বিশ্বরাষ্ট্রকে ব্রহ্মঘন শ্রীকৃষ্ণ-ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার যোগ্যপাত্র। ভারতের শ্রীকৃষ্ণ ভারতকে বিশ্বভারতে, উজ্জ্বলভারতে গড়িয়া তুলিবার জন্য 'জগদ্ধিতায় যোগমায়া দেহীব আকৃতি মায়য়া'। আমরা বিশ্ববাসী তাঁহার শুভ জন্মবাসরে তাঁহারই ঐ রাসনৃত্যকে আমাদের সকল স্পন্দনে বরণ করিতেছি। বন্দে মাতরম্

শ্রীরাধা

॥ শ্রীবেণু মিত্র ॥

[ভাদ্র মাসে শ্রীরাধার জন্ম স্মরণোপলক্ষে একুশ বৎসর আগের লেখা পুনর্মুদ্রিত]

বিশ্বের রসসত্তায়, জীবনের অবচেতন মানসের এক অনির্বচনীয় ও অপূর্ব সার্থক প্রকাশ শ্রীরাধা। জীবনের নিগৃহীত অস্তিত্বের অন্তঃস্থিত বিশ্বপ্রেমই তিনি ঘনীভূত মূর্তি। যে যাকে বুঝি, না অথচ যা পীড়া দেয়, যে কথাকে ভাষা দিতে পারিনা অথচ যা আছে, আমাদের অন্তর্জীবনের, অবচেতন মনের সেই সত্য-চিত্রের এক অভিনব ও আশ্চর্য প্রকাশ এই রাধাজীবন। শ্রীরাধার মধ্যে জীবনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির এক অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয়-পশ্চাৎ সূত্র আস্বাদন রয়েছে। তাই তিনি বিপ্রলব্ধার অন্তরদেবতা, নিশিড়ীতের বন্ধু, হতাশার আশা, বেদনার সান্ত্বনা। স্বপ্নময় এই জগৎ সংসারের কঠিনা কুটিলা প্রকৃতির মাঝখান দিয়ে পথ-চলার নিশানা দিয়ে তিনি আমাদের আপন জন, নিত্য পথ-প্রদর্শক। তাই প্রজ্ঞাবাদী দার্শনিকের কাছে তিনি প্রহেলিকা, প্রাণ-সাধক বৈষ্ণবের তিনি নয়ন-মণি, তথাকথিত শুদ্ধরুচির তিনি কেউ নন্, অবিজ্ঞানের তিনি হাস্যাস্পদ। তথাপি সব-কিছু ডিঙিয়েও জনসমাজের অন্তরের অন্তস্তলে সুপ্ত আছে তাঁর জন্য একটি দরদী আসন। বিশ্বের অন্তঃস্থিত প্রাণের তিনি বিগ্রহ, সহজ জীবনের তিনি মূর্ত আস্বাদন। তাই মানুষের জীবনের সহজতার মধ্যে তাঁর একটি সহজ আবেদন আছেই। তাই তো পদকীর্তন মানুষকে এমন বিমুগ্ধ করে।

কিন্তু সে আবেদন বুদ্ধিমানের একান্ত নেতিবাদের যুক্তির কাছে এতদিন দাঁড়াতেই পারেনি। সেই অমানুষ শ্রীরাধাকে সম্মানিত করেছেন বৈষ্ণবেরা, অপূর্ব গৌরবে তাঁরা তাঁকে বিকশিত করেছেন। তথাপি সে সবই অপ্রাকৃতের স্তরের। তাতে রক্তমাংসে প্রাকৃত এই আমাদের, এই মাটির জগতের মধ্যে তাঁর স্থান থাকে কোথায়? প্রেমতত্ত্বের বিচিত্র গতির যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁর জীবনকে ঘিরে রচিত হয়ে উঠেছে, আধুনিক কালে বিশ্বের আর কোথাও মনস্তত্ত্বের চেতন-অবচেতন স্তরের এমন অপূর্ব খনন দুর্লভ। কিন্তু এই প্রেমকে অপ্রাকৃত বলে দূরে সরিয়ে রাখলে আমাদের কাছে তাঁর কোন প্রয়োজনই থাকেনা; অথচ তিনি আমাদেরই।

অন্তরে বাইরে যা কিছু অস্বীকৃত, অবহেলিত, শ্রীরাধা তাদেরকেই আত্মস্বাতন্ত্র্যে ও স্বয়ংপূর্ণ মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বের চলার ছন্দের যে কথাটি তাঁর সমগ্র জীবন উদ্ঘাটন করেছে সেটা হচ্ছে এই যে, এ বিশ্বের প্রতিটি অণু স্বতন্ত্র ও স্বয়ংমূল্যবান, এবং সেই স্বতন্ত্র ও স্বয়ং মূল্যবান প্রতি অণুটি পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গিভাবনার মধ্য দিয়ে কায়াবৃহ সৃষ্টি করে সমগ্রের মধ্যে বিধৃত। তাই সেখানে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, আর সব মিলিয়ে সমষ্টিও প্রতিষ্ঠিত—তাঁর জীবনের রাসলীলার মধ্যে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে।

মানুষের সভ্যতার প্রথম দিনগুলিতে মানুষের অন্তরের সহজাত প্রকৃতির সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির ব্যবধান ছিল স্বল্প, তাই প্রাণের দেখা দেখানে সহজেই পাওয়া যেত। কিন্তু মানুষ যতই বুদ্ধিমান সভ্য হয়ে উঠেছে, ততই সে দুয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রাচীর রচনা করে তুলেছে, ততই সে প্রাণকে হৃদয়কে রসকে সরিয়ে দিয়েছে, নিষ্ঠুর অসম্মান করেছে। নিগৃহীত প্রাণ ঢাকা পড়ে গেছে মানবসভ্যতার কোন্ অবচেতন মানসে। আজ সেই প্রাণের সবগুলি প্রকাশই তাই সভ্যজগতে অবহেলিত, অসম্মানিত; তাই দার্শনিক দৃষ্টিতে রস বা ভক্তিধর্ম বিশেষত্বহীন অক্ষরত্বের থেকে কত ন্যূন! তাই প্রাণের,

হৃদয়ের প্রতিমূর্তি নারী, শূদ্র ও শ্রমিক বুদ্ধিমান সমাজের কাছে একান্ত তুচ্ছ। কিন্তু বিশ্ব-মনস্তত্ত্বের ক্রমাবর্তনে এই প্রাণ, এই রসসত্তাই রূপ গ্রহণ করলেন শ্রীরাধারূপে নিজের সন্ধানকে, নিজের নারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশ্ব-সত্তার মধ্যেও।

সত্য মানুষের অবচেতনায় কামের যে এক নিগৃহীত চিত্র আছে, মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে তার কিছুটা পরিচয় আজ আমরা জানতে পেরেছি। কামের স্বরূপ সম্বন্ধে, নরনারীর সম্বন্ধ সম্বন্ধে সত্য আমাদের যা ধারণা, বাইরে তার রূপায়ন একেবারেই অসম্ভব; কেননা তার রূপ অতি কদর্য। তাই বাইরের আমাদের সঙ্গে ভেতরের আমাদের কোন মিলই নেই—আমাদের সেই আমিকে নিজেরাই আমরা চিনতে পারব না। কিন্তু কেন যে ভেতরের সেই আমির রূপ এমন কদর্য, বাইরের আলোতে তাকে সন্ধানের সঙ্গে বের করাই যায় না, এবং এরকম না হয়েও যে তার দিব্যরূপ (sublimation) থাকতে পারে, সেকথা আমাদের জানিয়েছে শ্রীরাধাজীবন। শক্তিকে, রসকে, কামকে, এককথায় জীবনের বেগধর্মকে, কল্পনধর্মকে যা বলে আমরা এতদিন জেনে এসেছি তার সত্যিকার পরিচয় তা-ই নয়। স্বরূপতঃ তার যা পরিচয়, তা না জানার জন্যই তার সঙ্গে আমাদের এতদিনকার ব্যবহারও ঠিক হয়নি। তারই ফলে এত নিগ্রহ, আর সেই নিগ্রহেরই ফলে তার স্বরূপের তথা রূপের এত বিকৃতি—এই চক্র আবহমানকাল থেকে চলেই আসছে।

কিন্তু জীবনের রসসত্তার একটি নিজস্ব ছন্দ আছে, বাইরে থেকে চাপান বিধিনিষেধের মধ্যে যাকে পুরতে গেলে সে বিকৃত হবেই, অসুন্দর অশোভন হবেই। সে স্বতন্ত্র, আবার পরতন্ত্রও বটে। বিশ্বের রসসত্তা অন্য সব কিছু নিরপেক্ষও বটে, অপেক্ষা করেও আছে বটে। এ বিশ্বে প্রত্যেক মানুষের মত প্রত্যেক বৃত্তিও স্বাধীন, প্রত্যেকেই আবার পরাধীন; এখানে কারোরই মর্যাদা-হীন অস্বীকৃতির উপরে অপরের স্বীকৃতি দাঁড়াতেই পারে না। আকারস্পর্শহীন ব্রহ্ম বিশ্বের কামুকতাকে ক্ষিপ্ত উন্মত্ত করে তোলে; প্রকৃতির আলিঙ্গনেই পুরুষোত্তম সত্য, শিব, সুন্দর তাইতো বলা হয়েছে—

'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ'

স্বাতন্ত্র্যস্বীকৃতির দ্বারা রসসত্তার মূল্যদান ও সম্মানের—শক্তির চরম পরাকাষ্ঠায়—পরমেই পৌঁছে দিয়েছেন শ্রীরাধা। তাই তিনি 'পরাশক্তি', কোনো তাত্ত্বিক যার নাম deeper nature, কারো তাঁর বা higher nature। প্রকৃতির রসসত্তাকে, জীবনের কর্মধর্মকে যখনই স্বতন্ত্র গৌরবে মান দেওয়া হল, তখনই তার যান্ত্রিকতা থেকে তিনি মুক্ত হলেন। তখন শক্তি আর mechanical —যান্ত্রিক—নয়, তখনই তাঁর জীবন্ত (organic) রূপ ফুটে ওঠে, তখনই তার সার্থকতা। তখনই পচনধর্মী রসসত্তা তাঁর পচনত্বের গ্লানিমুক্ত হল, একতরফা object হয়ে থাকার দৈন্যমুক্ত হল। এমনই পরাশক্তির রূপকে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ 'ভজনা' করেছিলেন, এমনই সর্বগ্লানি-মুক্ত জীবন্ত শক্তিকে স্বীকার করে তিনি হলেন মদন-মোহন পুরুষোত্তম।

কামের রূপ আমাদের কাছে বিকৃত হয়, কেননা রসের বা কামের স্বাতন্ত্র্যময়ী, গৌরবময়ী অবস্থাকে আমরা জানি না, জানতে চাইও না। আমার হয়েও আমার থেকে বাইরে তার যে পররূপ—যেটাই তার সহজ ছন্দ—তার কোন পরিচয়ই আমরা রাখি না; তাই কামের দুর্মতাকে চাপা দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন গতিই থাকে না। কাম স্বরূপতঃ অসুন্দর নয়; কামকে একান্ত আমার করে নেওয়ার বিকৃতিই অসুন্দর, কামের তা স্বচ্ছন্দও নয়।

বিশ্বের সব কিছু স্বাতন্ত্র্যের গৌরবদান করেছেন শ্রীরাধা; তাই নারীকেও তিনি মুক্তি দিয়েছেন। নির্বিশেষ স্বামিত্বের দাবী থেকে সই করে দিয়ে পুরুষের মধ্যে নারীর যে নিঃশেষ আত্মবিলুপ্তি, কিংবা নারী বলেই তার যে সর্বকালীন পরতন্ত্রতা, তারই বন্ধনবলয়কে তিনি স্বাধীনতর্কাকারে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছেন। মিলনটা যে মানুষের সঙ্গে মানুষের হলেই তা হয় সত্যি

ও সার্থক, প্রভুর সাথে দাসীর নয়, কিংবা আরও পরের কথাটুকু বললে মিলনটা যে মনুষ্যত্বের সঙ্গে মনুষ্যত্বেরই—এই কথাটি প্রমাণ করে দিয়ে শ্রীরাধা বিশ্বমনস্তত্ত্বের কাছে এক অপরূপ অবদান রেখে গেছেন। তাই শ্রীরাধার পক্ষেই বলা সত্য ও সার্থক—

'না সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি।'

বিশ্বসভ্যতার আজকের দিনের সমস্ত দিকের গূঢ়তম অন্তর্বৃত্তির সংঘাতের সামনে, আজকের নারীপ্রগতির দিনে নারী সম্বন্ধে বিগত দিনের অপরিণামদর্শী মানদণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা ভেবে পেতাম না পথ কোন দিকে, যদি না রাধা-চরিত্রের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উজ্জ্বল থাকত।

শ্রীরাধা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। কালীর অক্ষরে কিংবা শিলালেখের অমর লেখনই ইতিহাসের একমাত্র প্রামাণ্য সম্পদ নয়। একদিকে শত শত বৎসরের কঠিন স্তর চুইয়ে এসে আজকের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে যা সেকড় গেড়েছে, আর একদিকের আধুনিকতম মানব-মনস্তত্ত্বের মধ্যে যা সার্থক সম্ভাবনার সত্যতায় প্রতিষ্ঠিত, তার ঐতিহাসিকতাকে প্রশ্ন করা অবান্তর, অর্থহীন, অসঙ্গত। সীতাচরিত্র ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের শেষ আদর্শ নারীচরিত্র নয়। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এক তরফা পরীক্ষা দেওয়ার অপমানের প্রতিবাদে সীতাদেবী যেখানে পাতাল প্রবেশ করেছেন, সেইখানেই মনস্তত্ত্বের পরবর্তী বিকাশের রূপে ফুটে উঠেছেন মহীয়সী শ্রীরাধা। তিনি সব কিছুরই একতরফাত্বের—one way traffic-এর—অবসান ঘটিয়েছেন। নারীর প্রাথমিক পরিচয় যে নারী হিসাবে নয়, 'মানুষ' হিসাবেই, শ্রীরাধা সে তত্ত্বের প্রমাণ রেখে গেছেন।

নারীর এই খাঁচরোয়া দাবী আজ আমরা ও করছি বটে, কিন্তু নারীত্বের যুগলঞ্চিত হীনতাভাবের (inferiority complex) সংস্কার, নারীত্বের সংস্কার আজকের দিনের নারীকেও এমন অভিভূত করে রেখেছে যে, তার অস্থস্থ ও প্রমত্ত মুখে এ দাবী পরিহাসের মতই শোনায়। তথাপি প্রতিক্রিয়ার দৌরাত্ম্যকে কিছুদিন আমাদের সইতেই হবে। সেই সঙ্গে আমরা যদি প্রাণবন্তা শ্রীরাধার মত সুস্থ ও অপ্রমত্ত একটি সামগ্রিক জীবনের তত্ত্বকে বিশ্বের নারী এবং পুরুষের কাছে তুলে ধরতে পারি, তবেই বর্তমান বিশ্বের হালছাড়া তরণীকে আমরা ঠিক পথে চালনা করতে পারব।

এমনই শ্রীরাধাকে আমরা বন্দনা করি, ধ্যান করি, যাঁর জীবন শক্তির পরাক্রমের খবর বিশ্বদরবারে পৌঁছিয়েছে পরস্পরবিপরীত ধর্মের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে। অন্ধ (blind) প্রকৃতি, পশু (brute) প্রকৃতির কলাণময়ী 'কেবল' রূপের চিত্র যিনি এঁকে দিয়ে গেছেন, ভাদ্রমাসের পুণ্য রাধাষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্মকে আমরা অভিনন্দন করি—আমাদের প্রকৃতিকে তার অন্ধত্ব থেকে তিনি মুক্তিদান করুন।

বৈদগ্ধ্যসিন্ধুঃ অনুরাগরসৈকসিন্ধুঃ
বাৎসল্যসিন্ধুঃ অতিলাঙ্গকৃপৈকসিন্ধুঃ
লাবণ্যসিন্ধুঃ অমৃতজ্ঞবিরূপসিন্ধুঃ
শ্রীরাধিকা স্ফুরতু মে হৃদি কেলিসিন্ধুঃ॥

দেশ-নায়ক গোবিন্দবল্লভ পন্থ

॥ সুশীলকুমার ঘোষ ॥

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ইংরাজ শাসন-কর্তাদের একটি সুদৃঢ় আশ্রয় কেন্দ্র ছিল যুক্তপ্রদেশ— বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ। আই, সি, এস গভর্ণরের কঠোর নীতির দুর্ভেদ্য অস্ত্র-প্রকোপ বিশিষ্ট তরুণ পন্থকে সহ্য করিতে হইল। মুস্লিম লীগ শাসক-সম্প্রদায় হইতে সমর্থন পাইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিলে খাকসারদের সহিত যোগদান করিল। খাকসার সম্প্রদায় ছিল দুর্ধর্ষ, কঠোর, অসহনশীল প্রতিষ্ঠান—দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষা ও আইন ব্যবস্থার সমস্যা সৃষ্টি করিত ও ভীতি উৎপাদন করিত।

তরুণনেতা পন্থজীর আবেদন ও বিশেষ প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হইল কাকোরী বন্দীদের মুক্তির প্রার্থনায়। বারবার এই বিষয় লইয়া গভর্ণরের সহিত ১৯৩৭ সালে তাঁহার সঙ্ঘর্ষ বাধিল।

যুক্তপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি কার্যকরী সমিতি ১৯৩১ সালে গঠন করিল, ইহার নাম হইল agrarian committee। কর্মবীর পণ্ডিত পন্থ ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। অদম্য উৎসাহে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তিনি তত্ত্বাবধানের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া বসিলেন। শস্য উৎপাদন ও কৃষিকার্যের সমস্যাগুলি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে উদ্‌ঘাটন করিয়া যে বিবরণী প্রকাশ করেন তাহাতে পরিচয় পাওয়া গেল অপূর্ব বিশ্লেষণ শক্তি ও কৃষিবিদ্যার নিহিত তত্ত্বসমূহ। তিনি যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহাতে অপার মননশীলতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের নিদর্শন রাখিয়া দিতেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তরুণ নেতা পন্থজী কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়া আমরণ তাহাতে যোগ্যতার সহিত কার্যনির্বাহ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বীর প্রতিভা গুণে ও কর্মতাত্ত্বিকের প্রভাবে স্বকীয় ধরনের সর্বভারতীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া যোগ্যতার পুরস্কার লাভ করিলেন। তিনি আরও পুরস্কার পাইলেন কেন্দ্রীয় এসেম্ব্লীর সদস্য ও স্বরাজদলের ডেপুটি লিডার নির্বাচিত হইয়া। দেশবাসী নিঃস্বার্থ জন-নেতার কণ্ঠে নীরবে জয়মালা পরাইল।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের পর যুক্তপ্রদেশের নবগঠিত এসেম্ব্লীতে নির্বাচিত হইয়া অগণিত লোকজনের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন এবং ঐ প্রদেশের প্রধান সচিবের আসন অলঙ্কৃত করিয়া বসেন। ভারতমাতার প্রিয় সন্তানের কণ্ঠে দেশবাসী আর একবার বরমাল্য পরাইল।

অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁহার সাধনার কার্য চলিতে লাগিল। বিবিধ উপায়ে দেশ-নায়ক গোবিন্দবল্লভ বিচিত্র বিধানে সমাজসেবা ও রাষ্ট্রশাসনের গুরুভার বহন করিয়া কৃতকার্যতায় সকলকে মুগ্ধ করিলেন। পুনরায় ভারতভূমির বুকের উপর এক অঘটন ঘটিল। দেশ মধ্যে সুবিস্তৃত অশান্তির কালোছায়া দেখা দিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসীর মতবাদ গ্রহণ না করিয়া ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করিবার ফলে সারা ভারতে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ফলে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস সমগ্র ভারত হইতে মন্ত্রিসভা প্রত্যাহার করিল। কংগ্রেস-সেবী নিষ্ঠাবান্ পন্থজীও সহচরগণ সমেত মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলেন।

সবিবেচক কংগ্রেস নেতা গোবিন্দবল্লভ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় প্রধান সচিবের পদ মুক্ত ঘোষণার কারণে পরিত্যাগ করিয়া দেখাইলেন কর্ম পরিচালনা এবং সম্মানিত পদের

মোহ তাঁহাদের নাই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস-নির্দেশে সত্যাগ্রহে নামিয়া কারাবরণ করিলেন মুক্তিলাভ করিবার পর পুনরায় স্বাধীনতাকামী নিভীক নায়ক গোবিন্দবল্লভ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত আমেদনগর দুর্গে বন্দী হন। সেই বার কংগ্রেসের উচ্চশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ সকলেই কারাবরণ করেন। মুক্ত উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় সকলকে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে বাস করিতে হয় গণ আন্দোলন জন্য ১৯৪২ সালে অগণিত ভারতবাসী বন্দী দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নূতন সংবিধান অনুসারে বিগত সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে সত্যাগ্রহী নেতা গোবিন্দবল্লভ পন্থ পুনরায় উত্তর প্রদেশের এসেম্ব্লীতে নির্বাচিত হইয়া কংগ্রেস দলের অবিসংবাদিত নেতারূপে গৃহীত হন। তিনি পুনরায় সর্ববাদিসম্মতভাবে মন্ত্রী দল গঠন করিয়া সবিশেষ পারদর্শিতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।

যখন তিনি কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন, তাঁহাকে সবিশেষ কষ্ট করিতে হইয়াছিল। বিবিধ বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। খাদ্য পরিস্থিতি তখন সন্তোষজনক ছিল না, দিক্‌চক্রবালে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা মুখব্যাদন করিয়া ছিল। কিন্তু তাঁহার রাষ্ট্রে তিনি সাহসের সহিত বিচক্ষণতাবলে বিপদ জয় করিতে পারিয়াছিলেন। দেখা গেল অন্যান্য রাষ্ট্রমধ্যে উত্তরপ্রদেশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী স্থান।

উত্তর প্রদেশের প্রধান সচিবের পদ অপেক্ষা ভারতের সেবা কার্যে আহ্বান-বাণী তাঁহার নিকট অধিক মূল্যবান বলিয়া গৃহীত হইত, যদিও তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সূচনা হইতে এবং ১৯৩৫ সালের গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট দ্বারা ১৯৩৭ সালে প্রবর্তিত হয়, তদবধি ঐ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি সমাসীন ছিলেন বহুকাল যাবৎ (১৯৩৭-১৯৫৪ খৃঃ পর্যন্ত যুদ্ধকাল বাদ দিয়া।

অন্যান্য কর্মী গোবিন্দবল্লভ পন্থের সুমধুর জীবন পরবে যে সকল অম্লান কুসুম ফুটিয়াছিল তাহার সুরভি সকল সময়ে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিত তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য ছিল স্নিগ্ধ, সংলেখা-সংযম ও নির্ভীকতায় সমুজ্জ্বল। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ, বুদ্ধিজীবী পন্থজীর মননশীলতা ছিল প্রখর, পরিণামদর্শিতা গুণে তিনি অনেক, প্রাতিস্বিকতা প্রভাবে দুর্জয়। প্রভুত্বপ্রিয়তা না থাকিলেও ব্যক্তিত্ব ছিল প্রভাব বিস্তারকারী তাঁহার সংসাহস দেখা গিয়াছিল দুর্দমনীয়। পরিণামদর্শী এই নেতার দূরদৃষ্টির প্রভাব নির্ভুল ও চিন্তাশীলতায় সমাকীর্ণ। তাঁহার ন্যায় রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা অতি বিরল বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

স্বাধীনতা অর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পণ্ডিত মতিলালে নেহরুর অধিনায়কত্বে তিনি কংগ্রেস সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মহাত্মাজীর আদর্শের স্থিত-প্রজ্ঞ নেতা হিসাবে পন্থজী বহু বিপদ ঝাঞ্ঝায় কর্ম-তরণী বাহিয়া চলিয়াছেন নির্ভীকভাবে। সতর্কতার সহিত বিপদ কাটাইয়া তীরে শান্তির কোলে কূলে উঠিয়াছেন। জাতীয় মহাসভা অর্থাৎ কংগ্রেসকে বহুবার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া দেশবাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। কংগ্রেসের পিছনে তাঁহার সত্তা এক বিরাট শক্তিস্বরূপ, মুক্তি সংগ্রামে তাঁহার উপদেশ এক কঠিন বর্মসদৃশ—তিনি ছিলেন এক চিন্তাশীল অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং রাজনৈতিক সঙ্কটত্রাতা। সঙ্কটকালে তাঁহার প্রজ্ঞা, ধৈর্য, বিচার-বিবেচনা জাতির পক্ষে মহৌষধ তুল্য ছিল।

পণ্ডিত পন্থ কংগ্রেস ক্ষেত্রে কোন অমূলক আক্রমণ সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রতিদ্বন্দ্বীকে মৃদু ভর্ৎসনায় যুক্তিবাদী পন্থ বিরত থাকিতেন না। কংগ্রেসের মধ্যে বা বাহিরে কোন বিরোধ বা আক্রমণ বিচক্ষণ পন্থজী নির্ভীকভাবে বিচার করিতে অগ্রসর হইতেন। কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী অধিবেশনে (১৯৩৯) কংগ্রেসের অহিংসা নীতির প্রতিরোধ করেন। কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন মহামতি পন্থজী। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঐ কমিটি তাঁহার প্রতিপক্ষকে সমর্থন করিতে প্রতিনিধিদের অনুরোধ প্রস্তাব করেন। সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতায় কংগ্রেস-প্রধান্য প্রতিরোধমূলক আভাষ ছিল।

প্রধান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। পন্থজী তাঁহাদের অগ্রণী হইয়া বিরুদ্ধতামূলক ভাষণ দেন। কংগ্রেস সংবিধান অনুসারে নব নির্ব্বাচিত সভাপতি কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ নিযুক্ত করিলেন সেই বৎসরের জন্য। পন্থজী এক প্রস্তাব পেশ করেন, পরে উহা কিছুক্ষণ যাবৎ বহুতর বিতর্কের পর গৃহীত হয়। তাহাতে মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠন করার জন্য সভাপতিকে সনির্ব্বন্ধ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। মহাত্মাজী অবশ্য তৎকালে কংগ্রেসের নিয়মমত সভ্যও ছিলেন না। ঐ প্রস্তাব প্রচুর বিরক্তির সৃষ্টি করিল কংগ্রেসের মধ্যে এবং সমগ্র দেশে।

তাঁহার অদৃষ্টে নির্য্যাতন ভোগের অবধি ছিল না। তথাপি দেশসেবার প্রেরণা তাঁহার মানসিক ভারসাম্য অবিচলিত রাখিতে পারিয়া ছিল। মৃদু-প্রকৃতির হইলেও দলীয় ব্যাপারে এবং মত-বিরোধের সময়ে তাঁহার চরিত্রে তীব্রতার লক্ষণ দেখা যাইত। তাঁহার অন্তরের উত্তাপ ও সিদ্ধান্ত-মূলক ভাষণ প্রকট হইয়া উঠিত অন্য পক্ষের অযথা আক্রমণ কালে। পন্থজীর সুবিবেচনাপূর্ণ ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইল। ঐ প্রস্তাবে নিহিত ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যাঁহাদের আস্থা আছে এরূপ ব্যক্তিমণ্ডলীর মধ্য হইতে কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন বা নিয়োগের অনুরোধ। যে তুমুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল তাহা দুইটি বিরুদ্ধ নীতির মধ্যে দ্বন্দ্বের অনিবার্য্য পরিণাম। মহাত্মাজীর অহিংস নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন অধিকাংশ সভ্য এবং পুরাতন কংগ্রেসসেবী ও প্রধান নেতৃবৃন্দ। কিন্তু অহিংস নীতি অগ্রাহ্য করিতে অগ্রসর হইলেন সভাপতি মহাশয় স্বয়ং,—সঙ্গে ছিলেন কতিপয় কংগ্রেস কর্ম্মী ও নেতা। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুমুল সংঘর্ষে পরিণত হইতে দেখা গেল। বিপুল উৎসাহে সভাপতি সুভাষচন্দ্র অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করিলেন।

যখন ভাবপ্রবণতা চরম সীমায় উপনীত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্ব পরিহার করিবার পূর্ব্বে কংগ্রেস মহলে বিষণ্ণতার ছায়াপাতে সকলে ম্রিয়মান, তখন সকলে বুঝিলেন, কংগ্রেস-নীতি পরিবর্ত্তন করিলে দেশ-মধ্যে আসিবে অশান্তি, মনোমালিন্য বিক্ষোভ এবং অগ্নি-কাণ্ড। অহিংস নীতির আবরণে বা আশ্রয়ে যাহারা আদর্শ-চরিত্র, সেবাপরায়ণ, দেশ-প্রেমিক ও কঠোর কংগ্রেস কর্ম্মী, তাঁহারা সকলে অবিলম্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আশা সুদূর পরাহত হইয়া উঠিবে।

এইরূপ সঙ্কটকালে কংগ্রেস অধিবেশনে ত্রিপুরীতে, পণ্ডিত পন্থ মকোপরি ষষ্ঠি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, Who could do without the generalship of Mahatmaji ? এ বিষয়ে চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী তাঁহাকে সমর্থন করেন। তিনি অকাট্য যুক্তিদ্বারা প্রতিপক্ষের সমস্ত বাধা নিপুণতার সহিত খণ্ডন করেন। সেদিনের অপূর্ব্ব দৃশ্য কংগ্রেস-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মানবর পন্থজীর বিজয়-ঘোষণা চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ত্রিপুরী প্রস্তাব এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জয়পুরে কংগ্রেস মহাসভার অধিবেশনে (ডিসেম্বর) কংগ্রেস অধিনায়কের বিরুদ্ধে আর একটি প্রস্তাব,—পণ্ডিত পন্থের গৌরবোজ্জ্বল জীবনের মূল্যবান ঘটনা। এই দুইটি প্রস্তাব করে তাঁহার তীক্ষ্ণ ধী, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞাশীল মনের পরিধি এবং বস্তুতান্ত্রিক বিচক্ষণতা। সকলে এক মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন তাঁহার দৃঢ়তা ও আত্ম প্রত্যয়। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রস্তাব প্রথমে ১১২ —৫৭ ভোটে গৃহীত হয়। কিন্তু পরে প্রত্যাহৃত হয় মনস্বী পন্থের চিন্তামূলক আবেদনপ্রসূত যুক্তির দ্বারা।

তাঁহার বক্তৃতা ছিল গম্ভীর, সদ্‌যুক্তিপরিপূর্ণ ও দেশ-সেবার প্রেরণায় সমুজ্জ্বল।

অতঃপর অতি পন্থজী যে ভাবে পার্লামেন্টারিয়ান রূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। বহুকাল যাবৎ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা ও অভাবনীয় যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় বিধান সভায় তিনি বিরোধী দলের ডেপুটি লীডার, উপনায়ক রূপে কার্য্য করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। শ্রীযুক্ত জুলাকাই

প্যেলাই ও অন্যতম নেতা সর্দারমূর্তি তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিতেন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যপদ্ধতি এবং বিদেশী শক্তির নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ তাঁহাকে স্মরণী করিয়া রাখিবে। কেন্দ্রীয় সভায় তাঁহার সহিত সংঘর্ষ ও বিতর্ক সময়ে তীব্র প্রতিবাদ কাউন্সিল মধ্যে ও বাহিরে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিত।

সাত বৎসর উত্তর প্রদেশ আইন সভায় স্বরাজ দলের নেতা হিসাবে তাঁহার অবদান যেমন সুপরিস্ফুট, উক্ত প্রদেশের প্রধান সচিবরূপে তাঁহার জাতির কল্যাণ কামনায় প্রভূত উপকার সাধন কার্য্যে প্রবর্তিত হইত তৎকালীন ইংরাজ-প্রাধান্য সত্ত্বেও সাহসের সহিত দৃঢ়চিত্ততা, প্রতিজ্ঞা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দেশসেবার কর্ম্মে অনমনীয় সাধনা, সকল প্রয়াসে আন্তরিকতা তাঁহাকে সকল ক্ষেত্রে বরণীয় করিয়া তুলিল। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড ও ভারতের Constituent Assembly-তে তাঁহার কর্ম্মকুশলতা তুলিবার নহে, সকল ক্ষেত্রে তিনি অদ্ভুতপূর্ব্ব সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ মহানগরী শাসন দপ্তরে তিনি টিফিনের পরে অফিস-গৃহে কর্ম্মে নিবিষ্ট হইতেন। সকালে ও বিকালে অভ্যাগত ও দর্শকবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ ও পরামর্শ করিতেন, কিন্তু দিল্লী মহানগরীর বাসভবনে, ৬ নং এডওয়ার্ড রোডে, তিনি প্রত্যূষ প্রাতে বিভাগীয় সম্পাদক গণকে আহ্বান করিয়া দৈনিক কার্য্যপন্থার নির্দ্দেশ দিতেন। পণ্ডিত পন্থ স্বরাষ্ট্র সচিবের অফিসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম সিন্ধুতে নিমগ্ন হইতেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কাগজ ও নথিপত্র পরীক্ষা করিতেন। সন্ধ্যাকালে বা অপরাহ্নে তিনি স্বকীয় ভবনে আগন্তুকদের আবেদন যুক্তি ও পরামর্শ নিবিষ্ট মনে শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ে Home Ministryর অন্তর্ভুক্ত ছিল ভারত সরকারের State Ministry। ভারতীয় আভ্যন্তরীণ নীতিগুলিতে উচ্চমনা পন্থজীকে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইত। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক জনগণের মধ্যে বহু বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি থাকিতেন।

উত্তর প্রদেশে ও অন্যান্য প্রদেশে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রাধান্য দৃঢ়তা ও নায়কত্বের প্রভাব বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়কে সংযুক্ত ও সম্মিলিত করিয়া রাখিয়াছিল। কংগ্রেস দলকে সম্মিলিত রাখিতে তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ পরিণামদর্শী নেতা অধুনা বিরল। সংঘর্ষ, বিরোধ ও পার্থক্য দূর করিতে তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অতুলনীয় বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করিতেন। গান্ধীজীর মহৎ আদর্শ ও উচ্চচিন্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কর্ম্ম জগতে তিনি বিচরণ করিতেন। সাধারণ পরিকল্পনা ও শাসন কার্য্যে তিনি লোকমতে শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া সমগ্র উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রাখিয়া ছিলেন।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল তাঁহার সেবা-পরায়ণ সমুজ্জ্বল জীবন ক্ষেত্রে। সমুন্নত চিন্তা ও পরিকল্পনার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া কল্যাণ প্রসারের প্রসঙ্গে ইতিহাস পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর রাখিয়া দিয়াছে। ঐ সকল বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন সুফলপ্রদ কর্ম প্রগতির সার্থকতা। তন্মধ্যে

১। উত্তর প্রদেশে জমিদারি বিলোপ কার্য্যে তৎপরতা, আইন সাহায্যে Faudalism-এর আদর্শের তিরোধান।

২। ঐ প্রদেশে সুবিস্তৃত ও বিবিধ জনপথ প্রবর্ত্তন ও সৃষ্টি, পরিবহন কার্য্যে জাতীয়তা অবলম্বন, জাতীয়তা নীতি সমগ্র প্রদেশে প্রবর্ত্তন।

৩। পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্ত্তে নূতন পন্থায় ধারা-বাহিক শিক্ষা বিস্তার।

৪। ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের প্রচুর সমুন্নতি, প্রসার ও বিস্তৃতি।

৫। হরিজন পল্লীনিবাস ভূমি সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা, পল্লীবাসীর বিরস বদনে হাসি ফুটাইবার বিপুল প্রয়াসে আত্মনিয়োগ, অসুস্থ ভারাক্রান্ত অন্তর

শ্রীসম্পন্ন, সুস্থ ও নিশ্চিন্ত করিবার পূর্ণ প্রয়াস।

৬। শস্য-উৎপাদন উদ্দেশ্যে সুবিশাল পতিত জমির উদ্ধার সাধন। উৎপাদন শক্তি বাড়াইবার জন্য বৃহৎ প্রচেষ্টা ও অর্থশক্তি নিয়োগ।

৭। সকল কার্যে উৎপাদনকারীদের সাফল্যের প্রেরণাদান, মানস ক্ষেত্রে আশার হিল্লোল প্রচলন এবং অর্থ সাহায্যদ্বারা তাঁহাদের পোষকতা করা ও পুষ্টি সাধনে তৎপর হওয়া। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-যজ্ঞে দেশবাসীকে বিভিন্ন উপায়ে ইন্ধন যোগান। পরামর্শ, উপদেশ দান ও সক্রিয় সহযোগিতা তাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বল মাহাত্ম্য। সেজন্য অনিচ্ছাপ্রসূত অবসাদ, অক্ষমতা, অসহায় মনোবৃত্তি, আসন্ন দেশের সকল ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ পশ্চাৎ অপসরণ করিতেছিল।

কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে মহামতি গোবিন্দবল্লভের অমূল্য উপদেশের ও কার্যনির্দেশের জন্য সকলে উন্মুখ হইয়া থাকিতেন। হোম মিনিষ্টার হিসাবে তাঁহার নেতৃত্ব অপার কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। তাঁহার কর্মকুশলতা-গুণে তিনি "ভারত রত্ন" রূপ শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করেন। বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টিশক্তি, গুণগ্রাহিতা এবং শাসন কার্যের চরম সাফল্যের জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এল, এল, ডি উপাধি প্রদান করেন। মুর সেন্ট্রাল কলেজ এলাহাবাদ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Law হইতে এল, এল, বি পরীক্ষায়ও যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। বারাণসী ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে সম্মান-সূচক এল, এল, ডি উপাধি প্রদান করেন।

যে ভাবে পন্থজী কার্যপদ্ধতি যুক্ত প্রদেশে (উত্তর প্রদেশে) নির্ধারিত করিতেন তদপেক্ষা ভিন্ন প্রণালী তিনি দিল্লী দপ্তরে গিয়া দেখিতে পাইলেন। নূতন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইতে তাঁহার বৎসর খানেক অতিবাহিত হইল। শুনা যায় প্রথম দিন তিনি কোন ফাইল পান নাই। এক সপ্তাহ পরে তিনি দুইখানি ফাইল পাইয়াছিলেন হোম মিনিষ্টার হিসাবে। অতঃপর অধ্যবসায়, অতিশয় পরিশ্রম, ভিতরে অনুপ্রবেশ, সুস্পষ্ট নির্দেশ, আলোচনার পদ্ধতিদ্বারা তিনি বিপুল কর্ম সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন দেখা গেল দিনে প্রায় সতের ঘণ্টা তাঁহাকে কর্মরত থাকিতে হইত। দিল্লীর কর্ম ক্ষেত্রে তিনি নূতন প্রেরণা ও সম্পত্তি আনয়ন করিলেন। প্রত্যেক ফাইলটি নিম্ন হইতে উপরিভাগ পর্যন্ত নিজে পাঠ করিয়া তবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিটি দিক পরীক্ষা করিতেন। প্রতিটি দলের সহিত প্রয়োজন বোধে আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার কোন সিদ্ধান্ত পরীক্ষিত বিষয় বা ঘটনাদ্বারা সমর্থনের অভাবে দুষ্ট থাকিতে দিতেন না। কোন ঘটনা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা অপেক্ষা গভর্ণমেণ্ট নীতির প্রতিরোধ তিনি উত্তম বলিয়া মনে করিতেন।

১৯৩০—১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাহা তিনি পার্লামেণ্টে নিখিল ভারত আইন বিষয়ক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন। তিনি তখন বিরোধী দলের ডেপুটি লীডার, যাহার নেতা ছিলেন শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই বিরোধী দলের প্রথম বেঞ্চীতে তাঁহার পার্শ্বে থাকিতেন আর একজন বিশিষ্ট নেতা —শ্রীযুত মুন্সি। সবল দৃঢ় পন্থজী স্বীকার করিয়াছেন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের কোন বক্তৃতায় যে, তৎকালে বিভিন্ন অবস্থায় আইন-কর্তাদের কার্য ছিল দুরূহ বিষয়ক। উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর উপর ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল, অনড় গভর্ণমেণ্টের উপর কোন প্রকার বিশ্বাস করা যাইত না। বিতর্ক সময়ে প্রত্যুৎপন্নমতি গোবিন্দবল্লভ জটিল ঘটনাগুলি নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের সবিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন।

গভর্ণমেণ্ট যে তাঁহার পরিশ্রম ও ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন তাহা প্রকট হইয়াছিল কোম্পানীর আইন পরিবর্তন সময়কার আলোচনায়। এই বিরোধিতার প্রকৃত নায়ক ছিলেন পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। তাঁহার সুবুদ্ধির যুক্তি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যথা সম্ভব তিনি শ্রম শিল্প পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পরিচালনা সম্পর্কে অযথা অনাচার বা দুর্নীতি বন্ধ করিবার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

তৎকালে বিরোধী দলের মুখনিঃসৃত অনর্গল জ্বালাময়ী বাগ্মিতা বহির্গত হইত শ্রদ্ধেয় দেশাই ও দেশবন্ধুর সত্যমূর্ত্তির নিকট হইতে। শ্রীযুত পন্থের সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল বিভিন্ন ঘটনাবলীর সমালোচনাপূর্ণ কৌশলে গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য বিনষ্ট করিয়া দেওয়া। কোম্পানীর আইন সম্বন্ধে তাঁহার নিখুঁত জ্ঞান, গবেষণা ও চিন্তা প্রকাশ পাইত তাঁহার তথ্যোদ্দীপ্ত বক্তৃতা ও চিন্তাপ্রসূত যুক্তি, যাহার প্রয়োজন হইত আইনজ্ঞ সুবিবেচক স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এবং স্যার জেমস গ্রিগ এর প্রতিভা-স্ফূর্ত্তিত বিচার খণ্ডনে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিতে প্রয়োজন হইত পন্থজীর মত লোকের বিশাল প্রতিভার।

খের কমিশনের বিবরণী সুবিবেচক পন্থ ধারাবাহিক পাঠ করিয়া জটিল সমস্যাগুলি আয়ত্ত করিতে থাকেন। কয়েক মাস যাবৎ চিন্তাকুল মনে ইহা তিনি অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মন্তব্য তিনি প্রকাশ করেন বিবিধ চিন্তার সমাধান করিয়া। কোন জটিল প্রশ্ন তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। সারগর্ভ বিবেচনায় রত থাকিয়া তিনি বিশ্লেষণ ক্রিয়ায় তন্ময় থাকিতেন।

তিনি রাষ্ট্রীয়ভাষা সম্পর্কে পার্লামেণ্টারী কমিটিতে যোগ্যতার সহিত সভাপতিত্ব করেন এবং প্রায় ত্রিশটি অধিবেশনে আলোচনা বিবেচনা করিয়া পরিশেষে বিবরণী প্রস্তুত করেন। প্রতিটি শব্দ সঙ্গত কিনা বিবেচনা করিয়া ছিলেন, প্রতিটি ধারণা সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতেন, গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করিতেন। এই সকল কারণে এই মূল্যবান দলিলরূপে উক্ত বিবরণী স্মরণীয় হইয়া থাকিবে—ইহাতে বিভিন্নতামূলক বিষয় থাকিলেও বিবদমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নাই।

শেষ জীবনে বিবেচনাশীল পন্থজী বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের দেশের কোলাহলময় রাজনীতিতে তোষণ-নীতি বা শান্তিমূলক সমাধানের গুরুত্ব, পরিশ্রম এবং যুক্তিবিবেক প্রসূত সিদ্ধান্ত সর্ব্বসময়ে কার্য্যকরী হইয়া উঠে না। আসাম প্রদেশে ভাষা সংক্রান্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা তাঁহাকে গভীরভাবে ব্যথিত করিয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে এ আঘাত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভুলিতে পারেন নাই। জাতিগত সামঞ্জস্য রক্ষায় বিচক্ষণ পন্থজী আসামের নেতৃবর্গকে বুদ্ধি বিবেচনার মধ্যে আনিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার দুঃখের অবধি ছিল না।

শান্ত শিষ্ট হইলেও আইন ও শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে তাঁহার আচরণ তীব্র বলিয়া পরিলক্ষিত হইত। কোন কোন সময়ে মহান আদর্শ অনুসরণে ও বিরাট জনকল্যাণের মঙ্গল বিধানে ও স্বার্থ রক্ষণে তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্দয় বলিয়া গণ্য হইত। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটে তাঁহার মতামত অনমনীয় ছিল এবং ইহার মীমাংসা করিতে অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। একবার ধর্ম্মঘট প্রশ্ন হইলে তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং এমন প্রণালী অবলম্বিত হইল যাহাতে আঘাতের ক্ষত নিয়ামক হইল এবং সরকারী কর্ম্মচারীগণের ক্ষতি ও দুর্ভোগ প্রশমিত হইল।

তাঁহার আচরণ ও উক্তি ছিল অভিজ্ঞতা-প্রসূত। বিশেষভাবে না জানিয়া তিনি কোন মন্তব্য করিতেন না।

নাগাজাতির সমস্যা সমাধানে তিনি ব্যক্তিগত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। নাগা খেলাগুলিতে স্বয়ং গমন করিয়া পরিদর্শন করিবার পর মন্তব্য দেন। তাঁহার শক্তিশালী মন্তব্য অভিজ্ঞতালব্ধ বিশেষ জ্ঞানের ফল। ঐ জাতি সম্বন্ধে সমস্যার সমাধান শান্তিমূলকভাবে সম্পন্ন হয়।

চীন জাতির প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী মহানগরীতে পদার্পণ করিলে তিনি জনপ্রিয় গোবিন্দবল্লভ পন্থের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি পন্থকে স্বীকার করিয়াছিলেন ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টার পন্থজীকে সুযোগ্য প্রতিপক্ষ ও তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। চৈনিক দাবী সহসা ভারতে প্রকাশমান হইলে সুচতুর পন্থজী মানচিত্র ও অন্যান্য নথিপত্র বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করেন এবং ভারতের প্রধান সচিব সদা-সর্ব্বদা তাঁহার ভবনে গিয়া সর্ব্বপ্রকার নূতন পরিস্থিতি আলোচনা করিতেন।

সুবিজ্ঞ গোবিন্দবল্লভের ধীশক্তি ও ধৈর্য্য ছিল অসাধারণ। আলোচনাকালে বা বিতর্ক সভায় তিনি

গভীর মনোযোগ সহকারে অপর পক্ষের বক্তৃতা শুনিতেন; যত বিপদ ও বিস্তৃত হউক না কেন, যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন বা বাক্য অধীর হইত বা অধিশ্রান্তের মন্থ গতি দুই হইত তিনি তখন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতে উঠিতেন। অতিরঞ্জিত বক্তৃতা বা সত্য ঘটনা হইতে ভ্রষ্ট হইলে বক্তাকে আক্রমণ করিতে ছাড়িতেন না, কয়েকটি সতর্ক-রচিত শব্দ প্রয়োগে বিপক্ষকে ঘায়েল করিতে সমর্থ হইতেন। উত্তেজনাপূর্ণ ক্ষণে বা আলোচনা সভায় তিনি শান্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেন, উত্তেজনা বা কর্কশ বাক্য প্রযুক্ত হইলে তিনি অত্যন্তোজিত স্বরে দুই একটি সরস বাক্য প্রয়োগ করিতেন। রসিকতাদ্বারা শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টা তাঁহার সুবিবেচিত রীতি ছিল, সেজন্য সকল দলের তিনি প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন।

জন্মাষ্টমী

।। শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ।।

শুচি সুন্দর পরম শোভন নামিল পুণ্যতিথি—
নাচে কালিন্দী বীচিমালা বুকে, পুলকিত বনবীথি;
বহে সমীরণ সুখস্পর্শ
সর্ব্বজীবের মনেতে হর্ষ
তরু শাখে শাখে হইল ধ্বনিত বিহগের কল-গীতি।

সাগরে সাগরে শঙ্খের ধ্বনি মেঘের মন্দ্ররব—
নিনাদিত নভে দেব দুন্দুভি চারণেরা করে স্তব।
নীরব নগরী নিদ্রার ঘোরে
জ্বলকে আলোক দৈবকী ক্রোড়ে
সর্ব্ববিভূতি লয়ে সাজন নামিলেন শ্রীবেশব।

জন্মে যোগমায়া যশোদার কোলে গোকুলের গোপগেহে
কংস কারার অন্ধ কক্ষে সে প্রভাব পড়ে ছেয়ে।
পলকে প্রলয় ঘটে অঘটন
দ্বারপাল সব ঘুমে অচেতন
লৌহ কিলক তিলেকে টুটিল দেখে বসুদেব চেয়ে।

তমসময়ী নিশা চমকে চপলা বহিছে জলদ বারি
যায় ব্রজধামে বসুদেব-বুকে লয়ে শিশু কংসারি;
ধরিল ছত্র অনন্ত ফণা
শিশু শিরে নাহি ঝরে বারিকণা
হইয়া প্রণতা ফেরিলা যমুনা দিল দেব পথ ছাড়ি।

সুপ্তিমগন যত গোপগণ, যশোদা শয্যাপরি
রাখি সুত বসু ধায় মধুরায় কন্যা বুকেতে ধরি;
রজনীর শেষে হেরি সুস্বপন
কংস বক্ষে জাগে কম্পন
অকপোরেতে নন্দ-ভবন আনন্দে উঠে ভরি।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় অন্তই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচারসকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততত্ত্বই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং শ্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

কারণ আত্মা-ব্রহ্মের, দ্বি-প্রকারতা অথবা বহু-প্রকারতা নাই। কেবল অনাত্মারই দ্বিপ্রকারতা ও বহুপ্রকারতা আছে। ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলিলেও তাঁহাকে অদ্বিতীয় বা অদ্বয় বলা যায় না। কারণ সচ্চিদানন্দ শব্দও যেমন তিনটি শব্দেরই সমষ্টি, তদ্রূপ সৎ যাহা,—চিৎ এবং আনন্দ তাহা নহে। ঐ তিন, তিন প্রকার। সুতরাং ঐ তিন ব্রহ্ম বলিলেও, তাঁহাকে অদ্বিতীয় বা অদ্বয় বলা যায় না। যিনি 'কেবল',—যিনি একই প্রকার—তিনিই অদ্বিতীয়। তাঁহাকেই অদ্বয়-ব্রহ্ম-একাত্মা বলা হয়।

একোনষষ্টি সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুঃষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"সর্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষু নিরীক্ষতে।
অজ্ঞানচক্ষুর্নৈবেহ ভাস্বতং ভানুমন্ধবৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে সচ্চিদাত্মা, 'সর্বগ' স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে সগুণ-সক্রিয়ই বলিতে হয়। 'সর্বগ' যিনি, তাঁহাকে নিশ্চয়ই নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। 'সর্বগং সচ্চিদাত্মানং' বলার পর, 'জ্ঞানচক্ষু নিরীক্ষতে' বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা ক্রিয়া হয় না, বলা যায় না। কারণ নিরীক্ষণ করাও ক্রিয়া। অতএব জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই বলা অতি অসঙ্গত। শঙ্করাচার্যের মতে জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে। শঙ্করাচার্যের মতে জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, এবং তাঁহার মতানুসারে জ্ঞান-চক্ষু হইতে দৃষ্টি-ক্রিয়া বিকশিত হয় স্বীকার করিলে, জ্ঞানের নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নির্গুণত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ নিরীক্ষণ করাও গুণ-কর্মের পরিচায়ক। সেই জন্যই, যে জ্ঞান হইতে গুণ-কর্ম বিকাশিত হয়, তাহাকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। শঙ্করাচার্যের আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত চতুঃষষ্টি শ্লোকের প্রথম চরণে জ্ঞান-চক্ষু বলিয়া, দ্বিতীয় চরণে অজ্ঞানচক্ষুও বলিয়াছেন। তবে কি তাঁহার মতে জ্ঞান ও অজ্ঞান অভেদ? তবে কি তাঁহার মতে জ্ঞান ও অজ্ঞান একই পদার্থ? চক্ষু-দ্বারা দর্শনই করা যায়, কিন্তু চক্ষু দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টা এবং যাহাদ্বারা দর্শন করা যায়, উভয়ে অভেদও বলা যায় না। দ্রষ্টাত্মার সহিত জ্ঞান-চক্ষুর অভেদত্বও স্বীকার করা যায় না। সুতরাং জ্ঞান-চক্ষুকে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ আত্মা যাহা নহে, তাহা নিশ্চয়ই অনাত্মা।

ষষ্টি সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"প্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্ব্বমলামুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ম্॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে প্রবণ-মনন প্রভৃতিদ্বারা যে জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়,—নিশ্চয়ই তাহা হ্রাস-বৃদ্ধি-শূন্য নহে, নিশ্চয়ই তাহা অপরিবর্ত্তনীয় নহে, নিশ্চয়ই তাহা অটল নহে এবং নিশ্চয়ই কেবল তাহার এক-প্রকারতাই আছে বলা যায় না; সুতরাং সেই জন্যই তাঁহাকে আত্মা বলিতে পারা যায় না। শঙ্করাচার্য্যেরই মতে, জ্ঞানকে নিত্য-সত্যও বলা যায় না। তাঁহার মতে জ্ঞানও যে নশ্বর, তাহা তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে সিদ্ধান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় ভাগে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সেই শঙ্করাচার্য্যেরই মতে, জ্ঞানকে অনাত্মা না বলিয়া অপর কি বলা যাইতে পারে? উক্ত পঞ্চষষ্টি শ্লোকানুসারে,—

"প্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্ব্বমলামুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ম্॥"

স্বীকার করিলে, 'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' বলা সঙ্গত হয় না। কারণ 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' বলায়, জীবও নিত্য, সত্য, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল এবং শুদ্ধ স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকাংশে ব্রহ্ম এবং জীব অভেদ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে বলিয়াই, জীব কখন মলিন হন ও জীব কখন সবিকার হন্, তাহাও স্বীকার করা উচিত হয় না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত পঞ্চষষ্টি শ্লোকানুসারে প্রবণ-মনন প্রভৃতিদ্বারা উদ্দীপ্ত-জ্ঞানাগ্নি-পরিতাপিত বা জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা পরিশোধিত জীবই, সর্ব্বপ্রকার মালিন্য-মুক্ত বুঝিতে হয়। কিন্তু জীব, প্রবণ প্রভৃতিদ্বারা জ্ঞানাগ্নি-পরিতাপিত না হইলে তাহার সর্ব্ব-মালিন্য বিরহিত হয় বুঝিবার কোন সন্তোষজনক হেতু নাই। সেই জন্যই জীব, প্রবণ প্রভৃতিদ্বারা জ্ঞানাগ্নি পরিতাপিত বা পরিশোধিত হইবার পূর্ব্বে, সর্ব্ব-মালিন্য-বিশিষ্টই থাকেন, বুঝিতে হইবে। সুতরাং নিত্য-নির্ব্বিকার, নিত্য-নিরঞ্জন ও নিত্য-শুদ্ধ-ব্রহ্মের সহিত জীবের কি প্রকারেই বা অভেদত্ব বা ঐক্য স্বীকার করা যাইতে পারে? কোন শাস্ত্রেই ত ব্রহ্মকে, কখন সবিকার এবং কখন নির্ব্বিকার, কখন অঞ্জন-বিশিষ্ট এবং কখন নিরঞ্জন ও কখন অশুদ্ধ এবং কখন বা শুদ্ধ ও বলা হয় নাই। অতএব 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' স্বীকার করিয়া কি প্রকারেই বা, ব্রহ্মও যাহা, জীবও তাহা বলা যাইতে পারে? জীবত্বই মালিন্য,—ইহাই ত সর্ব্বশাস্ত্রের মত। আর আত্মজ্ঞান-প্রভাবে জীবত্ব নষ্ট হইলে, জীবেরও অস্তিত্ব থাকে না। মলিন-জীব বিনষ্ট হইলে, কেবল নিরঞ্জন-শুদ্ধাত্মাই বিদ্যমান থাকেন। উক্ত শ্লোকে সর্ব্ব-মালিন্য-বিরহিত-স্বর্ণের সহিতই, প্রবণ প্রভৃতিদ্বারা উদ্দীপ্ত জ্ঞানাগ্নি-পরিতাপিত বা জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা পরিশোধিত জীবের তুলনা করা হইয়াছে। যেমন সর্ব্ব মালিন্যবিরহিত স্বর্ণের সহিত উক্ত জীবের তুলনা করা হইয়াছে, তদ্রূপ সে স্বর্ণও অবশ্য সর্ব্ব-মালিন্য-বিরহিত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বমালিন্যবিশিষ্টই ছিল। সুতরাং ঐ প্রকার স্বর্ণের সহিত কথিত জীবের তুলনা করায়ও জীব, নিত্য-নির্ব্বিকার, নিত্য-নিরঞ্জন, নিত্য-নির্ম্মল ও নিত্য-শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। জীব যে মহা-মলিন,—জীব যে বিষম-বিকার-বিশিষ্ট,—তাহা কোন্ বুদ্ধিমান না বুঝিতেছেন?

একষষ্টি সিদ্ধান্ত

আত্মবোধ গ্রন্থের ষট্‌ষষ্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"হৃদাকাশোদিতো হ্যাত্মা বোধভানুস্বমোহপহৃৎ।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী ভাতি সর্ব্বং প্রকাশয়ন্॥"

আকাশ যত বড়, তাহাতে উদিত ভানু, তত বড় নহে, আকাশ অপেক্ষা আকাশোদিত ভানু অনেক ছোট। সুতরাং হৃদাকাশ অপেক্ষা তাহাতে উদিত-আত্মা বা বোধ-ভানুও ছোট। তবে সেই আত্মা বা বোধ-ভানুকে সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বধারী কি প্রকারে বলা হয়? শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই, তাহা যে হৃদয়ের সর্ব্ব-স্থানেও ব্যাপ্ত নহে। সুতরাং তাহা শরীরেরও সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত নহে বলা যাইতে পারে। আর আত্মাই বোধ-ভানু স্বীকার করিলে, সেই আত্মাকে বোধ-

কর্ত্তাই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যেমন দ্রষ্টা আর সৃষ্টি অভেদ নয়, তদ্রূপ বোধ-কর্ত্তা আর বোধও অভেদ নয় বলা যাইতে পারে। আত্মাকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে বোধ-ভানু বলা যাইতে পারে না। কারণ উক্ত শ্লোকানুসারেই বোধ-ভানু সগুণ-সক্রিয়। কারণ বোধ-ভানুই তম অপহরণ করেন। তম-অপহরণ করাও কার্য্য। কোন প্রকার কার্য্য যাঁহা-দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাঁহাকে অবশ্যই সগুণ-সক্রিয় বলিতে হয়। ভানু উদয়ের স্থান আকাশ। ভানু আকাশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই উদিত হন্ না। আকাশে যে ভানু উদিত হন্, কেবল সেই 'ভানুই' সত্য বলা হয় নাই; ভানুও সত্য এবং ভানু যেখানে উদিত হন্, সে স্থানও অবশ্যই সত্য। বোধ-ভানু হৃদাকাশে উদিত হন্, বলা হইয়াছে। সেইজন্য কেবল আত্মা বা বোধ-ভানুকেই সত্য বলিতে পারা যায় না। সেই ভানু যে হৃদাকাশে উদিত হন্, সে হৃদাকাশও সত্য; কারণ হৃদাকাশ ব্যতীত, স্বয়ং আত্মা বা বোধ-ভানু উদিত হন্, বলা হয় নাই। তদ্ব্যতীত উক্ত শ্লোকে হৃদাকাশকে অসত্য বলা হয় নাই। উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ শঙ্করাচার্য্যের সহিত আত্মা বা বোধ-ভানু অভেদ, উক্ত শ্লোকেও বলা হয় নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বধারী এবং তিনি সর্ব্ব প্রকাশ করেন; সুতরাং সর্ব্বের অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত ষষ্টিষষ্টি শ্লোকে সর্ব্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে তিনি সর্ব্বকে অসত্য বলেন নাই বলিয়া, সর্ব্বও সত্য স্বীকার করিতে হয়। উক্ত শ্লোকে তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলায় তাঁহার এক প্রকার সীমা নির্দ্দেশ করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অনেক গ্রন্থের অনেক স্থলেই আত্মাকে সর্ব্ব বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত ষষ্টিষষ্টি শ্লোকানুসারে, সেই আত্মাকে সর্ব্ব-ব্যাপী কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? যাঁহাতে ব্যাপ্ত ও যিনি ব্যাপ্ত বা ব্যাপী, উভয়ে কখনই অভেদ নহেন। সুতরাং আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলায়, সর্ব্বের সহিত সেই সর্ব্বব্যাপী-আত্মার অভেদত্ব, ঐক্য বা অদ্বৈততা স্বীকার করা যায় না। আত্মাকে উক্ত শ্লোকেই সর্ব্বধারী বলা হইয়াছে। সর্ব্বধারী ও সর্ব্ব অভেদ, স্বীকারই করা যায় না। সুতরাং সর্ব্ব ও সর্ব্বব্যাপী, এবং সর্ব্ব ও সর্ব্বধারী, পরস্পর অভেদ নহে। উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মা প্রকাশ করেন। যিনি প্রকাশ করেন এবং যাহা প্রকাশ করা হয়, উভয়ে কখনই অভেদ নহে। অতএব সেইজন্যও সর্ব্বের সহিত আত্মা বা বোধ-ভানুর অভেদত্ব, ঐক্য বা অদ্বৈততা নাই।

দ্বি-ষষ্টি সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধ নামক গ্রন্থের সপ্তষষ্টি বা শেষ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"দিগ্‌দেশকালাদ্যনপেক্ষ সর্ব্বগং শীতাদিহৃদ্বিত্যসুখং নিরঞ্জনম্।
যঃ স্বাত্মতীর্থং ভজতে বিনিষ্ক্রিয়ঃ স সর্ব্ববিৎ সর্ব-গতোঽমৃতো ভবেৎ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে 'যঃ' আর শঙ্করাচার্য্য, অভেদ বুঝিবার কোন কারণ নাই। কারণ, উক্ত শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং এবং শ্লোকোক্ত যিনি, পরস্পর যে অভেদ, তাহা প্রতিপন্ন করা হয় নাই। উক্ত শ্লোকীয় 'যঃ' 'সর্ব্বগং'। সুতরাং 'যঃ'কে বিনিষ্ক্রিয় বলা উচিত নয়; কারণ 'সর্ব্বগং' অর্থে সর্ব্বগামী। সর্ব্বগামী যিনি, তাঁহাকে কি প্রকারে বিনিষ্ক্রিয় বা ক্রিয়াবিহীন বলা যাইতে পারে? 'সর্ব্বগ' বা সর্ব্বগামী যিনি, তাঁহাকে সগুণ সক্রিয় বলাই উচিত। উক্ত শ্লোকানুসারে যিনি দিগ্‌দেশকাল প্রভৃতির অপেক্ষা করেন না, সর্ব্বগামী-শীত প্রভৃতি-হারী, নিত্য-সুখ, নিরঞ্জন এবং নিজ আত্ম-তীর্থ ভজনা করেন, তিনিই সর্ব-বিৎ সর্ব-গত এবং অমৃত হন্। উক্ত শ্লোকানুসারে যিনি স্বাত্ম-তীর্থ ভজনা করেন, তাঁহার অবশ্যই অদ্বৈত জ্ঞান নাই। অদ্বৈতজ্ঞান স্ফুরিত হইলে আর ভজনা করিতে হয় না। ভজনা, দ্বৈতবোধবশতই করা হইয়া থাকে। ভক্তি-প্রতিপাদক নানা শাস্ত্রানুসারে ভক্তিভাবে ভজনা করাই প্রসিদ্ধ। উক্ত শ্লোকে স্বাত্ম-তীর্থ-ভজনার উল্লেখ আছে। সেইজন্য ঐ স্বাত্ম-তীর্থ-ভজনার সঙ্গে ভক্তিরও

সংশ্রব আছে বলিতে হইবে। যে হেতু, ভক্তি ব্যতীত ভজনার প্রবৃত্তিই হয় না। যাঁহার ভজনার প্রবৃত্তি আছে অথবা যিনি ভজনাশীল, তাঁহার ভক্তির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতেও ভক্তি উপেক্ষার সামগ্রী নহে। তিনি তাঁহার বিবেক-চূড়ামণি নামক গ্রন্থেও ভক্তির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে 'মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরিয়সী।' শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেবপ্রণীত 'অদ্বৈতানুভূতি' গ্রন্থেও ভক্তি-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা এই প্রকার,—

"স্বর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিং।
নির্মুক্তি বন্ধনমপারসুখাম্বুধিং
শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি॥"

ভক্তি-ভাববশতই প্রণাম করা হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেবও বিশ্বেশ্বর-শ্রীবল্লভকে প্রণাম করিয়াছিলেন। অতএব নিশ্চয় তাঁহারও ভক্তি-ভাব ছিল। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের শেষ শ্লোকেও ভক্তি-বিষয়িনী কথা আছে। উক্ত শেষ শ্লোক এই প্রকার—

"পরিশঙ্কং মনো যেষাং কেবলোঽহমিতি স্থিতঃ।
গুরুদৈবতভক্তানাং সর্বেষাং সুলভো ভবেৎ॥ ১৪১॥"

উক্ত শ্লোকে যেমন গুরুদৈবত-ভক্তগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ মণিরত্নমালা নামক গ্রন্থেও গুরুভক্ত-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে, 'বিশ্বস্ত যো যো গুরুভক্ত এব'। উক্ত গ্রন্থের সপ্তদশ শ্লোকেও ভক্তি সম্বন্ধিনী প্রসঙ্গ আছে, তাহা এই প্রকার—

"মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতবিধেয়ং,
সৎসঙ্গতি র্নির্মমতেশভক্তিঃ।"

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত

চতুর্থ ভাগ

অষ্টাবক্র-সংহিতোক্ত প্রথম প্রকরণ সম্বন্ধে মত।

প্রথম সিদ্ধান্ত

উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ব্রূহি মে প্রভো॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে রাজর্ষি জনকের প্রভু অষ্টাবক্র। উক্ত শ্লোকানুসারে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়, অষ্টাবক্রের প্রতি জনকের দাস্য-ভাব ছিল। দাস্য-ভাব দ্বৈতবোধক। দাস্য-ভাব ভক্তিবশতই স্ফূরিত হইয়া থাকে। জনকের দাস্য-ভাব ছিল। সেইজন্য তিনি, অবশ্যই ভক্ত ছিলেন স্বীকার করিতে হয়। আপনাকে দাস-বোধ করিয়া অন্যকে প্রভু যিনি বোধ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দ্বৈত-বাদী। জনকের জ্ঞান, মুক্তি এবং বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই জন্যই তিনি অষ্টাবক্রকে ঐ তিন লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐ তিন যদি রাজর্ষি জনকের মধ্যে নিয়ত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার ঐ তিন লাভের প্রয়োজন হইত না,—তাহা হইলে ঐ তিন, তাঁহাতে স্ফূরিত হইবারই প্রয়োজন হইত। সেইজন্য ঐ তিন জনকের মধ্যে ছিল, বলা যায় না। জনক নিজে ঐ তিন ছিলেন না। তাহা হইলে জনকের ঐ তিনে প্রয়োজন হইত না। ঐ তিন তিন প্রকার। জনক এই প্রকার। অদ্বৈতমতানুসারে জনক আত্মা। আত্মা যাহা, তাঁহার বহু-প্রকারতা অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করেন না।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

দ্বিতীয় শ্লোকে জনকের প্রতি অষ্টাবক্র কর্তৃক বলা হইয়াছে,—

"মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত ! বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষ সত্যং পীযূষবদ্ভজ॥"

অষ্টাবক্রের মতে মুক্তিলাভেচ্ছা করিলে, বিষয়সকল বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হয়। মুক্তি আত্মা নহে। মুক্তিকে আত্মা কোন শাস্ত্রেই বলা হয় নাই। মুক্তিও অনাত্মা, বিষয়সকলও অনাত্মা। অষ্টাবক্রের বিবেচনায়, জনকের

পক্ষে অনাত্মা বিষয়সকল পরিত্যাজ্য এবং অনাত্মা মুক্তি লাভের প্রয়োজন হইয়াছিল। মুক্তিও অনাত্মা। সেইজন্য উহাও আত্মজ্ঞানীর পক্ষে প্রলোভনের সামগ্রী নহে। অদ্বৈত মতে আত্মজ্ঞানীই আত্মা আত্মা নিত্য; —সেইজন্য আত্মজ্ঞানীও নিত্য। অতএব সেইজন্য আত্মার বন্ধন স্বীকার করা যায় না। আত্মার বন্ধন স্বীকার করা যায় না বলিয়া, নিত্যাত্মজ্ঞানী আত্মার মুক্তির প্রয়োজন হয় না। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার ক্ষমা, আর্জব দয়া, সন্তোষ ও সত্যের প্রয়োজন হয় না। ঐ সকলও আত্মা নহে। সেইজন্য ঐ সকলও অদ্বৈতমতানুসারে অনাত্মার কতক প্রকার বিকাশ। সুতরাং অবদ্ধ-অমুমুক্ষু আত্মার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই। উক্ত প্রকার আত্মা ব্যতীত, অন্যের ঐ সকলে প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে। জনকও অনাত্মা বস্তুটি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জনকের ঐ সকলে প্রয়োজন হইয়া থাকিতে পারে। আত্মা নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। সেইজন্য তাঁহার ক্ষমা, আর্জব, দয়া, সন্তোষ ও সত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই,—অবদ্ধ-নির্লিপ্ত আত্মার মুক্তির কারণ ঐ সকলে প্রয়োজনই নাই। সেইজন্য তাঁহার ঐ সকলের ভজনাও করিতে হয় না। অষ্টাবক্র জনককে ঐ সকল ভজনা করিতে বলিয়াছেন। ভজনা দ্বৈতজ্ঞানাত্মিকা। বৈষ্ণব মতে শ্রদ্ধা, ভক্তি অথবা প্রেমাত্মক কোন ভাবদ্বারা ভগবানের ভজনা করিতে হয়। ভজনা অদ্বৈত-জ্ঞানাত্মিকা নহে।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত

অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম প্রকরণের দ্বিতীয় শ্লোক মতে বিষবৎ-বিষয় সকল পরিত্যাগে, ক্ষমা, আর্জব, দয়া সন্তোষ ও সত্য ভজনা করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্য অনেক যোগীর মতেই ক্ষমা, আর্জব, দয়া ও সত্য প্রথম যোগাঙ্গ-যমের অন্তর্গত। অষ্টাঙ্গ যোগের একাঙ্গ যম। সেই যমের দশ-প্রকার বিকাশ। সেই দশ প্রকার বিকাশের অন্তর্গতই ক্ষমা, আর্জব, দয়া ও সত্য। অতএব সেইজন্য অষ্টাবক্র যাজ্ঞবল্ক্য জনককে যোগাভ্যাস করিতেই বলিয়াছিলেন, প্রমাণিত হইয়াছে। সেইজন্য অষ্টাবক্রের, যোগ অনভিজ্ঞ ছিলেও বলা যায় না। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জবং।
ক্ষমা ধৃতিমিতাহারঃ শৌচঞ্চেতে যমা দশ ॥"

প্রথম যোগাঙ্গ-যমের দশ প্রকার বিকাশের মধ্যে অহিংসাই প্রথম বিকাশ। অহিংসা নানাপ্রকারে আচরিত হইতে পারে। কর্ম্মদ্বারা অহিংসা করা যাইতে পারে, মনদ্বারা অহিংসা করা যাইতে পারে ও বাক্যদ্বারা অহিংসা করা যাইতে পারে। ঐ বিষয়ে মহাত্মনী গার্গীর প্রতি মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসাব্রতেন যোগিভিঃ ॥ ৫১ ॥"

যমের দ্বিতীয়-বিকাশ সত্য। যে সত্য-বাক্যদ্বারা কোন জীবের অনিষ্ট হয় না তাহাই সত্য। সত্য সম্বন্ধে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মত,—

"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণং ॥ ৫৩ ॥"

যমের তৃতীয় বিকাশ অস্তেয়। অস্তেয় সম্বন্ধে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মত,—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিঃস্পৃহা।
অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫৪ ॥"

প্রকৃত অস্তেয়ী-যোগী কর্ম্মদ্বারা পরদ্রব্য গ্রহণেচ্ছা করেন না, মনদ্বারা পরদ্রব্য গ্রহণেচ্ছা করেন না এবং বাক্যদ্বারা পরদ্রব্য গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করেন না। যমের চতুর্থ বিকাশ ব্রহ্মচর্য্য। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে ॥ ৫৫ ॥"

সর্ব্বদা, সর্ব্বত্রে ও সর্ব্বাবস্থাতে মন, বাক্য এবং কর্ম্ম-দ্বারা মৈথুনত্যাগই ব্রহ্মচর্য্য। নিষ্ঠ ব্রহ্মচারীর মনেও মৈথুনেচ্ছা হয় না, তিনি বাক্যদ্বারাও মৈথুনেচ্ছা প্রকাশ করেন না, কর্ম্মদ্বারাও তাহা কর্ত্তৃক মৈথুন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যমের পঞ্চম বিকাশ, দয়া। প্রথমত দয়া-

বৃত্তির উদয় মনে হইয়া থাকে। সেই উদয় হইতে দয়া করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। দয়া করিবার ইচ্ছা হইলে, তাহা বাক্য অথবা কর্ম্মদ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে। প্রসিদ্ধ যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য দয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"দয়া ভূতেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বত্রানুগ্রহস্তথা।
বিহিতেষু তদন্তেষু মনোবাক্কায় কর্ম্মনা॥"

যমের ষষ্ঠ বিকাশ আর্জ্জব। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-সম্বন্ধে এক প্রকার ভাবই আর্জ্জব। প্রকৃত আর্জ্জবসম্পন্ন যোগী ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়কেই প্রাকৃত জানেন। সেইজন্য তিনি উভয়কেই সম বোধ করেন। ঐ উভয়ই প্রাকৃত বলিয়া তিনি ঐ উভয়েতেই সম-ভাবে রত নহেন্ এবং তিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েতেই লিপ্ত নহেন্। আর্জ্জব সম্বন্ধে মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,—

"প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা এবক্রপত্বমার্জ্জবং।"

যমের সপ্তম বিকাশ, ক্ষমা। যে বৃত্তি প্রভাবে দোষীর দোষ গ্রহণ করা না হয়, তাহাই ক্ষমা। ক্ষমাশীল-সম্বন্ধে প্রিয়াপ্রিয় সমান। ক্ষমার সহিত দয়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। যাহার ক্ষমা আছে, তাঁহারই দয়া আছে। দয়াশূন্য, ক্ষমাশীল নহেন্। ক্ষমা সম্বন্ধে মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছিলেন,—

"প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্ব্বেষু সমত্বং যদ্ধরীরিণাং।
ক্ষমা সৈবেতি বিদ্বদ্ভির্গদিতা বেদবাদিভিঃ॥ ৬৪"

যমের অষ্টম-বিকাশ, ধৃতি। যে বৃত্তি স্ফুরিত হইলে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুগণের বিয়োগে, শোকে এবং দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না, যে বৃত্তি স্ফুরিত হইলে সম্পূর্ণ অর্থ-হানি ও সম্ভ্রম-হানি হইলেও মন বিচলিত হয় না, সর্ব্বাধিপত্য পাইলেও লাভ বোধ হয় না, আনন্দ-বোধ হয় না, যে বৃত্তি স্ফুরিত হইলে কোন কুবৃত্তি কিংবা কোন কুবৃত্তি আত্মার উপর আধিপত্য করিতে পারে না, তাহাই ধৃতি। সেই ধৃতির সঙ্গে ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধ। ধৃতি সম্বন্ধে মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্যের মত,

"অর্থহানৌ চ বন্ধূনাং বিয়োগে চাপি সম্পদি।
ভূয়ঃ প্রাপ্তৌ চ সর্ব্বত্র চিত্তস্য স্থাপনং ধৃতিঃ॥ ৬৫॥"

যমের নবম বিকাশ, মিতাহার। মিতাহার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সে সম্বন্ধে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মত এই প্রকার—

"অষ্টৌ গ্রাসা মুনের্ভক্ষ্যাঃ ষোড়শারণ্যবাসিনাং॥৬৬॥
দ্বাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্য তদর্দ্ধৈঃ ব্রহ্মচারিণাং।
তেষামন্নং মিতাহারস্তয়ামন্নভোজনং॥ ৬৭॥"

যমের দশম বিকাশ বা শেষ বিকাশ, শৌচ। শৌচই শুদ্ধি। শৌচ বা শুদ্ধি দ্বিবিধ। সেই দ্বিবিধের মধ্যে দুই প্রকারই প্রধান,—বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি। দেহ শুদ্ধ করিতে হইলে, বহিঃশুদ্ধির প্রয়োজন হইয়া থাকে। মলমূত্র বমনোচ্ছিষ্ট প্রভৃতিবর্জ্জিত মৃত্তিকা ও জলদ্বারা দেহ-শুদ্ধি হইতে পারে। অন্তর বা অন্তরাত্মা শুদ্ধ করিতে হইলে, ঐ সকলদ্বারা শুদ্ধ হয় না। অন্তর শুদ্ধ করিবার জন্য জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। প্রধানতঃ তিন প্রকার অন্তঃশুদ্ধি। চিত্ত-শুদ্ধি, বুদ্ধি-শুদ্ধি এবং আত্ম-শুদ্ধি। শুদ্ধি বা শৌচ সম্বন্ধে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—

"শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরস্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরং॥ ৬৮॥
মনঃশুদ্ধিশ্চ বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মেণাধ্যাত্মবিদ্যয়া।
অধ্যাত্মবিদ্যা ধর্ম্মশ্চ শিষ্টাচারেণ চানঘে॥ ৬৯॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু সর্ব্বৈর্নিঃশ্রেয়সার্থিভিঃ।
শুচয়ঃ প্রতিসম্পন্না মাত্মা বাঅনসাদিভিঃ॥ ৭০॥"

চতুর্থ সিদ্ধান্ত

মহাত্মা অষ্টাবক্র দ্বিতীয় শ্লোকে রাজর্ষি জনককে প্রথম যোগাঙ্গ-যমসম্বন্ধীয় কয়েকটি অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। তিনি উক্ত রাজর্ষিকে দ্বিতীয় যোগাঙ্গ নিয়মসম্বন্ধে কেবলমাত্র তোষ বা সন্তোষকেই অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। অনেক যোগ-শাস্ত্রেই নিয়মের উল্লেখ আছে। মুমুক্ষু-ব্যক্তিদিগের পক্ষে অনেকেরই মতে, নিয়ম বিশেষ প্রয়োজনীয়। অষ্টাবক্রও জনককে নিয়মের একটি অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছিলেন। সম্যক্ নিয়ম কি প্রকার, তাহা অনেকের জানিবার অভিলাষ হইতে পারে। সেইজন্য সম্যক্ নিয়মই এইস্থানে বিবৃত হইবে। যে যোগ-বল দ্বারা মনোবুদ্ধি সংযত রহে, তাহাই নিয়ম। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিয়ম সম্বন্ধে এই প্রকার

লিখিত হইয়াছে,—

"তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বরপূজনং।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো হুতং।
এতে চ নিয়মাঃ প্রোক্তাস্তাংশ্চ সর্ব্বান্ পৃথক্ পৃথু
বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরশোষণং প্রাহুস্তপসাং তপ উত্তমং॥ ২॥
যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং মনঃ পুংসো ভবেদিহি
যা ধীস্তাদৃগ্বরঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণং।
ধর্ম্মার্থেষু বিশ্বাসো যত্তদাস্তিক্যমুচ্যতে॥ ৪॥
শ্রদ্ধান্বিতং ধনকালমন্ত্রা যৎ প্রদীয়তে।
অধিভ্যঃ শ্রদ্ধয়া গুরুং দানমেতদুদাহৃতং॥ ৫॥
যঃ প্রসন্নত্বভাবেন বিষ্ণুং বা রুদ্রমেব চ।
যথাশক্ত্যার্চ্চনং তস্য এতদীশ্বরপূজনং॥ ৬॥
রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগ্দুষ্টানৃতাদিভিঃ।
হিংসাদিরহিতঃ কায় এতদীশ্বরপূজনং॥ ৭॥
সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং বেদান্তশ্রবণং বুধৈঃ।
দ্বিজবৎ ক্ষত্রিয়স্যোক্তং সিদ্ধান্তশ্রবণং বুধৈঃ॥ ৮॥
বিশাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি শীলবৃত্তমতাং সতাং।
শূদ্রাণাঞ্চ স্ত্রিয়শ্চৈব স্বধর্ম্মস্য তপস্বিনাং।
সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং পুরাণশ্রবণং বুধৈঃ॥ ৯॥
বেদলৌকিকমার্গেষু জুগুপ্সিতং কর্ম্ম যদ্ভবেৎ।
তস্মিন্ ভবতি যা লজ্জা হ্রীস্তু সৈবেতি কীর্ত্তিতা॥১০॥
বিহিতেষু চ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যা সা মতির্ভবেৎ॥ ১১॥
গুরুণা চোপদিষ্টোঽপি বেদবাহ্যবিবর্জ্জিতঃ।
বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ॥ ১২॥
অধীত্য বেদং সূত্রং বা পুরাণং সেতিহাসকং।
এতেষ্বধ্যয়নং তস্য অভ্যাসেন জপঃ স্মৃতঃ॥ ১৩॥
জপশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকো মানসস্তথা।
বাচিকোপাংশু উচ্চৈশ্চ দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৪॥
মানসো মনসা ধ্যানং বেদাদ্যৈর্বিধ্যমান্বিতঃ
উচ্চৈর্জপাদুপাংশুশ্চ সহস্রগুণমুচ্যতে॥ ১৫॥
মানসশ্চ তথোপাংশোঃ সহস্রগুণমুচ্যতে।
উচ্চৈর্জপশ্চ সর্ব্বেষাং যথোক্তফলদো ভবেৎ।
নীচঃ শ্রুতো নচেৎ সোঽপি শ্রুতশ্চেন্নিষ্ফলো ভবেৎ॥১৬॥
ক্ষবিষ্ঠসোঽহমিত্যেবঞ্চ ধ্যায়ন্ মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বদা।
যত্র মন্ত্রং জপেৎ যাগি তদেব হি ফলপ্রদং॥ ১৭॥
প্রসন্নগুরুণা পূর্ব্বমুপদিষ্টমভীপ্সিতং।
সর্ব্বার্থসাধনং সিদ্ধ্যৈ মন্ত্রগ্রহণং ব্রতং॥ ১৮॥"

উক্ত নিয়মাচরণ প্রোক্তসমূহের ভাবার্থ লিখিত হইতেছে,—"তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর-পূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, হ্রী বা লজ্জা, মতি, জপ এবং হোম বা যজ্ঞ, এই নয়টিই নিয়ম। ঐ সকলের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে শ্রবণ কর—বিধি-নির্দ্দেশিত পন্থাবলম্বনে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ প্রভৃতিদ্বারা শরীরশোষণই সমস্ত তপাপেক্ষা উত্তম তপ। যে শক্তি-প্রভাবে যদৃচ্ছালাভে পুরুষের মন একভাবে থাকে, ঋষিগণের মতে তাহাই সুলক্ষণসম্পন্ন সন্তোষ। ধর্ম্মাধর্ম্মে বিশ্বাসই আস্তিক্য। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অল্প বা অধিক ন্যায়ার্জ্জিত ধন, ধনার্থীকে প্রদত্ত হইলে, তাহাকেই দান কহা যায়। যাঁহাশক্তিসহকৃত ভক্তি-ভাব-প্রসূতা প্রসন্নতার সহিত বিষ্ণু কিম্বা রুদ্রদেবের যে অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে, তাহাই ঈশ্বর-পূজা। (বিষ্ণু এবং রুদ্র উভয়ই ঈশ্বর। একই ঈশ্বরের দ্বি-প্রকার মূর্ত্তি-ভেদই বিষ্ণু এবং রুদ্র নাম হইয়াছে)। হৃদয়ের রাগাদি-রাহিত্য, বাক্যের অসত্যাদি দোষ-রাহিত্য, শরীরের হিংসাদি রাহিত্যও ঈশ্বর-পূজা। (ঐ প্রকার অবস্থাতেই প্রকৃত মানসী-পূজা হইয়া থাকে।) বেদান্ত-শ্রবণই বুধগণ-সম্মত সিদ্ধান্ত-শ্রবণ। দ্বিজের ন্যায় ক্ষত্রিয়েরও কথিত-সিদ্ধান্ত শ্রবণে অধিকার আছে, তাহাও বুধগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। কোন বুধ, সদ্বৃত্তি-সম্পন্ন-সাধু বৈশ্যগণের পক্ষেও সিদ্ধান্ত-শ্রবণ উপযোগী বিবেচনা করেন। বুধগণের মতে তপস্বী-শূদ্রগণের পক্ষে, সর্ব্ব-বর্ণের তপস্বিনী স্ত্রীগণের পক্ষে নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণ ও পুরাণ-শ্রবণই সিদ্ধান্ত-শ্রবণ। বেদ ও লোকাচারানুসারে যাহা জুগুপ্সিত কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠানে যে লজ্জাবোধ হয়, তাহাই যোগ-শাস্ত্রীয় 'হ্রী'। বিহিত সর্ব্ব-বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহাই মতি। বৈদিক বহির্ম্মার্গাদি-বিবর্জ্জিত স্বীয় গুরূপদিষ্ট ব্যবস্থানুসারে মন্ত্রাভ্যাসই জপ।

ক্রমশঃ

দুইটী সেবা-মনের কথা

॥ প্রত্যক্ষদর্শী ॥

মানুষের জীবনের দুটি দিক আছে; একটি, নিজকে সঙ্কুচিত রাখিয়া নিজের ও পরিবারের মঙ্গলসাধন; অপর একটি নিজকে সম্প্রসারিত করিয়া সমাজের হিত-সাধনে আত্ম-নিয়োগ। সেজন্য পরলীয় ভাষায় বলা হয়,—Expansion is life, contrction is death। যিনি সংসারের কাজ করিয়া বাহিরের কাজে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারেন, তাহার মধ্যে আত্মার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। আমাদের মেয়েদের এই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের পরিচিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের বধূ শ্রীমতী প্র. সরকার নদীয়া জেলায় মহিলা-সমাজ-কল্যাণে নিবেদিত-প্রাণ নীরব কর্মী। তিনি কৃষ্ণনগর মহিলা-সমিতির সভ্যারূপে কাজ আরম্ভ করেন। কৃষ্ণনগরের মহিলা শিল্প বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদিকার ভারপ্রাপ্ত হইয়া নিজের ও সহকর্মীদের চেষ্টায় এবং শ্রীযুক্ত মজুমদারের সহায়তায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ২৫,০০০ টাকা অনুদান ও রাজ্য সমাজ কল্যাণ পর্ষদের নিকট ৫,০০০ টাকা অনুদান পাইয়া বিদ্যালয়ের একটি মনোরম গৃহ নির্মাণ করাইয়াছেন। এই বিদ্যাভবনে ছাত্রীদিগকে—কুমারী, কুলবধূ ও বিধবা—নানাবিধ শিল্প-কলা শিক্ষা দান করেন। লেডী ব্যাব্রোর্ণ ডিপ্লোমার জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করা হয়। এখানকার তৈয়ারী 'খেস্' আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে অন্যান্য বিদ্যালয় কর্তৃক।

শ্রীমতী সরকার P. I. C-র সভ্যারূপে জেলার অভ্যন্তরে গ্রামে যাইয়া পল্লীবধূর পর্ণকুটীরে সন্তানসম্ভবা ছিন্ন-বসনা মায়েদের দ্বারে দ্বারে maternity bag বিতরণ করিয়া তাহাদের আশীর্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। সুদূর পল্লীবালার কাছে ইহা অপ্রত্যাশিত। সমাজ-সেবিকাদের মধ্যে প্রাণের সকার করিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। কর্মের সহিত আনন্দ যুক্ত হইয়াছিল।

এইরূপ কর্মের মধ্য দিয়া তিনি দেখাইলেন, নিঃস্বার্থ কর্মে অনির্বচনীয় আনন্দ নিহিত আছে। অর্থোপার্জন বা উচ্চপদ জীবনের মাপকাঠি নয়। Man does not live by £. s d. মানুষের একটি উচ্চতর সত্তা আছে।

সমাজ-কল্যাণের কাজের সঙ্গে তিনি সংসারের কাজ করিয়া ছেলে-মেয়ে মানুষ করিয়াছেন, গরীব দুঃখীকে সাধ্যমত দান করিয়াছেন।

আমাদের নারী-সমাজের উদ্দেশ্যে একটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরা হইল। "উজ্জ্বল-ভারত" গঠনে গঠনমূলক কাজের প্রয়োজন মকে বড় বড় বক্তৃতা ও ঢক্কা-নিনাদ অপেক্ষা অনেক বেশী।

* * *

শিক্ষকমহাশয় ছাত্রছাত্রী-হিতে নিবেদিত-প্রাণ এ যুগে অবিশ্বাস্য। একজন শিক্ষক মহাশয়ের দিনলিপি হইতে আমরা কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করিব। শিক্ষক মহাশয়কে আমরা বর্ত্তমান নিবন্ধে কু. না. স-নামে অভিহিত করিব।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে প্রায় তিন বৎসর ঘরে ও বাহিরে অক্লান্ত সেবার পর সাম্প্রদায়িক কুফাটে তাঁহাকে বলি দেওয়া হইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকল ছাত্রকেই তিনি সমান চোখে দেখিতেন। ইহাই তাঁহার অপরাধ! সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরেজ D. P. I.-কে বাধ্য করিলেন—কু. না. স-কে বরখাস্ত করিতে। হেডমাষ্টার, ম্যানেজিং কমিটী ও ইংরেজ স্কুল-পরিদর্শকের সুপারিশ ভাসিয়া গেল। নিঃস্বার্থ সেবা ও ভালবাসার এই পরিণতি! সংখ্যালঘু

শিক্ষকরা বিস্মিত হইতেন, আমাদের ছেলেরা হিমু শিক্ষককে কেন এত ভালবাসে। ভালোবাসারো যেন জাতিধর্ম আছে!

তাঁহার শিক্ষা-গুরু ছাত্রবৎসল আর, এন, গিলক্রাইষ্ট -এর চেষ্টায় খুলনায় (অধুনা পূর্ব-পাকিস্থানে) তিনি নূতন পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি extra curricular কাজরূপে বিদ্যালয়ের সমবায় ভাণ্ডারের অবৈতনিক সম্পাদক রূপে ব্রতী হইলেন। ভাণ্ডারের দুইটি বিভাগ ছিল—(১) বুকস এণ্ড ষ্টেশনারী (২) চাউল। দুইং মাষ্টার শ্রীকে, পাল চাউলের লেন-দেন ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। একদিন সারা বাংলার সমবায় বিভাগের রেজিস্ট্রার মিঃ ষ্টিফেন আই, সি, এস বিদ্যালয়ে আচমকা দর্শন দিলেন। প্রধান শিক্ষক খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি সাহেবকে চাউল-বিভাগ না দেখাইয়া বুকস এণ্ড ষ্টেশনারী বিভাগ দেখাইলেন। পরিদর্শক খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এই বিভাগের কার্যকলাপ দেখিয়া। তিনি চাউল বিভাগ দেখিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন না। হেডমাষ্টার জানিতেন এই বিভাগের কার্যে গলদ আছে। ষ্টেশনারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উভয় বিভাগের জন্য দায়ী (সরকারী ভাবে) ছিলেন। যদি চাউল-বিভাগের গলদ উদ্ঘাটিত হইত শেষোক্তের চাকুরী যাইত ও তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইত—একের দোষে অপরের শাস্তি! Honesty pays in the long run;—সততা ও নিঃস্বার্থ সেবা বিফল হয় না। পরে সমবায় বিভাগের হিসাব-পরিদর্শক কয় দিন ধরিয়া ষ্টোর ও হিসাব দেখিয়া প্রধান শিক্ষক ও ভূ, না, স'-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন তাঁহার অডিট রিপোর্টে।

শীতকাল;—বড় দিনের ছুটি। ভূ, না, স, তখন গ্রাম কৃষ্ণনগরে। সহরের উপকণ্ঠে বন-জোপের মধ্যে ইটের ভগ্ন গৃহ। সেখানে বাস করেন তাঁহার এক দুঃস্থ ছাত্র ও তাহার অন্ধ পিতা। ছেলেটি অন্ধের যষ্টি!—সন্ধ্যাগমে শিবারব; চারিদিকে গাছপালা—মাষ্টার মশাই (ভূ. না. স.) তাঁহাদের আবাসে হাজির—বার্ত্তা লইতে। বালকের পিতা শীতে কাঁপিতেছে; অঙ্গে কোন আবরণ নাই একখানি মলিন বস্ত্র ব্যতীত। একটি প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল—বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। বলিলেন,—সারাদিন উপবাসী থাকাতাবে। তিনি বলিলেন, মাষ্টার মহাশয়, আপনি ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। পরদিন মাষ্টার মশাইয়ের নির্দেশ মত তাহার বাড়ী আসিয়া বৃদ্ধ হাজির। তাঁহাকে একখানি কম্বল, কিছু অর্থ ও চাউল প্রভৃতি দেওয়ায় তিনি আনন্দাশ্রু পাত করিলেন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। এ সব কাহিনী সরকারের সেরেস্তায়, ডি, পি, আই অফিসে থাকে না। —থাকে মানুষের হৃদয়ে। জাগতিক দিক্ হইতে এ সবের কোন মূল্য নাই। পরবর্ত্তী কালে ছেলেটি 'মানুষ' হইয়াছিল। এখন সে ও তাহার পিতা স্বর্গে।

অঙ্কুর

॥ শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী ॥

চিরন্তনী কামনায়
উদ্গত অঙ্কুর নিত্য বিকশিতে চায়।

জীবনের প্রবাহ লৈকতে পলিভরা মৃত্তিকায়
জীবন-ধারার প্লাবন লেখা অবিরল বয়ে যায়।
সে প্রবাহে নিত্য সঞ্চারিত পলিমাটি রেখা জমে
অন্তরে সে মৃত্তিকার কামনায় অঙ্কুর উদ্গমে।

চাহে বায়ু, চাহে আলো—রূপরস গন্ধভরা বুকে
অন্তরে ঘুমন্ত কুসুম-কোরক কিশলয় মুখে।

চিরন্তনী কামনায়
উদ্গত অঙ্কুর নিত্য বিকশিতে চায়—
অন্তরের সুন্দরের স্পর্শ-কামনায়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৭২)

ঠাকুর, তুমি আত্ম-প্রতিষ্ঠ, স্বমহিমায় স্বমাধুর্যে তুমি স্বপ্রতিষ্ঠ। তুমি কি 'স্বাং প্রকৃতিং' অধিষ্ঠায় এই বিশ্বের বুকে সম্ভূত হইবে না? বিশ্ব-প্রতিষ্ঠ হইবে না? আমাকে তোমার স্ব-প্রকৃতি করিয়া লও। আমি তোমার স্ব হইব, প্রকৃতি হইব। তুমি পরম ধর্ম, পরম অর্থ, পরম কাম ও পরম মোক্ষ। তোমাতে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রতিষ্ঠিত, ঘনীভূত। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লইয়া যত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তুমি তাহার মূর্তিমান সমাধান। তুমিই ধর্ম-মূর্তি, মূর্তিমান পরম অর্থ, পরম কাম-মূর্তি, মোক্ষ মূর্তি। আমার জীবন তোমার হউক, তোমার জীবন আমার হউক। ১১।৹টার পর রেণু বাহির হয়...৫টার মধ্যে ফেরে। আমি ৪।৹টার পর মঠে যাই। মঠে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্ম-সমস্যা' (সুদর্শন) পাঠ করেন তারিণীবাবু।...খগেনবাবুর আপত্তি। ইহা নাকি খুব pessimistic। অথচ ইহাই তো বর্তমান যুগের diagonisis। ইহা না বুঝিলে নিত্যগোপালের অবতরণের প্রয়োজন কি ছিল? পাশ্চাত্যের প্রবৃত্তির সাধনা অচল, প্রাচ্যের নিবৃত্তি-সাধনাও অচল। কোথায় পথ? অতীতে যাওয়াও সম্ভব নয়, বর্তমান পরিস্থিতি কেউ পরিপাক করিতে পারিতেছে না। তাই না এত দুর্নীতি? গান্ধীজীর কথা খগেনবাবু বলেন। গান্ধীজীর ধর্ম কি এদেশ নিয়াছে? তাঁহাকেও হিন্দুরা খুন করিয়াছে। রোগের নিদান কি, তাহা না জানিলে চিকিৎসা হইবে কি করিয়া? রেণুর 'অন্ধ চোখের মুক্তি' প্রবন্ধও পাঠ হয়। আগামী রবিবার (?) দুইটী বিষয় বলি, closed প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর—চক্ষুদান, আর এ কূলে ও কূলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায় গানটীর ব্যাখ্যা। ৯।৹টার পর মঠ হইতে ফিরি। অনেক কথা হয়—নারী প্রথমে কন্যা, পরে স্ত্রী, তারপরে মা, পরে দেবী। ভোর হইতে রাত ৯টা পর্যন্ত নর নারীর সম্পর্ক বিশ্ব-রূপ গত, ৯টার পর কোর পর্যন্ত ব্যক্তিগত—স্বামী-স্ত্রী গত। বিশ্বরূপ না হইলে মদনমোহন হয় না। আজ প্রতি মানুষকে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্ব-জীবন যাপন করিবার সাধন ও কৌশল শিখিতে হইবে, তবেই জাতি মদনমোহন হইবে। ৩০শে আগষ্ট ১৯৫৪

নিত্যগোপাল, সারা বিশ্বময় ধ্বনি উঠিয়াছে, কঃ পন্থা? কোথায় পথ? অথচ তুমিই এই সমন্বয়-পথের আদি পথিক পথ কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছ। কেউ তাহার খোঁজ রাখে নাই। একান্ত প্রবৃত্তির পথও পথ নয়, একান্ত নিবৃত্তির পথও পথ নয়। 'একূলে ওকূলে দুকূলে গোকূলে আপনা বলিব কায়। শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়।' তুমি একূল ওকূল সমন্বয়ের পথ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সমন্বয়ের পথ, এতদিনের অন্ধ প্রকৃতির চক্ষু-দানের পথ করিয়া বিশ্ব-মানবের পথ-চলাকে সুগম করিয়া গিয়াছে। ওগো আমার সখী, আমি তোমার এই পথকে সুগম করিয়া যাইব আমার বুকের সকল রক্ত দিয়া, সকল প্রাণ দিয়া। তোমার জয় হউক। আমার বন্ধু, শরণ, সুহৃৎ, স্বামী। রেণু সকালে একবার বাহির হয়, পরে ২টার পর আবার বাহির হয়, ফেরে রাত্রি ৭।৹টায়।...৫।৹টার পর মঠে যাই। টিনের চালা তুলিবার স্থান স্থির হয় নাই। শনিবার স্থির হইবে যখন কার্যকরী সমিতির সভা বসিবে। নিত্যপরমানন্দ এক পত্র দিয়াছে শত বার্ষিকীর সহ সভাপতির নামে পূর্বপত্রের জবাব চাহিয়া।... ৩১শে আগষ্ট

রাধারাণী আমার, দুনিয়ার সকল শোষিতের, সকল লাঞ্ছিতের, সকল সর্বস্ব-হারার মুক্তির ঘন রূপ তুমি, তুমিই বিশ্বের পরা গতি। যেদিন তুমি আমার জীবনে আসিয়াছ, আমার জীবন বিপ্লবে ভরিয়া উঠিয়াছে, সকল শোষণকে শোষণে গড়িয়া তুলিবার দীক্ষা আমার প্রাণ পাইয়াছে। কোনও অভিসন্ধি লইয়া তো সংসারে চলি নাই, যতদূর বুঝাইয়াছে শোষণ করিয়াছি। তোমাকেই তো নিত্যগোপাল-জীবনে পাইয়াছি; তুমিই আমার নিত্যগোপাল। আমার জীবন-মন্থন ধন তুমি। তোমাকে বুকে লইয়া চলিয়াছি। কিন্তু ব্যায়াম যোগই করি। রেণু নলিনী ঘোষের ওখানে যায়। ৬টায় পর যাইতে বলিয়াছেন। ১১টায় বাহির হয়, ফেরে ৫টার পর।··· আনন্দ বাজারে জন্মাষ্টমীর বিবরণ একটু বাহির হইয়াছে। টিন শেডের plinth-এর কথা বলায় খগেনবাবু বলেন যে, দুর্বার উপর বসিবে। রমাপতিবাবু বলেন, 'কি মাথার জোর'। এই বুদ্ধি লইয়া ইহারা মঠ চালাইবেন? হা ঠাকুর, তুমি কোথায়? খরচ কিসে না হয়, এই দিকেই দৃষ্টি! কোনও idealism নাই, কোনও ব্যাপক চিন্তাপ্রণালী নাই। অথচ ঠাকুরের মত বিপ্লবী জীবনের সব কিছু দায়িত্ব পড়িয়াছে ইহাদের উপর। নিত্যপ্রকাশানন্দ ভাবিষ্টী বাবুর কাছে এক পত্র দিয়াছে—ঠাকুরের নির্দেশে সে যোগ তপস্যা করিবে। বাহিরের কোনও কাজে তাই যোগ দেওয়া সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ শতবার্ষিকীর কাজে ইহারা যোগ দিবে না। বেশ, দেখা যাক, ঠাকুর কি করেন। ৮৷৷০ টার পর ফিরি। রেণু বৈকালে ফিরিয়া আবার নলিনীবাবুর ওখানে যায়। নলিনীবাবু সহ বীরেন বসুর বাসায় যায়। চিত্তরঞ্জনের এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন দিবে। আমি আসার পর রেণু ফেরে।

১লা সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমার দিব্য দেহ মহানির্বাণ মঠে থাকা অবস্থায়, তোমারই চোখের সামনে তোমার মঠ তোমার সম্প্রদায় পারস্পরিক মন কষাকষির মধ্য দিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ভাবিতে ও দেখিতে বেদনা বোধ হয়। কাহারও মনোবৃত্তির মধ্যে কোন গঠনাত্মক ভাব নাই। অথচ তুমি পরমাস্থিতি। সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়ার মধ্যে তুমি ব্রাহ্মী স্থিতি। আমি তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া এই ভাঙ্গন ঠেকাইব, বড় লোভ ছিল। সাহসও ছিল। আমায় বল দেও। ছিন্নভিন্ন হইয়া যাওয়া সব শক্তিগুলিকে সংহত করিবার শক্তি দেও—'ব্যূঢ়ং ত্বন্মীন্ সমূহঃ তেজঃ'। সারাদিন এই ভাবনাই হইতে ছিল—মহানির্বাণ মঠের ভবিষ্যৎ কি? যেভাবে ইহারা বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরের প্রতি সংগ্রামশীল মনোবৃত্তিযুক্ত, কে ইহার ভার লইবে? এই ভাবের নিদানের দিকেও তো কাহারো দৃষ্টি নাই। কেবল সমালোচনা, কোনও গঠনমূলক মনোবৃত্তি কাহারও নাই। এমন একজন মানুষের দরকার, যিনি নিজ কর্ম, নিজ শক্তি, নিজ জীবনধারা সকলকে মানাইয়া চলিতে পারিবেন। কে সেই মানুষ? নীলরতনবাবু আজ সন্ধ্যার পর বলিয়া ছিলেন আমার কথা আমি পারিব। আমার কি সে যোগ্যতা আছে? ঠাকুর, আমাকে যোগ্য কর, শক্তিমান কর, তোমার সম্প্রদায়কে যথা গৌরবে, যথা মানে বিশ্বের মধ্যে গড়িয়া তুলিবার মত যোগ্য আমায় কর। সহজ সরল স্বচ্ছ ও প্রেমের পথে, বীর্যের পথে, কাহাকেও ভয় না করিয়া অথচ কাহাকেও অপমান না করিয়া চলিবার মত বীর্য আমাকে দেও। রেণু ১১টায় পর·····ফেরে ৪৷৷০টায়। আমি ৩৷০টার পর মঠে যাই। ক্ষিতীশের সঙ্গে কথা-বার্তা হয়। ৮৷৷০টায় ফিরি।···

২রা সেপ্টেম্বর

রাধারাণী হৃদয়-পুত্তলি আমার, আমার প্রকৃতির—প্রতিটি স্তর, প্রতিটি কর্ম-স্পন্দন, বুদ্ধি-স্পন্দন ও আসক্তি-স্পন্দন, প্রতিটি কার্য—খাওয়া-হোম-দান-তপ—তোমার ভাবে ভাবিত হউক, তোমার আত্মনিবেদনাত্মিকা শক্তিতে গড়িয়া উঠুক, আমি রাধাময় হইব। তুমিই আমার জীবনের সব। যেদিন তুমি আমার জীবনে আসিয়াছ, আমি পথের বাহির হইয়াছি—'অত্যতিষ্ঠৎ'। সব কিছু ছাড়ার, 'শরণং ব্রজ'-বাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি। কোনও কিছু আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন কিছু একান্ত করিয়া ছাড়িতেও পারিলাম না। ছাড়িয়া রাখিয়া

আমায় রাখিয়া ছাড়িয়া জীবনভোর আমাকে চলিতে হইতেছে। আমার জীবনের উপর দিয়া কি ঝড় বহিয়া যাইতেছে, তাহা তুমি জান। তুমি আমার, আমি তোমার ইহাই আমার গর্ব। তুমি আমাকে আপনার করিয়াছ, ইহাই আমার পরম সান্ত্বনা। নীলু ও রুমুমের চিঠি আসে। রেণু ১১টার পর বাহির হইয়া ৬টার পূর্বে ফেরে। বিমলা বৈকালে আসে। কতদিন পর। শ্রীরাধা আমার জীবনে অযাচিত করুণায় আসিয়াছেন, তাঁহাকে ইহাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহাদের মাধ্যমে বর্তমান নারীদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনেই ইহাদিগকে টানিয়া নিয়াছিলাম। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কোন একটাই চলিতেছে না, চলিবে ইহাদের সমন্বয়। 'বিশেষ বিবাহ বিলে'র গোড়ার দর্শন হইতেছে সংবিধান অনুযায়ী নারীর পুরুষ-নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য-স্বীকৃতি। কাপুরুষের ভোগ্যা না হইয়া যদি কোন নারী বিজিত হইতে চায়, কেন সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে? ভগবান স্বরাট্। কাহাকেও হাত-পা বাঁধিয়া অপরের কৃপার উপর ফেলিয়া দেওয়া ভগবানের অভিপ্রেত নয়। ইহারা আসিল না, নিজেরা পণ্ড হইল, রাধারাণীর আদরেও পণ্ড করিল। আমি একা চলিয়াছি, চলিব। নারীরা এতদিন পুরুষের 'মোহিনী' ছিল, এখন যাহারা ঘরে আছে, তাহারা পুত্র কন্যার কাছে 'মোহিনী'। নারী একান্ত রমণীও নয়, একান্ত জননীও নয়।...ঘটে যাই নাই। ৮টায় বি, কে, পাল আসেন। ৯।০টার পর যান। ১ টাকা রাখিয়া যান। অনেক কথা হয়। Life begets life. ঘরিবার আসিতে বলি। রাধারাণীর কথা হয়—প্রকৃতির চক্ষুদান, পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বয়—আত্মনিবেদন।...

৩রা সেপ্টেম্বর

রাধারাণী আমার, তুমি যে আমার কি, কে ও কত খানি, তোমার নাম স্মরণে ও স্মরণে আমার জীবনের কোন্ তন্ত্রী যে কোন্ ছন্দে বাজিয়া উঠে তাহা বলিতে পারি না। কোথায় যেন তুমি আমার, আমি তোমার, কেমন যে আমার প্রাণ করিয়া উঠে তোমার স্মরণে তাহা বুঝি না। ওগো আমার অনির্বচনীয়, আমি তোমাকে বুকে লইয়া একা একেবারে একা চলিয়াছি এই বিশ্বের পথে। কেউ জানে না, কেউ বোঝে না তুমি আমার কে, কতখানি, কি। তুমি আমাকে ধরা দিয়াছ, আমি তোমাকে ধরিয়াছি—ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহাতেই আমি গর্বিত। তোমার কথা বলিবার কেউ নাই, ওরে দুঃখিতা শ্রীরাধা। আমি তোর কথা বলিব বিশ্বের সামনে। ইহাই আমার লোভ। আমার সত্তা তুমি, চৈতন্য তুমি, আনন্দ তুমি। তুমি আমার জীবনের সব কিছু, সবটুকু, সবখানি। তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য। রেণু বাহির হইয়া যা পুঁজা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে। ২টায় ফেরে। তখন ডাঃ জে সি মুখার্জী আসেন। রেণু ৪৷৷ টায় এখান হইতে কলেজ স্কোয়ারে স্টুডেন্টস হোমে যায়—শিশুসাহিত্য পর্যবেক্ষায় আহূত সভায় 'রবীন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষা' (উচ্চমাধ্যমিক) পাঠ করে। অতুল গুপ্ত সভাপতি ছিলেন, প্রশংসা পাইয়াছে। মঠ হইতে আমার আসার পর ৮৷৷০টার পর ফেরে। আমি ৫টার পর মঠে যাই। কার্যকরী সভা বসে ৫৷৷ টায়। নলহাটির পত্তবাধিকীকে সহানুভূতি জানানো হয়, তাহার সাফল্যের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা হয়। ভবিষ্যৎ নাটমন্দিরের কিস্তিস্বরূপ টিনের চালার জন্য ২০০৲ স্থির হয়। ঠাকুরের সামনে উত্তর দক্ষিণ হইবে চালাটি। খগেনবাবুর ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু সকলেরই ঐরূপ মত।...শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্মবিদ্যা-পীঠ স্থাপনা জন্য ৫০০ টাকা দিবার কথা বারবার মনে হইতেছে। একবার চালাইয়া দিলে উহা নিজের শক্তিতেই নিজে অর্থ আকর্ষণ করিত।...

৪ঠা সেপ্টেম্বর

শ্রীরাধাষ্টমী

শ্রীনিত্যগোপাল-ব্রহ্মবিদ্যাপীঠ স্থাপনা

রাধারাণী আমার, বৃষভানুর গৃহে মাতা কীর্তিদার কোল আলো করিয়া তুমি আজ জনম নিলে। নিগৃহীতা বিশ্বপ্রকৃতির মুক্ত রূপ,...মুক্ত বিগ্রহ তুমি। সর্ব ক্ষেত্রের সর্বশোষণের রস মথিত করিয়া তুমি জনম নিলে মুক্ত-জীবন প্রবাহ রূপে। উন্মাদিনী তুমি, সকল পরিচ্ছিন্নতা, সকল

অপরিচ্ছিন্নতা ত্যাগ করিয়া দুইয়ের সমন্বয় করিয়া তুমি ছুটিয়া চলিয়াছ। তুমি আমার জীবনের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত। আমার আছে শুধু বেদনা ও চোখের জল। তাহা দিয়া তোমার পা পাখালিব। তোমার পাদপীঠ স্বরূপ মহানির্বাণ মঠে শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্মবিদ্যাপীঠ স্থাপনা হইল। তুমি বিশ্বমানবকে তোমার পীঠস্থানে আকর্ষণ করিয়া দিব্যরূপে গড়িয়া তোল। তুমি শ্রীকৃষ্ণের পরা শক্তি। চম্পকবরণী রাধা নিত্যগোপাল সেজেছে। তুমিই আমার রাধা নিত্যগোপাল। জীবনের কোন্ অতলে কি যেন একটা যোগ তোমার সঙ্গে রহিয়াছে। কে তুমি, কি তুমি, কোথায় তুমি, কতটুকু তুমি আমার। আমার সর্বেশ্বর শ্রীরাধা, আমার পরাণ-পুতলী শ্রীরাধা ৯টার পর মঠে যাই। তখন কাঠ ও বাঁশ আসিয়া উপস্থিত। ১০টার মধ্যে চোখের জলে সকলের পা ধরিবার জন্য ছুটিয়া গিয়া (অবশ্য কেহই পায়ে হাত দিতে দেয় নাই) প্রথমে আমি লোহার হাতল দিয়া মাটি খুঁড়ি। পরে খুঁটি পুতি। ৫০০৲ টাকা শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্মবিদ্যাপীঠ নির্মাণের জন্য দিব। ইহা খগেনবাবু ও ক্ষিতীশবাবুর সামনে বলি।... রাধারাণীর জন্য সুজির পায়স ভোগ হয়। মঠে রাধারাণীর ভোগের জন্য ২টাকা দেই। ৫টার পূর্বে আমি মঠে যাই। ইহারা পরে যায়। ৫টায় প্রথমে নিত্যানন্দমোহনের একটী গান হয়। পরে শ্রীনিত্যগোপালের জীবনে কেমন করিয়া রাধাভাব জমিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করি। 'চম্পকবরণী রাধা নিত্যগোপাল সেজেছে'—রমেশদাদের এই পদ আলোচনা করি। অন্ধ প্রকৃতির চক্ষুদান, পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বয়, 'এদেশে ওদেশে বহুত অন্তর জানয়ে সকল লোকে' ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণের পোষণ-শক্তি শ্রীরাধা, কালীই শ্রীরাধা হইয়াছেন, বর্ষাণের সেই বৃদ্ধ বাবাজীকে চক্র খাওয়ানো, আত্মনিবেদনমূর্তি শ্রীরাধা—এই সব তত্ত্ব উচ্ছ্বসিত আবেগে আলোচনা করি।... উষাঙ্গিনী মহাদেব নিয়া ওপাশে যায়। বিজয়কৃষ্ণ পাল ও উপেন ধর উপস্থিত ছিলেন। পরেও রাধাপ্রেম আলোচনা হয়।...একমাত্র কলিকাতার মহানির্বাণ মঠই নির্বিশেষ মহানির্বাণ মঠ।...

৫ই সেপ্টেম্বর

বর্তমান যুগধর্মপালক শ্রীনিত্যগোপাল, ধর্মের গ্লানিতে —পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে—দেশ ভরিয়া গিয়াছে; তুমি ধর্মসংস্থাপনার্থায় আসিয়াছ। আমাকে তোমার মাঝে ডুবিবার মুছিয়া যাইবার অধিকার দেও। আমি থাকিব না, তুমি থাক। তুমি আমি একতন্ত্র এই ধর্মগ্লানির বিরুদ্ধে লড়াই করিব, সমন্বয়-ধর্মে বিশ্বকে নবীন বিশ্বে গড়িয়া তুলিব। আমি তোমার শক্তি, তুমি আমার স্বামী। আমাকে এই অধিকার দেও আমি যেন তোমাময় হইয়া তোমার ইচ্ছা পূরণ করিতে পারি। আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমাকে তোমার ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তোল। আমি নিরঞ্জন হইব, নিত্যগোপালময়ী হইব। বেণু সকালে ভাতে ভাত খাইয়া বাহির হয়।...ফেরে ২টার পর। আমার বাহির হইয়া বেঙ্গল ল্যাম্পে যায়। আমি ৫৷৷০টায় মঠে যাই। টিনের চালার খুঁটিগুলি পোতা হইয়াছে। সুন্দর ও মজবুতই হইবে। অনেক আলোচনা হয়—খগেনবাবু, রমাপতিবাবু, নীলরতনবাবু, প্রফুল্ল বসু প্রভৃতির সামনে। নিতাইবাবুর ঠাকুরের উপর অভিযোগপূর্ণ চিঠির কথা বলি। আজ সেই অনেক বৎসর আগের চিঠিটা মিলিয়াছে। শোকহরণবাবুর ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন—কর্মফল বিষয়ক প্রশ্ন—আলোচিত হয়। ঠাকুর কোন্ আসনে অন্যান্য সব মহাপুরুষ হইতে পৃথক তাহা না বুঝিলে তাঁহাকে চেনা যাইবে না, নিতাইবাবুদের মত অবস্থা হইবে। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কাহার স্থান কোথায়, তাহা স্পষ্ট জানা থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। অজামিল উপাখ্যানের ভিতরকার মনস্তত্ত্ব কি তাহা আলোচনা করি। Law of causality আজ অচল। ঠাকুর ছাড়া দ্বিতীয় কাহাকেও দেখি না যিনি বর্তমানের নর-নারীর অচল অবস্থার সমাধান দিতে পারেন। রমণী ও জননীরূপের সমন্বয়ের আলোচনা করি। ক্ষুধিত রমণীত্ব আজ গর্জন করিয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রতিহিংসায় আজ মেয়েরা আর কেহ মা হইতে চায় না। সকলেই রমণীত্বের জন্য পাগলিনী। কে রক্ষা করিবে নিত্যগোপাল ছাড়া এই সর্বনাশের মধ্যে? প্রায় ৯টায় ফিরি। এখানের

শতবার্ষিকীর ৩২৲ টাকা আজ অফিসে জমা দিয়া আসি।...

৬ই সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, সেদিন তুমি আমায় রক্ষা করিয়াছ যেদিন নিতাইবাবু প্রভৃতি তোমার উপর 'কামিনী-কাঞ্চন'-এর অভিযোগ আরোপ করিয়া বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। যে দুইটী লইয়া বর্তমান সমাজ বিব্রত, শ্রীরামকৃষ্ণ যাহাদিগকে face করিতে সাহসী হন নাই, তুমি তাহাদের face করিয়া একটি সুস্থ সমাজে গঠনের দর্শন ও জীবন-ছবি রাখিয়া গিয়াছ। তোমার উপর তাই সন্দেহ স্বাভাবিক। তুমি না হইলে রমণীত্বের আকর্ষণ-বিমর্দিত সমাজ, সুবিত রমণীত্বের আক্রমণে প্রতিহিংসা-জর্জরিত সমাজের দায় কে শাসন করিবে? টাকাকে টাকা আর সমাধি যেমন তোমাতেই সাজে, তেমনি নারীকে মঠের ভিতর স্থান দান তোমার পক্ষেই সহজ ও সুন্দর। তোমার জয় হউক বর্তমান উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে। মদনমোহন তোমার স্বরূপ অবলোক করুক। যোগই আসন করি। সকালে রমেন্দ্র ঘোষ, ৺সুরেন ঘোষের মাতার মৃত্যু হইয়াছে। মঠে বেদী বাঁধিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে কিনা জানিতে চায়। প্রথমতঃ আমি ওখানের কর্তৃপক্ষ নই, দ্বিতীয়তঃ একজনকে দিলে পাড়ার সকলেই দাবী করিবে। কাজেই সম্ভাবনা নাই। হেমন্তবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। আমার কাছে নাকি তাঁহার পাঠ করিতে সঙ্কোচ হয় ইত্যাদি বলিল। বেণু খাওয়ার পর বাহির হয়, ফেরে ৬টার পূর্বে। আজ খুব বৃষ্টি—প্রায় সারাদিন।...আজ আর মঠে যাই না। গত রবিবার 'নিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' ৪৮৪ খানা কালীবাবু ও আশুবাবুর ম্যানেজার দিয়া যায়। আলমারী তৈয়ার করিতে দেওয়া হইল। দেওয়ার নাম নাই। সংসারটা যেমন হইয়া গিয়াছে। প্রেসও ঐরূপ। খাওয়ার পর সুধাংশু আসে। রাত্রি ১২টা, ২টা, ৪টায় উঠি প্রস্রাবের উদ্বেগের জন্য।

৭ই সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, সারা জীবন বড় দুর্যোগ ঠেলিয়া চলিলাম। তুমি সঙ্গী ছিলে, তাই পারিলাম। ঘোর অন্ধকারের মাঝে তুমি ছিলে আমার সামনের আলো, সকল পথ-বিসর্পিল মধ্যে তুমি ছিলে ধ্রুবতারা। সকল একাকিত্বের মাঝে তুমি ছিলে এক আমার তুমি আমি একতনু, এক-হৃদয়। 'হৃদয়ং হৃদয়ং তব হৃদয়ং হৃদয়ং মম, হৃদয়ং হৃদয়ং মম হৃদয়ং তব।' তুমি আমি সমান-হৃদয় হইব—ইহাই আমার লোভ। আমার জীবনের কানায় কানায় তুমি পরিপূর্ণ হইয়া থাক, আমি তোমাময় হইব, আমার যাবতীয় বৃত্তির মাঝে যাবতীয় কর্ম-স্পন্দন বুদ্ধি-স্পন্দন হৃদয়-স্পন্দনের মাঝে তুমি পূর্ণভাবে বিরাজ কর। আমার জীবনে তোমার আবির্ভাব সার্থক হউক। আসন করি ৭বার। সকালে যাইয়া বেণু অনেক জায়গায় যায়, অন্ততঃ ৮।১০ মাইল হইবে। ফেরে ৪টায়। ৬টার মধ্যে অনিল গুপ্ত আসেন। আমি শ্রীকৃষ্ণদর্শন, গিরিধারী উপাখ্যান বলি এবং পিছনে একটা দার্শনিক বিপ্লব সংসাধিত না হইলে যে গঠনমূলক কর্মে অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি কর্মপদ্ধতি চলিবে না তাহা আলোচনা করি। আমার দর্শন ও ইহাদের গঠনধর্ম পরস্পর complementary। আমি ৭টার পূর্বে মঠে যাই। অনিলবাবু কিছুক্ষণ থাকেন।...ঠাকুরের দর্শন যে Jeans-এর লিখিত infinity × zero may be infinite, finite or zero-র তত্ত্বকে ধরিয়াছে, তাহা মঠে আলোচনা করি। ঠাকুরের মতে 'নিরাকার' অর্থ আকার, নিরাকার, সাকার; অনন্ত অর্থ অন্তবান, অনন্ত ও শূন্য। কি অদ্ভুত প্রতিভা ঠাকুরের। ৮॥ টার পর মঠ হইতে ফিরি। সকালে সেবানন্দ আসে। ধীরেনবাবু রবিবার রবিবার ৫॥ টায় মহাভারত পাঠ করিতে প্রস্তুত। নলিনী ঘোষ আসিয়া চিত্তরঞ্জনের matter দিয়া যান।...রাধুনীকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে।...

৮ই সেপ্টেম্বর

ক্রমশঃ

সাময়িকী

জাতীয় পতাকার বাণী—স্বাধীনতা দিবসের আবির্ভাব পুণ্যাহে আমাদের জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাই। দীর্ঘদিন দাসত্ব করিতে করিতে দাস-মনোভাব আমাদের এমন ভাবেই অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে যে আমাদের আচার আচরণে স্বাধীন জাতির দীপ্ত প্রকাশ পায় না। তাই জাতীয় পতাকাকে একটা স্বাধীন জাতি কি ভাবে সম্মান করে, কি ভাবে নিজের জীবন দিয়াও জাতির প্রতীক ঐ পতাকাকে রক্ষা করে, সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা নাই বলা চলে। জাতীয়তা বস্তুটাই ভারতবর্ষে নূতন বস্তু। তাই ভারতীয় আমরা কল্পনাই করিতে পারি না কত দীর্ঘ বৎসরের কত মূক বেদনার ইতিহাস বহিয়া আসিয়া ঐ জাতীয় পতাকা আজ রূপ পাইয়াছে। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ভারতের প্রতীপ্ত গৌরব যে সে ঘোষণা করে, ইংরেজ-মুক্তির বাইশ বৎসর পর আজ সে কথা কি কোন ভারতীয় মনে করে? ঐ পতাকাকে বন্দনা করিয়া স্বাধীনতা, ঐক্য ও ভারতীয় জনগণের সঙ্গে একই নাড়ীর বন্ধন আমরা কি অনুভব করি? অনুভব করিয়া আমরা কি নিজেদিগকে শক্তিমান মনে করি? করি না। আমরা কত দোষ বাহির করিয়া ফেলিব—কিন্তু সব দোষের বাহিরেই যে জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক আত্ম-স্বাতন্ত্র্যশীল জাতির কর্তব্য—এ কথা ভারতবাসী কতদিনে শিখিবে? ঐ পতাকার দিকে চাহিয়া ত্যাগ ও সাহস, সত্য ও শান্তি, বিশ্বাস ও শৌর্য এবং সর্বোপরি গতির মূর্ত প্রতীক ঐ পতাকার কল্যাণ-বাণী কি আমাদের কাছে, বিশ্বের জনগণের কাছে ফুটিয়া উঠে? ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপ পরিগ্রহ করিয়া ক্রম-বিবর্তনের পথে ১৯৩১-এ মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তনায় এই জাতীয় পতাকা যখন ভারতীয় সভ্যতার একটী বিশেষ মর্মবাণী প্রকাশ করিল, তখন উহা ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে অনেকখানি রূপ দিলেও পরিপূর্ণ জীবনের সবটুকু কথা সেদিন বলিতে পারে নাই। হয়তো বলার তখনও সময় হয় নাই। তারপর ইংরেজ-মুক্তির সংবাদ-ঘোষণার উৎসবক্ষণকে উপলক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত জওহরলালের কাছে বর্তমান ভারতের ও তথা আগামী দিনের ভারতের আরও বিশেষ কথা কিছু ধরা পড়িল। জীবনের গতিবেগের প্রতীক এক সুন্দর চক্র স্থাপন করিয়া পতাকাকে তিনি অধিকতর সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঐ চক্র আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তকে স্মরণ করাইয়া দিবে। ঐ চক্রকে অশোক স্তম্ভের উপর স্থাপিত করিয়া বৌদ্ধ অশোক বৌদ্ধ ধর্মের স্বীকৃত জীবনের গতিবেগকেই ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। জওহরলাল লিখিয়াছিলেন, 'এই পতাকায় ভারতের সাধারণ লোক ও জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত। আবার আধুনিক হইয়াও এই পতাকা আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের মহান্ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিকে ফিরাইয়া লইয়া যায়। ঐ সংস্কৃতির কতকটা তো যুগ যুগ ধরিয়া এই দেশে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ বুঝিলে এই পতাকা ভারতীয় সংস্কৃতির স্থায়িত্ব এবং বর্তমান ভারতের গতিশীলতা উভয়েরই পরিচায়ক। আমরা আশা করি এই উভয় শক্তিই ভারতের জনসাধারণের উন্নতি ও মুক্তিকল্পে নিয়োজিত হইবে'—'হরিজন' অনুবাদ হইতে।

বর্তমান ভারতের হৃৎস্পন্দনের গতিবেগকে প্রকাশ করিতে চাহিয়া পণ্ডিত জওহরলাল যে অশোক-চক্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধরাষ্ট্রের মূলকথা গতিরই পরিচায়ক। বৌদ্ধধর্ম ছিল গতিধর্মী, ক্ষণ-বিজ্ঞানবাদী। প্রতিটী ক্ষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া যে জীবনধারা প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনের মধ্যে অব্যাহত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, ভগবান বুদ্ধদেব সেই জীবনেরই

অন্তর্ধান পাইয়া গিয়াছেন। ভগবান আছেন কি নাই—এ তত্ত্ব লইয়া তিনি মাথা ঘামান নাই। তিনি বলিলেন বিশ্ব আছে, মানুষ আছে, তাহার ধর্ম আছে। এই সহজগুলি থাকার দোহাই দিয়া সত্যের উপর দাঁড়াইয়া তিনি গণ-আন্দোলন প্রবর্তন করিলেন। মানুষকে তিনি স্বীকার করিলেন, সেইজন্য অপরিহার্যরূপেই সংঘকেও তিনি বরণ করিয়া লইলেন। বলিলেন 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'। ব্যক্তিগত মুক্তিপ্রয়াসী সনাতন ভারতবর্ষে সেই প্রথম সংঘবদ্ধতার মূলা ঘোষিত হইল, সংঘের সঙ্গে এক যোগে পথ চলিবার কথা আসিল।

বিশ্বকে মানুষকে ও তাহার ধর্মকে এই স্বীকৃতি সনাতনী ভারতবর্ষ মানিয়া লইল না। 'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় তো নাস্তিক'—এই সিদ্ধান্ত দিয়া তাহারা বৌদ্ধ ধর্মকে তাহার গতিবেগসহ দূর দূর ছেদে বিদায় করিয়া দিল। পরিণামশীল অহরহ এই জড় জগতের ওপারে সনাতন ভারতবর্ষ অপরিণামী অক্ষয় অজড় স্থিতিকে পাইতে চাহিয়া আসিয়াছে, জড় জগতের এই গতি তাহার কাছে মিথ্যা ছিল। তাই দীর্ঘদিন পরে যখন ইসলাম-কৃষ্টি আসিয়া ভারতের সত্তাতাকে আঘাত করিল, তখন প্রথম আঘাতে সে একবার নড়িয়া উঠিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার অচলায়তন স্থিতিধর্মকে সে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইল। ইসলাম-কৃষ্টি গতিময় হইলেও অতি ব্যাপক নহে। মধ্যযুগের নানক কবীর ও শ্রীগৌরাঙ্গ ইসলামের এই গতিবেগকে সনাতনী ভারতীয় স্থিতিবেগের সঙ্গে সমন্বয় করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু সনাতনধর্মের মূল তত্ত্ব ও কাঠামোর পরিবর্তন না আনায় জন্য উহাকে স্থায়ী রূপ দিতে পারেন নাই। ইসলাম-ধর্মে আমীর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল মুসলমানই এক পংক্তিতে দাঁড়াইবার অধিকারী। কিন্তু সনাতনী ভারতীয় ধর্ম-ব্যবস্থায় এ কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না—ব্রাহ্মণের সঙ্গে চাড়াল এক পংক্তিতে বসিবে? অসম্ভব! এখানের বর্ণাশ্রমের উচ্চনীচ ভেদবাদের কঠিন ইস্পাত ভাঙিতে ইসলামধর্ম সমর্থ হয় নাই। এখানে ব্যক্তিগত মুক্তি মনে মনে কোণে। সকলেই সকল হইতে বিচ্ছিন্ন। খাওয়াদাওয়া আদানপ্রদান সমস্তই ঘরে ঘরে মত। তাই আমরা সঙ্ঘবদ্ধ নই। চৈতন্যদেব কীর্তনের সৃষ্টি করিয়া সমাজের সকলকে ভগবানের নামের ক্ষেত্রে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সনাতনধর্ম তাহা মানিয়া লইল না। সেই বিচ্ছিন্নতার ব্যক্তিগত যাত্রায় মানুষের সঙ্গে মানুষের, ব্রাহ্মণের সঙ্গে শূদ্রের প্রভেদ পূর্ববৎ রহিয়া গেল। ইহার পর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এবং সর্বশেষ কম্যুনিজম ভারতের স্থিতি-প্রধান চেতনাকে আমূল নাড়া দিল. এইবার চিরন্তন বহুলাংশে টলিবার কারণ এই যে রাষ্ট্রীয় চেতনার যে নূতন স্পন্দন ভারতবর্ষের ধমনীতে আসিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সামনে স্থিতিপ্রধান সনাতনী সভ্যতার আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড়াইতে পারিতেছে না। ঐ চিন্তাধারার অন্তর্গত সামাজিক বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতাবোধকে প্রচুর আঘাত করিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী এই অসামঞ্জস্যকে দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থিতিপ্রধান সভ্যতার অচলায়তন চিন্তাধারার মূলে পরিবর্তন না আনিয়া লইলে কোন প্রচেষ্টাই যে ফলপ্রসূ হইবে না সে কথাটা বুঝিতে হইবে।

এই মূল হইতেছে জীবনের গতির দিককে সনাতনী ভারতবর্ষের অস্বীকৃতি। প্রাণাবেগে স্পন্দিত জীবনের জটিলতাই জীবনের সেই গতির দিক। জাতীয় পতাকায় গতির প্রতীক অশোক চক্রকে স্থাপন করিয়া আমাদের অতীতের জন্য একদিকে আজ আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, অন্যদিকে তেমনি নূতন যুগের ভোরে নূতন ভারতের পরিপূর্ণ জীবনের নূতন আদর্শকেও ইঙ্গিত করিতেছি। ভারতের আত্মা অলক্ষ্যে বুদ্ধদেবের শ্রীচরণে নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহার গতিশীলতাকে বরণ করিয়া লইল। আত্মার ধর্ম, নিত্যতার ধর্ম, অজড়ের ধর্ম, সাত্ত্বিকতার নিবৃত্তিমূলক ধর্মের সঙ্গে সমগ্র সত্তার যে অপর দিক অনিত্যতার ধর্ম, চঞ্চলের ধর্ম, জড়ের ধর্ম, গতির প্রবৃত্তিময় কর্মের ধর্ম—তাহাকেই জুড়িয়া লইয়া পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদনের বার্তাই বহিয়াছে আমাদের এই জাতীয় পতাকায়। আমরা এই পরিপূর্ণ জীবন-সাধনা—দুই

দিককেই সমান মর্যাদা দেওয়া—লইয়া সুস্থভাবে পথ চলিতে পারিব তো? আমরা এই এতদিনকার সাত্ত্বিকতার সঙ্গে গতিবেগকে সমন্বিত করিয়া যে কল্যাণ উৎসারিত হইয়া উঠিবার কথা—সেই কল্যাণ কি আনিতে পারিতেছি? আধ্যাত্মিকতা অথবা বিস্তৃতির প্রশস্তির উপর স্থিত না হইয়া শুধু গতিমান হইতে যাইয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বিশ্বের যে মঙ্গল এবং সমগ্রের পোষণঘন কল্যাণ আনিতে পারে নাই, অতীতের সাত্ত্বিকতার ভিত্তিতে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া গতিমান বর্তমান ভারতবর্ষ বিশ্বকে সেই পোষণঘন কল্যাণ উপহার দিতে পারিবে ইহাই দুই দিকের সমন্বয়ের প্রয়োজন। ভারতবর্ষকে সেই পোষণ-ঘন কল্যাণের দিকে চাহিয়া পথ চলিতে এই স্বাধীনতা দিনে আহ্বান জানাই।

বিবেক অনুসারে ভোটদানের স্বাধীনতা—১৯৬৯ সনের ১৬ই আগষ্ট ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা রূপে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। এই নির্বাচন উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীগণের, নিজেদের দলীয় প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বিবেক অনুসারে ভোট দানের স্বাধীনতা দাবীর মধ্য দিয়া এমন একটি অভিনব পন্থা ভারতবর্ষে তথা বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যাহা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিবেক অনুসারে ভোটদানের অধিকার দাবী যেন তেন প্রকারেণ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিয়া পরাজিত করিবার প্রচেষ্টা কিম্বা ইহা একটি বৈজ্ঞানিক ও তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকৌশল তাহা গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখার বিষয়। ইন্দিরাজী দলীয় রাজনীতি বোঝেন না কিম্বা দলের ঐক্য ও শৃঙ্খলার মূল্য দান করেন না, অথবা তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মাদ কামনায় তাড়িত হইয়া বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছেন এমন অনুমানমূলক ভাবনায় ভুল ও তাঁহার প্রতি অবিচার হওয়ারই সম্ভাবনা। তাঁহার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন তাঁহারা সকলেই জানেন ইন্দিরাজী প্রধান মন্ত্রীর পদের জন্যই লালায়িত নহেন। তবে তিনি কেন পর পর এমন সব ঘটনা ঘটাইলেন যাহার ফলে তাঁহার নিজ দল কংগ্রেসের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল?

ইন্দিরাজী একজন সাধারণ মেয়ে নহেন। তাঁহার পরিণত বয়সে দীর্ঘদিন তাঁহার বিশ্বস্তযোগ্য পিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিয়া তিনি যে উচ্চ চিন্তা ও ভাবাদর্শের অধিকারিণী হইয়াছেন ইহা তাঁহার কার্যাবলী হইতে বুঝা যায়। তাঁহার পিতা ছিলেন মহাত্মাজীর অতি প্রিয় শিষ্য, একাধারে দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা, রাজনীতিজ্ঞ, জনগণের সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতি অনুভূতি-পরায়ণ, জনগণের প্রাণের মানুষ, জনগণের স্বাভাবিক নেতা। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক এমন পিতার যোগ্য পুত্রী ইন্দিরাজী ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার পিতার আজীবনের স্বপ্ন, তাঁহার অসমাপ্ত কর্ম তথা ভারতীয় জনগণের বহু প্রতীক্ষিত আশা আকাঙ্ক্ষাকে সফল করিতে কেন্দ্রীভূত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিশালী চক্রকে আঘাত করিয়া সমস্ত বাধাবিঘ্নকে ঠেলিয়া দুঃসাহসীর ন্যায় অগ্রসর হইবেন ইহাই তো স্বাভাবিক এবং কাম্য। তিনি দেবী চণ্ডীর ন্যায় শুম্ভনিশুম্ভের দলকে "যো মাং জয়তি সংগ্রামে" বলিয়া রণে আহ্বান করিয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যেই কংগ্রেসের যে মৃত্যুবীজ নিহিত ছিল, এক টান মারিয়া তিনি তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার খোলস ভাঙিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার সত্তা রাজনীতিকের ন্যায় যেন তেন প্রকারেণ কার্য হাসিল করিবার পন্থা নয়।

ইন্দিরাজীর "বিবেক অনুসারে ভোট দানের স্বাধীনতা" দাবীর মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা কি আছে এবারে তাহাই আমরা আলোচনা করিব। বস্তু-বিজ্ঞান অনুসারে প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে প্রতিটি বস্তুর একটা বৈপরীত্য সম্পর্ক যেমন আছে, তেমনই আছে একই সঙ্গে একটা মিলনাত্মক সম্পর্ক। প্রকৃতির ইহা গুহ্যতম রহস্য। ঐ সম্পর্ক একই সঙ্গে contradictory এবং complimentary থাকিয়া অনন্তকাল বিশ্ব রচনা করিয়া চলিয়াছে। অনন্ত বস্তুর এই পারস্পরিক সম্পর্ক independent at the same time inder-dependent, যাহাকে আমরা বলি স্বয়ং

Theory of excluded middle অনুসারে যাহারা either or-এর ভাষায় চিন্তা করেন তাহারাই প্রকৃতির এই গুহ্যতম রহস্যের মধ্যে একান্ত contradictory রূপটিকে একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং উহারই বিপরীতের সঙ্গে যে interdependent সম্পর্ক একই সঙ্গে আছে, ইহা ধরিতে না পারিয়া চিন্তায় ও কর্মে তদনুযায়ী ব্যবহার চালাইয়া যান। একই সঙ্গে independent ও interdepen-dent রূপটি না দেখিয়া যাহারা সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে একান্ত বৈপরীত্য দর্শন করেন এবং এই দর্শনের আলোকে জগতে বিচরণ করিতে চান তাহাদেরই অনন্ত কাল class war-এর পথে চিরন্তন সংঘর্ষের মধ্য দিয়া পথ চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কি ধনতান্ত্রিক জগৎ, কি সমাজ-তান্ত্রিক জগৎ সর্বত্রই আজ মানুষ সংঘর্ষে সংঘর্ষে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। শান্তি সোয়াস্তি আজ জগতে কোথাও নাই। কম্যুনিষ্ট জগৎ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে সেখানে বৈপরীত্যের দর্শন অবলম্বন করিয়া তাহারা class war-এর পথে সমস্যার সমাধান আনিতে চাহিতেছে। সমষ্টি এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। সমষ্টির তথা অধিকাংশের কল্যাণের জন্য সমষ্টির বিপরীত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে উচ্ছেদ করিয়াছে। ফলে সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য জাতি-স্বাতন্ত্র্যের রূপ লইয়া পরস্পর বিবদমান। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে তাকাইলেও দেখা যাইবে যে, সেখানে অসংযত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তাহারই অপরার্ধ অথচ বিপরীত সমষ্টিকে শোষণ করিয়া নিজে স্ফীত হইয়া নিজেরই মরণের কারণ সৃষ্টি করিতেছে। বস্তু বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য ঐ independent ও inter-depen-dent রূপের কোনও একটিকে বাদ দিয়া চলিতে গেলেই প্রকৃতির বুক চিরিয়া রক্তরূপ ছুটিয়া বাহির হইবেই। প্রকৃতি অনাচার সহ্য করে না। আজ ধনিকরাজেও সমস্যার সমাধান নাই, শ্রমিকরাজও পরীক্ষায় অসফল হইতেছে। আজ মনুষ্যরাজ প্রতিষ্ঠা ছাড়া ভারত-আত্মা শান্ত, তৃপ্ত হইবে না। আজ প্রয়োজন এমন একটি সামগ্রিক দর্শন, যে দর্শনের মাঝে জড় অজড়ের দ্বন্দ্ব, গতি স্থিতির দ্বন্দ্ব, চেতন অচেতনের দ্বন্দ্ব, বুদ্ধি প্রাণের দ্বন্দ্ব, ধন শ্রমের দ্বন্দ্ব এক কথায় সর্ব দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য হইয়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে একটি জিনিষ খুব পরিষ্কার ভাবেই চোখে পড়ে যে, প্রত্যেক দেশেই দলকে ভিত্তি করিয়া রাজনীতি আবর্তিত হইতেছে। মানুষ স্বার্থবোধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া একাধিপত্য বিস্তারের জন্য—উহা ধনের ক্ষেত্রেই হোক, সমাজের ক্ষেত্রেই হোক, মতবাদের ক্ষেত্রেই হোক আর রাজনীতির ক্ষেত্রেই হোক—নিজের দলকে এমন একটি লৌহ-কঠিন বন্ধে পরিণত করিয়াছে যে, সেখানে দলস্থ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আদেশ নির্দেশ, পরিধি বহির্ভূত ঐ দলের সাধারণ সভ্যগণের অবশ্য পালনীয়। কোন সভ্যেরই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আদেশ অন্যথা করার নিয়ম নাই। আমরা পৃথিবীর রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এমন কোন দল দেখি নাই যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সংঘর্ষ ছাড়া নেতৃত্বের আচার আচরণ সম্বন্ধে সাধারণ সভ্যগণ স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত করিতে পারেন। নেতৃত্ব ভুলই হউক আর শুদ্ধই হউক, নেতাগণ নিজেদের আসন ও আধিপত্য নিষ্কণ্টক করার জন্য অতি মাত্রায় ঐক্য ও নিয়ম শৃঙ্খলার কথা বলিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া থাকেন। জনগণ তথা সাধারণ সভ্যগণ পরীক্ষক। জনসাধারণের নিকট শুভবুদ্ধি, কল্যাণবুদ্ধি এবং সেবাবুদ্ধির কার্যাত্মক রূপ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই জন সমর্থন পাইতে হয়। এখানে কোন ব্যক্তির বা দলের অভিসন্ধি অচল। তাই রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের জনসাধারণের স্বাধীনভাবে ভোট দানের অধিকারকে এত ভয়। সেই জন্যই দল বা নেতৃত্ব নানা প্রকারের চটকদার মতবাদ, পুলিশ বাহিনী, নীতিকথা, প্রচার, আইন নিয়ম, এমন কি মগজ ধোলাইএর ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। আমাদের মনে হয় ইন্দিরাজী এই সত্যটি অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ভারতবর্ষের রাজনীতির তথা বিশ্বের রাজনীতির দুর্বল স্থানে সাহসের সঙ্গে আঘাত করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়

রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের মধ্যে Independent at the same time interdependent রূপটির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই তিনি সচেষ্ট হইয়াছেন। এবং সেই জন্যই সংসদীয় পরিষদ কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী শ্রীসঞ্জিব রেড্ডিকে ভোটদানের নির্দেশ পালনের প্রশ্নে প্রত্যেক সভ্যের বিবেক অনুসারে স্বাধীনভাবে ভোট দানের অধিকার দাবী—আমাদের বিবেচনায় খুবই বৈজ্ঞানিক ও তত্ত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ—কংগ্রেস সভাপতির নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার অনুগামীগণ সরলভাবেই নির্দেশ অমান্য করিবার কথা ঘোষণা করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি কংগ্রেস সভাপতির অনুমতি চাওয়াতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেস সভাপতির স্বীকৃতি পাইলে উহা প্রকারান্তরে কংগ্রেসেরই একটি স্বীকৃত নীতি হিসাবে পরিগণিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেস সভাপতি তথা সিণ্ডিকেট বলিয়া পরিচিত উচ্চতম পদাধিকারী কতিপয় কংগ্রেস নেতা ক্ষমতাগর্বে গর্বিত হইয়া ইন্দিরাজীর তথা কংগ্রেসেরই প্রগতিশীল কর্মসূচীকে রূপ দেওয়ার কাজে সহায়তা দান না করিয়া তাহাকে ধানচাল করিয়া দিবার জন্যই অতিমাত্রায় ব্যগ্র। তাই তাহারা পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া তুলিয়া ইন্দিরাজী ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে কার্যকরী সমিতির সভা আহ্বান করিয়াছেন। ইহারা যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ হইয়া কংগ্রেসেরই সকল জনকল্যাণমূলক কাজকে বাধা দিবার এবং বিলম্বিত করিবার অপকৌশল অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন তাহা জনসাধারণের নিকট নগ্নভাবে আজ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। দেশবাসী ও সাধারণ কংগ্রেসকর্মীগণ আর ইহাদের চায় না। ইহারা স্বার্থান্ধ হইয়া আত্মসম্মান-বোধ পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থীর পরাজয় অর্থই তাঁহাদের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা। সুতরাং তাঁহাদের যদি এটুকু সম্মান-বোধও থাকিত তবে কালবিলম্ব না করিয়া পদত্যাগ করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য তাঁহারা এই শুভ পথে না যাইয়া ইন্দিরাজী ও তাঁহার অনুগামীদের কংগ্রেস হইতে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। ইন্দিরাজী সর্বস্তরে ব্যক্তি স্বাধীনতা দাবী করিয়া বিপথে চালিত নেতৃত্ব কিম্বা দলের বাধা জনসাধারণকে শোষণের বৃদ্ধিকে সংযত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিতে এই পন্থা অভিনব এবং সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাপূর্ণ। ইহাতে কায়েমীস্বার্থের প্রতিভূগণ ভেঙ্গে ভিন্ন হইবেনই। তাই তাঁহারা ইন্দিরাজী কমিউনিষ্ট হইয়া গিয়াছেন—কমিউনিষ্টগণের সঙ্গে আঁতাত করিয়াছেন বলিয়া অপপ্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। ইহারা জানেন না যে কমিউনিজম্ বিশ্বে একটি বিশেষ ঘটনা এবং ইহাকে নিন্দা করিয়া বা নিষ্পেষণ করিয়া ইহার গতি রুদ্ধ করিতে পারিবে না। কমিউনিজমের অন্তর্নিহিত সত্যকে স্বীকার করিয়া অধিকতর যোগ্য তত্ত্বের অধিকারী হইয়া কমিউনিজমকে পরিপাক করিতে হইবে এবং এই ভাবেই ভারতবর্ষকে শ্রেণী-সংগ্রামের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবে। ইন্দিরাজী সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। গান্ধীজি-প্রবর্তিত এবং বহু নর-নারীর রক্তে পুষ্ট কংগ্রেস যে ঘুনে ধরা জড়ধর্মী আদর্শ লইয়া চলিতেছে তাহা বদলানো হয় নাই—কমিউনিজমের অন্তর্নিহিত সত্য সর্ব সাধারণের স্বীকৃতির সঙ্গে কংগ্রেস যে সর্ব-সাধারণের সুখ শান্তি সোয়াস্তিরও জন্ম দিতে পারে এমন অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক জীবনাদর্শই যে কংগ্রেসের কাম্য ছিল ও আছে, অথচ যাহাকে আমাদেরই মত কতকগুলি স্বীকৃতপ্রাপ্ত সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মানুষগুলির জন্য রূপ দেওয়া যাইতেছিল না সেই কথাটি প্রকাশ করিয়া দিয়া এবং কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসের সেই আদর্শকেই ইন্দিরাজী তুলিয়া ধরিলেন। এইখানেই তাঁহার অবদান কালের বুকে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। আজ ধনিকরাজ কিম্বা শ্রমিকরাজ কোনটিই বিশ্বে শান্তি আনয়ন করিতে অপারগ প্রমাণিত হইয়াছে। আজ প্রয়োজন—এমন একটি রাজ—মনুষ্যরাজ—যেখানে ধনিক তার ধনলিপ্সাকে সংযত করিয়া তার ধনকে দেশের সেবা, বিশ্ব-সেবার কাজে নিয়োগ করিবে, শ্রমিকও তাহার শ্রমকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করিয়া দেশসেবা বিশ্বসেবার অংশীদার করিবে। ইন্দিরাজীর অধুনাকালের বক্তৃতার মধ্যে তিনি যে ঐ দিক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ইন্দিরাজী, দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হউন। শ্রীভগবান আপনার সহায়—পথের সকল বাধা বিপত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। জয় নিতাগোপাল, জয় পুরুষোত্তমানন্দ।

—শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি, নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন করার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রহ্ম। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্গের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবান্তর, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার দুঃখে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১। ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
- ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
- ২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
- ৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)

২। ঈশোপনিষৎ
৩। কেনোপনিষৎ
৪। কঠোপনিষৎ
৫। প্রশ্নোপনিষৎ
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
স্বরাজের পূর্ণরূপ
গীতাজয়ন্তী
উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

৺প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির জন্মকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিষ্য নিত্যগোপাল
ও শিক্ষা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়ঋষি শ্রীনিত্যগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন
রবীন্দ্র-হৃদয়
প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—দেশবন্ধুনগর) ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীশ্রীনিতাগোপাল

শারদীয়া ১৩৭৬, ১৯৬৯ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদ[illegible] ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুই-এর সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

P 29274

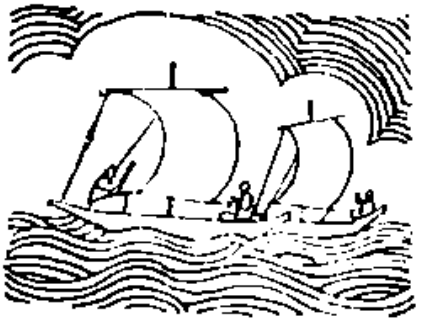

উৎসবের ঋতু শুরু হল।

নীল আকাশ আর
সোনা-সোনা রোদে
দূরের হাতছানি।
ক্লান্ত দিনগুলির স্মৃতিকে
পেছনে ফেলে এই তো
বেড়িয়ে পড়বার
সময়। আর, ঘরছাড়া
মানুষেরাও তো ঘরে
ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব।
তাঁদের যাত্রাপথ শুভ
ও নির্বিঘ্ন হোক।

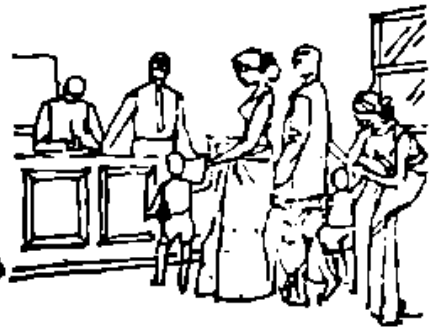

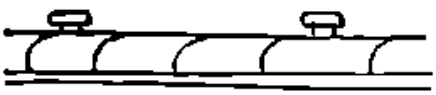

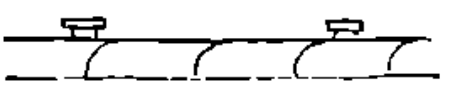

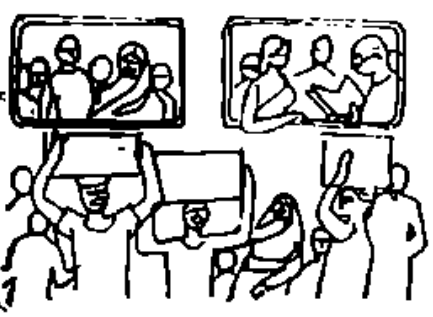

পূর্ব রেলওয়ে

With best compliments of

National Rubber Manufacturers Ltd.

54/10, Debendra Chandra Dey Road

Calcutta-15

With best compliments of

Orient General Industries Ltd.

6, Ghore Bibi Lane

Calcutta-54

ছোটদের জুতো চাই আজীবন খুশি পায়ে চলতে

ছোটদের চলতে [illegible] মনে রেখেই তৈরি।
এমনই এদের নকশা ও নির্মাণ যে-পায়ে যে ছুটিতে চলতে
ভালো লাগে। সামনে আঙুল ছেলার ফাঁকা নকশা, খাপখাওয়ানো
গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর ভাঁজ যা অনায়াসে পা
খাপখাওয়ানোর সহায়ক। টুকটুকে রঙ, বাহারে নকশা, আর
আরামে পরলা নম্বর—এমন জুতোই এখন মজুত
দোকানে দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের,
এদের খুশি পায়ে শুধু ছোক শতেকের শোচকারো।

Bata

আকাশি ৪.৭৫—৫.৫০

৫।৫ ১১৩

ইউবিআই এর ঋণদানের ব্যাপকাচিতে

বিরাট পরিবর্তন

ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগী, চাষী, খুচরা দোকানদার, পরিবহন পরিচালক বা অন্যান্য ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে তাদের যে গুণটি প্রধান বলে গণ্য হয় তা হল ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা যার অর্থই হল

- ● কারিগরি বিদ্যা
- ●● পরিচালনে পারদর্শিতা
- ●●● উৎপন্ন দ্রব্যের বা সেবার বিপণন ব্যবস্থা
- ●●●● ব্যক্তিগত সততা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

হেড অফিস ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

এই তব শুভ আশীর্বাদ !

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে গান্ধিজী কথাপ্রসঙ্গে প্রিয় শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, তাঁর ন ইচ্ছে যে দেশে সত্যিকারের ভালো স্বদেশী কাপড় তৈরী হয় দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত দুই তরুণ "মৈত্র" ভ্রাতা তখন সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছেন। সতীশ বাবু তাঁদের দুজনকে ডেকে এই মহৎ কাজের ভার দেন। সহায় সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই, তবু শুধু নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম সম্বল করেই তাঁরা গ্রহণ করেন এই দুঃসাধ্য ব্রতের ভার মাথায় তুলে নেন। আজকের বিশ্ববিখ্যাত সুলেখা ফাউন্টেন পেন কালির এই হল সেই ছোট্ট কথা।

সুলেখার আজ যে এই সুনাম ও সমাদর, এটা গড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লেগেছে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে, নিরলস গবেষণা, কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এই বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

যাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই জাতির জনকের পুণ্য জন্মশতবর্ষে, তাঁর উদ্দেশ্যে বিনত নমস্কারে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক, কলিকাতা৩২

Progressive SW-44

পূজার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

বেলেঘাটা ভ্যারাইটী ষ্টোর্স

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,

কলিকাতা-১০

আমাদের দেশবাসীর ও পৃষ্ঠপোষক-
গণের সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ুক এই কামনা
করছি এবং দেশ গড়ে তোলার
সমস্ত কাজে আমরা সর্বাঙ্গীন
সহায়তা ক'রব, নতুন করে
আবার এই শপথ নিচ্ছি।

হেড অফিস : কলিকাতা

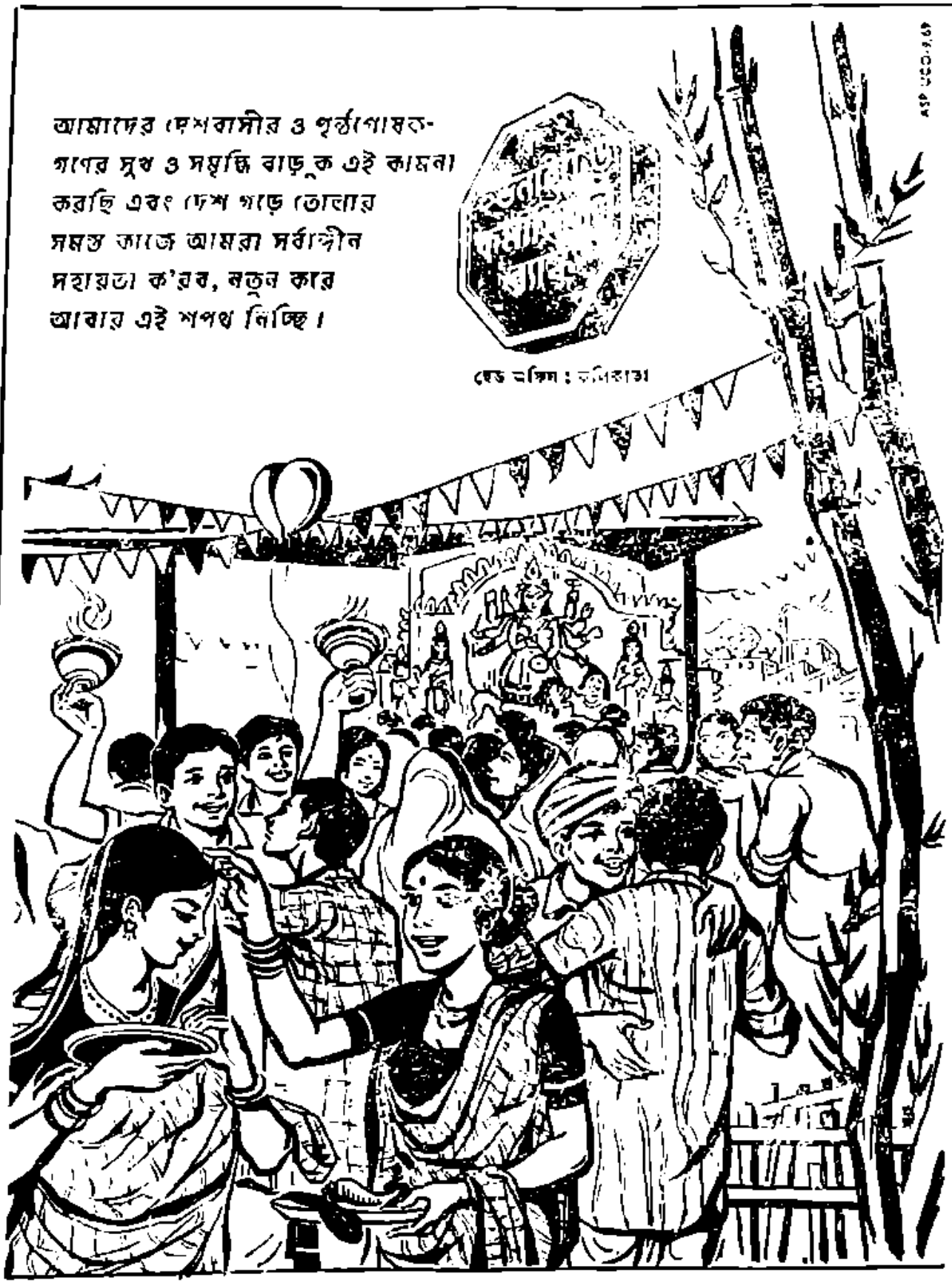

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·০০
কর্মবাণী	১·১৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৫·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	১·৫০
বাংলার মনীষী	১·৩০
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·১৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ
মানুষের মত মানুষ
বঙ্কিমের গল্প
বিদ্যাসাগর
ছোটদের সেরা গল্প

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

হুড়ায় জীবনী	১·২৫
শিশু রামায়ণ	০·৬২
শিশু মহাভারত (শিক্ষা-বিষয়ক বই)	০·৭৫
শিক্ষা—শ্রীরমণী রঞ্জন সেনগুপ্ত	৭·৫০
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি	১২·০০

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত ও শ্রীরমণী সেনগুপ্ত

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা	৯·২৫

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত

শিক্ষা-বিজ্ঞান—শ্রীযতীন্দ্র চৌধুরী	৩·৫০
শিক্ষার ইতিহাস—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী	৩·২৫

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী	২·৫০
ভয়ঙ্কর আফ্রিকা ১ম, ২য়	৩·২৫
বেদুইনের দেশে	১·৭৫

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	১·৫০
নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন	১·৫০
সরল যোগ ব্যায়াম	১·৫০
যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	১·৫০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	১·২০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৩·৫০

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর (মহারাজ)

জেলে ত্রিশ বৎসর ও ভারতের
বিপ্লব-সংগ্রাম

শ্রীরমেশচন্দ্র সরকারের

বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

সর্বদা ব্যবহার্য মধ্যমাকৃতি অভিনব বাংলা অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ঔপনিষদ

শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী

লেখিকা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ঈশ, কেন, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর—এই চারিটি উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। "সংস্কৃত ভাষা যাঁরা জানেন না তাঁদের কাছে গ্রন্থটি অসীম মূল্যবান বলেই প্রতিভাত হবে।"—

মাসিক বসুমতী ।। মূল্য ৬·০০

অভয়ের কথা

স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ও

মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত

'অভয়ের কথা' সম্বন্ধে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন "কি অপূর্ব ভাষা, বুঝাইবার সে কি অপূর্ব ভঙ্গী! বাংলা সাহিত্যে ইহার জোড়া দেখি নাই।"

"বেদান্তের তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকসমাজের দৃষ্টি পুস্তকটির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।"— উদ্বোধন ।। মূল্য ৫·০০

সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত মূল্য ৫·০০

বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
মোহিতলাল মজুমদার ৫·০০

বিবেকানন্দের সমাজ দর্শন
অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ৫·০০

[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্, এ-৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২, ভূপেন বসু এভিনিউ
কলিকাতা-৪

রোদ বৃষ্টি মাথায় করে সবসময় আমায় কাজে বেরোতে হয়—কিন্তু চুল আমার এলোমেলো হলে চলেনা—আর তাই আমি নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখি

কেয়ো-কার্পিন তেল মোটেই চট্‌চটে না, বালিশে বা জামায় দাগ লাগে না,—আর এর মৃদুমধুর গন্ধ সারাদিন শরীর মন ঝরঝরে রাখে।

সারাদিন ছোটাছুটির মাঝেও কেয়ো-কার্পিনে আমার চুল পরিপাটি থাকে।

কেয়ো-কার্পিন
কেশ তৈল—আরো তরতি চুলের জন্য

কেশ কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

সূচীপত্র : আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৭৬, ১৯৬৯

শ্রীদুর্গা (কবিতা)
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

বেদান্ত শক্তিদর্শন সমন্বয়
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

বাংলা কথ্য সাহিত্যে সাম্প্রতিকতা
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

তুই আমি (কবিতা)
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায়

আমাদের সংস্কৃতি
শ্রীভারতী

সংসারে কৃতিত্ব কোথা ? (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ

পারিবারিক জীবন আলোচনা
ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃতের কবি রবীন্দ্রনাথ
ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

আমি বিশ্বনাগরিক
শ্রীনলিনীবিনোদ গুহ

শ্রীদুর্গা (কবিতা)
শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

বেদোক্তবিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদের কথা
শ্রীঅনিলকুমার সমাদ্দার

যে স্মৃতি আজও ভুলিনি
শ্রীকবিদাস সাহা

অথ অন্ধ-খঞ্জ-সংবাদ (কবিতা)
শ্রীঅনিরুদ্ধ বিশ্বাস

অভেদানন্দ অন্তর্ধান
শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

মুক্তিপথ
অনামিকা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী
(১৯৪৪)

প্রার্থনাকালীন ভাবণ

সিদ্ধান্ত দর্শন
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

গান্ধী শতাব্দীতে
গান্ধীজীর রচনাবলীর বঙ্গানুবাদ পড়ুন

	মূল্য
আত্মকথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ গুহ	১২·০০
গীতাবোধ—ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শিক্ষায়	১·৫০
সত্যই ভগবান—শ্রীনরেন্দ্রনাথ গুহ	৩·০০
পল্লী পুনর্গঠন—শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০
নারী ও সামাজিক অধিকার—শ্রীউপেন্দ্র রায়	৪·৫০
সর্বোদয়—শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত	১·৫০
পঞ্চায়েত রাজ—শ্রীমতী সাধনা সোম	·৭৫
অভিবাদ—শ্রীমতী সাধনা সোম	·৬১
উৎপাদক শ্রম—শ্রীসন্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	·৬০
আমার সমাজবাদ—শ্রীঅজিতকুমার বসু	১·০০
অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি—শ্রীশিশির সান্যাল	১·০০
গান্ধী-রচনা-সংকলন—শ্রীসন্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
মোহনমালা (গান্ধীবাণী)—শ্রীঅনাথ বসু, শ্রীসুধীর লাহা	৩·৫০

গান্ধীজীর সম্পর্কিত ও অন্যান্য বই

মহাত্মা গান্ধী—ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ	৫·৫০
(কাপড়ে বাঁধাই)	৮·৫০
গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন—শ্রীরবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫·৫০
মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি—স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ	৩·০০
সর্বোদয়ের পথ—গান্ধীপন্থী নেতৃবর্গের ভাষণাবলী	৩·০০
স্বর্গের সন্ধান—শ্রীসন্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রিচার্ড গ্রেগ-এর 'আই ওয়াণ্ট এ জয়'-এর স্বানুবাদ)	·৭৫
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ—শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (যন্ত্রস্থ)	
স্বাস্থ্যরক্ষা নিম, তুলসী, বেল—শ্রীসরোজ মজুমদার	·৫০
গান্ধীচরিত কথা—শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার বসু (যন্ত্রস্থ) (রামায়ণের মত পয়ার ছন্দে লিখিত গান্ধীজীর জীবনকাহিনী)	

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা),
১ ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

পাঠাগারের অপরিহার্য বই
মণি বাগচির
বাঘা যতীন—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে একদিন নরকারতের ইতিহাসটি সৃষ্টি করেছিলেন বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি বাঘা যতীন নামে পরিচিত। ইতিহাসের পেছনপটে রচিত তাঁর সম্পর্কে এই নূতন জীবনীতে বহু নূতন তথ্য আছে আর আছে সেই বিপ্লবী মানবের বাস্তবনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু	মণি বাগচি	৪·০০
জননায়ক জওহরলাল	মণি বাগচি	৪·০০
সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী	মণি বাগচি	৩·০০
সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক	মণি বাগচি	৩·০০
লোকমাতা নিবেদিতা	মণি বাগচি	২·৫০
বাংলার বাঘ আশুতোষ	ভবেশ বিশ্বাস	২·৫০
দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র	মণি বাগচি	৪·০০

শিক্ষা ভারতী
৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

বিশ্ব-বীক্ষা প্রকাশনী র

সৌজন্যে

৩৩এ, বেদিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৯

আমাদের শক্তি শুধু ইস্পাতেই নয়, মানুষেও। এই কিশোরটির চোখে যে নিশ্চিন্ততার ভাব স্পষ্ট তার মূলে আছে পারিবারিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। আর এই পারিবারিক সুখশান্তি পরিবার নিয়ন্ত্রণের ফল। জামসেদপুরে পরিবার পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চলেছে।

টাটা স্টীল

TJ 70BA

With Compliments from

HINDUSTAN MOTORS LIMITED

15, India Exchange Place,

Calcutta.

Factory : Uttarpara (Hooghly)

মাটিতে আলু-পটল ও ব্রহ্মজ্ঞান দুই-ই যুগপৎ ফলাইতে সক্ষম বিপ্লবী শ্রীকৃষ্ণ। পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্মের ক্ষেত্রে গীতার পুরুষোত্তমবাদের লাঙ্গলে চাষ লাগাইয়া নূতন বিশ্ব যে গড়া যায় তাহারই খোঁজ পাইতে পড়ুন

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত

সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-র

অবধূত-ভাষ্য

নরনারায়ণ আশ্রম

UNIVERSITY

উজ্জ্বলভারত

আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৯ — ষাবিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

শ্রীদুর্গা

। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ।

শ্রীদুর্গা নামের অদ্ভুত প্রভাব।
সে নামপ্রভাবে নির্ম্মল স্বভাব। ১।
সে নামপ্রভাবে তোরেছি বিপদে,
পেয়েছি বিবেকে এ জ্ঞান-সম্পদে,
পেয়েছি হৃদয়ে শ্রীদুর্গার পদে,
সে নামপ্রভাবে পেয়েছি সুভাব। ২।
নিত্য নিরমল শ্রীদুর্গার নাম,
অদ্ভুত আশ্চর্য্য শ্রীদুর্গার প্রেম!
শ্রীদুর্গার প্রেম নিত্য নিরুপম!
সে প্রেমে মোহিত নিজে মহাদেব। ৩।
মহাদেব শিব আমার জনক,
তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অপূর্ব্ব আলোক!
আলোকিত তাহে দিব্য শিবলোক!
সে শ্রীপদ সদা ভক্তিভাবে ভাব। ৪।
পরম বৈরাগ্য তাঁহার কৃপাতে,
ডুবেছে এ মন নির্ম্মল ভক্তিতে!
তাঁহার কৃপাতে ডুবেছে তাঁহাতে।
তাঁহার কৃপাতে মোহের অভাব। ৫।
বল শিব, শিব, দুর্গা বল রে,
শ্রীদুর্গার নাম জপ রে অন্তরে,
শ্রীদুর্গা শ্রীশিব দিবা দেহ ধ'রে,
তাঁদের মহিমা কিরূপে বর্ণিব? ৬।
(তাঁ'দের) অনন্ত প্রভাব অনন্ত মহিমা!
অনন্ত স্বরূপে চিন্ময়ী সুষমা!
নিরুপম শিবে শিবা নিরুপমা!
সগুণ শ্রীশিব, তত্ত্ব শিব শব। ৭।
অপ্রাকৃত শব! শব নির্ব্বিকার।
শব অপ্রাকৃত দিবা নিরাকার!
ভাব শব শিবা ভাব নিরন্তর!
ভাবে শব শিবা শ্রীকৃষ্ণ মাধব ৮।

শ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

তিন প্রকার পূজা। সত্ত্বগুণীর পক্ষে সাত্ত্বিকী পূজা, রজোগুণীর পক্ষে রাজসী পূজা এবং তমোগুণীর পক্ষে তামসী পূজা।

অবিচলিত চিত্তে যিনি ভক্তিসহকারে পূজা করেন, তিনিই যথার্থ পূজা করেন। তাঁহার পূজাই দেবতা গ্রহণ করেন।

ভক্তির সহিত যিনি ভগবানের পূজা করেন তাঁহার পূজাই ভগবান গ্রহণ করেন।

পূজা অতি সহজেই অভ্যাস করা যায়। ভক্তি অতি দুর্লভ। তাহা অভ্যাসদ্বারা লাভ করা যায় না।

শিশু নিজ হাতে করিয়া খাইতে পারে না, তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। পুরোহিত পূজা করাবেন তাঁদের যাঁরা নিজেরা পূজা করিতে অক্ষম এবং ভক্তিহীন। ভক্তের ভগবানের পূজার সময় পুরোহিতের আবশ্যক নাই। তিনি স্বয়ং পূজা করিবেন।

বেদান্ত শক্তিদর্শন সমন্বয়

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ॥

শক্তিকে কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই; 'পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। পরাশক্তি অস্বীকার করিলে 'এক' হইতে কি স্বাভাবিকভাবে জগৎ-উৎপত্তির সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করা যায়? শ্রুতিকে মুখে 'মানিলাম' বলিলেই মানা হয় না। শক্তিহীন 'একের' স্থাপনা করিয়া এবং তাঁহাকেই জীবনে পাইবার সাধনা অঙ্গীকার করিয়া ভারত ক্লীবতায় ডুবিয়া গিয়াছে। শক্তিকে অস্বীকার করিতে গিয়া শক্তির প্রেম-ময় দান ঐ কৈবল্যের পরিবর্তে পাইয়াছি কৈবল্যময় ক্লৈব্যই। আজ কেবলাশক্তির সহিত কেবল ব্রহ্মের সংভাব ও অনন্তরমণ অনুধাবন দ্বারাই আমরা গৃহজীবন, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্রজীবন, ধর্মজীবন গড়িয়া তুলিব। শক্তির চরণতলে লুটাইয়া শিব শক্তিময়, শক্তিজয়ী; শ্রীকৃষ্ণ 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' হইয়াই 'রন্তুম্ মনশ্চক্রে'। শক্তির অতীত হওয়া ও শক্তিকে দমন করা একই রসবস্তুর বিবিধ ধারা মাত্র। কেবল কোনও একটির ভজনে শ্রুতির 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' মন্ত্রাবলীর অসম্ভবত্বই উপলব্ধ হইবে, যতই না মুখে শ্রুতির দোহাই দেওয়া হউক না কেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় জীবনে ও গীতাশাস্ত্রে ব্রহ্ম-শক্তির অবিরোধ সমন্বয়ই প্রচার করিয়া-ছেন। শক্তিই তাঁহার যোনি 'মহদ্ ব্রহ্ম'। শক্তির আলিঙ্গন ব্যতীত ব্রহ্মে কোন সৃষ্টির কথা উঠিতেই পারে না। জীবেরও সেই স্বভাব। অতীতপ্রায় বর্ত্তমান যুগ যাহা ব্যভিচারিণীর প্রলোভনায় সকল হারাইয়া পথে পথে ভিখারীর মত শক্তির তাড়নায় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। শক্তি তাহার কাছে আজ অত্যাচারিণী নৃসংস মূর্তিতে প্রতীয়মান, তিনি আজ রামপ্রসাদের মা। এ হেন শক্তিকে তুচ্ছ করিতে করিতে শক্তিও আমাদিগকে তুচ্ছ করিলেন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। গোপীগণ এই মহাশক্তির পূজা করিয়া পরাশক্তিময়ী হইয়া কৃষ্ণসহ রাসলীলা আস্বাদনে ধন্য হইয়াছিলেন।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্।
আপ্লুত্যাম্ভস্যি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চুর্নৃপসৈকতীম্।

• • •

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ

—ভাগবত ১০। ২২। ১-২-৪

বিশ্বের মধুলীলায় যোগদানপ্রয়াসী রসিকবৃন্দ বিশ্ব ও ঈশ্বরের সমন্বয় বিধানার্থই এই কাত্যায়নীব্রত যুগে যুগে করিয়া আসিতেছেন। কেহ যেন মনে না করেন যে, কাত্যায়নী দেবী শুধুই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সাধন (means) এবং কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সেই সাধনের সাধ্য (end)। সাধ্য-সাধনের এই বিভাগ-লোপ করাই কাত্যায়নী পূজার তাৎপর্য্য। ইনিই উপনিষদের দেবী, গায়ত্রী, যোগমায়া মহাবিদ্যা। 'বিদ্যা আত্মনি ভিদাবাধঃ'। ভেদদর্শনবাধই বিদ্যা। কাত্যায়নী পূজার ফলে ব্রজগোপীদের বিকল্প বসনই অপহৃত হইয়াছিল।

সত্যই কাত্যায়নী পূজায় সব বিকল্প দূর হয়। বিকল্প বসন বর্ত্তমান জগৎকে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। বিকল্প বসন হরণার্থই আবার যুগের বুকে যমুনার তীরে অন্ধকারের রাত্রে শক্তিপূজার মঙ্গল ঘট স্থাপন করিতে হইবে, নচেৎ এ জাতির কল্যাণ নাই। কে আছ নচিকেতার মতন একনিষ্ঠ সাধক, এস, এই যমপুরীর ঘোর সূচীভেদ্য তমঃ উজ্জ্বল করিয়া রাসলীলার মহাবার্ত্তা জগতে প্রকট করিবে। এস, অগ্রসর হও, ধন্য হও, ধন্য কর।

ব্রহ্মসূত্র-অবধূতভাষ্য

বাংলা কথা সাহিত্যে সাম্প্রতিকতা

।। শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ।।

নদী যেমন পাহাড়ের গুহামুখ বা সরোবর থেকে বেরিয়ে শহর গ্রাম বা জনপদ দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে সাগরাভিমুখী হয়, সার্থক উপন্যাসও তেমনি একটি দেশ বা জাতির ঐতিহ্যের ধারায় পুষ্ট হ'য়ে তার সংস্কৃতি ও সমাজের বৈশিষ্ট্যকে বহন ক'রে মানবতার গভীর অনুভবের দিকে প্রধাবিত হয়। শিল্পকর্ম ও সংস্কৃতির ধারা থেকে একটি দেশ ও জাতির মন ও চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় কথাটা ঘুরিয়েও বলা যায়। একটি সার্থক উপন্যাস অনেক সময় জাতির চিন্তাধারাকে গঠিত করে, তার চরিত্রকে পুষ্ট করে, এমন কি তাকে আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে' নতুন সৃষ্টির কর্ম ও চেতনায় উজ্জীবিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এই অর্থে যতখানি সত্য, টুর্গেনিভের 'ফাদার্স এণ্ড সন্স'ও ততখানি। শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ' ও 'পথের দাবী' লিখে গ্রামের অশিক্ষিত অবহেলিত এমনকি জীবনবেদনায় কাতর মানুষের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বলেই আমরা পল্লী ও পল্লী সমাজের প্রতি সমবেদনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করে মানুষ—বিশেষতঃ গ্রামের সেই অশিক্ষিত, মূর্খ, প্রাণাবেগে প্রবল অথচ সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্যে বিপর্যস্ত—সাধারণ মানুষের অপূর্ব আলেখ্য নিপুণ শিল্পরচনার মাধ্যমে পেয়েছি। পরবর্তী যুগে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমার সেই ঐতিহ্যের ধারাতে পুষ্ট হ'য়ে মানুষের জীবনের কাহিনীকে অশ্রুসিক্ত বেদনার অনুভবের মধ্য দিয়ে দেখতে পেয়েছেন।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে বিভিন্নধারা চিন্তা ও ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। বস্তুতঃ নদী যেমন তার গতিপথে বিভিন্ন জলধারাকে গ্রহণ করে' করে' এগিয়ে চলে, সাহিত্য-চিন্তাকেও তেমনি দেশ ও বিদেশের ভাবধারাকে গ্রহণ করে পুষ্ট হ'তে হবে। আধুনিকতার অর্থই হ'চ্ছে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারা; এবং মানুষের প্রয়োজন ও কল্যাণের সঙ্গে শিল্পবোধের আনন্দকে যুক্ত করা।

সমকালীন বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের মধ্যে আধুনিকতার যে লক্ষণগুলি চোখে পড়ছে তাতে পুরো-পুরি আশস্ত হবার মত মনোভাব খুঁজে পাচ্ছিনা। সাহিত্যের মহত্তর উদ্দেশ্য শিল্প সৃষ্টি, কিন্তু শিল্পবোধকে বিপর্যস্ত করা নয়। তাছাড়া মহৎ শিল্পী যদি শিল্পবোধের বাইরে ব্যবহারিক বোধকে প্রাধান্য দেন তাহ'লে শঙ্কিত হওয়ার কারণ থাকে। যখন ঐতিহ্য-বিচ্যুত কোন শিল্পী দুরভিসন্ধিবশতঃ শিল্পসৃষ্টিকে ব্যবসায়িক পর্যায়ে নামিয়ে আনে, তখন সেই শিল্পী যে চরিত্র ভ্রষ্ট ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণজনক, এ কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা বুঝতে হলে সাম্প্রতিকতার লক্ষণগুলি জানা দরকার। আজ বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিক বিষয় বা আদর্শ ঔপন্যাসিকের হাতে নির্দ্ধারিত হয় না; হয় পুস্তক প্রকাশক অথবা মুনাফালোভী পত্রিকা সম্পাদকের হাতে। প্রকাশক ও পত্রিকা সম্পাদক (বিশেষ করে' পূজাসংখ্যার) এই দুয়েরই উদ্দেশ্য হ'ল—প্রথমতঃ লাভের অংশ বাড়ানো, দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মানুষের বাহবা কুড়োনো।

উপন্যাসের সঠিক সংজ্ঞা কি হ'বে এ নিয়ে মত ভেদ আছে। তবু একটি কথায় উপন্যাসের রূপ নির্ণয় করা সম্ভবতঃ অগ্রাহ্য হ'বে না। উপন্যাস হ'চ্ছে জীবনের প্রবহমানতার শিল্পপ্রকাশ। জীবনের রূপায়ন, জীবনের বিশ্লেষণ, মানবিক চেতনার উন্মেষ—এ' যদি উপন্যাসে আবিষ্কার করতে না পারি, তবে উপন্যাস কোন্ উপকরণ নিয়ে হবে? লিরিক কবিতা কোনদিন উপন্যাস হ'বেনা,

কেননা কোন একমুহূর্তের বিশেষ অনুভূতির মধ্যে রস সঞ্চার করা উপন্যাসের কাজ নয়। ছোট গল্পের পরিধিতেও জীবনের বিশেষ এক বৈচিত্র্যের রূপ ধরা পড়ে। লিরিক কবিতার মত ছোট গল্পেরও একটি কেন্দ্র বিন্দু আছে। তার পরিধির সীমা আছে। কিন্তু উপন্যাসে জীবনের সমগ্রবিকাশ তার মধ্যে প্রবহমান জগতের রূপ। সে আংশিক খণ্ডিত নয়, পূর্ণে বিধৃত। তাই উপন্যাসের ক্যানভাস সমগ্র জীবনের ক্যানভাস। সে ক্যানভাসে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, রাত্রির নিবিড় অন্ধকার ও আঁধার থেকে আলোকের প্রসূরণ সবটাই ধরা পড়ে।

উপন্যাসের উপাদানগুলিকে ভেঙে ভেঙে যদি দেখানো যায় তাহলে কি পাওয়া যাবে? প্রথমতঃ একটি ভাল প্লট, একটি কাহিনী বা গল্পকে কেন্দ্র করে ঘটনার বিন্যাস। ঘটনাগুলি জীবনের ঘটনা। বাস্তব পৃথিবীতে যে ঘটনাগুলির প্রভাবে জীবনের গতি ও আলোড়ন। [কিন্তু একটি সুবিন্যস্ত প্লট থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় কিনা সে বিষয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক উপন্যাসে যাঁরা নানারকম পরীক্ষা করে চলেছেন তাঁদের বইয়ে প্লট একটা থাকলেও তা সুবিন্যস্ত নয়। গল্প সেখানে প্রাধান্য লাভ করেনি। উদাহরণ স্বরূপ নাম করা যায় টমাস মান ও মার্সেল প্রুস্ত এর] দ্বিতীয়তঃ দুই বিখ্যাত লেখক ওয়েল্‌স্ ও মম এর আদর্শ পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চার করতে পারা। অবশ্য এটাই সাহিত্যের সনাতন আদর্শ। লেখক যদি তাঁর উপলব্ধির আনন্দকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করতে না পারেন তবে লেখকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। তৃতীয়তঃ উপন্যাসের প্রধান ধর্ম চরিত্র সৃষ্টি। শুধু একটি প্রধান চরিত্র নয় অনেকগুলি চরিত্র সৃষ্টি, যে চরিত্রগুলি জীবনের বিভিন্ন প্রকাশকে রূপায়িত করবে। তলস্টয়ের্ভ্‌স্কির ব্যাপারভ্‌ এর মত চরিত্রের সৃজন বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। তবু 'গোরা' 'নিখিলেশ' দুটি চরিত্র যা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। 'শেষপ্রশ্নের' 'কমল' এমন আর একটি চরিত্র যা জীবনকে মহিমান্বিত করেছে। উপন্যাসের চতুর্থ প্রয়োজন—জীবনদৃষ্টা ও জীবনের অন্তর্মুখর মুহূর্তগুলির প্রতিফলন। জীবনের চেয়ে শিল্প কখনও বড় হতে পারে না কারণ জীবনকে নিয়েই শিল্প। Art is the criticism of life. পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশ ও বিভিন্ন চরিত্রের সংঘাতে, ঘটনা বা দুর্ঘটনার গতিপথে জীবনের যে গতি ও বিবর্তন—তাকে রূপায়িত করতে পারাই উপন্যাসের প্রধানতম ধর্ম। পঞ্চম কথা যুগ ও সমাজ চেতনা। উপন্যাসকার যুগের প্রবাহে অবগাহন না ক'রে যুগের উর্দ্ধে ওঠার আশা করতে পারেন না। কোন জীবনই যুগ বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। উপন্যাসের সর্বশেষ কথা—শিল্পরীতির যথার্থ অভিব্যক্তি। শিল্পীর রচনাশৈলী আঙ্গিক ও দর্শন-বৈশিষ্ট্য তাঁর একান্ত নিজস্ব। এরই মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। ওপরের যে কোন একটি উপাদানের ঘাটতি হলেও চলে; কিন্তু শিল্পরীতি ব্যর্থ হ'লে উপন্যাসের ভবিষ্যৎও ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

আমি এতগুলি উপকরণের মধ্যে দুটিকে বিশেষভাবে বেছে নিতে চাই। অবশ্য শিল্পরীতি না থাকলে কোন বিষয়ই রসোত্তীর্ণ হয় না। দেহের প্রতিটি অংশ সাজিয়েও একটি মানুষকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তার প্রাণশক্তি থেকে। তাই সাহিত্যের সব কিছু উপকরণের আরক রস হ'চ্ছে শিল্পরস। এই শিল্প রস লেখকের অনুভব ও উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল। এবং এই শিল্পরসই শিল্পের বিষয়কে সরলের করে তোলে। কিন্তু আমি সাধারণভাবে দুটি উপাদানের কথা বলছি যে দুটির অভাবে উপন্যাস উপন্যাসপদবাচ্য হয় না। সে দুটি হ'ল: প্রথম—জীবনের গতিবেগ, ঘটনা ও সংঘাতের মাধ্যমে প্রতিফলিত জীবন ধারার নিরন্তর প্রবাহ এবং দ্বিতীয়—মানবতার অনুভব। সমগ্র জীবনের ধারণা থেকে যে অনুভব আসে এবং যে অনুভব শিল্পীকে তার ব্যক্তি সত্তা থেকে, তার ক্ষুদ্র খণ্ডিত জীবন ধারণা থেকে, তার সীমাবদ্ধ পরিবেশ থেকে বিশাল পৃথিবীর দিকে টেনে নিয়ে যায়। যে অনুভব শিল্পকে সর্বযুগের ও সর্বমানবের ক'রে তোলে।

উপন্যাসসাহিত্যপরিক্রমায় যে কটি নাম আপনা থেকেই মনে এসে যায় সেগুলি হল—টলষ্টয়, ডষ্টয়েভস্কি জোহান বোয়ার, হিউগো। বালজাক বা মোপাসাঁ মূলতঃ গল্প লেখক। পরবর্তী কালে জীবনের সমগ্র বোধ নিয়ে উপন্যাস লিখে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম হ'ল হেমস্, লরেন্স, সাঁত্রে, প্রুস্ত্ ইত্যাদি। টলষ্টয় থেকে প্রুস্ত অথবা ডষ্টয়েভস্কি থেকে সাঁত্রেতে বিষয় ও ভঙ্গির যে বিবর্তন ঘটেছে বাংলা উপন্যাসে তার উদাহরণ খুঁজতে গেলে সম্পূর্ণ হতাশ হ'তে হবে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এবং প্রথম সার্থক উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের গোরা। তারপর শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর পার হ'লে মন যেন কিছুটা হোঁচট খায়। অবশ্য নতুন এক একটা ধারার প্রবর্তনের জন্য আরও অনেকের নাম করা যায় শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য থেকে সুরু ক'রে অতি আধুনিক যুগে সমরেশ বসু পর্যন্ত। অন্নদাশঙ্করের বুদ্ধিদীপ্ত দার্শনিকতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রে ধূসর ও ধূলিমান জীবনের আকস্মিক চমক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তর্মুখীন হৃদয়ের প্রগাঢ়তা এবং সুবোধ ঘোষের অভিজ্ঞতার তাপর জীবনলেখ্য উপন্যাস সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে মর্যাদা দিয়েছে। প্রথমোক্ত চারজনের মধ্যে যে ঐতিহ্যচেতনা, দৃষ্টির গভীরতা, সমবেদনা বোধ ও আন্তরিকতা ছিল, তার দ্বারা তাঁরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হ'য়ে আছেন। পরবর্তী যুগের লেখকবৃন্দ আর একটু যুগসচেতন হ'য়েছেন এবং রীতি নিয়ে পরীক্ষার পথে এগিয়েছেন। কিন্তু ফল সর্বত্র শুভ হয়নি। বিদেশী সাহিত্যের মহৎ শিল্প প্রেরণাকে আত্মস্থ করবার শক্তি তাঁদের না থাকায়, দৃষ্টির ব্যাপকতা ও অনুভবের গাঢ়তা না থাকায় সাফল্য বিঘ্নিত হ'য়ে থেকেছে। আরও পরবর্তী দলে অর্থাৎ সমকালীন যুগের লেখকদের সাহিত্য নিষ্ঠার চেয়ে বেশী নিষ্ঠা দেখা গেছে অর্থোপার্জনে অথবা বাহবা পাওয়ার চেষ্টায়। প্রথমেই এ'বিষয়ে আলোচনা করা হ'য়েছে, এবং সেই প্রসঙ্গেই আধুনিক যুগে উপন্যাসের ধারাকে লক্ষ্য করা যাক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে জীবনের মূল্যবোধগুলি বিপর্যস্ত হ'য়ে যাওয়ায় চিন্তাজগতে যে বিভ্রান্তি বা নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে তার ফলে কোন সুস্থির ও সুস্থ জীবনবোধ দানা বাঁধতে পারছেনা। ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশের লেখকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস শিথিল হ'য়ে যাওয়ায় তাঁরা অনুকরণ প্রবৃত্তির মধ্যে হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে আমাদের সাহিত্য ধারণায় ঐতিহ্য চেতনা কম। অস্থিরতা ও অবিশ্বাস একান্ত প্রবল।

অথচ আমাদের চোখের সামনে আদর্শ রয়েছে হাক্সলে, লরেন্স, সাঁত্রে ও কামু। সাহিত্যে বাস্তবতার নামে যে বস্তুর আমদানি হয়েছে তার অর্থও সহজ-বোধ্য হয়নি। পরিবর্তনশীল সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনকে চিন্তা করতে পারার নামই বাস্তব চেতনা। শিল্পীকে objective ও হ'তে হবে, আবার subjective ও থাকতে হ'বে। যে মানুষ সময়ের ঘূর্ণিমান আবর্তে হারিয়ে গেল, সে কেমন করে সময়কে উত্তীর্ণ হ'য়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে? যার নিজের মন বিপর্যস্ত, সে কেমন করে অন্যের মনে রসসঞ্চার করার আশা রাখে? তাই বাস্তব চেতনা মানুষকে একদেশদর্শী করে না, কিংবা সীমাবিতদৃষ্টি করে না। বাস্তব চেতনা তাকে সময়ের তরঙ্গবিক্ষোভ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দেহবাদের যে প্রচণ্ড প্রাবল্য দেখা দিয়েছে তার কারণও ওই একই। অর্থাৎ সমগ্র বা যুগের তরঙ্গে যে শিল্পী ভেসে গেল সেই ভাবলো দেহই একমাত্র সত্য। পৃথিবীতে ভোগ্য বস্তুই একমাত্র গ্রাহ্য। বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যে দেহবাদ কিছু কম ছিল না। লরেন্স হাক্সলেতেও কম নেই। কিন্তু এপদী সাহিত্যের লেখক যাঁরা, তাঁরা দেহ বা যৌন সম্বন্ধের আবর্তে মগ্ন হয়ে শিল্প সম্ভাবনাকে বিস্মৃত হ'তে পারেন না। জীবনের সমগ্র চেতনা যার আছে সে জীবনের বিরাটত্বকে অনুভব করেছে। দেহ তার কাছে শুধু ভোগ্য নয়, তত্ত্ব; সাধন পথ। দেহের থেকে সে অদেহ'তে পৌঁছবার স্বপ্ন দেখে। কথাশিল্পী অচিন্ত্য কুমার একটি কথা দিয়ে

ভাবটিকে ব্যক্ত করেছেন—

"ভুলে যাচ্ছি, নশ্বরতার শেষ আছে, আবরণেরই শেষ নেই। আর যার শেষ নেই সেই সৌন্দর্য আর কল্যাণই সাহিত্যের আদিকথা।"

তাই সমকালীন সাহিত্য স্রষ্টাদের কাছে এই আবেদনটুকুই জানাতে চাই যে, বিষয়সর্বস্ব হ'য়ে শিল্প প্রকাশের মহৎ সম্ভাবনার পথকে তাঁরা যেন রুদ্ধ না করেন। জীবনের অনন্ত বিকাশের এবং সমগ্রের অভিব্যক্তির গতির কথা বিস্মৃত না হ'লে শিল্পরীতি সেই শক্তিকেই আয়ত্ত করতে পারবে, যে শক্তি কালজয়ী শিল্পের স্রষ্টা। বাস্তব চেতনা যার আছে সেই জানে ধরণী দুঃখ যন্ত্রণা ও ব্যর্থতায় মলিন; জানে দেহ প্রকৃতির অন্ন এবং দেহের পুষ্টাও শিল্পসৃষ্টির সহায়ক। কিন্তু এ'ও জানে সে যে এই ধরণী প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে নিজেকে আবর্তিত করে চলেছে, কারণ নব নব সম্ভাবনার সিংহদ্বারকে সে অনন্তকালের বুক থেকে খুঁজে বার করতে চায়॥

দুই আমি

॥ শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার রায় ॥

এক আমি পড়ে থাকি সংসারের চক্রে বাঁধা
কেবলি যে আধা,
কর্মচক্রে ঘুরে মরি, অস্তিত্বের নিগড়েতে
হাসা আর কাঁদা।
সুখ দুঃখ তরঙ্গিত জীবনের সাগরেতে
উঠি আর পড়ি,
ঘনঘন মানে ঘেরা, নিন্দা প্রশংসার ভরা
লাভ ক্ষতি কেবলি বিচারি।
এই আমি ক্ষুদ্র আমি প্রতিদিনকার,
জড়ের জগতে
নিত্য সঞ্চরণ করি, সাগ্রহে বরণ করি
পাই যাহা ইন্দ্রিয়ের পথে।
বুদ্ধি মন অহঙ্কার, পুরী এই নবদ্বার
সেবা করি তারে সযতনে,
সংসারের রঙ্গমঞ্চে মায়াময় এ প্রপঞ্চে
মাতি নিত্য সবাকার সনে।
অন্য আমি উদাসীন, আপনার মাঝে লীন
মুক্ত সদা, বন্ধনবিহীন
উদার অনন্তে ঐ নিত্য আমি চেয়ে রই
ধূলি মোরে করে না মলিন।
প্রকৃতির মহাখেলা দেখি এ মায়ার খেলা
মোর মাঝে চলে নিরন্তর
তবুও নির্লিপ্ত আমি, আপনি প্রতিষ্ঠাভূমি
নিত্য পূর্ণ, ব্রহ্ম সনাতন।
আমার আত্মার মাঝে, নিত্য দেখা জ্বলিতেছে
জ্যোতির্ময় অনির্বাণ শিখা,
চিনি তারে ক্ষণে ক্ষণে, নিশীথে কি জাগরণে
আদিত্য বরণে তাহা লিখা।
আমার সকল কাজে করে তারে পাইব যে—
সে পরশ রতনের বিভা,
ক্ষুদ্রতার অহমিকা, আত্মার হোমাগ্নিশিখা
উজলিয়া আনি দিবে শোভা।
এক বৃক্ষে দুই পাখী রহিবে কি ভিন্নপাখে
কবে দোঁহে হইবে মিলন?
নিত্য ও অনিত্যের, সংসার ও অনন্তের
হবে নাকি শুভ সম্মিলন?
তা না হলে ব্যর্থ সব জীবনের কলরব,
মিছে ধন, মিছে অনমান,
বিদ্যা ও অবিদ্যায়, পরা ও অপরায়
কেন দোঁহে বিচ্ছিন্ন এমন।
দৈনন্দিন ক্ষুদ্র কর্ম আত্মার মহান ধর্মে
করে তাহা হইবে মহৎ
ছাড়ায়ে আপন সীমা লভিবে সে কি মহিমা
বিস্মৃত হবে এ বিশ্বজগৎ।

আমাদের সংস্কৃতি

॥ শ্রীভারতী ॥

সংস্কৃতি কথাটি বহু ব্যাপক এবং তার ধারাও বহুমুখী; কাজেই সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় ও তার বিকাশের ধারাকে ঠিক ভাবে বুঝতে হলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও তাকে সন্ধান করে নিতে হয়। চতুর্দিকের এই বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট এবং প্রচলিত কতকগুলো ধারাকেই আমরা সাধারণতঃ লোকসংস্কৃতি নামে অভিহিত করি। অনেক সময় আমরা এও লক্ষ্য করি যে এই সংস্কৃতিই কালক্রমে মানুষের মর্মমূলে প্রবেশ করে আশ্চর্য ভাবে অনড় সংস্কার বা প্রথায় পর্যবসিত হয়ে গেছে।

আমরা জানি সংস্কৃতি নামক বস্তুটা প্রধানতঃ শিক্ষিত বা উচ্চতর মহলেরই মনের ফসল; কিন্তু এই ফসল আসে কোথা থেকে? এটা কি শুধু ব্যক্তি-মানুষের স্বয়ম্ভূ ইচ্ছার থেকেই জাত হয়, না বিশেষ যুগে বিশেষ শ্রেণীর আধিপত্যে যে সমাজ-ব্যবস্থা তৈরী হয় তারই প্রয়োজনে ভূমিষ্ঠ হয়? শেষোক্তটাই নিশ্চয় সত্য, কারণ সংস্কৃতি (যার সঙ্গে বহু কিছুই জড়িত) শুধু ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান ধারণা বা কেবলমাত্র শুদ্ধ মনন শক্তিরই স্ফুরণ নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সমগ্র অথবা স্থানীয় সমাজ-ভাবনার সম্পর্ক। সমসাময়িক সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ছাড়িয়ে তার অস্তিত্বকে কল্পনা করা যায় না।

একসময়ে সতীদাহ, অবরোধ প্রথা, বালবিবাহ, বিধবার অসহনীয় কৃচ্ছ্রসাধন, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, দরিদ্রের নিজেকে হীন ও হীনতর মানুষ বলে ভাবা প্রভৃতিও আমাদের সংস্কৃতিরই একটা বিশেষ অঙ্গ বলে প্রাচীনেরা মনে করতেন; ইদানীং কাল পর্যন্তও নানা রকমের অর্থহীন পূজা, প্রথা বা যুক্তিহীন নানা লোকাচার, এমন কি দেব পূজায় বলিদান পর্যন্ত ঐ সংস্কৃতিরই নামে চলে আসছে এবং এর কোনো কোনোটা আমাদের মজ্জার মধ্যে বেশ গভীরভাবে মিশেও গেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"নিছা প্রথংসার ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে, শাসনের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সমাজ যে ব্যবস্থা করে থাকে তাতে চিরন্তন শ্রেয়োধর্ম গৌণ, প্রথাঘটিত সমাজ রক্ষাই মুখ্য তাই এমন কথা শোনা যায়, শ্রেয়োধর্মকে বিশুদ্ধভাবে সমাজে প্রবর্তন করা ক্ষতিকর। প্রায়ই বলা হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূরিপরিমাণ মূঢ়তা আছে, এই জন্যে অনিষ্ট থেকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে মোহের দ্বারাও তাদের মন ভোলানো চাই, মিথ্যা উপায়েও তাদের শুভ দেখানো বা সান্ত্বনা দেওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে এমন ভাবে ব্যবহার করা দরকার যেন তারা চিরশিশু বা চিরনাবালক।—একদিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর অন্যদিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা—সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন কি অন্যায় প্রণালী—ধরপাকড় নরকের তর্জনী-সংকেতে নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্তন। রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বুদ্ধিরই প্রতীক আমামান, ফ্রান্সের ডেভিল আইল্যাণ্ড, ইটালীর লীপারি দ্বীপ। এদের ভিতরকার কথা এই যে, বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতি ও লোকস্থিতি একতালে চলতে পারে না। এই বুদ্ধির সঙ্গে চিরদিনই তাদের লড়াই চলে এসেছে যাঁরা সত্যকে শ্রেয়কে মনুষ্যত্বকে চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন।"

কাজেই আমরা দেখতে পাই সংস্কৃতির নামে নিষিদ্ধায় বহুবিধ অনিষ্টকর বস্তুও মানুষের উপর কায়েমী স্বার্থের ধারকেরা এতাবৎ কাল ধরে চালিয়েই চলেছেন। কিন্তু এক একটা সংঘাত এসে কালের দরজায় যখন ঘা দিতে সুরু করে তখন ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মানুষকে উঠে দাঁড়াতেই হয়; যখন তখন আলস্য হয়ে আসে;

তাই আজকের মানুষ এসব অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সচেতন ভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। অবশ্য এ বিরোধিতা সুরু হয়েছে রামমোহন রায়ের আমল থেকেই এবং উনিশ শতকের মনীষীরাই পৃথিবীর সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে চিন্তার ফসল আহরণ করে এবং আপন প্রতিভার অনন্যতায় গতানুগতিক অচলায়তনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন। তারপর থেকেই আমাদের যাত্রাপথ কখনো দ্রুত এবং কখনো বা অত্যন্ত স্তিমিত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রগতির পথে আমাদের পুরণো অনেক কিছুকেই যেমন ত্যাগ করতে হচ্ছে তেমনি আমাদের প্রাচীন ও যথার্থ সম্পদগুলোকে তার সত্যমূল্যে যাচাই করে নিয়ে গভীর মমত্বের সঙ্গে তাকে রক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের অমিত রত্নরাজি আহরণ করে আমাদের চলার পথকে আরো আরো সহজ ও সুন্দর করে নেবার প্রচেষ্টাও সমভাবেই চলছে।

সাধারণতঃ ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের দেশের অনেকেই প্রচুর গর্ববোধ করে থাকেন; কিন্তু কেন? এটা কি শুধু নিজের মাতৃভূমি বলেই, নাকি এর কোনোও বিশেষ গুণাবলীর জন্যে? সম্ভবতঃ এর সবচেয়ে বড় গুণ তার গ্রহণ ক্ষমতা; যথার্থ গ্রহণীয় বস্তুকে ভারতবর্ষ সানন্দে তার নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিতে পারে। "পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই।"

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন,—'ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কি, একথায় স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে।...ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরের নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

এই নিগূঢ় যোগটি কি? এটা নিশ্চয়ই কবির কাছে কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় তত্ত্বকথার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। এটা তাঁর নিজস্ব অনুভবেরই একটি গভীরতর উপলব্ধি। মানুষ মাত্রেরই মধ্যে যে সূক্ষ্ম অনুভূতির তন্ত্রীগুলো রয়েছে, তার মধ্যে প্রতিটি বিশ্বমানবেরই হৃদয়ের মূল সুরটি এসে বারে বারেই ধরা দিচ্ছে; আর সে হৃদয়ে এই তারটি যত বেশি করে হচ্ছে ততই সেখানে বহু মানুষের সমবায়কে একটি মাত্র অখণ্ড ও অবিভাজ্য মানুষ বলেই জানা সহজ হচ্ছে বলে সকলের সমস্ত দুঃখ বেদনা ও আনন্দের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে। এ যদি না হত তাহলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিটি মানুষই তাদের নিজের নিজের চিন্তার ছায়াকে এবং মনের প্রতিটি অবস্থার ছবিও এমন করে দেখতে পেতেন না।

"ব্যক্তিগত মানুষগুলির মধ্যে দেশ কালের ব্যবধান যথেষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি বৃহৎ এবং গভীর ঐক্য। সেই ইন্দ্রিয় বোধাতীত ঐক্য সাংখ্যের সমষ্টিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে অতিক্রম করে। সেই হচ্ছে সমস্তের এক গূঢ় আত্মা, একৈবাদ্বিতীয়ঃ, কিন্তু বহুধা শক্তিযোগে তার প্রকাশ। সমস্ত মানুষের মধ্যে সেই এক আত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব করবার উদার শক্তিকে যাঁরা পেয়েছেন তাদেরই তো বলি মহাত্মা, তাঁরাই-তো সর্বমানবের জন্য প্রাণ দিতে পারেন ...তিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য সকল হতে প্রিয়, এই আত্মা, যিনি অন্তরতর।"

উপনিষদ্ এই প্রিয় হতে প্রিয়তর বা প্রিয়তম যাঁর উল্লেখ করেছেন তিনি কে, যাঁর জন্যে মানুষ অন্য সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে? কি তাঁর নাম? বহুজনে বহুনামে তাকে অভিহিত করেছেন; তবুও মনে হয় একটা 'মহৎ আদর্শ'ই হয়ত এর যথার্থ নাম, কারণ আমরা দেখতে পাই এই আদর্শই হল মানুষের সবচেয়ে প্রিয় ও পরম ধন। নাস্তিক আস্তিক সকলেরই কাছে

এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কিছুই নেই, সেই জন্যই নিরীশ্বরবাদীও বলতে পারেন—'সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।"

এই যে সর্বলোকহিত কামনা, এরই চেষ্টায় সর্বস্ব পরিত্যাগ করতেও তাঁদের বাধে না।

কাল স্রোতে অনেক কিছুই ভেসে যায়, জীবন যৌবন ধন মান এবং আরও অনেক কিছুই যায়, তবুও স্থায়ী বা শাশ্বত সম্পদ বলেও কিছু থাকে—তা হল মানুষের সুমহৎ চিন্তা রাজি। তাই প্রাচীন দিনের চিন্তার মধ্যেও যে কালজয়ী ঐশ্বর্য আমরা পাই তার সঙ্গে আজকের প্রকৃত প্রগতিশীল চিন্তার কোনো বিরোধ ঘটে না। সেই চিন্তা বা চিন্তা থেকে উত্থিত সংস্কৃতিই সমগ্র মানব সমাজকে অমরত্বের অধিকারী করে রেখেছে অবশ্যই এই চিন্তা বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শুধু ভারতেরই সম্পদ বলে আমরা দাবি করতে পারি না, আমরা শুধু এই টুকুই বলতে পারি যে, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষ এই চিন্তার সাহায্যেই একটা নিবিড় ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ হবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। লেনিন, রোঁমারঁলা, আইনষ্টাইন এবং আরো অনেক জগৎ বিখ্যাত মহৎ ব্যক্তির চিন্তার সঙ্গেও আমরা এর ফলেই সম্ভবতঃ খুব সহজেই একাত্মতা অনুভব করতে পারি।

"মানুষকে দুই কূল বাঁচাইয়া চলিতে হয়; তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সকলের সঙ্গে মিল—দুই বিপরীত কূল। দুটির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে আমাদের মঙ্গল নেই।"

"...এই দ্বন্দ্বের মাঝখানেই যাহা সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলে, যাহা ঐক্যের আদর্শ রক্ষা করে তাহাকেই বলি মঙ্গল। যাহা একদিকে আমার স্বাতন্ত্র্য, অন্যদিকে অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াও পরস্পরের আঘাতে বেসুর বাজাইয়া তোলে না, যাহা স্বতন্ত্রকে এক সমগ্রের শান্তি দান করে, যাহা দুই অহংকারকে এক সৌন্দর্যের পরিণামে বাঁধিয়া দেয় তাহাই মঙ্গল। শক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বাড়াইয়া তোলে, মঙ্গল স্বাতন্ত্র্যকে সুন্দর করে।"

"যেমনটি হইলে সকল দিকে আমার পূরা বিকাশ হইতে পারিত তেমন আয়োজনটি চারিদিকে নাই; সুতরাং সংসারে আমার সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্ব আছেই। কাহারো জীবনে সেই দ্বন্দ্বটাই কেবলই চোখে পড়িতে থাকে—সে কেবলই বেসুরই বাজাইয়া তোলে। আর কোনো গুণী সংসারে এই অনিবার্য দ্বন্দ্বের মধ্যেই সংগীত সৃষ্টি করেন, তিনি তাহার সমস্ত অভাব ও ব্যাঘাতের উপরেই সৌন্দর্য রক্ষা করেন। মঙ্গলই সেই সৌন্দর্য। সংসারের প্রতিঘাতে তাহাদের অবাধ স্বাতন্ত্র্য-বিকাশের যে ক্ষতি হয়, মঙ্গল তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। বস্তুতঃ দ্বন্দ্বের বাধাই মঙ্গলের সৌন্দর্যকে প্রকাশিত হইয়া উঠিবার অবকাশ দেয়; স্বার্থের ক্ষতিই ক্ষতি-পূরণের প্রধান উপায় হইয়া উঠে।

এমনি করিয়া দেখা যাইতেছে, স্বাতন্ত্র্য আপনাকে সফলতা দিবার জন্যই আপনারই খর্বতা স্বীকার করিতে থাকে; নহিলে তাহা বিকৃতিতে গিয়া পৌঁছে এবং বিকৃতি বিনাশে গিয়া উপনীত হইবেই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে মঙ্গলের অনুসরণ করিয়া প্রেমের দিকে না গেছে, সেখানে সে বিনাশের দিকেই চলিতেছে। অতিবৃদ্ধি দ্বারা সে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে; কিছুদিনের মতো উপদ্রব করিয়া তাহাকে মরিতেই হয়।

অতএব মানুষের স্বাতন্ত্র্য যখন মঙ্গলের সহায়তায় সুন্দর হইয়া উঠে তখনই বিশ্বাত্মার সহিত মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের জন্য সে প্রস্তুত হয়।"

এই বিশ্বাত্মার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যতই নিবিড় হতে থাকে—ততই মানুষের একদেশদর্শিতা এবং নানা রকম সংকীর্ণ স্বার্থবোধও আপনা আপনিই বিলুপ্ত হতে থাকে। নইলে একলা মানুষ বা ছোট একখণ্ড মাটি কতটুকু? বহুর সমবায়েই সে বিরাট। সেই বিরাটের মধ্যেই ক্ষুদ্র তার বিলুপ্তি ঘটাতে চায়; সেখানেই তার চিরদিনের অনুষ্ঠিত প্রণাম।

কিন্তু এ প্রশ্নও তো স্বাভাবিক যে "যেখানেই হইলে সকল দিকে আমার পুরা বিকাশ হইতে পারিত তেমন আয়োজনটি চারিদিকে নাই"। এটা নাই বলিয়াই তো সংসারে এত বেদনা ও এত দ্বন্দ্ব। কিন্তু কেন তাহা নাই, এর উত্তরও আজ আর মানুষের অজানা নাই; কাজেই সেই আয়োজন অর্থাৎ বিশ্বজোড়া মানুষের সার্বিক বিকাশের জন্যই এই আয়োজনটীকে সৃষ্টি করার চেষ্টা এও তো মানুষের ধর্ম; আর এই ধর্মই ক্রমাগত বলছে সেই আয়োজন সৃষ্টিতে যেমন প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষকে তেমনি সমস্ত দেশ বিদেশকেও যোগ দিতেই হবে। সেখানেও আমরা শুনি 'চরৈবেতি'। মহৎকে চাই, সুন্দরকে চাই এবং চাই জীবনের সুন্দরতর বিকাশকে; আর তা চাইলেই তাকে সৃষ্টি করবার দায়িত্বও নিতে হয়, এখানে ফাঁকি চলে না, পালাবার উপায় নেই। যার যেটুকু সামর্থ্য আছে তাই নিয়ে কাজে যোগ দেওয়া চাই। আমাদের মিলিত হাত 'বহুদলধারিণী', তার পরাজয় নেই। অতএব সকলে মিলে চল এবং আরো আরো এগিয়ে চল।

সাম্য ও মৈত্রীর, ঐক্য ও মিলনের, গতি ও প্রগতির পথে চলার নির্দেশ মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকেই পেয়ে এসেছে কিন্তু সেই বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতির দ্বারা লোক-মানস প্রভাবিত হলে শ্রেণী বিশেষের আধিপত্যের গৌরবকে তো অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। অতএব বৃহত্তর জনসাধারণকে মূঢ় বা চির শিশু বানিয়ে রাখবার জন্যে বহুবিধ ছলাকলার উৎপত্তি এবং তাকেই শাস্ত্র বা সংস্কৃতির মুখ্য ভাগ বলে এতাবৎ কাল মানুষকে বহু ফাঁকি ও মিথ্যার মোহ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। সেই উপেক্ষিত শ্রেয়োবোধগুলিকে উজ্জীবিত করে মানুষকে মোহমুক্ত করে তোলাও এ যুগের একটি বিশেষ কাজ।

"মানুষের জন্য কাজ না করিলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না। একদেশবাসীর মধ্যে যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতিনিধি স্বরূপ, সকলের দায় সকলেই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে, সেখানেই প্রকৃতরূপে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। আর যাঁহারা স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া মানব সাধারণের জন্য কাজ করেন তাঁহারা মানব জাতির মধ্যে গণ্য। আমরা স্বজাতি ও মানব জাতির জন্য কাজ করিতে পারিব বলিয়া কি আশ্বাস জন্মিতেছে না? আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বিলাপ করিতেছে 'সমস্ত একাকার হইয়া গেল'; কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্ত 'একাকার' হইবে, আর বাঙালী যখন মানুষ হইবে তখন আবার 'একাকার' হইবে। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে? এ আমাদের সংকীর্ণতা, আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে।" (দ্বাদশ খণ্ড ৬৬৪ পৃঃ)

আজ যখন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা সংস্কৃতি সমস্ত কিছুতেই সকলের সমানাধিকারের দাবী উঠছে এবং দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর এক বৃহদাংশও তাকে সমর্থন জানাচ্ছেন, তখন আরেক পক্ষ রব তুলেছে, 'গেল সাম্যবাদ এসে আমাদের দেশের সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্যকে ডুবিয়ে তলিয়ে একাকার করে দিল'। কিন্তু এরা বোঝেন না যে যা চিরকালীন সত্য তাকে কখনই ডোবানো যায় না। যা ডোবে তা যুগোপযোগী নয় বলেই ডোবে এবং মানুষকে সত্য মূল্য দিতে চায় না বলেই তার ভাসনও এত অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মহৎ চিন্তা এবং কর্ম-প্রণালীর মধ্য থেকে যে-সত্য আপন মহিমায় উদ্ভাসিত, তাকে 'আমার' বা 'তোমার' বলে কোণঠাসা করবার চেষ্টার মত অপচেষ্টার গোড়া কোথায়? প্রত্যেক দেশেরই যথার্থ সংস্কৃতির মূল স্বরূপটি এক; সবাই সমুদ্র-যাত্রী। মিলনের সেই সুরটিকে আমরা ঠিকমত ধরতে পারলেই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিকেও আমরা তার সত্য-মূল্যে বরণ করে নিতে পারব। সেই সংস্কৃতি যেমন প্রগতি

ও ঐক্যকে প্রাধান্য দিয়েছে তেমনি সেই গতির লক্ষ্যকেও নির্দ্ধারিত করে দিয়ে বলেছে—"সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক! সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথা লব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।—সেই সঙ্গে এও বলতে পারি, দুঃখ আগে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক—মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক।"

ধ্বংসেতে কৃতিত্ব কোথা ?

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

মানুষের প্রীতি নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়ে, ভালবাসা নিয়ে
বাঁচতে তোমার ইচ্ছা করে না কি ? তবে কেন তুমি
তাদের আঘাত করো, হত্যা করো অসংখ্য জীবন :
চারিধারে কী করুণ আর্তনাদ, দীর্ঘশ্বাসে ভরা !

পৃথিবীর অধিপতি হতে চাও শুধু হত্যা করে ?
রক্তে-রাঙা পৃথিবীর আধিপত্যে কী লাভ তোমার ?
শ্মশানে প্রতিষ্ঠা হবে তোমার সাম্রাজ্য, তাই চাও ?
তারপর একদিন সে-শ্মশানে নিশ্চিহ্ন তুমিও।

এ বীভৎস প্রতিষ্ঠায় কেন লোভ ? শুধু ঘৃণা নিয়ে
আর নিয়ে অভিশাপ ব্যাধিগ্রস্ত অসংখ্য জনের—
এ মানস সুস্থ নয়, বিকৃত এ ; স্বাস্থ্য এ-মনের
ফিরে পেতে হবে কিংবা চিরতরে এর নির্বাসন।

কল্যাণের পথ ধরে যে চলে, চালায় অনুরাগে,
দুটি হাত ধরে নিয়ে যায় যত দুর্বল দুস্থেরে,
মোছায় চোখের জল, আনে আলো, ঘোচায় আঁধার
প্রতিষ্ঠা তো তারই মেলে, সে-প্রতিষ্ঠা শাশ্বত সুন্দর।

ধ্বংসেতে কৃতিত্ব কোথা ? সৃজনের মাঝেই গৌরব,
শুভ কর্ম অনুষ্ঠানে জীবনের সত্য পরিচয়।

পারিবারিক জীবন আলোচনা

॥ ডাঃ অমিলা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

[স্থান—সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের একটী বড় বসবার ঘর।

সময়—বেলা ৯টা। "কল্পনা" নামে মধ্যবয়সী একটি মেয়ে জানালার সামনে বড় টেবিলে রাখা বই, কাগজপত্র দেখছে, মাঝে মাঝে বাইরের আকাশের দিকেও চাইছে—এমন সময়ে "খনা" ও "গায়ত্রী" একসঙ্গে ঘরে ঢুকলো, এরাও মধ্যবয়সী]

["চপলা" (বছর ২৫ বয়স হবে) ও "ছবি"র প্রবেশ (৩৫ বছর হবে)]

কল্পনা—এস, এস। যতক্ষণ আর সবাই এসে না পড়ে, ততক্ষণ একটী রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোন:—"একদিন শিবগুরু গোবিন্দ নির্জনে, একাকী ভাবিতেছিলা আপনার মনে, আপন জীবন-কথা; যে সংকল্প যা অথণ্ড সম্পূর্ণরূপে দিয়েছিলো দেখা যৌবনের স্বর্ণপটে, যে আশা একদা তারত প্রাণিয়াছিলো, সে আজি শতধা সে আজি সঙ্কীর্ণ-জীর্ণ সংশয় সঙ্কুল সে আজি সঙ্কট-মগ্ন। তবে কী এ ভুল? তবে কী জীবন ব্যর্থ? দারুণ ধিক্কার প্রান্ত দেহে ক্ষুব্ধচিত্তে আঁধার সন্ধ্যায় গোবিন্দ ভাবিতেছিলা—"

খনা—আরে ওতো জানা কবিতা—সেই পাঠান এসে ঘোড়ার দাম চাইলো—গুরু গোবিন্দ তাকে পরের দিন দেবেন বলায় সে রেগে তাঁকে "চোর" বলে গাল দিলো; তিনিও রেগে গেলেন—তলোয়ার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেল্লেন।

ক—হ্যাঁ, কিন্তু তারপরে কি হোল, বলো তো!

খ—তারপরে নিজের কাজের জন্য তিনি খুব অনুতপ্ত হোলেন আর সেই পাঠানের ছোট্ট ছেলেকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে লাগলেন, তারপর সে সর্ব-বিদ্যাবিশারদ হোলে তাকে তিনি তার পিতৃহাতককে (মানে গুরু-গোবিন্দকে) হত্যা করে প্রতিশোধ নেবার জন্য নানাভাবে উত্তেজিত করে করে অবশেষে একদিন বনের মধ্যে খেলতে বলে তাকে এতো রাগিয়ে দিলেন যে সে রাগের মাথায় তাঁকে সাংঘাতিক আঘাত করে ফেল্লো—আর তাতেই তিনি মারা গেলেন; কিন্তু মারা যাবার আগে সেই ছেলেটীকে অনেক আশীর্বাদ করে তাকে বল্লেন যে এটাই তিনি তাকে "শেষ শিক্ষা" দিয়ে গেলেন।

গায়ত্রী—কিন্তু তাঁর "যে আশা" নাকি প্রাণিয়াছিলো' তার কি হোল?

ক—আর সেই কথাই তো বলতে আরম্ভ কোরে ছিলাম যে, মানুষ যে কোন্ দিকে কতখানি কাজ করে যেতে পারবে তার যেন একটা মাপ আছে—তার বেশী আর তার জীবনে হবার নয়।

গায়ত্রী—মানে?

ক—এই দেখনা এই গুরু-গোবিন্দেরই কথা, যখন তিনি রাগের বশে পাঠানকে মেরে ফেল্লেন—

"হেরি নিজ কাজ—
মাথা নাড়ি কহে গুরু, বুঝিলাম আজ
আমার সময় গেছে। পাপ ভরবার
লঙ্ঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার
নিরর্থক রক্তপাতে। ঘুচে মুছে যেতে হবে এ পাপ এ লাজ, আজ হোতে জীবনের এই শেষ কাজ।"

ছবি—আজ তোমাদের হোল কি? আমাদের অতি গদ্যময় পারিবারিক-জীবন আলোচনার আসর হঠাৎ আজ পদ্যময় হোয়ে উঠ্‌লো যে!

"জয়ন্ত" দ্রুত প্রবেশ—এই দেখ তোমরা সবাই এসে গিয়েছ; আমার তাই একটু দেরী হোয়ে গেলো।

চপলা—দেরী কোরে অনেক ঠকেছ। এখানে

অনেক সব আবৃত্তি হোয়ে গেলো, তাতে আরও বোঝা গেলো যে তোমার জীবনে আর কিছুই হবার আশা নেই।

জ—কি রকম?

ক—আরে না, ও তোমায় ক্ষেপাচ্ছে। আমিই বলছিলাম যে আমার জীবনে বোধহয় আর কিছুই এগুনো যাবে না। যদি এই পারিবারিক জীবন আলোচনার কথাই বলছি। যতই এবিষয়ে পড়াশোনা করছি, ভাবতে চেষ্টা করছি ততই মনে হোচ্ছে যে এত রকম সমস্যা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে আমার জীবনে এর কাজ ঠিকমত সুরু করাও হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ।

জ—ওরে বাবা আজ দেখছি একেবারে গোড়ায় গলদ! এ যে জিভে কাঠে উত্তন ধরাবার মতো মনে হোচ্ছে! উনুন কি আর জ্বলবে? অর্থাৎ আজকের মিটিং কি আর জমবে? অনেক অসুবিধার মধ্যেও আজ এসেছি জানো?

ছ—খুব জমবে। আমি আজ এমন একটী প্রসঙ্গ এনেছি যে ইলেকট্রিক উনুনের মতো সুইচ টিপলেই জ্বলে উঠবে।

জ—তবে বাপু তাড়াতাড়ি সুরু কর—সুইচ টিপে যাও, আমায় তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে।

চপলা—কেন শুনি?

ক—আঃ, ওর সঙ্গে আর লেগো না। ছবি, বল তোমার কী এমন ইলেকট্রিক প্রসঙ্গ।

ছ—তুমি তো বলেছিলে যে আমাদের গিন্নীবান্নী বন্ধুদের সঙ্গে দেশের পারিবারিক জীবন কীভাবে উন্নত করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করে তাদের কথা তোমায় জানাতে?

ক—হ্যাঁ। তাতে কি হোল?

ছ—হোল অনেক কিছুই। কত যে হাসি ঠাট্টা তাচ্ছিল্য সহ্য করতে হোল আমায়, সে আর কী বলবো!

খ—হাসি, ঠাট্টা? কেন, কি রকম?

ছবি—কোথাও বা একটা দায়সার ভাব নিয়েই যেন তাঁরা আমার সঙ্গে আলাপ কোরলেন, কোথাও কোথাও বিদ্রূপের হাসিও দেখা গেলো। কেউ কেউ তো স্পষ্ট বলেই দিলেন যারা নাকি নিজেদেরই পারিবারিক জীবন সামলাতে পারে না তারা আবার কি করে অন্য লোকের পারিবারিক জীবন উন্নত করবে?

ক—তা তুমি কি বল?

ছ—আমি বল্লাম যে, এতো আর একটী বা কয়েকটী লোক মিলে দেশের সকলের পারিবারিক জীবন উন্নত কোরে দিচ্ছে এমন ব্যাপার নয়। দেশের প্রত্যেকটী লোক নিজেরাই নিজেদের পারিবারিক জীবন উন্নত করতে পারে। কেউ একজন গিয়ে অন্য একজনের পারিবারিক জীবন উন্নত করে দিতে পারে না। তবে এজন্য পরিবারের প্রত্যেকের কি করা বা কি রকম হওয়া প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করতে পারি; আমাদের সংসারের শত কাজের চাপে যদি সেই প্রয়োজনগুলি ভুলে না যাই তার জন্যও আমাদের নিজেদের মধ্যেই মাঝে মাঝে আলোচনা হওয়া দরকার।

খনা—কিন্তু কারো নিজের পারিবারিক জীবন যদি অশান্তিময় হয়, তার কি অন্যের পারিবারিক জীবন যাতে সুখের হয় সে চেষ্টা করার কোন দোষ আছে? আমার যদি ছোট বেলায় টিকা না দেবার ফলে বসন্ত হোয়ে চেহারা নষ্ট হোয়ে থাকে—তাহোলে আমি কি আরো বেশী করে সকলকে বলবো যে তোমরা সবাই তোমাদের ছেলেমেয়েদের বসন্তের টিকা দাও—নইলে দেখ, না দেবার ফলে আমার কি অবস্থা হোয়েছে! আর আমার তো মনে হয় সেটা সবাই আরও বেশী সহানুভূতির সঙ্গে নেবে!

গা—তাছাড়া দেখ, যখন কারো অত্যন্ত প্রিয়জন কেউ কোন একটী রোগে মারা যায়, তখন সেই রোগটীতে যারা ভুগছে বা ভুগতে পারে ভবিষ্যতে, এদের সম্বন্ধে তার খুবই সহানুভূতি আসে। এর ফলে দেখা যায় যে হয় তো সে তার সর্বস্ব (সেটা ধনসম্পদ হোতে পারে কিম্বা তার সমাজজীবনের কাজও হোতে পারে) পণ করে এইসব লোকের কিছুটা সুবিধা করার বা এই রোগের নিবারণের চেষ্টা করে। কত হাসপাতাল বা

হাসপাতালের বেড্‌ও এইভাবে কতলোক যে দিয়েছে সেটা ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে এইসব ভুক্তভোগীদের দুঃখের একটা ভালো দিকও আছে ; আর সেটা ঠাট্টা করে নষ্ট করে দিয়ে কারো তো লাভ নেইই বরং ক্ষতিই হবার কথা।

চ—কিন্তু এখানে ঠাট্টা বিদ্রূপ করার কারণটা কি ?

খ—কারণ হোচ্ছে এই যে আমাদের পাঁচজনের কারোরই তো পারিবারিক জীবন আপাতঃ দৃষ্টিতে খুব সুখের নয়! তাই আমাদের একাজে এগিয়ে যাওয়াটা সকলের ঠিক ধারণায় আসে না। আমরা ঘরে বসে বসে "কপালে করাঘাত আর ক্রন্দন" করলেই ঠিক সাজতো—মানে সাধারণতঃ লোকেরা যা করে সবাই যা করে তাই করা হোত। এ যেন বড় অসাধারণ হোয়ে যাচ্ছে। কজনের এরকম সৎসাহস আছে বলো যে নিজের দুর্ভাগ্যকে সকলের কাছে স্বীকার করে, তার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে, মন্তব্য করে, আর তার নিবারণ সম্বন্ধে দাবী করতে পারে ?

ছ—তাছাড়া আর একটা কারণও আছে। শরীরের অসুস্থতার কথা যদিও কেউ বলতে ভয়টা কিম্বা আজ কাল করেনা তবু কতকগুলি রোগ আছে যা শারীরিক হোলেও লোকে নিকট আত্মীয়কেও বলতে চায়না।—পারিবারিক জীবনে অশান্তির কারণও অনেক সময়ে কোনও শারীরিক বা মানসিক অবাঞ্ছিত পরিবেশ বা অবস্থা থেকেই ঘটে থাকে। কাজেই এসম্বন্ধে কেউ আলোচনা করতে সাহস করে না।—কারণ কতগুলি অবস্থা আছে যেগুলি জেনেও না জানার ভাব করে পৃথিবীতে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু জানাটা সবার কাছে স্বীকার কর্ত্তে গেলে আর অতটা সহজে চলা যায় না, একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেই হয়—তাতে অনেক সংঘাতের সম্ভাবনা থাকে, অনেক দুঃখ বিপদ বরণ করার সাহসের প্রয়োজন হয়, অর্থ সামর্থ্যের সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়। এই আলোচনায় সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিতে সেজন্য অনেকেরই অসুবিধা হোতে পারে।

চ—তুমি কি বলতে চাও এসব আলোচনা তাদের নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে খুব চলে না ?

ছ—চলতে পারে। কিন্তু সেটা একটু দায়িত্বহীন ভাবে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে। একটুখানি ভাসাভাসা আলোচনা মাত্র ; সবটা নয়, সঠিকও নয়। কিছুটা প্রকাশ করে মনটা নিজেকে হাল্‌কা করার যেন একটা উপায় করে নেয়। যারা এইভাবে হাল্‌কা হোচ্ছে—তারা ঠিক এটা যে কেন করছে বুঝে করছে না, বিচার করেও করছে না বলেই তো আমার মনে হয়। কিন্তু আমরা যে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এ আলোচনা করতে চাই—উপায় বার করে করে তার ব্যবহার করতে চাই—তাতে ঐটুকুতে চলে না—গোটা সমস্যাটা নিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে এতে যোগ দিতে হয়।

ক—এবার বল দেখি কী ভাবে তুমি তাদের কাছে তোমার প্রসঙ্গটা তুললে ?

ছ—তবে শোন বলি, তুমি যা ভাবছো তা মোটেও নয়! একেবারেই নির্ভুলভাবে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছি তা বলছি না, তবে এটাও বলবো যে ঠিকমতো ভাবে প্রসঙ্গটা উত্থাপন না করার জন্যই যে ওদের ব্যবহার এমন হোল তাও নয়।

শোন, আমি প্রথমেই স্থির বুঝেছিলাম যে কখনই সব পরিবার একরকম হোতে পারেনা সুতরাং "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিভিন্নতে"—অর্থাৎ কিনা আগে পরিবারটি বুঝে তবে তাদের গ্রহণযোগ্য ভাবে প্রসঙ্গটা তুলতে হবে। আমার অভিজ্ঞতায় যা বুঝেছি জগতের আর সবকিছুর মতোই বিভিন্ন পরিবারকেও এক একটা শ্রেণীতে ফেলা যায়। যেমন ধর কতকগুলি পরিবার শুধু নিজেদের পরিজনদের মধ্যেই স্নেহ-ভালবাসা-বিশ্বাসের আদান প্রদান করতে পারে ; আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী বন্ধুবর্গ তাদের কাছে পরের মতোই গণ্য হয়।

ক—ঠিক বোঝা গেলো না ; আগে বল দেখি এখানে তুমি "পরিবার" আর "পরিজন" বলতে কি বোঝাতে চাও ?

ছ—পরিবার বলতে অবশ্য এক একদেশে (এমন কি একই দেশের বিভিন্ন এলাকায়) এক একরকম বোঝায়।

আমি এখানে আমাদের দেশের ছোটখাট পরিবারের কথাই বলছি; যেমন ধর স্বামী, স্ত্রী আর তাদের নানা বয়সের অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে সংসার সেই রকম পরিবারের কথা বলছি।

ক—এবার বল আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গ পরের মত গণ্য হয় মানে ঠিক কি বলতে চাইছো।

খ—তুমি আমায় যেভাবে অন্য কথায় নিয়ে যাচ্ছো শেষে আমি আসল আলোচ্য বিষয়টাই না ভুলে যাই। যাই হোক আপাততঃ তোমার কথারই উত্তর দিচ্ছি; আমরা তো সকলেই "আপন" আর "পর" কথা দুটী ব্যবহার করে থাকি। "আপন" বলতে মোটামুটি এই বুঝি, যে আমার সুখে দুঃখে অংশ নেয়; আমার ভালো যাতে হয় তার চেষ্টা করে বলে আমার ধারণা এবং আমার মধ্যে যা কিছু মন্দ আছে তা জানলেও সে আমায় মুক্ত হোতে সাহায্য করবে বলে আমার ধারণা। এক কথায় আমার ভালোমন্দ সবকিছু নিয়ে যে আমি গোটা মানুষটী সেই মানুষটীর দাম আছে তার কাছে আর আমার কাছেও তার নিজের একটী অনুরূপ দাম আছে আর সেটা পরস্পরে জানি এবং মানি পরস্পরের কাছে।

খ—এই "জানা" আর কথাটীর ওপর অত জোর দিয়ে বলছ কেন?

ক—কারণ যদি 'অজানা' আর 'অমানা' থাকে তবে তো আর আপন বোধটা সহজ হোতে পারে না!

খ—তা, ঐ পরিবারের কথা বলে - এরা কি বাইরের আর কারো সঙ্গে মেশে না?

ক—এই দেখো—'কল্পনা' তো আবার এখনই জিজ্ঞাসা করে বসবে মেশেনা মানে তুমি কি বলতে চাইছো!

খ—নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব।

ক—আমাকে নয় কিন্তু।

খ—আরে বাপু মেলামেশার যে রকমফের আছে তাতো সবাই বোঝে। এই দেখোনা এইখানে আমরা পাঁচজন তো পরস্পরের সঙ্গে মিশি; তবু তারই মধ্যে আমরা একজন আর একজনের সঙ্গে কম কিম্বা বেশী মিশি না কি? সেটা আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। আমি যে পরিবারের কথা বলছি তারা তাদের সব প্রয়োজনগুলি শুধু নিজেদের পরিবারটীর পরিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। তাতো সম্ভব নয়—তাতেই সংঘাত বাধারই সম্ভাবনা।

গ—সম্ভব নয় কেন?

ক—তবে অবধান কর যাতে বলে মনস্তত্ত্ব। এতে কিন্তু সভার সময়ের ক্ষতি হবে। বলনা, কি বল?

খ—সময় সার্থক হবে মনে হোচ্ছে—অতএব সুরু কর তোমার মনস্তত্ত্ব।

ক—শরীরতত্ত্ব আজকাল বেশীর ভাগ লোকই বোঝে—এমন কি 'চলন্তা'র মতো 'অবোলা'রাও বুঝবে বলে আশা করা যায়। তাই শরীরের সঙ্গেই উপমা দিয়ে বলা যাক্—

খ—আমায় যে অবোলা বলে তার জন্য আর এক দিন অনেক বিতর্কের জন্য তৈরী থেকো, আজ আমি কিছু বলব না।

ক—বাধিত হোলাম; আপাততঃ বলিতে, তুমি দুর্বাহাতে নিয়ে বসো, যেমন ব্রতকথা শুনতে বসে থাকো। অতি পুণ্যময় এই মনস্তত্ত্ব কথা।

খ—আমায় তোমরা বলতে বাধ্য কোরছ যে ঠিক এরকম করাটা আমি সময় সার্থক বলে বলিনি।

ক—এইবার গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করলাম। আচ্ছা, মানুষের শরীর সুস্থ রাখতে হোলে কি কি প্রয়োজন তার কয়েকটীর কথা বলি—যেমন আহার, বিশ্রাম, পরিশ্রম, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। মনেরও অনুরূপ আহার বিশ্রাম, পরিশ্রম, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। আর তা ছাড়াও তার কতকগুলি প্রয়োজন আছে।

খ—মনের আহারের প্রয়োজন বলতে আমি বুঝি যে, মানুষের পরিবেশ থেকে চিন্তাধারা বা ভাবধারার কিছুটা নিজস্ব করে নেবার যে আগ্রহ সেইটী, যেমন ধর আমরা ভালো লেখকের বই পড়ে আনন্দ পাই, বড় বক্তার বক্তৃতা শুনতে যাই এইসব তো।

ক—কতকটা হোল; তবে আরও বহু বিস্তৃত আছে এই আহার্য্য দ্রব্যের এলাকা।

গ—কিন্তু বিশ্রামটা তো বোঝা যাচ্ছে না!

ছ—তবে বলো, বিশ্রামটা এর কোন্‌খানে? তাবে?

গা—কেন, ঘরে, সাধারণতঃ বিছানায় শুয়ে!

ছ—ঘুমের সময়, যখন "বম্" পড়ার সাইরেণ বাজে তখনও?

গা—তা কেন হবে? তখন একটা আরও নিরাপদ আশ্রয়ে মানে "সেল্টারে" গিয়ে থাকতে হয়।

ছ—তবেই দেখো, যদিও তোমার ঘরে বম্ না পড়তেও পারে তবু তখন সেখানে তুমি বিশ্রাম বোধ করনা; কারণ নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারনা বলে। এই "নিরাপদ বোধ"ই মনের বিশ্রাম।

গা—তার মানে শরীরের যখন কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই তখনই মনও বিশ্রাম পায়।

ছ—সেটা কতকটা ঠিক বটে তবে ততটুকুই সব নয়। মনকে আরও নানা বিষয়ে অবহিত থাকতে হয়। যেমন ধর আমার সামাজিক অবস্থা, আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। এ সবের আবার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ইত্যাদি নিয়ে মনের কাজ চলতে থাকে—শুধু শারীরিক অবস্থাই নয়। কাজেই দেখো মনের বিশ্রামের কত বেশী প্রয়োজন অথচ কতটুকু পাওয়া আজকালকার দিনে সম্ভব!

জ—যাইহোক, এতে তো মনের পরিশ্রমের কথাও বোঝা গেলো।

ছ—তা বলতে পারো।

খ—সেকি, এটুকু বলেই থেমে গেলে যে আরো কতকগুলি কথা জুড়ে না দিয়ে?

ছ—ঘড়ির দিকে চোখ রাখছি। দেখছো না "অষা"র বাড়ী ফেরার তাড়া আছে? দশটী মিনিট মাত্র আছে আর।

খ—তবে তো মনের যে 'পরিচ্ছন্নতা'র প্রয়োজনের কথা বল্লে সেটা আর বোঝা হোল না?

ছ—শুধু কি তাই? মনে নেই—"পরিচ্ছন্নতা"র পর ইত্যাদি বলেছিলাম? মনের আরও অনেক প্রয়োজন আছে এবং আগে যেগুলি বলেছি তাদেরও বিস্তৃত ব্যাখ্যার দরকার।

অষা—দেখো, আজ যে বিষয়টী নিয়ে আলোচনা সুরু হোল সেটিই আর এগোল না। আমার কর্ত্তা বলবেন, "এতো তোমাদের মেয়েদের সভা—এরকম ছাড়া আর কি হবে!" সত্যি ভাই, এ সব বুঝবার কি খুব দরকার আছে আমাদের?

চপলা—কর্ত্তাদের সভাতেও কি কোন সময় এরকম হয়না নাকি?

ক—তা নিয়ে আমাদের কোন সমস্যা নেই; কারণ কর্ত্তারা কর্ত্তাদের প্রয়োজন মতো আলোচনা করুন এবং গৃহিণীরা গৃহিণীদের প্রয়োজন মতো আলোচনা করুন এটাই ভালো,—একজনকে যে আর একজনের মতোই করতে হবে, তার কি মানে আছে? আর এটা ঠিকই যে নিজ নিজ পরিস্থিতিতে যার যেভাবে প্রয়োজন বা সম্ভব সে সেইভাবেই তার জীবনের সব অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। তবে পরস্পরের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার আর সেই মত চলাও দরকার। তাই এসব প্রয়োজনের কথা জানাটা অত্যন্ত দরকার আমাদের। এমন একটু চা খাও—তারপর বাড়ী যাবে সবাই; এই তো চা নিয়ে এসেই গেছে।

(চায়ের ট্রে নিয়ে একজনের প্রবেশ।)

ক্রমশঃ

অমৃতের কবি রবীন্দ্রনাথ

॥ ডকটর গোপেশচন্দ্র দত্ত ॥

উপনিষদের রসপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ চিরদিন অমৃতের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, এবং অমৃতের গানে জীবনের প্রতিটি দিন উদাত্ত হ'য়ে উঠেছেন; অমৃতের কেন্দ্রভূমিতে জীবনকে স্থাপন ক'রে অন্তরের 'আমি'কে বিশ্লেষণ করতেও চেয়েছেন। জীবন এবং জগৎকে এই অমৃতের উপলব্ধি দিয়েই চিরকাল চিনবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রশ্ন জাগে, কী সেই অমৃত?

তার পূর্বে অমৃতের সঙ্গে যে একটি মৃত্যুর কথা জড়িত আছে, রবীন্দ্র-ভাবনায় তার স্থান কোথায় তা' আমাদের একটু বুঝে নিতে হ'বে। রবীন্দ্র-মানসিকতায় মৃত্যু হচ্ছে অনন্ত জীবন-যাত্রার একটি পরিপূর্ণতা লাভ করার সোপান। এই মৃত্যুকে যে তিনি শূন্য বিদায় করবেন না, বরং সারা জীবনের সঞ্চিত ধন দিয়ে, বহুদিনকার পুঞ্জীভূত আয়োজন দিয়ে চরম দিনে তাকে বরণ ক'রে নেবেন, এ-কথা কাব্যচ্ছন্দে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন নি তিনি। এই মৃত্যুর জন্যই সারা জীবন তিনি দুঃখ-সুখের রাখী বহন ক'রে গিয়েছেন, এ-কথাও নিঃসংকোচে উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে এও সত্য যে, মৃত্যু যখন প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে, তখন জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে যায়, আর একটি সুনিবিড় বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা নিজের স্বরূপটিকে কিছু উপলব্ধি করতে পারে'। ১ আমার আত্মার 'প্রকাশ-রূপ যে অহং' তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা না জন্মায়-মিরতে, না জন্মায় না মরে। অহং জন্ম-মরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে। আত্মা অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হ'তে থাকে।...অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো সীমাবদ্ধ পদার্থ নিশ্চল হ'য়ে এই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একান্তভাবে রুদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে।...এই জন্য মৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার সঙ্গে রুদ্ধ দ্বার নয়'। ২ এই আত্মার উপলব্ধিতেই যথার্থ আধ্যাত্মিকতা। 'অহং' বা ছোট আমি যখন একটা আবরণের মধ্যে আবৃত হ'য়ে এই পৃথিবীর বুকে সঞ্চরণ করে, তখন ডিমের মধ্যে পক্ষী-শাবকের মতো পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'এই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম'। সেই জন্মের দ্বারাই মানুষ দ্বিজ হয়। রবীন্দ্র-ভাবনায় এই আধ্যাত্মিকতা 'আমাদের আর কিছু দেয় না, আমাদের ঔদাসীন্য, আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম ক'রে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ'। ৩

মানব-জীবনে সংসার মিথ্যে নয়, বিচার ক'রে মিথ্যা বলেও লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে সংসারকে 'আমার' বলে জানাই একমাত্র মিথ্যে। কারণ এর একটি সামান্যতম বিন্দুও আমার বলে আমরা ধরে রাখতে পারি নে। যদি কেউ এই 'আমার' তাবটির উপর সব কিছুর প্রতিষ্ঠা দিতে চায়, তবে সে কেবল বালির উপর ঘর বাঁধা ছাড়া আর কিছু করে না। মৃত্যুর একটা ঠেলাতেই সমস্ত কিছু ধূলিতে লুটিয়ে পড়ে'। তাই যেখানে অহং আছে, সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোনো কিছুই মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না। 'জগৎ কিছুই হারায়

---

১ মৃত্যু ও অমৃত—শান্তিনিকেতন ৭

২ আত্মার প্রকাশ : শান্তিনিকেতন ৭

৩ আত্মার দৃষ্টি শান্তিনিকেতন ১

না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়'। ৪ সুতরাং অহং-এর চেয়ে আত্মা বড়। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ একবার ছন্দের মাধুর্য দিয়ে তাঁর আত্মার মহত্তী বাণীকে রূপায়ন দিয়েছিলেন—

তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও।
'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা ব'লে
যাবো আমি চলে'। ৫

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে কঠিন রোগশয্যা থেকে উঠে আর একবার বলেছিলেন,—

দুঃসহ দুঃখের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব,
সেদিন আত্মার হাতে হয়নি দুর্বল পরাভব। ৬

মৃত্যুর কথা চিন্তা করলেই অহংটীকে আর চিরকালের বলে মনে হয় না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে কেবল তাই-ই যথেষ্ট নয়। কারণ এই ধরণের বৈরাগ্য কেবল শূন্যতাই নিয়ে আসে। তিনি বলেন,—'সেই সঙ্গে এও জানতে হবে যে, এই সংসারটা থাকবে। অতএব আমার যা' কিছু দেবার তা' শূন্যের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হ'বে। এই দানের দ্বারাই আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ হ'বে, ত্যাগের দ্বারা নয়। আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না, সে দিতে চায়, এতেই তার মহত্ত্ব। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।' এর পরেই তাঁর সুগভীর উপলব্ধি দিয়ে তিনি বলেছেন—'এই দেবার দিকেই অমৃত, নেবার দিকেই মৃত্যু'। ৭ আত্মার এই দেবার দিক মনে ক'রেই মৃত্যুর একটি শান্ত হাস্যময় রূপকেও তিনি দেখতে পেয়েছেন, যেমন দেখেছিলেন সেই প্রাচীন যুগের ভারতীয় ঋষিরা চিরন্তন অমৃতবোধকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে। মৃত্যুর দান জীব জগতের প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িত বলেই মানুষ মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর উপলব্ধি সকলকে জানায়,—'মানুষ একদিকে মৃত্যুর অধিকারে, তার একদিকে অমৃতে; একদিকে সে ব্যক্তিগত সীমায়, আর একদিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই দু'য়ের কোনোটাকেই উপেক্ষা করা চলে না'। ৮ অমৃতেই মানুষের স্থায়িত্ব; মৃত্যু পূর্ণতাকে পাওয়ার দ্বারপথ হ'তে পারে, কিন্তু সে সংসারে সত্য নয়। কারণ কালধর্মে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটে, পরিবর্তিত হয় না কেবল মৃত্যু। মৃত্যুর চিরকালীন অন্ধকার কোনোদিন সত্য হ'তে পারে না।

সব কিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্তনবেগে,
সেই তো কালের ধর্ম।
মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে,
এ-বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি [শেষ লেখা-২ নং]

তা' ছাড়া, 'সংসার একটানা মৃত্যুকে ধ'রে রেখেছে। সে-সব জিনিসকে কেবলই ক্ষয় করতে করতে সেই অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়ে ফেলে। কিন্তু এই একটানা মৃত্যুর ধারা যদি চরম সত্য হ'তো তবে তো কিছুই নতুন হ'য়ে উঠতো না, তবে তো এতদিনে পৃথিবী পচে উঠতো, তবে জরার মূর্তিই সব জায়গায় প্রকাশ পেতো। সেইজন্য মানুষ উৎসবের দিনে বলে, 'আমি এই মৃত্যুর ধারাকে মানব না, আমি অমৃতকে চাই'। এ-কথাও মানুষ বলেছে, 'অমৃতকে আমি দেখেছি, আমি পেয়েছি। সমস্তই বেঁচে আছে অমৃতে'। ৯ এই অমৃতের অধিষ্ঠান-ভূমি কোথায়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তর দিয়েছেন এইভাবে 'মানুষের মধ্যে অমৃত রয়েছে বলেই না মৃত্যুকে কেন ক'রে সেই অমৃতের প্রকাশ হচ্ছে? ফোয়ারা যেমন তার ছোট একটুখানি ছিদ্রকে ভেদ ক'রে ঊর্ধ্বে আপনার ধারাকে উৎক্ষিপ্ত করে, তেমনি এই মৃত্যুর সংকীর্ণ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অমৃতের উৎস উঠছে। যাঁরা এটা দেখতে পেয়েছেন তাঁরা তাই দিয়ে বলেছেন, 'ভয় করো না,

৪ মৃত্যু ও অমৃত : শান্তিনিকেতন ৭
৫ মৃত্যুঞ্জয় পরিশেষ
৬ আরোগ্য—২৯
৭ মৃত্যু ও অমৃত : শান্তিনিকেতন ৭
৮ মানুষের ধর্ম : পৃঃ ১৯
৯ অমৃতের পুত্র : শান্তিনিকেতন-১৬

অন্ধকার সত্য নয়, মৃত্যু সত্য নয়, তোমাদের অমৃতের অধিকার। মৃত্যুর কাছে দাসখত লিখে দিও না'। ১০ এই অমৃতের অধিকারকে আরো গভীরভাবে বুঝতে হ'লে রবীন্দ্রনাথের সেই 'আমি' প্রত্যয়টির মধ্যেই আমাদের আবার ফিরে যেতে হ'বে। রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, আমরা প্রতিটি মানুষই একদিকে যেমন অত্যন্ত ছোটো, আবার তেমনি অন্যদিকে অত্যন্ত বড়ো। যে-দিকটাতে আমি শুধু কেবল আমি, আমাকে কেন্দ্র ক'রেই আমার সুখদুঃখ, আরাম, আয়োজন, প্রয়োজন ও বহুবিধ ইচ্ছার সব সাজানো, এবং অন্য সকলকে বাদ দিয়ে কেবল নিজেকেই আমি একান্ত ক'রে পেতে চাই, সেখানে আমি একটি বিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়, সেখানে আমি ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র। আর যেখানে আমার সমস্তের সঙ্গে যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেন পূর্ণতা আসে, সেইখানে আমার মহত্ত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে সেখানে আমার নাড়ীর বন্ধন যেন ঘটে গেছে। 'সকল স্বার্থের সকল অহংকারের অতীত সেই আমার বড়ো-আমিকে সকলের চেয়ে বড়ো আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্ছে আমাদের বড়োদিন'। ১১ মানুষের এই আমিকে কেন্দ্র ক'রে অনন্তকাল ধ'রে একটি দ্বন্দ্বের লীলা আছে; সে-দ্বন্দ্বটি হচ্ছে ভেদ এবং অভেদ, বিচ্ছেদ এবং মিলনের দ্বন্দ্ব। এই আমির পরিমণ্ডলে ভেদ এবং অভেদের দ্বন্দ্ব আছে বলেই মানুষের চিত্তলোক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা উচ্চারিত হচ্ছে, অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আর যিনি আমাদের পুত্র এবং বিত্ত থেকে প্রিয়, তাঁরই লীলাভূমি হচ্ছে আমাদের এই 'আমি-নিকেতন'। তাই 'এইখানে এত নিদারুণ দুঃখ এবং সেই দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান—সেইজন্যেই তো এইখানেই মৃত্যু—এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে উৎসারিত হচ্ছে'। ১২ 'আমাদের অন্তরাত্মার আমি ক্ষেত্রের' এই আনন্দ-নিকেতনে পরম প্রিয়তমের লীলামাধুর্য যখন আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করি, তখনই আমাদের বিশ্বব্যাপী সকল আমির সঙ্গে অচ্ছেদ্য এক যোগবন্ধন ঘটে, আর তখনই বুঝতে পারি—'কী সুন্দর আমি। কী মহৎ আমি। কী সার্থক আমি'। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাতেও ঠিক এই সুর অনুভূতির গভীরতা নিয়ে বেজে উঠেছে—

যারে যারে
পেয়েছিনু তারে
অতল মাধুরী সিন্ধুতীরে
আমার অতীত সে-আমিরে।
জানি তাই, সে আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।
[আমি-পরিশেষ]

এই প্রসঙ্গে আমাদের এ-কথাও উল্লেখ করতে হ'বে যে, রবীন্দ্রনাথের অমৃত-ভাবনায় আমি-বোধ যেমন দেখতে পেলাম অধ্যাত্মরসের ক্ষেত্রে, তেমনি দেখা যায় শিল্পরসের ক্ষেত্রেও। জীবনের 'আমি' কবিতায় তিনি বলেছেন—

আমারই চেতনার রঙে
পান্না হ'লো সবুজ,
চুনি উঠ্‌লো রাঙা হ'য়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠ্‌লো আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হ'লো সে।

বিশ্ববিধাতার সঙ্গে মানুষের কেবল চাওয়া-পাওয়ারই সম্পর্ক নয়, মানুষ না হ'লে তাঁর সৃষ্টিও অনর্থক হ'য়ে উঠতো। মানুষের রস-সাধনাই তার সৃষ্টিকে সুন্দর ক'রে তুলেছে। মানুষ তার রসদৃষ্টি চোখে নিয়ে গোলাপের দিকে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়েছে, বলেছে 'সুন্দর', তাই সে সকলের

১০ অমৃতের পুত্র : শান্তিনিকেতন-১৬
১১ জাগরণ : শান্তিনিকেতন-১২
১২ দুই ইচ্ছা : শান্তিনিকেতন-পরিশিষ্ট

কাছে সুন্দর বলে পরিচিতি লাভ করেছে। মানুষের এখানে একটি অহংকার থাকা স্বাভাবিক ; কারণ, 'মানুষের অহংকারপটেই বিশ্বকর্মার বিশেষিত্ব'। মানুষ না থাকলে বিধাতাপুরুষ কবিত্বহীন হ'য়ে যাবেন। মানুষের মধ্যে তাই তিনি 'বড়ো আমি' হ'য়ে আছেন। মানুষের সীমানায় ব'লে তাঁকেও রসের সাধনা করতে হয়েছে, তবেই তিনি হ'তে পেরেছেন 'রসো বৈ সঃ'। রবীন্দ্রনাথ এইজন্যই কাব্যচ্ছন্দে বলেন,—

ওদিকে অসীম যিনি তিনি স্বয়ং
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠলো রস।
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ' মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

মানুষের শিল্প-ভাবনা ও অধ্যাত্ম-ভাবনার এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে এখানে। জীবনের মাধুর্য সাধনা ও সত্যচিন্তার সঙ্গে অন্তরের সুগভীর এক আত্মিক অভীপ্সা মিশে সকল যুগের মানুষের জন্যই অবগাহনের এক রস-সরোবর সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায়। মানুষের এই 'আমিটুকুর কুঞ্জবনে' এসে বিধাতা পুরুষেরও রসের সাধনা না করলে তাঁর সৃষ্টিও সুন্দর হ'য়ে ওঠে না। পরমপুরুষের সমস্ত সৌন্দর্যের কষ্টিপাথর সৃষ্টি ক'রে রেখেছে যেন মানুষের দৃষ্টি। মানুষের স্বীকৃতি না পেলে তাঁর সুন্দর যেন সুন্দর ব'লে পরিগণিত হয় না। যথার্থ পরিচিতিও লাভ করতে পারে না। অমৃতস্বরূপের মানুষের সঙ্গে এইখানেই লীলার যোগ।

এবার আমাদের দেখতে হ'বে, রবীন্দ্রনাথ অমৃত বলতে কি বুঝতে চেয়েছেন। অমৃতের প্রসঙ্গে তিনি বহুবার বহুভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী অমৃতলাভিকা মৈত্রেয়ীর কথা বলেছেন। মৈত্রেয়ী দৈহিক অমরতা যাচ্ঞা করেন নি এ নিঃসন্দেহ ; আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও তিনি অবহিতা ছিলেন ; তবে তিনি অমৃতা হ'তে চেয়েছিলেন কি ভাবে এ-প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সংসারে আমরা তো কেবলই একটার ভিতর দিয়ে আর একটাতে চলেছি—কিছুতেই তো স্থির হ'য়ে থাকতে পারছিনে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায়, আমার মনও স'রে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে, তা'কে যখন ছাড়ি, তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি ক'রে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই যে মৃত্যুর পর্যায় এর আর অন্ত নেই'।[১৩] অথচ মানুষের মন এমন একটা কিছু চায়, যা' পেলে তার আর কিছুই পাওয়ার বাকী থাকে না, অন্তরের গভীরে দৃষ্টি দিয়ে অপরিসীম তৃপ্তির সঙ্গে সকলকে বলতে পারে যে, সে কেবল এই-ই চেয়েছিল। এ-ছাড়া আর কিছুই সে চায় না, আর তার সঙ্গে কোনোরূপ বিচ্ছেদের কথাও ওঠে না। 'এমন কোন্ মানুষ এমন কোন্ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বলতে পারি এই আমার চির জীবনের সম্বল হ'য়ে গেল—আর কিছুই দরকার নেই'।[১৪] এই জন্য ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী স্বামীর দেওয়া সমস্ত ধন-সম্পত্তির বিনিময়ে অমৃতের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক এর পরেই বলেছেন,—'উপকরণ তো অমৃত নয়, তা হ'লে অমৃত কী। আমরা জানি অমৃত কী। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাইনি তা' নয়। যদি না পেতুম তা' হ'লে তার জন্যে আমাদের কান্না উঠতো না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার কারণ ক্ষণে ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ ক'রে যায়'।[১৫] এই উক্তিতে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই অমৃতের আস্বাদ এই পৃথিবীর মধ্যেই লাভ করতে পেরেছেন। উপনিষদ যে অমৃতকে বলে 'অমৃত-অক্ষয়ম্' অর্থাৎ মরণাতীত ও অবিনাশী, তা এই বিশ্বের অনন্ত আনন্দরূপের মধ্যেই তিনি ধরতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, 'এই মৃত্যুর পরিমণ্ডলের মধ্যে যে আমাদেরকে ক্ষণে ক্ষণে অমৃতের স্পর্শ দিয়ে যায়, সে আর কেউ

১৩ প্রার্থনা : শান্তিনিকেতন-১
১৪ প্রার্থনা : শান্তিনিকেতন-১
১৫ প্রার্থনা শান্তিনিকেতন-১

নয়,—প্রেম। এই প্রেমের মধ্যেই আমরা অনন্তের আস্বাদ লাভ করি। এই প্রেমই একমাত্র মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারে। প্রেমই সীমাকে অসীমতার ব্যঞ্জনায় ভ'রে তোলে, পুরানোকে নবীন ক'রে রাখে। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'এক আত্মার সঙ্গে আর-এক আত্মার যে-সম্বন্ধ সকলের চেয়ে নিবিড়, সকলের চেয়ে সত্য, তাকেই বলে প্রেম।' ১৬ অন্য এক স্থানে বলেছেন,—'তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য ত্যাগ করেছেন, তিনিই প্রেম-স্বরূপ'। ১৭ এই প্রেমস্বরূপকে তিনি চেয়েছিলেন বলেই অমৃতরূপের জ্যোতির্ময়তায় প্রাণমনকে উজ্জ্বল ক'রে রাখতে পেরেছিলেন। এই প্রেমের দ্বারাই পরম আমির সঙ্গে পরিচয় ঘটে অন্তরাত্মার, এবং সমগ্র বিশ্ব যে অমৃতের মধ্য থেকেই উদ্ভূত, সেই আনন্দানুভূতিও কবি-হৃদয়কে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে। তা'ছাড়া, যে-সমস্ত তপস্বী তাঁরা কালের দিকে দৃষ্টি রেখে গভীরতর সত্তার উৎসমূলের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁদেরকেও স্মরণ ক'রে মানুষ নিজেদের অমৃতের সন্তান ব'লে জানতে পেরেছে; ১৮ কারণ তাঁরা মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে প্রমাণ করেছেন অমৃতকে। 'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থেও তিনি বলেছেন—

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
কবির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।

শুধু 'আনন্দ অমৃতরূপে'ই বিশ্বের প্রকাশকে তিনি প্রত্যয় করেননি, আলোকের অন্তরে যে আনন্দের স্পর্শ আছে, তার মধ্যেও তিনি জানেন তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মার কোনো ভেদ নেই। তাই তিনি বলেন—

এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী,
পরম আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে;

প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে। (আরোগ্য-৩২)

বিশ্বকে পূর্ণে যিনি জেনেছিলেন, তাঁর আমিই সমগ্র অস্তিত্বের সাক্ষী হ'য়ে রয়েছে, এবং পরম আমির সত্তাই তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্তরে এই উপলব্ধি নিয়েই অমৃতবাণী রবীন্দ্রনাথ অমৃতকে আহ্বান জানিয়ে বলেন,—'হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই মর্ত্য আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি। কতকাল ধ'রে যে তা' আমি নিজেও জানিনে, কিন্তু অপেক্ষা ক'রে আছি।' ১৯ অমৃতের সাধনায় কবি রবীন্দ্রনাথের এ-প্রতীক্ষা তাঁর আনন্দ-চেতনার মধ্যেই বিধৃত ছিল। আত্মার সঙ্গে অমৃতের চিরদিনকার যোগবন্ধন আছে বলেই এই প্রতীক্ষা, এবং এই প্রতীক্ষাই আত্মাকে পূর্ণতার সন্ধান দেয়। এই পূর্ণতা বস্তুর অতীত, কিন্তু এর মধ্যে অন্তরলোকের সার্থকতার যোগ আছে, আর এই সার্থকতাই একদিকে যেমন পরমতম তৃপ্তির, তেমনি অন্যদিকে একান্ত সাধনার বস্তু।

১৬ মানুষের ধর্ম-পৃঃ ৩৫
১৭ প্রেম : শান্তিনিকেতন-১
১৮ মানুষের ধর্ম : পৃঃ ১২
১৯ জাগরণ : শান্তিনিকেতন-১২

আমি বিশ্বনাগরিক

॥ শ্রীনলিনীকিশোর গুহ ॥

ভোরে শুণ শুণ করিয়া গাহিতেছিলাম রবীন্দ্রনাথের "অয়ি, ভুবন মনোমোহিনী !—জগৎ-জননী, জননী !" তারপর সবটা গানই স্মরণে আসিয়া গেল—

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সাম রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী !
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য.....।"

এই সঙ্গীতে বাংলার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভারত-জননীকে স্মরণ করিয়াছেন—প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। পৃথিবীর মানব-সভ্যতার ইতিহাস-সম্মত সিদ্ধান্তই তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন, আমাদের শুনাইয়াছেন।

জানিলাম, ভারতগগনে প্রথম জ্ঞানের উষার আলো দেখা দিল,—তপোবনে সামগান গীত হইল।

ভারতের এই তপস্যালব্ধ সত্য, সম্পদ; এই আবিষ্কার কিন্তু ভারত নিজস্ব স্বতন্ত্র করিয়া পাইল না, দেখিল না, ভারত যাহা জানিয়াছে তাহা শুধু ভারতের নয়, যে শ্রেয়কে ভারত জানিয়াছে, তাহা যেমন ভারতের তেমনি তাহা বিশ্বমানব মাত্রেরই শ্রেয় লাভের সত্য। তাই ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষী পরম আনন্দে বিশ্বজনকে ডাকিয়া বলিতেছেন—'শৃণ্বন্তু'—শোনহ, শোন বিশ্ববাসী ভাই সব, তোমরা অমৃতের সন্তান—অন্ধকার যবনিকার পারে আমি পরম ও দিব্য সত্যকে জেনেছি, তিনি অমৃত স্বরূপ, তুমি আমি আমরা সবাই এই অমৃতের অধিকারী !

এই পরম সত্যের উপলব্ধিই বিশ্ব প্রেমের মূল প্রেরণা। বিশ্বজনের সঙ্গে এই একাত্মবোধ হইতেই সত্য হইয়া উঠে বিশ্বমানবের ঐক্যের সত্য, ভেদ-বিভেদ নয়। বিশ্ব-বিশ্বেশ্বর-বিশ্বমানব এক ও অখণ্ড, এই পরম উপলব্ধি হইতেই বলা সম্ভব—'আমি বিশ্বনাগরিক।' (শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালের সত্য সিদ্ধান্ত।)

আজ 'ওয়ান্‌ওয়ার্লড্' এক-বিশ্বের স্বপ্ন যাঁহারা দেখেন,—পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন চিন্তানায়ক oneworld-এর কথা বলিতেছেন—তাহা আজ পর্যন্ত যদিও স্বপ্নই, তথাপি ইহা দুঃস্বপ্ন নয়, কবির কথায় বলি "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে"।

ভারতের একটি প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকে নিত্যকার স্তব,

'মাতা চ পার্বতীদেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরো
ভ্রাতরঃ মানসাঃ সর্বে, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।'

শ্লোকটি এখানে উল্লেখ করিয়া রাখিলাম, ভারতের সত্য উপলব্ধির স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে সহায় হইবে।

পৃথিবীর মানুষের সভ্যতার ক্রম বিবর্তন, পঞ্চম অঙ্কাদয় বস্তুর পরিক্রমার পরেও মানুষের ঊর্ধ্ব-যাত্রা মিথ্যা আশা নয়। শতসহস্র বিঘ্ন বাধার অগ্নিপরীক্ষার পরেও এই সত্যেই মানুষকে লইয়া যাইবে যে, বিশ্ব-বিশ্বেশ্বর-বিশ্বমানব এক অদ্বিতীয়। মহাপুরুষগণের সত্যের সাধনা মিথ্যা হইবে না।

কিন্তু সত্যেরও বিকৃতি ঘটে। অনৈক্যের, অসত্য ও অধর্মের, অজ্ঞানতার ও অনাচারের, বৈষম্য ও অবিচারের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সত্যের এই বিকৃতির প্রতিরোধ এবং সত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই মহাপুরুষগণের আবির্ভাব সম্ভব হয় যুগে যুগে, যুগসন্ধিক্ষণে। মহাপুরুষগণের আবির্ভাব, তাঁহাদের বাণী ও আচরণ নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করে। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম ভালবাসা একাত্মবোধ জাগ্রত করিতে থাকে। সমাজের প্রাণবান

অংশ পাড়া যেয়—নূতন কারখানার স্বভাবতঃই তাঁহারা দীক্ষা লাভ করে। তখন আশা জাগে সমাজের গ্লানি অন্ধকার চিরতরে দূর হইল। কিন্তু ইহাও দেখা যায় কালের হাতে অর্থাৎ কালক্রমে মহাপুরুষগণের প্রচারিত সত্য কার্যতঃ যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে—অথচ কালজয়ী এই সত্য তো ব্যর্থ হইবার নয়।

এই সম্পর্কে সাধারণভাবে আমাদের চিন্তায় যাহা আসে তাহা বলি। নানা কারণের মধ্যে যে কারণটি প্রধান মনে হয়, তাহা রাজনীতি।

ইতিহাসে দেখা যায় প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী, জগৎ প্রেমী মহাপুরুষগণ যে সত্য-ধর্ম প্রচার করেন, জীবনে আচরণ করেন তাহাদেরই অনুগামিগণ, শিষ্য বা চেলাগণ, তাহা কিন্তু তাহারই বিপরীত আচরণ করিতে পারেন। ধর্ম-জগতে ধর্মের ইহাই 'ট্রাজিডি'—বলা যায় ধর্মের ব্যভিচার!

মানবপ্রেমী যীশু মানুষেরই অজ্ঞানতার নির্মম-নিষ্ঠুরতায় ক্রুশ-বিদ্ধ হইলেন। ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াও তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান—পিতঃ, এদের মার্জনা করো; এরা জানেনা, কি করছে। প্রেম ভালবাসার ইহাই স্বরূপ। পলরিসারের নিম্নোক্ত কথাটি স্মরণ করাই; Love does not find fault - it understands—ভালবাসা দোষ সন্ধান করেনা, দোষ দেখে না, কারণ কেন এমন ভুল করে তাহা সে বোঝে। তাই বিরুদ্ধতা বিদ্বেষ ঘৃণা পাকে না। কিন্তু অনুগামিগণের ধর্ম বা ধর্মীয় চেতনা অপর ধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে, বলা হয় ধর্ম-যুদ্ধ - ক্রুসেড্। শুধু এতোটুকুতেই তাহারা ক্ষান্ত থাকে না, থাকা সম্ভব হয় না। কারণ ধর্মের সঙ্গে আসিয়া যায় 'রাজনীতি'।

ইউরোপ যীশুর ধর্ম গ্রহণ করিল, যীশুখৃষ্টেরই নামে সৃষ্ট ধর্ম। ইউরোপেও যীশুখৃষ্টের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত মানব প্রেম কিছু সংখ্যক খাঁটি খৃষ্টান দেখা গেল। কিন্তু বলিয়াছি, মুস্কিল বাধাইল রাজনীতি। যে রাজনীতির আসল রূপ রাষ্ট্রিক ক্ষমতা লাভ, প্রভুত্ব বিস্তার। যে রাজনীতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় পরের কাড়িয়া খাওয়ার 'রাজনীতি'; প্রমথ চৌধুরীর কথায়—যে রাজনীতিতে নীতি নাই।—নীতি নাই, সুতরাং থাকে শুধু 'রাজ'। তাহার অর্থ—ক্ষমতা যখন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, আর তাহা রক্ষা ও বিস্তারের প্রয়োজন-ই হইয়া উঠে একমাত্র প্রধান বিষয়—আর নীতি-ধর্ম-আদর্শ হইয়া পড়ে নিতান্তই মূল্যহীন। রাজনীতির এই বিচারটিও চমৎকার। ইউরোপ এশিয়ার একটি মানুষকে (যীশুকে) 'প্রভু' বলিয়া গ্রহণ করিল স্বীকার করিল—আর যেন তাহারই বিনিময়ে আর সকল এশিয়াবাসীকে দাস বা অধীন করিয়া রাখিবার অধিকার সে অর্জন করিল। (পলরিসারের কৌতুকপ্রদ কিন্তু সত্য উক্তি)। সেই সঙ্গে এই প্রভুত্ব করার অধিকারকে আখ্যা দেওয়া হইল "স্বর্গীয় কর্তব্য পালনের দায়িত্ব" বলিয়া! রাজনীতির প্রভুত্বের কামনা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হইলে ধর্ম আর থাকেনা, ধর্ম প্রচার ও ধর্ম পালনের অর্থ হয় অপর জাতি ও অপর ধর্মের মানুষের উপর প্রভুত্ব ও মোড়লি করা, অথবা অপর ধর্মীর স্বরূপ পাল্টাইয়া উহা ধ্বংসের বা বিনাশের মূলে ও সুস্থ হরেক প্রয়াস। এই প্রভুত্বের কামনা একদিকে আনে অহংকার দম্ভ, সেই সঙ্গে অপর ধর্মমত ও পথ-সম্পর্কে বিরূপতা-বিদ্বেষ ও অসহনশীল ধ্বংসাত্মক উগ্রতার সৃষ্টি করে। ফলে রাষ্ট্র ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকেই যে শুধু ধ্বংস করে তাই নয়—সত্য ধর্মকেই প্রকৃত প্রস্তাবে হনন করে, যে মহান ধর্মের নাম করিয়া, যে ধর্মের অনুগামী বলিয়া তাহারা 'ধর্মী' সাজে। ইহাকেই বলিয়াছি ধর্মের ট্রাজিডি।

মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মতোই আরবদেশে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ মহম্মদের মহান আবির্ভাব ঘটিল। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত অনুগামীদের মধ্যেও সত্যনিষ্ঠ ত্যাগী ও মানবপ্রেমী দেখা গেল। কিন্তু কালক্রমে অনুগামীদের মধ্যেও 'রাজনীতি' আসিয়া গেল। তাই ইসলামধর্ম প্রচারের সঙ্গে ঐ ধর্মীদের অপর ধর্মীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার তথা রাজ্যবিস্তারের রাজনীতিই প্রাধান্য লাভ করিতে থাকিল—ঐ ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য ও প্রেম উপেক্ষিত হইতে থাকিল। এই

রাজনীতিই প্রভুত্ব করার লালসাকে সক্রিয় করে। এমনকি, স্বধর্মীদের প্রতি স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্ব বোধ, ভ্রাতৃবিদ্বেষ মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা রাজসিংহাসন-লাভের লড়াইয়ে ভ্রাতায় নিধনাদি সব কিছুই হইয়া যায় ঐ সত্য ধর্মের মিথ্যা দোহাই দিয়া।

মানবপ্রেমী কার্লমার্কস-এর 'ধর্ম'—মতবাদ দর্শনও—এই রাজনীতির দুষিত কামনা হইতে রেহাই পায় নাই। কার্লমার্কসের দোহাই দিয়াই অথবা কে কত অধিক কার্লমার্কসের ভক্ত, প্রতিপক্ষের মধ্যে সে লড়াই কি সাংঘাতিক! ভিন্ন মত পোষণকারিদের প্রতিবিপ্লবী নাম দিয়া যে নরমেধ চলিতে পারে, চলে, তাহা কার্লমার্কস-এর মূল আদর্শ সত্যকে—মানুষের প্রতি প্রেমই ছিল মার্কস-এর জীবন-দর্শনের মূল প্রেরণা—আঘাত করিতেছে,—এই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার রাজনীতিই কমিউনিজমে বিশ্বাসীদেরই বিভিন্ন দলে বিভেদ আর দ্বন্দ্ব—যে দ্বন্দ্বের যুপকাষ্ঠে বলি হইতেছে মার্কস-এরই সত্য-মানুষ। মার্কস-এর অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্রও এই প্রভুত্বের নিরঙ্কুশ শাসনে মার খাইতেছে। ইহাই ট্রাজিডি।

ভারতের ক্ষেত্রে কি দেখা গিয়াছে? মানুষ অমৃতের সন্তান, জীবে শিবজ্ঞান যে দেশের সাধনালব্ধ জ্ঞান—সে দেশেই অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব দেখা গেল—সত্যের বিকৃতি ঘটানো, জীবে দয়া দেখাবার প্রয়াসে মানুষের রক্তে খটমল (ছারপোকা) মিলাইবার মূঢ়তা দেখা দিল, সতী-সাবিত্রীর দেশে সতীধর্মরক্ষার পাণ্ডাগণ সতীদাহের বহ্ন্যুৎসবে প্রমত্ত হইল, দেবমন্দিরের শুচিতা রক্ষার নামে মানুষকে অশুচি অস্পৃশ্য করা হইল—এক কথায় জ্ঞানের ভারত-ভূমিতে অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব। ভারতেও যুগে যুগে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে,—তাঁহারা ধর্মের অনাচার ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সত্যের অমোঘ বাণী নব-রূপে প্রচার করিয়াছেন—সমগ্র জীবনে আচরণ করিয়াছেন—সাময়িক ফল অবশ্য ফলিয়াছে—কিন্তু আবারও মানবতাবিরোধী হিংসাশ্রয়ী পাশবিক প্রবৃত্তি মাথা তুলিয়াছে—যেন মরিয়া না মরে। তাই আবারও ভারতের সাধনালব্ধ শাশ্বতবাণী, বিশ্ব বিশ্বেশ্বর বিশ্বমানব এক ও অবিচ্ছিন্ন, তাহারই পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, পরম আবিষ্কারের পুনরাবিষ্কারের, নব-রূপায়নের জন্য যুগন্ধর মহাপুরুষগণের মহা আবির্ভাব।

মনুষ্য সমাজে সমস্যার অন্ত নাই—সমস্যা সমাধানের প্রয়াসেরও অবধি নাই আজে কর্মে ও আচরণে বৈপরীত্য দেখা যায়—বাক্ মানস ও আচরণ এক হওয়া মানুষের শ্রেয় লাভের জন্য যত অপরিহার্যই হউক—মানুষের স্ববিরোধী প্রবৃত্তি ও প্রবণতা গোলযোগ বাধায়। ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান যেন নিয়তি। তখনই নূতনের আবির্ভাব সম্ভব হয় যুগে যুগে। বিপ্লবের বাণী লইয়াই তাঁহারা আসেন। রূপান্তর ঘটাইবার নূতনতর বাণী। মূল পুরাতন সত্যকে ধরিয়াই তাঁহারা নবজীবন ও নব অভ্যুদয়ের যুগোপযোগী বাণী প্রচার করেন। স্ববিরোধী প্রবৃত্তি ও কর্মোদ্যমে যে জটিল নূতন সমস্যা দেখা দেয়, সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের দ্বারাই উহার সমাধানের পথ নির্দেশ করেন—'not to hate but love, not to fight but help'—Vivekananda। মানুষের ভবিষ্যতের সুমহান মঙ্গলেরই রূপদর্শী রূপকার বিপ্লবী মহাপুরুষগণ। অতীতের সত্য বর্তমানের শিক্ষা অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তিত অবস্থার সম্যক উপলব্ধি হইতেই চলে তাঁহাদের ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ।

মানুষই বিজ্ঞান-সাধনায় যে পরমাণবিক শক্তি আবিষ্কার করিয়াছে তাহা যেমন সৃষ্টি কার্যে, তেমনি সর্বধ্বংসের হাতিয়ার হইয়া উঠিতে পারে, উঠিবার আত্মঘাতী প্রবণতা সুস্পষ্ট—আর তাহাই বিশ্বমানবের সর্বনাশা বিপদের কারণ। যুদ্ধ বিগ্রহের ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া বর্তমানে মানুষ ও পথ চায় না, শান্তিই চায়। শান্তি স্থিতি ও নিরাপত্তার জন্যই আকাঙ্ক্ষা করিবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা আশ্চর্য স্ববিরোধিতা থাকে, যাহার দরুণ শান্তি চাই একথা বলিয়াও যে পথে শান্তি স্থিতি নিরাপত্তা, সেই পথে চলে না,—যায় সে বিপরীত পথে। যুদ্ধের পথ সর্ব ধ্বংসের পথ, মুখে একথা বলিয়াও—যুদ্ধের সর্বনাশা মারণাস্ত্র তূণে ভরিয়া রাখিবার প্রতিযোগিতায় ক্ষান্ত হয় না।

বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রশক্তিগুলির প্রভাব-প্রভুত্ব লাভের ভয়, অবিশ্বাস-বিভ্রান্ততা, বিদ্বেষ-হিংসা, ছিদ্রান্বেষীর প্রমত্ততা আত্মনাশের মূলরূপে দেখা দিবে, দেখা দিতেছে—এক ভয়াবহ চিত্রমন্তারূপ।

মানুষের প্রকৃতিতে অজ্ঞানতা পশু-প্রবৃত্তি আছে, তাহা ধ্বংস করাও চলে না ; কিন্তু তাহা দিয়া শক্তি হইতে পারে। তাহারই ইঙ্গিত জগন্মাতার বাহন পশুরাজ সিংহ। পশুরাজ সিংহ ভাগবত শক্তির পদাশ্রিত হইয়া দিব্যশক্তিতে রূপান্তরিত। আপাতঃ বিভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য, বৈচিত্র্যকে সত্যরূপে জানিয়া সেই সত্যের সমন্বয় সাধন মানুষের ভাগবত সত্তার রক্ষা কবচ। আজ হিংসা বিদ্বেষ হানাহানির পথ নয়। প্রত্যেকের অস্তিত্ব ও মর্যাদা-স্বীকৃতির সহাবস্থান পথে প্রেম ও মৈত্রীর পথই মানবের ও ভারতের বৈপ্লবিক বাণীটি—সার্থক করিতে পারে। বিশ্বাস করি, কালজয়ী এই সত্যেরই জয় হইবে বর্তমানের এই সংকট বিপদ হইতে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্যই প্রয়োজন এই সত্য উপলব্ধি যে বিশ্ব-বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বমানব এক অখণ্ড সত্তা জয় জগৎ, জয় মানুষ।

শ্রীশ্রীদুর্গা

॥ শ্রীজগদ্বরঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

দুর্মদ দুর্গমাসুর—
মহা তপস্যায় হইয়া সিদ্ধ খাইল স্বর্গপুর ;
ধ্বনিল ভয়াল দৈত্য তূর্য
নিষ্ক্রিত রথে চৈত্র সূর্য
পলকে প্রলয়—দলিত ত্রিদিব—দেবতা হইল দূর।

মদমোহে হয়ে অন্ধ—
ঋষি আশ্রম বৈদিক ক্রিয়া করিল সহসা বন্ধ।
হইল লুপ্ত হোমানল শিখা
পূত তপোবনে নামে বিভীষিকা
বসি তরুতলে ব্যাকুল চিত্ত তাপস সন্তানন্ত।

করিল না সুধাবৃষ্টি
হইল বিলীন মর্ত্য-মাধুরী ভাঙ্গ সুন্দর সৃষ্টি ;
বর্ষণ বিধুর মরুর মৃত্যু
পশু বিহীন নিখিল বিশ্ব
গ্রাসিল মানবে মহা আলস্য, ঘুচিল সুচারু কৃষ্টি।

হানিয়া আঘাত বক্ষে—
কাঁদিয়া উঠিল আর্য্য ঋষিরা—নয়নারী মুহ-মুহ :
শুনি সে আর্ত্তি করুণ রোদন
কাঁদিয়া উঠিল গিরি গুহাবন
শুভ্র-আকাশে দিল দরশন শতাব্দী শত চন্দ্র।

মেঘ মধুবারি বর্ষে—
লভি সুধাধারা সসাগরা ধরা হাসিয়া উঠিল হর্ষে।
শাক, সব্জী, কন্দ ও মূল
ভরি মানব পুলকে আকুল ;
দ্যুলোক ভূলোক হ'ল মধুময় দেবীর চরণ স্পর্শে।

হয়ে দুর্গম ক্রুদ্ধ—
সহস্র সৈন্য লয়ে সহচর মারে করে অবরুদ্ধ।
ভয়াল ত্রিশূল বক্ষেতে হানি
দুষ্ট দানবে বধিলা ঈশানী
শ্রীদুর্গা নাম লভিলা জননী ; ধরাতল হ'ল শুদ্ধ।

বেদোক্তবিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদের কথা

।। শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার ।।

মানুষ মাত্রেই চায় আমার বাকশক্তি প্রবল থাকুক, নাসিকায় থাকুক প্রাণ-শক্তি, দৃষ্টি থাকুক অটুট; দন্ত অটুট থাকুক, অ-পক্ক ও অচলিত কেশ থাকুক। পদে দৃঢ়তা হস্তদ্বয়ে, সবলতা, বাহুতে বল, উরুতে ওজঃ শক্তি সমস্ত অবয়ব সু-দৃঢ় হোক। প্রবল শত্রুর অত্যাচারে আমি যেন পরাভূত না হই। পরিপূর্ণ ও দীর্ঘায়ু এবং জীবনে যেন পরিপূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হই। আর যেন পবিত্র চিত্তে বিশ্বের আনন্দ উপভোগ করি।

বাঙ্মম আস্যয়োঃ প্রাণশ্চক্ষুরক্ষ্নোঃ শ্রোত্রং কর্ণয়োঃ।
অপলিতাঃ কেশা অশোনাঃ দন্তাংস্থ বাহ্বোর্বলম্॥
ঊর্বোরোজো জঙ্ঘয়োর্জবঃ পাদয়োঃ। ৬০।১
প্রতিষ্ঠা অরিষ্টানি মে সর্বাত্মা সিষ্টিঃ॥ ৬০।২
তনূস্তন্বা মে সহ সন্তঃ সর্বমায়ুরশীয়।
শোনং মে সীষ পুরুঃ পাবমানঃ স্বর্গে॥ ৬১।১

[অথর্ববেদ ১৯।৬০-৬০।৬১।১]

এটাই হলো আয়ুর্বেদের সূত্রপাত। আর্য ঋষিগণ তাঁদের তীক্ষ্ণ দার্শনিক দৃষ্টিতে অনুভব করে ছিলেন যে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই আমাদের একমাত্র উপায়, যা দ্বারা আমরা নিরোগী হয়ে সুখে দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

পরমেশ্বর একদিকে যেমন দেহ দিয়েছেন তেমনি রোগও দিয়েছেন, অপরদিকে খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী আর ভেষজও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সেগুলিকে আমাদের যতন সংব্যবহার করাই মনুষ্যত্ব আর সেই চেষ্টা আর অনুসন্ধানেই বিজ্ঞান বা আয়ুর্বেদের সৃষ্টি।

যখন তাঁরা নানা ভেষজ আবিষ্কার করে ঔষধ তৈরী করে নানাবিধ ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে লাগলেন—তখন তাঁরা বলে উঠলেন :—

আদরেতী ভূত্র শন্তমেভিঃ শতহিমা অশীয় ভেষজেভিঃ
ব্যংহসঃ পুরুবো বিশ্বতরং ব্যংহোঅশ্মীচাতয়াস্যারিষ্টতাতী॥

[ঋগ্বেদ ২।৩৩।২]

হে পরমেশ্বর! তোমার দেওয়া হিতকারী ঔষধের সাহায্যে আমরা যেন শতবর্ষ জীবন ধারণ করতে পারি। আমাদের মধ্যের অহিতকর হিংসাত্মক ও সমগ্র শরীরের ব্যাপক ব্যাধিকে বিদূরিত কর।

ক্রমে অভিজ্ঞ বৈদ্যের উদয় হতে লাগলো, অনেকে সু-বৈদ্য বলে যশ ও খ্যাতি অর্জন করলেন। তার মধ্যে—

যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহামীবচাতনঃ

[ঋগ্বেদ ১০।৯৭।৬]

সেই বিপ্রই সুবৈদ্য যিনি ব্যাধিকে দূরীভূত করেন এবং বিনাশ করেন, যাঁর মস্তিষ্কে ওষধির তত্ত্বজ্ঞান সমিতিতে রাজা ও পরিষদের ন্যায় দেদীপ্যমান থাকে।

বৈদ্যগণের যশ ও সুখ্যাতি প্রচারিত হতে লাগলো, তখন তাঁদের গুণের আদর হতে লাগলো।

দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভিষগাশিনা।
বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ।

[যজুর্বেদ ১৯।১২]

আত্মার কল্যাণের জন্য ইন্দ্রিয়ের দমনকর্ত্তা সাধক বিদ্যা ও বাণীদ্বারা বৈদ্যের কার্য্য করেন। বিদ্বানেরা প্রচার করেন যজ্ঞ ও গুরুকর্মের। সু-বৈদ্য নিজের শক্তিতে চিকিৎসার বিস্তার করেন।

কি করে বিপ্রগণ আয়ুর্বেদ শিক্ষা লাভ করেন, তা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলেন :—

ঋগযজুঃ সামার্থবাখ্যান্ বৃহাবেদান্ প্রজাপতিঃ
বিচিন্ত্য তেষামর্থৈকমায়ুর্বেদং চকারসঃ।
কৃত্বাতুপঞ্চমং বেদং তাস্তরায় দদৌ বিভুঃ
স্বতন্ত্রসংহিতাং তস্মাত্তন্তরশ্চ চকার সঃ।
তাস্তরশ্চ মহিষেভ্যো আয়ুর্বেদং চ সংহিতাম্
প্রদদৌ পাঠয়ামাসতে চক্রুঃ সংহিতাস্ততঃ॥

[ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ ১৬ অধ্যায় ১।১০।১১ শ্লোকাঃ]

স্বয়ং ব্রহ্মা ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ দেখে পড়ে, এবং তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করলেন। পঞ্চম বেদ নামকরণ করে ভাস্করকে দেন।* তখন ভাস্কর নিজে একখানি সংহিতা রচনা করে তাঁর শিষ্যবর্গকে দিলেন এবং শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন। তখন তা মানবগণের মধ্যে প্রচারিত হতে লাগলো। তারপর :—

চিকিৎসাতন্ত্র বিজ্ঞানং নামতন্ত্রমনোহরম্
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান চকার প্রথমে ভুবি।
চিকিৎসা দর্শনং নাম দিবোদাসশ্চকার সঃ।
চিকিৎসা কৌমুদীং দিব্যাং কাশিরাজশ্চকার সঃ॥
চিকিৎসা সার তন্ত্রঞ্চ প্রভাকাখিনীসুতৌ।
তন্ত্রং বৈদ্যক সর্বস্বং নকুলশ্চকার সঃ॥

ধন্বন্তরি দিবোদাস কাশিরাজ অশ্বিনীকুমার দ্বয় ও নকুলাদি ক্রমশঃ নানা সংহিতা রচনা করে মানব ব্যাধি ও বেদনা নাশ করবার জন্য প্রদান করতে লাগলেন। কিন্তু :—

ব্যাধসূত্র পরিজ্ঞানং বেদনানাঞ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্বিষয়ন্ত বিজ্ঞানং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥

বৈদ্যগণ ব্যাধি ও বেদনা নাশ করতে সমর্থ হলেও আয়ু দেবার ক্ষমতা নেই।

ঋগ্বেদ সংহিতায় জানতে পারা যায় যে তাঁরা অর্থাৎ বৈদ্যরা চিকিৎসা চিন্তায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তাই তাঁরা দেবতা বলে গণ্য হয়েছেন। অদ্ভুত কার্য্যের কেতুরে— বৃষাগিরের পুত্র ভরদ্বাজ নামক একজন ঋষি ছিলেন। কোন কারণে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি পরলোকগত হলেন। অশ্বিনয় তাঁকে চিকিৎসা করে চক্ষু দান করেন। চক্ষু চিকিৎসা ও অন্ধকে পুনরায় চক্ষু দান বা সৃষ্টি দান।

শতং মেষাযূন্যে চক্ষুদানমৃজাশ্বং তাপিতাক্ষংচকার।
তস্মা অক্ষী নাসত্যা বিচক্ষ আধত্তং দত্রা ভিষজাবৃষণ্বসূ।
[ঋগ্বেদ ১ম।১১৬।১৬]

অসুরেরা বধ করিতে একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে চোখ অন্ধ করে দেয়, পরে অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করেন। অশ্বিদ্বয় খুশী হয়ে বধ ঋষিকে চক্ষু দান করেন।

যুবনমত্রেরবনীতাথ তপ্তমূর্জ মোমানমশ্বিনাবধত্তং
যুবং কক্ষীবতিরিজায় চক্ষুঃ প্রত্যধত্তং যুবমস্য দৃষ্টিং দুদুবংশা॥
[ঋ বেদ ১।১১৮।৭]

অত্রি ঋষিকে শতবার পাঁড়া যন্ত্র গৃহে প্রবেশ করিয়ে তাঁকে তুষের আগুনে জ্বালিয়ে দেন। অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করলে অশ্বিদ্বয় শীতল জল দ্বারা সে অত্রি নিজিতে পীড়া-গৃহ হতে অবিকলেন্দ্রিয় অত্রিকে বাইরে এনে এবং তাঁর নষ্ট চক্ষু পুনঃ প্রদান করেন।

দীর্ঘতমা ঋষি অন্ধ ছিলেন। অগ্নিকে সন্তুষ্ট করেন তিনি। তাতে অশ্বিদ্বয় প্রসন্ন হন···এবং চক্ষু প্রদান করেন।

যে পায়বো মাহিনেয়ং তে অগ্নে পশ্যন্তো অন্ধংদুরিতাৎ
রক্ষন্ত।—ঋগ্বেদ ১।১৪৭।৩

ঘোষা নাম্নী কক্ষিবান্ ঋষির পুত্রী কুষ্ঠরোগগ্রস্তার জন্য তাঁর বিবাহ হয় না। বৃদ্ধা অবস্থাতেও পিতৃ-গৃহেই ছিলেন। পরে অশ্বিদ্বয়ের চিকিৎসার রোগ হতে আরোগ্য লাভ করে পতিলাভ করেন।

ঘোষায়ৈ চিৎ পিতৃষদে দুরোণে পতিং
জূর্যন্ত্যা অশ্বিনাবধত্তং॥ [ঋগ্বেদ ১।১১৭।৭]

ঋগ্বেদ চক্ষুদান ভাবার কুষ্ঠ, বৃষণ পুত্রের বর্ণ (শ্রবণেন্দ্রিয়) দিয়েছিলেন।

যুবং ভাবয়ং কৃষ্ণত্বীমবধত্তং মহোধস আশ্বিনাকবায়।
প্রাবাচ্যং তদ্বৃষণাকৃতং বাং দশাবধং শ্রবো অশ্বাবধত্তং॥
[ঋগ্বেদ ১।১১৭।৮]

বন্ধ্যার পুত্র দান—ভিন্ন ভাগ ছিন্ন ভাব ঋষির পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন।

হিরণ্যহস্তমশ্বিনারমাণা পুত্রং নয়া বধিমত্যা অধত্তং।
ত্রিধাহভাব যবিনা বিকস্যুজীগর্ভ ঐরয়তং দুবস্যান॥
[ঋগ্বেদ ১।১১৭।২৪]

রাজা খেলের রাণী বিশ্‌পলা যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁর একটি পা বিখণ্ডিত হয়ে যায়। সেই কারণে অশ্বিদ্বয় লৌহ নির্ম্মিত পায়ের অভাব পূরণ করে দেন।

চরিত্রং হি বেদিষাচ্ছেদি পর্ণযাজা খেলস্য পরিতক্ষ্যায়াঃ।
সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈধনেহিতে সর্ভবে প্রত্যধত্তং॥

[ঋগ্বেদ ১।১১৬।১৫]

কুৎসের পুত্র বিষ্ণাপ্ব স্তব করলে তাঁর বিনষ্ট পুত্র বিষ্ণাপ্বের প্রাণ রক্ষা হয়।

যুবং নরা স্তবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়ং

[ঋগ্বেদ ১।১১৭।৭]

দুর্বলদাহ স্রোত গমনে সমর্থ যুদ্ধের মুখ থেকে বর্ত্তিকাপক্ষী মুক্ত আদি অনেক উপকারী কাজ বেদের যুগে সম্ভাবিত হয়েছিল।

(ক) জরাজীর্ণ ঋষিকে পুনরায় জীবন ও যৌবন দান করা হয়েছিল :—

ঘুঘুরঘো নাসত্যোত বন্দিং প্রাবৃক্তং স্রোপিমিব
স্রাবণায়াং। [প্রাক্তিরক্তংরহিতমস্যার্ষদস্রাদ্বিং পতিম
কৃণুতংকনীনাং]

[ঋগ্বেদ ১।১১৬।১০

(খ) যুবং স্রাবণমিচ্ছিনা জরান্তং পুনর্যুবানংচক্রথুঃ শচীভিঃ।

[ঋগ্বেদ ১।১১৭।১৩

শারীরিক ব্যাধি ছাড়াও মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার হতো। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি তাঁর মানসিক ও দৈহিক ব্যাধি হতে মুক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

বায়ু পিত্ত কফ, এই ত্রিধাতুর কোনও একটা প্রবল হলেই ব্যাধি হয়। হৃদয়ভাবের সত্ত্ব রজঃ আর তমো ভাবের মধ্যে যে কোন একটি প্রবল হলেই মনে অশান্তি আদি মানসিক চঞ্চলতা হয়। অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্যও হয়েছিলো :—

(ক) প্রসব-রহিত গাভীকে দুগ্ধবতীকরণ।

(খ) কূপে পতিত পাশবদ্ধ বেতস ও কবন্ধকে উদ্ধার।

(গ) মান্ধাতাকে বিশ্ব-অধিপতি আদি কাজ।

বৈদিক যুগেও বন্ধ্যা ছিল কিন্তু মন্ত্রদ্বারা উহা আরোগ্য হতো।

মুকামিষ্বা হবিষা জীবনায় কমদ্ভাতে বন্ধ্যামূতায় রায়ে যজামহে।
প্রাহির্দ্দুরাহ্ যদিবৈতদেনং তক্ষা ইন্দ্রাগ্নি প্রমুমুক্তমেনং॥

[ঋগ্বেদ ১০ম-১৬১-(১৪১]

এ মন্ত্রটি ছাড়াও আরোও তিনটি মন্ত্র আছে। এ যুগে মন্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাস নেই বলেই উল্লেখ অবান্তর।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৯৭ সূক্তে ২৩টি ঋক্ বা মন্ত্র আছে। তা পড়লে বোঝা যায় যে বৈদিক যুগে নানা প্রকার রোগের প্রতিকারের জন্য নানা উদ্ভিদ ব্যবহৃত হতো।

আয়ুর্বেদবিজ্ঞান যজুর্বেদের মন্ত্রেও আছে। অথর্ব-বেদেও অনেক প্রকার রোগের কথায় উল্লেখ আছে।

১। সূ-প্রসব, জলোদর, বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মার বিকৃতি, হৃদরোগ, দুষ্ট ও শীতজ্বরাদি আছে প্রথম কাণ্ডে।

২। জ্বরতিসার, ক্ষয়রোগ, ক্রিমি, অক্ষি, নাসা, জিহ্বা কর্ণ ও গ্রীবা রোগ ইত্যাদির কথা আছে দ্বিতীয় কাণ্ডে।

৩। কেশরোগ গণ্ডমালা, সর্প মূষিকাদির দংশন ষষ্ঠ কাণ্ডে।

৪। সপ্তম কাণ্ডে শিশু পীড়ার কথা।

বৈদিক যুগে ভেষজাদির ব্যবহার ছিল এবং চিকিৎসক ও বৈদ্যদের বিশেষ আদর ছিল।

চিকিৎসায় দক্ষ হয়ে বৈদ্য বলতেন :—

অশ্বাবতীঃ সোমাবতীর্ঘর্জ্জয়ন্তী র্মধোমতীঃ
আবিৎসি সর্বা ঔষধিরুতা অরিষ্টতাতয়ে।

[ঋগ্বেদ ১০।৯৭।৭]

আমি অশ্বাবতী, সোমবতী, ঊর্জ্জয়ন্তী, উদোজস্ প্রভৃতি তাবৎ ঔষধ সংগ্রহ করেছি, আমার মনের ইচ্ছা যে আমি এই ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করবো।

বেদে যে কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক তত্ত্বই আছে তা নয়। বেদে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথাও আছে। বেদ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মানব কল্যাণের সর্বদিক দিয়েই পরিপূর্ণ। সর্বতোমুখী। চতুর্বেদ যেন ব্রহ্মার চতুর্মুখ। জীবনের সর্বপরিব্যাপ্ত।

যে স্মৃতি আজও ভুলিনি

॥ শ্রীকৃহিদাস সাহা ॥

ও ছেলে! শুনছ গো ছেলে! বারবার এই আহ্বান ভেসে আসে।

একবার এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করি, পরমুহূর্তে বেগুন মাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ভাবি, কি জানি কে কাকে ডাকে! আমাকে আবার ডাকবে কে!

তেমন গুরুত্ব দেই না।

বেগুন ক'টা ব্যাগে তুলে ষাট পয়সা হিসাবে দাড়ে চারশো গ্রামের দাম হিসাব করি। আধুলিটা দিয়ে বাকী পয়সা পকেটে রেখে ব্যাগটা হাতে তুলে মুখ ফেরাতেই এক বৃদ্ধাকে বলতে শুনি—ওগো ছেলে, তোমায় যে ডাকছি।

আমাকে! বিস্মিত হয়ে উঠি। বিস্ময়াবিষ্ট মন নিয়ে প্রশ্ন করি—কেন?

তোমার পয়সা নিয়ে যাও তো, যাদু।

আমার পয়সা! আরও অবাক হয়ে উঠি।

হ্যাঁ গো ছেলে, তোমার পয়সা। কতদিন ধরে খুঁজছি তোমায়। পাইনে আর।

এক নাগাড়ে বলে যায় বৃদ্ধা। অনুযোগভরা কণ্ঠে শুধোয়—বাজারে আর আস না বুঝি?

কোন কথা বলতে পারি না। এক পা দু' পা করে এগোতে থাকি।

বৃদ্ধাও এগিয়ে আসে। তারপর বসে যায় একটি দোকানে। দোকান মানে ফুটপাতের দোকান—পণ্যের মধ্যে কয়েক আঁটি পলতা পাতা, কিছু ফুল, বেলপাতা আর কয়েকটি কাঁচালেবু। অস্থিচর্মসার হাতখানি দিয়ে শতচ্ছিন্ন কাপড়ের আঁচলের গাঁট থেকে পয়সা খুলে হাত বাড়িয়ে আমাকে দিতে আসে।

প্রশ্ন করি—কিসের পয়সা, বুড়িমা?

উত্তর আসে—একদিন আট নয়া পয়সার একটি বেল কিনে একটা সিকি দেছেলে। পয়সা ফেরত না নিয়েই চলে গেছেলে সেদিন। সেছন সেছন সেছলাম। কোথায় চলে গেলে আর খুঁজে পেলাম না।

মাঝে মাঝে বেল আমি কিনি। কিন্তু পয়সা ফেরত নিইনি বলে তো আমার মনে পড়ছে না! ভাবি আমি। খানিক পরে বলি—আমার তো কিছু মনে নেই বুড়ীমা।

স্বচ্ছন্দে বলে ওঠে—আমার তো মনে আছে, ছেলে মোজ তোমার কথা ভাবি, তোমায় খুঁজ করি। কিন্তু তোমাকে আর পাইনে।

প্রশ্ন করি—তুমি আমাকে চেন, বুড়ীমা?

চিনি গো চিনি। মোরা মুখ্যু মানুষ। কিন্তু ভুল মোদের হয় না। এক নিশ্বাসে বলে যায় বুড়িমা।

আমি বলি—ভুল তো হয় না, কিন্তু আমার তো মনে নেই। পয়সা নিই কি করে?

নেবে না কেনে, ছেলে? আমি বলছি তোমার পয়সা।

বলেই বুড়ীমা উঠে দাঁড়ায়, আমার হাতে পয়সা গুঁজে দেবার চেষ্টা করে।

আমি হাত নেড়ে নিষেধ করি। সুস্পষ্টভাবে বলে উঠি—না বুড়ীমা,—আমি নিতে পারবো না।

বৃদ্ধার মুখমণ্ডল কেমন যেন বিকৃত হয়ে ওঠে। বিরক্তিকর কণ্ঠে বলে ওঠে—না গো ছেলে, আমিও ঋণী থাকতে পারবো না। ভগবান আমাকে ক্ষমা করবে না। তোমার পয়সা তুমি নিয়ে নাও।

বলেই পয়সা হাতে গুঁজে দেয়, হালকা মন নিয়ে নিজের জায়গায় ফেরে বসে।

আমি একটু এগিয়ে যেয়ে বলি—বুড়ীমা, তোমার সত্যনিষ্ঠার জন্যে পয়সাগুলো তোমায় পুরস্কার দিচ্ছি। বলে পয়সাগুলো দিতে যাই।

নেয় না বুড়ীমা। ওর চোখ দু'খানি কেমন যেন ছলছল করে ওঠে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আমাদের আবার সত্যনিষ্ঠা! আমরা তো গরীব লোক!

আমি কোন কথা বলি না, ওর মনের ঘড় তুলতে চাই না।

খানিক পরে পাশের একখণ্ড ছেঁড়া কাপড় পরা ছেলেটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করি—এই ছেলেটি কে, বুড়ীমা?

উত্তর আসে—বাপ-মা খাওয়া সন্তান, আমার নাতি। আমার কাঁধেই এসে পড়েছে।

করুণ দৃষ্টি নিয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকি। মুহূর্তকাল বিষাদে ভরে ওঠে মন।

পয়সাগুলো ছেলেটির হাতে দিয়ে বলি—নাও ভাই, এ পয়সা তোমার।

বৃদ্ধার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি ফেলে ছেলেটি ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে পয়সাগুলো তুলে নেয়। সারা মুখে হাসির রেখা দেখা দেয়

সে রেখা বৃদ্ধার মুখেও প্রতিভাত হয়ে ওঠে। শুকনো মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

আমিও উৎফুল্ল চিত্ত নিয়ে চলে আসি। কিন্তু স্মৃতি পরে থাকে সেখানে কত কথাই মনে আসে। গ্রামের এ সকল সহজ সরল মানুষের কথা ভাবি। দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী, তবু মনের দিক থেকে এরা কত সমৃদ্ধ! দারিদ্র্য এদের স্পর্শ করে না, অসৎ পথে নিয়ে যায় না। ঈশ্বরে এদের বিশ্বাস কত। কত না এদের ভগবৎ প্রীতি।

সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রশ্ন এসে মন জুড়ে বসে। ঈশ্বরে বিশ্বাস আর সৎপথ নিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকলেই তো চলবে না। এ যুগের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজনও তো এদের দারিদ্র্যমুক্তি, প্রয়োজন দুবেলা দু'মুঠো ভাতের, প্রয়োজন লজ্জা নিবারণের জন্যে এক খণ্ড বস্ত্রের। প্রশ্ন জাগে—তাদের জীবনে এমন দিন কি কোন দিন আসবে?

অথ অন্ধ-খঞ্জ-সংবাদ

॥ শ্রীক্ষণিভূষণ বিশ্বাস ॥

পড়েছেন বিনোবাজীর সাম্প্রতিক একটা বিবৃতি:
যেটা আজকের সামাজিক বিকৃতির আশ্চর্য স্বীকৃতি,—
আজ যা' ভাব-বিপ্লব বলে
আলোড়ন তুলেছে বিদগ্ধ মহলে।
তামাম ভারতবর্ষ জুড়ে যে শাসন শোষণ চলেছে আজ—
তাকে তিনি বলেছেন অন্ধ-খঞ্জের সমাজ।
কথাটা যেন এ যুগের বাস্তব আয়না—
যাকে কেতাবাশ্রিত তথ্য বলে আর কিছুতেই উড়িয়ে
দেওয়া যায় না।
কেননা, যে সমাজের বারো আনা লোকের আত্ম-চেতনার
ধার কম,
অশিক্ষায় কুশিক্ষায় আজ যারা প্রায় অন্ধ,
সেই সব অন্ধ মানুষের চলচ্ছক্তিকে
এক দল খঞ্জ প্রভু যেন চালনা করছে বিভ্রান্তির দিকে!
সেই অসামঞ্জস্যকর অব্যবস্থার দুর্নীতির ফলে,—
যদি ক্রমাগত এই আত্মশক্তি অবসানের পথে চলে,
তা' হ'লে অন্ধ-খঞ্জের সমাজ সর্বনাশের খানায় গিয়ে পড়বে।
সেই চরম দুর্দিনের হাত থেকে কে তাদের রক্ষা করবে?
কাজেই আজকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই হবে প্রাথমিক
কাজ,—
গোড়া থেকেই গড়ে তোলা সেই অন্ধ-খঞ্জত্ব মুক্ত এক
আদর্শ সমাজ।

অভেদানন্দ অনুধ্যান

॥ শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী ॥

'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্।"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

১৮৮০ সালের কথা। চৌদ্দ বছর বয়সের একজন বালক একদিন তার বাড়ীর লাইব্রেরীতে একখানি গীতা দেখতে পেয়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে যখন সেটি পড়ছিল, ঠিক সেই সময় পিছন দিক থেকে তার বাবা এসে বইটি হস্তগত ক'রে মৃদু তিরস্কারের সুরে বলে উঠলেন "এই বই পড়বার বয়স এখনো তোমার হয় নি"। তারপর তিনি বইটিকে ছেলের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রেখে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু বালকের অনুরাগ অবদমিত হোল না। সে বাড়ীর সমস্ত সম্ভাব্য স্থানে অনুসন্ধান করে বইটি ঠিক খুঁজে বার করল এবং রাত্রে সবাই যখন নিদ্রামগ্ন সেই সময় প্রদীপ জেলে তার স্বল্প আলোকে নিয়মিত পাঠ করতে থাকল। ক্রমে গীতার আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ তার মনে ভগবান লাভের প্রবল বাসনা জাগিয়ে তুলল।

বালকের পিতার নাম রসিকলাল চন্দ্র। তিনি আহিরীটোলার ২১নং নিমুগোস্বামী লেনে বাস করেন। এবং 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী' নামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, বিশ্বনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের পিতা), গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। রসিকলালের দুই সংসার—প্রথমা পত্নী একটি পুত্র আর একটি কন্যা রেখে অকালে পরলোক গমন করেন। পুত্র বেহারীলাল ছাত্রাবস্থায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং গৃহত্যাগ করেন। ফলে রসিকলাল দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এবং দ্বিতীয় স্ত্রী নয়নতারার গর্ভে তাঁর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে তার নাম রাখা হয় কালীপ্রসাদ। মা কালীর কাছে প্রার্থনার ফলস্বরূপ এই নামকরণ হয়। পুত্রের জন্ম তারিখ ১২৭০ সালের ১৭ই আশ্বিন ইংরেজী ১৮৬৩ খৃঃ ২রা অক্টোবর।

পাঁচ বছর বয়সে বালক কালীপ্রসাদ নিকটস্থ গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় ভর্তি হল, এবং সুযোগ্য আহিরীটোলায় বহু পণ্ডিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' প্রবেশ করে তিন বছর অধ্যয়ন করল। দশ বছরে পদার্পণ করলে পর কালীপ্রসাদের বাবা তাকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি করে দিলেন। ছাত্র হিসাবে কালীপ্রসাদ অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়ে প্রত্যেক বছর দুটি শ্রেণী অতিক্রম করে পারিতোষিক লাভ করল। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তার এমন একটা আকর্ষণ জন্মাল যে বিদ্যাসাগর মশায়ের সংস্কৃত ব্যাকরণ ও উপক্রমণিকা পাঠ করে সে অভিভূত হয়ে গেল। তারপর হাতিবাগান টোলে সংস্কৃত পড়বার সুযোগ খুঁজতে লাগল, এবং হেরম্বচন্দ্র পণ্ডিতের কাছে 'মুগ্ধবোধ' পড়তে লাগল।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক কালীপ্রসাদের সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ দেখে 'ছন্দোমঞ্জরী' নামক একখানি বই পড়তে দিয়েছিলেন। এই বই থেকেই তিনি ছন্দের লক্ষণ সম্বন্ধে অবহিত হন। অতঃপর শঙ্করাচার্যের জীবনী ও বাণী পাঠ করে মনে মনে তাঁর মত অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত ও দার্শনিক হবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।

দেশে ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনা যেমন যুবকগণকে সংস্কার-মুক্ত করেছিল, তেমনি তা একদিকে খৃষ্টধর্ম ও অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্মের সংঘাতে সনাতন হিন্দুধর্মকে অনেকখানি কোণঠাসা করে রেখেছিল। তখন সেই দুরবস্থার দ্রুত অবসান করে শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দস্বামী) প্রমুখ পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্মের মহিমা

প্রচারে ব্রতপরিকর হলেন। সেই সময় একবার হুগলী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পণ্ডিত তর্কচূড়ামণি ধারাবাহিকভাবে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছিলেন। কালীপ্রসাদ তখন আকুল মনে কোনো ভগবান দর্শনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। প্রত্যহ যে বক্তৃতা প্রদান করা হোত পরদিনই তার মর্মার্থ বা সংবাদ বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এবং কালীপ্রসাদ নিয়মিত সেই সভায় যোগদান করে স্বীয় উৎসাহ ও অনুরাগ বর্দ্ধন করতে থাকলেন। তর্কচূড়ামণি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা শেষ করে পতঞ্জলির যোগসূত্র নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। তখন কালীপ্রসাদের মনে যোগাভ্যাসের প্রবল বাসনা জাগল। জল খাবারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সঞ্চিত করে কালীপ্রসাদ 'পতঞ্জল যোগসূত্র' কিনে সোজা তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হয়ে তাঁকে পতঞ্জল দর্শন পড়াতে অনুরোধ করলেন।

ষড়দর্শন কিশোর বালকের এই জ্ঞানার্জন স্পৃহা দেখে তর্কবাগীশ মহাশয় আনন্দিত হলেন এবং বালককে কালীবর বেদান্ত বাগীশের নিকট গমন করতে নির্দেশ দিলেন। কালীপ্রসাদ এই আদেশ পালন করতে বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। বেদান্তবাগীশ তখন পতঞ্জল যোগসূত্রের বাংলা অনুবাদ কর্মে ব্যস্ত থাকায় জানালেন যে, বেলমাত্র স্নানের পূর্বে তৈল মর্দ্দনের সময় একঘণ্টা কালীপ্রসাদের জন্য তিনি ব্যয় করতে পারবেন। এই সর্তেই কালীপ্রসাদ প্রত্যহ সকালে ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে যোগসূত্রের নিয়মিত পাঠ আরম্ভ করলেন। এবং শিবসংহিতা ও অন্যান্য যোগশাস্ত্র একে একে আয়ত্ত করতে থাকলেন। কিন্তু যোগশাস্ত্রের পাঠ অপেক্ষা যৌগিক সাধন প্রণালীর অভ্যাস অধিক মূল্যবান এবং ঐ কার্যে সিদ্ধ যোগীর নির্দেশ সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় এই কথা চিন্তা করে কালীপ্রসাদ গুরু অন্বেষণে তৎপর হয়ে উঠলেন।

অবশেষে এক সহপাঠীর পরামর্শ অনুযায়ী দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এক যোগীর খবর পেয়ে আপনার বাঞ্ছিত বস্তুকে লাভ করার আশায় তাঁর শরণাপন্ন হলেন। একদিন অতি প্রত্যূষে বাড়ী থেকে বার হয়ে দীর্ঘ রাস্তা পদব্রজে অতিবাহন করে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়ে শুনলেন যে পরমহংসদেব কলকাতায় গিয়েছেন এবং সন্ধ্যার পূর্বে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন না। অগত্যা কালীপ্রসাদ শশিভূষণ নামে পরমহংসদেবের অপর একজন ভক্তের সাহায্যে স্নান আহার সমাপন করে পরমহংসদেবের জন্য সায়ংকালের প্রতীক্ষায় রইলেন। ক্রমে রাত্রির আঁধার ঘোর হয়ে উঠলে পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছলেন। শশিভূষণের চেষ্টায় তাঁর সমীপে কালীপ্রসাদের ডাক পড়ল। সেখানে নতজানু হয়ে প্রণাম করে কালীপ্রসাদ আপনার মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। পরমহংসদেব তাঁর মনের আকুতি ও স্পৃহা লক্ষ্য করে বললেন, "তোমার এই অল্প বয়স। এই বয়সে যোগশিক্ষার ইচ্ছা হয়েছে। এটা খুবই ভালো লক্ষণ। তুমি আগের জন্মে একজন বড় যোগী ছিলে। একটু বাকী ছিল, এই তোমার শেষ জন্ম। যাই হোক, আমি তোমায় যোগ শিক্ষা দেব। আজ রাত্রে এখানেই বিশ্রাম কর, কাল সকালে আমার কাছে এস"।

অপূর্ব আবেগ, অপার আনন্দ ও অব্যক্ত অনুভূতি কালীপ্রসাদকে সারারাত্রি জাগিয়ে রাখল। প্রভাত হওয়ার সঙ্গেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতে স্নান সমাপন করে তিনি শুভ লগ্নের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন, তারপর পরমহংসদেব যথাসময়ে কালীপ্রসাদকে আহ্বান করলেন। একান্তে তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন, তাঁর পড়াশুনার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি গীতা, পতঞ্জল দর্শন, শিবসংহিতা ইত্যাদি পড়েছেন শুনে আনন্দপ্রকাশ করলেন এবং তারপর যোগাসনে উপবিষ্ট করিয়ে দিব্যভাবের শিক্ষাদান করলেন—মূলমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। এবং প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ইষ্টদেবীকে ধ্যান করতে নির্দেশ দিলেন। এরপর কালীপ্রসাদ প্রায়শঃ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করলেন এবং ক্রমে ক্রমে পরমহংসদেবের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করে নরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য গুরু-ভ্রাতাগণের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ১২৯০ সালের ১০ই শ্রাবণ পরমহংসদেব তাঁর পার্থিব দেহ রক্ষা করলেন।

ঐ বছরই মাঘ মাসে বরাহনগর মঠে তাঁর পাদুকা সামনে রেখে 'বিরজা হোম' করে কালীপ্রসাদ বিধিসম্মত সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। মন্ত্রেশ্বরানন্দের নাম হল 'বিবেকানন্দ' আর অদ্বৈত ব্রহ্মের সাধক হিসেবে কালীপ্রসাদ নিলেন 'অভেদানন্দ'।

পরবর্তীকালে এই গুরুর কৃপায় বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি অর্জন করলেন এবং দেশের হৃত গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। অভেদানন্দ ও বিবেকানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে আজও পৃথিবীর সর্বত্র বরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে আছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাঁকে আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলে বর্ণনা করেছেন, শ্রীমা যাঁকে 'তোর মুখে সরস্বতী বসুক' বলে আশীর্বাদ করেছিলেন, অধিতীয় ষড়দর্শনবিদ্ মনরাজ গিরি যাঁকে বলেছিলেন, অলৌকিকী প্রজ্ঞা, বিবেকানন্দ যাঁকে বলেছিলেন—'You have a Resonant voice which has carrying power' এবং ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের সেই উক্তি—Swami Abhedananda is a born preacher, wherever he will go he will succeed'—ইত্যাদি থেকে অভেদানন্দের ব্যক্তিত্বের পরিচয় নিঃসন্দেহে স্ফুটতর হয়ে উঠে। বস্তুত অভেদানন্দের জীবন ত্যাগ, নিষ্ঠা, অনুভূতি, মনীষা, বাগ্মীতা, সরলতা, বিচক্ষণতা, দয়ার্দ্রতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা প্রভৃতির সমাবেশে মহিমান্বিত। তাঁর ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈচিত্র্যময় জীবন দক্ষিণেশ্বরে কালীপুর বাগান বাড়ীতে পরমহংসদেব, শ্রীমা ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের আশীর্বাদ ও সাহচর্যে বর্ণাঢ্য। পরিব্রাজকরূপে হিমালয়ের গিরি কন্দরে, পাহাড়ের হটযোগীর আস্তানায়, বুদ্ধগয়ায়, বোধিবৃক্ষমূলে ভারতের নানা তীর্থস্থানের স্মৃতি আহরণে, ঐশ্বর্য মণ্ডিত ইংলণ্ডের, আমেরিকায়, ইউরোপের নানাদেশ ও মহানগরীর বিদগ্ধ সমাজে, বেদান্ত সমাজে বেদান্তধর্ম দর্শন প্রচারের কীর্তিতে ভাস্বর।

বেদান্ত প্রচার কালে অভেদানন্দ কখনও আত্মপ্রচার বা আত্মমহিমার আশ্রয় নেন নি। এমন কি পৃথিবীব্যাপী সংগঠন, বক্তৃতা, প্রচার কার্য ইত্যাদি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত ক'রে এবং যশের শিখরে নিজে আরোহণ করেও তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের একজন অনুগত সন্তান ও বিবেকানন্দের শেষ জীবিত গুরুভাই রূপে পরিচয় দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন "গুরুস্থান সকল তীর্থস্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।...ধর্ম অবলম্বন করে মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়। সমস্ত কাজের মধ্যে যদি ঈশ্বরের অনুভূতি ফুটে উঠে তবেই ধর্মজীবনের সার্থকতার প্রমাণ। নিজের দিব্য স্বরূপকে উপলব্ধি করার ফলে যে জ্ঞান হয় তারই নাম আত্মজ্ঞান; হীন সংস্কার ও পশুবৃত্তিকে সম্পূর্ণ জয় করার নামই আত্মসংযম। সুদীর্ঘ সাধনায় তাঁর এই সত্যের উপলব্ধি হয়েছিল যে ক্ষমা ব্যতীত মানুষ কখনও দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একাগ্রতা ব্যতীত কোন কার্যেই কৃতকার্যতা লাভ করা যায় না, ধর্ম জীবন মানে সমস্ত জীবনটাকে ঈশ্বরীয় ভাবে পূর্ণ করে ফেলা। এবং ব্রহ্মচর্যই সমস্ত জাতির উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ।"

পৃথিবীর সমস্ত দেশে ভারতের বেদবাণীকে প্রচার করে অভেদানন্দ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে বেদান্ত সমিতি গঠন করলেন, এবং দেশের তরুণ সমাজকে এই আহ্বান জানালেন "যাঁহারা বিশ্বাস করেন প্রাচীন ভারতের অঙ্কুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের মধ্যেই ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের উপাদান রহিয়াছে, যাঁহারা বিশ্বাস করেন এই পরাধীন পতিত জাতি পুনরায় স্বমহিমায় জাগ্রত হইয়া বিশ্বেশ্বরেণ্য হইবে, যাঁহারা বিশ্বাস করেন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াও মানব-মহত্ত্বের বেদীর উপর সকল ধর্মের, সকল মতের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর—তাঁহাদের সকলকেই বেদান্ত সমিতির ধর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্যে আহ্বান করিতেছি"। প্রতি বছরের ২রা অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দের জন্মদিবস। ঐ পুণ্য আবির্ভাবকে স্মরণ করে অভেদানন্দের অদ্বৈত স্বরূপ ও অমর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনকালে তাঁর সেই সঞ্জীবনী বাণীকে পুনরায় উচ্চারণ করি—"বাঙালী যুবক, নীরব কর্মী দেশসেবক, তুমি অনেক সহ্য করিয়াছ, অনেক দুঃখ সহিয়াছ। তুমি

অত্যাচারে নিশ্পিষ্ট নেতাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, দেশবাসীর নিকট অবজ্ঞাত, কাপুরুষের দ্বারা লাঞ্ছিত, মদান্ধ বিদেশীর বিষনিঃশ্বাসে জর্জরিত দেশের বুকে, সমাজের বুকে, পাপের, অন্যায়ের, বৈষম্যের অসংযত তাণ্ডবনৃত্য...

অগ্নিবেণুর তূর্যে প্রজ্বলিত হও।—লক্ষিত পাপ ও নির্লজ্জ সমাজকে একটি দুঃসহ উত্তর দাও। চতুর্দিকে কালের শুভচিহ্ন।"

মুক্তিলগ্ন

॥ অম্বাম্বিকা ॥

এক

উনিশ শতকের গোড়ার দিকের একটি কাহিনী। বীরভূমের এক মহকুমা শহরের খ্যাতনামা উকিল শিবনাথ সেনশর্মা বয়স পরিণত বয়সে মারা যান তখন তার একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র দেবাশীষ একজন প্রবীণ কৃতি অধ্যাপক। দেবাশীষের মাতৃবিয়োগ হয়েছিল পিতার মৃত্যুর বছর পাঁচেক আগে। স্ত্রী মীরা দেবী, একটি ছেলে সুমন ও একটি মেয়ে শুভ্রাকে নিয়ে ছিল দেবাশীষের একটি ছোট খাটো সুখী পরিবার। দেবাশীষ নিকটবর্তী জিলা সহরের একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধ্যাপনার কাজে ব্রতী ছিলেন। মীরাদেবী গ্রাজুয়েট, ধর্মশীলা, কোমল হৃদয়া মহিলা। কন্যা শুভ্রা তখন দশ বছরে পা দিয়েছে, পুত্র সুমন অষ্টমবর্ষীয় কিশোর।

অধ্যাপক দেবাশীষ একদিন সকাল বেলা ড্রইংরুমে বসে পড়াশুনা করছিলেন, এমন সময় মীরাদেবী একজন বিধবা মহিলাকে নিয়ে দেবাশীষের ঘরে প্রবেশ করেন। মহিলার সাথে ছিল ফুটফুটে সুন্দর চেহারার একটি এগারো বারো বছরের কিশোরী। মীরাদেবী ড্রইংরুমে ঢুকে চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন দেবাশীষ দেখতে পেয়ে বলে ওঠে "কিছু বলবে, মীরা"?

মীরাদেবী—হ্যাঁ, তাগো, কিছুদিন আগে আমার সাহায্যের জন্য একজন মহিলাকে রাখার কথা বলছিলে না? দেখে শুনে মনে হয় একে রাখলে ভালই হবে।"

দেবাশীষ স্মিত হাস্যে বলে "তথাস্তু, তোমার পছন্দ হলেই হোলো।" তারপর মহিলাটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে "আপনাদের বাসস্থান কোথায়? এর আগে আর কোথায়ও কাজ করেছিলেন?"

মহিলা বিমলাসুন্দরী কাঁদ কাঁদ স্বরে জবাব দেয় "বাবু, পাশের গ্রাম পলাশপুরে ঘোষ পাড়ায় আমাদের বাড়ী। কাজ আগে কোথাও করিনি, দরকারও হয়নি। কোনদিন দরকার হবে তাও ভাবিনি।"

দেবাশীষ কুণ্ঠিত হয়ে বলে "কি ব্যাপার খুলে বলুন তো।"

মীরাদেবী—আমি বলছি। ওর নাম বিমলা। এখানে এসেই বিমলা আমাকে সব কথা বলেছে। ওর স্বামী গোবিন্দ বিশ্বাসের একটা ভাল জামা কাপড়ের দোকান ছিল। তাতে ওদের কষ্টক্লেশেই দিন কাটতো। অভাব অনটন ছিল না। কিন্তু মাস তিনেক আগে মাত্র ১০ দিনের অসুখে ভুগে গোবিন্দ মারা যাওয়ায় ওরা ঘোর বিপদের মধ্যে পড়ে। দোকান বিক্রী করে হাজার দেড়েক টাকা পায়। এখন বসে বসে ঐ টাকা খরচ করলে কদিন চলবে? তাই কাজের সন্ধানে ঘুরছে মাসখানেক ধরে। ভাল কাজ পেলে দোকান

বিক্রীর টাকাটা ওর মেয়ের জন্য ব্যাংক বা পোষ্টাফিসে জমা রাখতে পারবে।"

দেবাশীষ—"বেশতো, ওকেই তাহলে রেখে যাও, মীরা। মাইনে মাসে ৩০ টাকা করে দেয়া যাবে।

মীরাদেবী—"ওর মেয়েটিকেও রাখতে হবে। মাকে ছেড়ে ও কোথায় গিয়ে আর থাকবে। ভারী মিষ্টি ও চতুর মেয়েটি।"

দেবাশীষ—"কি নাম তোমার, খুকু?"

শিশোরী—"আমার ডাকনাম অনু, ভাল নাম অনামিকা" বলে চটপট জবাব দেয়।

দেবাশীষ—"বেশ বেশ" বলে মেয়েটিকে কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর জানায়।

মীরাদেবী—"চল ভাই বিমলা, তোমাদের থাকার ঘরটা দেখিয়ে দেবো।" এই বলে মীরাদেবী বিমলা ও অনামিকাকে নিয়ে একতলার একটা মাঝারি আয়তনের পরিচ্ছন্ন ঘরে ঢুকে ওদের সব বেশিয়ে বুঝিয়ে দেন। ঘরে একখানা তক্তপোষ, একটা দেরাজ, ও এক সেট্ চেয়ার টেবিল দেয়া যাবে।

ঐদিন বিকাল বেলাই বিমলা অনামিকাকে নিয়ে নিজেদের গ্রামের বসতবাটিতে ফিরে যায়। পরের দিন বসতবাটি ও তৎসংলগ্ন জায়গাজমি ও গাছপালার সাময়িক ভোগ দখলের অধিকার মাসিক পঁচিশ টাকার বিনিময়ে প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের কাছে অর্পণ করে। বসতবাটির একখানা বড় ঘরে নিজেদের যাবতীয় আসবাব পত্র, থালা, বাসন ইত্যাদি গুছিয়ে জমা করে ঐ ঘরখানি তালা বন্ধ করে রাখা হয়। পরে প্রয়োজন হলে জিনিষগুলি সুযোগ সুবিধামত নিয়ে যাওয়া যাবে। মীরাদেবীর বাড়ীর কাজে যদি মন বসে যায় তবে তিনি শীঘ্র বসতবাটিতে ফিরবেন না এ ছিল বিমলার অভিপ্রায়।

বিমলার ভাল কাজ পাওয়া ও দেশ ত্যাগের কথা পাড়ার লোকেরা জানতে পারে। বহুদিনের সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত স্বামীর ঘর অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছেড়ে যেতে বিমলার মন বিষন্ন ও চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হচ্ছিল। পাড়ার ঘনিষ্ঠ মহিলারা বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে বিমলার বিদায় প্রস্তুতি দেখছিলেন। সকলের ঐকান্তিক অনুরোধে বিমলা বসতবাটিতে পুরো একদিন কাটিয়ে তৃতীয় দিন জামা কাপড় ভর্তি একটা বাক্স, বিছানা ও টুকিটাকী জিনিষে ভর্তি থলি নিয়ে নৌকাযোগে সপরিবার দেবাশীষের "নিরালা" বাড়ীতে চলে আসে এবং ঐদিনই নিজেদের ঘরখানি সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়।

বিমলার আসার পর মীরাদেবীর সংসার পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। দেবাশীষ কলেজের কাজ ও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রায় নিয়মিতভাবে প্রতিদিন খুব ভোর বেলা মীরা ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেবাশীষ বেশ কিছু সময়ের জন্য খোলা জায়গায় বেড়িয়ে আসে। তারপর ফিরে এসে প্রাতঃকৃত্য সেরে টিফিন খেয়ে যে যার কাজে লেগে যায়।

একতলার একখানা ঘর ঠাকুর ঘর হিসেবে সাজিয়ে নিয়েছিলেন মীরাদেবী। সেখানে শিব, কালী এবং আরও নানারকম দেবদেবী ও সাধু সন্তের ছবি রাখা হয়েছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মীরাদেবী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঠাকুর ঘরে সমবেত হয়ে স্তোত্রাদি পাঠ ও নানাটি ভক্তিমূলক গানে কিছু সময় কাটাতেন। যেদিন সম্ভব হোতো সেদিন দেবাশীষও এদের সাথে থাকতেন। এ কাজটি এদের অজোন্তে দাঁড়িয়েছিল। অনামিকা মীরাদেবীকে বলে ঠাকুরঘর ঝাড়পোছের কাজ হাতে নিয়েছিল। খুব ভোরে অনামিকা ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার জামা কাপড় পরে নিজেদের ফুলের বাগানে ঘুরে ঘিরে ফুল আহরণ করতো এবং তার বেশীর ভাগটা দিয়ে মালা গেঁথে দেবদেবীর ছবিতে ঝুলিয়ে দিয়ে প্রণাম করতো। এসব কাজে অনামিকার আনন্দের সীমা ছিল না। শুভ্রা সুবন যখন পড়াশুনায় থাকতো, অনামিকা ওদের কাছে গিয়ে বসতো এবং বলতো "আমারও পড়তে লিখতে খুব ইচ্ছা করে।" মীরাদেবী নিজে তা দেখতেন ও লেখাপড়ায় ওর আগ্রহের কথা ছেলেমেয়েদের কাছে শুনতেন।

মীরাদেবী একদিন বিমলাকে বললেন "ভাই বিমলা, অনামিকা একটু লিখতে পড়তে শিখুক এ আমার ইচ্ছে।

ওর বুদ্ধি আছে, মাথা আছে, ওকে কোন প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দেবো ভাবছি।"

বিমলা জবাব দেয় "দিদি, বেশী লেখাপড়া করলে আমাদের ছোট কায়েতের ঘরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া শক্ত হয়ে পড়বে।"

মীরাদেবী বলেন "বেশতো, ম্যাট্রিক, আই এ পাশ নাইবা করলো। কিন্তু মোটামুটি সাধারণ লেখাপড়া ওর করতেই হবে। আমাদের পাড়ায় যে প্রাইমারী স্কুল আছে ওখানে ওকে ভর্তি করে দেয়া যাক্।"

বিমলা সানন্দে জানায় "তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে দিদি।"

দেবাশীষের মত পেতে কোনই অসুবিধা হয় না। মীরাদেবী নিজেই একদিন অনামিকাকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়ে আসেন। খুব খুশী মনে অন্য কাজকর্মের সাথে পড়াশুনা আরম্ভ করে অনামিকা। অক্ষর ও বর্ণ পরিচয় অনামিকার আগেই ছিল। কাজেই মাসখানেক পরেই লিখতে পড়তে ভালভাবেই সক্ষম হয়। কারোর কাছে হয়ত কখনও অনামিকা শুনে থাকবে—"প্রতিদিন মা দুর্গা বা মা কালীর নাম ১০৮ বার ভক্তি-ভরে লিখে গেলে যে কোন লোকের মনস্কামনা পূর্ণ হয়"। তাই লিখতে শিখেই অনামিকা এই কাজটি গোপনে করতে থাকে। সারা দিন রাতে ফাঁকে ফাঁকে নাম লেখার কাজ সম্পন্ন হয়।

এই ভাবে মাসের পর মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। দেখতে দেখতে চার বছর কেটে যায়। অনামিকা উচ্চ প্রাইমারী ভালভাবে পাশ করেছে। মাঝিমা মীরাদেবীর কাছে মেশিনে সেলাইয়ের নানা কাজও বেশ শিখে নিয়েছে। এ ছাড়া স্বভাবে, অকপট আচরণে, কথাবার্তায়, বুদ্ধিতে এবং ঠাকুরদেবতার প্রতি সহজাত ভক্তি বিশ্বাসে অনামিকা হয়ে ওঠে অনন্যা।

ক্রমে উজ্জ্বল যৌবন নিয়ে অনামিকা যখন চৌদ্দ বছরে পা দেয় তখন থেকেই বিমলা ওর বিয়ের কথা ভাবে এবং চেষ্টায় লেগে যায়। মাস দুয়েক খোঁজ খবর নেবার পরে সব দিক থেকে বিচার করে সুপাত্রে কন্যার বিবাহ দিয়ে বিমলা সুন্দরী কন্যাদায় থেকে মুক্ত হন। বিয়ে মোটামুটি ঘটা করে অধ্যাপকের গৃহেই সম্পন্ন হয়। বিদেহতে মীরাদেবী অনামিকাকে অন্যান্য জিনিষের সাথে একটা ব্যবহৃত সেলাই কলও উপহার দেন। বিয়ের পর অনামিকা যখন হুগলী জেলার বীরগঞ্জ বন্দরের অধিবাসী স্বামী তিনকড়ি দাসের ঘর করতে চলে যায়, বিমলা সুন্দরী পাকাপাকিভাবে মীরাদেবীর আশ্রয়েই থেকে যেতে রাজী হয়।

অনামিকা ও তিনকড়িকে নিয়ে ভবিষ্যতে যে অপূর্ব কাহিনীর জয়লাভ হোলো এবং যে কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু, তা যে ঘটতে পারে তা জানতেন শুধু বিধাতাপুরুষ।

দুই

অধ্যাপকের গৃহে যখন সকন্যা বিমলাসুন্দরী প্রায় এক পরিবারভুক্ত হয়ে জীবন শুরু করেছিল তখন তিনকড়ি দাস ষোল বছরের যুবক। তিনকড়ি হুগলী জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের অধিবাসী মহিম দাসের একমাত্র ছেলে। মহিম দাসের সংসারে ছিল স্ত্রী কাত্যায়নী ও পুত্র তিনকড়ি। কৃষ্ণপুর বাজারের কাছেই ছিল মহিম দাসের বড় একটি মুদি দোকান। দোকানের বেশ কিছুটা দূরে ছিল মহিম দাসের বসতবাটি। উহার অনতিদূরে ছিল প্রাচীন জমিদার চৌধুরীদের বাড়ী। চৌধুরীদের অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাসাদোপম জীর্ণশীর্ণ অট্টালিকা। তারই একটা অংশ সংস্কার করে বসবাস করছিলেন বিলাসী, বেহিসাবী ও স্বল্পচরিত্র রমেন্দ্র চৌধুরী। গ্রাম হলেও কৃষ্ণপুর জায়গাটা বেশ উন্নত, বর্ধিষ্ণু ও জনবহুল ছিল।

আলোচ্য সময়ে তিনকড়ি স্থানীয় হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। তিনকড়ি পড়াশুনায় মেধার পরিচয় দিত এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগমোহন আচার্য্য মহাশয়ও ওর পড়াশুনার দিকে বেশ নজর রাখতেন কয়েক বছর থেকেই। পাছে ওর পড়াশুনায় বাধা পড়ে এজন্য মহিম দাস তিনকড়িকে পারতপক্ষে দোকানের কাজে তেমন টানতেন না। নীচের ক্লাশ থেকে শুরু করে

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিনকড়ির পড়াশুনা নির্বিঘ্নে হয়েছিল। কিন্তু নবম শ্রেণীতে ওঠার পরই নানা অন্তরায় দেখা দেয়। তখন পিতা মহিম দাসের দোকানের বেনাবেচার কাজ যেমন এক দিকে বেড়ে যায়, অন্যদিকে কাত্যায়নীর দেহে রোগের আক্রমণ দেখা দেয়। দোকানের কাজে বাবাকে সাহায্য করার জন্য তিনকড়ির লেখাপড়া ছাড়ার প্রয়োজন হয় এবং ঘর সংসারের কাজে অসুস্থা মায়ের সাহায্যের জন্য তিনকড়ির বিয়ের চিন্তা মহিম দাসকে ভাবিয়ে তোলে। স্কুল থেকে নাম কাটাতে গেলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগমোহনবাবু বলেছিলেন "তিনকড়ি, তুমি তোমাদের ক্লাসের একজন ভাল ছেলে, তোমার ভবিষ্যৎ ছিল উজ্জ্বল। তুমি পড়াশুনা ছেড়ে চলে যাচ্ছো এ খুব আক্ষেপের কথা।"

তিনকড়ি অম্লানবদনে জবাব দেয় "কি করবো স্যার, দোকানের কাজের চাপ বাবা আর একা বইতে পারছেন না। বিশ্বাসী লোকও পাওয়া যায় না। এদিকে বাড়ীতে মাও বেশ অসুস্থ। মা বাবার কষ্ট লাঘব করার চাইতে আমার কোন কাজই তো বড় নয়।"

জগমোহন বাবু তা শুনে বলেছিলেন "তোমার মা বাবার প্রতি ভক্তি ও কর্তব্যবোধে আমি খুবই খুশী হলাম। লেখাপড়া যা করেছো তাতে তুমি শিক্ষিত সমাজে সহজেই চলতে ফিরতে পারবে। শুভবুদ্ধি, বুদ্ধি, শ্রমনিষ্ঠা ও চরিত্রবল তোমার আছে। ভাগ্য-দেবতা তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস"।

এর বছর চারেক পরে অনামিকার সাথে তিনকড়ির বিয়ের হয়। অনামিকাকে বধূ হিসেবে পেয়ে সকলেই খুব খুশী হয়। মহিম দাস বিয়ের পর প্রথম আগমনের দিনই অনামিকাকে দেখে বলেছিল "সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী আমাদের সংসারে এসেছে, আর ভাবনা নেই। অনামিকা যে ভাগ্যবতী তা প্রমাণিত হয় কয়েক মাসের মধ্যেই। একদিকে মুদি দোকানের পসার বৃদ্ধি, অন্যদিকে গৃহে সব সময়ের জন্য একটা শান্ত, মধুর আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি তারই সাক্ষ্য দিয়েছিল।

বিয়ের বছর খানেক পরেই তিনকড়ির প্রথম সন্তান অমিলার জন্ম হয়। ফুটফুটে সুন্দরী নাতনীর আগমনে সংসারে একটা নূতন আনন্দের উৎস খুলে যায়। এই আনন্দ একটানা চলতে থাকে বছর চারেক ধরে। এর ভেতরে দ্বিতীয় সন্তান অমলা ও তৃতীয় ও কনিষ্ঠ সন্তান শান্তনুর জন্ম হয়। মহিম দাসের সংসার একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিধাতাপুরুষ তাঁর লীলা প্রকাশের জন্য দারুণ বিপর্যয় আনলেন এ সুখী পরিবারে মাত্র ছ'মাসের ব্যবধানে প্রথমে মা কাত্যায়নী ও পরে মহিম দাস মারা যান। পিতা-মাতার পারলৌকিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের জন্য দোকানে খাটাবার জন্য জমা টাকা তিনকড়ির খরচ করতে হয় এবং সে একরকম কপর্দকহীন হয়ে পড়ে।

প্রায় যুগপৎ মাতৃপিতৃবিয়োগে তিনকড়ি ও স্ত্রী অনামিকা তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। পাওনাদার মহাজনদের বকেয়া টাকার জন্য ক্রমাগত চাপ তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। কিন্তু ক্রেতা যাদের কাছে তার বেশ কিছু টাকা পাওনা ছিল, তাদের অনেকেই গা ঢাকা দেয়। কেহ কেহ আধিক অনটনের কথা বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কেউ কেউ আবার বাকী পাওনা টাকার কথা স্রেফ অস্বীকার করে বসে। হিসাবের খাতার সাক্ষ্য দেখিয়ে মামলা করে প্রাপ্য বাকী টাকা আদায়ের একটা উপায় থাকলেও অর্থের অভাবে ও ঝামেলার ভয়ে ভালমানুষ তিনকড়ি সে পথে যাওয়া সমীচীন মনে করে না। দোকানের সামান্য মজুদ মাল বিক্রী করে দেনা শোধ করেও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, কিন্তু তারপর? পাড়াপ্রতিবেশী লোকেরা তিনকড়িকে নানারকম বুদ্ধি ও কুবুদ্ধি দিতে থাকে। কেউ কেউ ভরসা দিয়ে বলে "চুপচাপ থাকো তিনকড়ি, পাওনাদারদের টাকা না দিলে ওরা কিছুই করতে পারবে না।" তিনকড়ি ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয় "তা হয় না, ওরা হয় মামলা করে, না হয় জোর জবরদস্তি করে টাকা আদায় করে নেবেই।

এমনরে প্রতিবেশী জমিদারপুত্র রঙ্গীন চৌধুরী উপযাচকভাবে একদিন সকালবেলা ৮টায় তিনকড়ির

বাড়ীতে এলে তিনকড়ি তাকে সম্ভ্রম অভ্যর্থনা জানিয়ে একটা চেয়ার এনে বাড়ীর দাওয়ায় বসতে দেয়। রথীন চৌধুরী কিছুক্ষণ মৌন থেকে করুণস্বরে বলে, "তিনকড়ি, পরম্পরের মুখ থেকে শুনলাম তুমি নানা কারণে দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছো। তোমার বাবা মা দুজনেই খুব ভাল লোক ছিলেন। হঠাৎ প্রায় একই সময় ওরা চলে না গেলে এ আর্থিক সংকটে তোমায় পড়তে হোতো না।" তিনকড়ি নির্লিপ্তের ভাব দেখিয়ে বলে "কি করব স্যার, কপালে যা আছে তাতো হবেই!" রথীন চৌধুরী "কপালের কথা বলে বসে থাকলে তো চলবে না! সংসার তো চালিয়ে যেতে হবে? বউমা আছেন, ছেলে মেয়েরা আছে।" ক্ষণকাল ভেবে ইতস্ততঃ করে রথীন চৌধুরী আবার বললো, "তিনকড়ি, আমি বলছি কি···তোমার দেনার টাকাটা আমি মিটিয়ে দিতে চাই। হাজার দেড় দুই হাজার টাকার ব্যাপার, ওতে আমার কিছু যাবে আসবে না।"

অনামিকা অদূরে ঘর ও বারান্দার মধ্যবর্তী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আধা ঘোমটার মুখ ঢেকে ওদের কথাবার্তা শুনছিলো। তিনকড়ি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তার চোখের অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত পেয়ে বললো, "মাপ করুন স্যার, ওতে তো দেনার দায় থেকেই যাবে।"

রথীন চৌধুরী আশ্চর্যের সুরে বলে "আচ্ছা, তিনকড়ি, ধর টাকাটা যদি তোমাকে এমনি দিয়ে দেই"। তিনকড়ি বলল, "তা হয় না স্যার, [ক্ষণকাল ভেবে] আর কোন্ স্বার্থে আপনি আমার জন্য অতগুলো টাকা ব্যয় করবেন?" অনামিকার চোখের ইঙ্গিত জমিদার পুত্রেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। অনামিকাকে লক্ষ্য করে রথীন চৌধুরী বলেন "বউমা, তোমারও কি একই মত? শেষে দেওয়া জিনিষ পায় ঠেলে ফেবে?" অনামিকা নিরুত্তর থাকে।

ঘনিষ্ঠতা জমানো এখানে সহজ হবে না উপলব্ধি করে দুর্বলচরিত্র জমিদার-পুত্র "আচ্ছা তোমরা যা ভাল বোঝো করো, তবে আমাকে একাবে ছোট করার দুঃসাহস তোমাদের কি করে হোলো ভেবে পাচ্ছিনা"—এই বলে উদ্যত দ্রুতক্ষেপে প্রস্থান করে।

জমিদার-পুত্র নিষ্ক্রান্ত হবার পর স্বামী-স্ত্রী কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। নীরবতা ভঙ্গ করে তিনকড়ি বলে ওঠে, কি করা যায় অনু?

অনামিকা—কি আর করবে, দোকান চালানোর সম্ভাবনা দেখছি না। মালপত্র বিক্রী করে দেনা তো শোধ করো।

তিনকড়ি—আচ্ছা অনু, রথীনবাবুর দেবে দেওয়া টাকাটা নিলে তো দোকান বিক্রী না করেও পারা যায়।

অনামিকা—ওকথা মুখেও এনোনা, ঠেকা বাবার কখনও ওর কাছ থেকে বাবা একটা টাকাও নেয়েছেন? ওর মতলব এতটুও ভাল নয়। টাকা দেওয়ার পরে কিছুদিন গেলেই নানা বায়নাক্কা আরম্ভ করবে।

তিনকড়ি—ঠিকই বলেছো অনু। ক্ষণকাল থেমে—আচ্ছা দেনা ছিল বাবার, ওটা শোধ না করলে ক্ষতি কি?

অনামিকা—কি যে বলো তার ঠিক নেই। পিতৃ ঋণ শোধ পুত্রের কর্তব্য। ওটা করায় পুণ্য নেই, না করলে পাপ আছে। আচ্ছা, বাবা মোটা টাকা রেখে গেলে তা আরামে ভোগ করতাম, আর দেনাটার বেলা আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই!

তিনকড়ি—আমায় ক্ষমা করো অনু, বড় অন্যায় কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে।

অনামিকা—তুমি যে মনে প্রাণে ওকথা বলোনি আমি জানি—আমাকে একটু পরীক্ষা করে নিলে, না?

তিনকড়ি—ওকথা ছেড়ে দাও। আচ্ছা অনু, দেনা শোধ তো করা যাবে মালপত্র বিক্রী করে। কিন্তু সংসার খরচ চালাবার কি করবে?

অনামিকা—অনিলা ও অমলার লেখাপড়াও আছে। স্কুল ছাড়িয়ে ওদের ঘরে বসিয়ে রাখা চলবে না।

তিনকড়ি—প্রফেসরের বাড়ীতে থেকে রোগে ধরেছে, বুঝতে পারছি।

অনামিকা—কি যে বলো। আমার পরম ভাগ্য যে জীবনের গোড়াতে শিক্ষিত পরিবেশে থেকে কিছু শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলাম।

তিনকড়ি—পড়াশুনা করতে না পারার দুঃখ আমার কি কম অন্ন!

অনামিকা—মা বাবার কথা ভেবে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিলে। ওঁদের আশীর্বাদ আমাদের অনেক ক্ষয় ক্ষতি পূরণ করে দেবে।

তিনকড়ি কিছু না বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

অনামিকা উৎসাহদীপ্ত চোখে সহাস্যে বলে, থাকো, তা হতাশ হবে লাভ নেই। একটা প্ল্যান আমার মাথায় এসেছে। আমার গয়না নেহাত কম নেই। এর অল্প কিছুটা বিক্রী করো, তাতে তিন চার মাস এদের লেখাপড়ার ও সংসার চালাবার খরচ মিটানো যাবে। এর ভেতরে চাকরীর চেষ্টা করো।...আর আমিও বসে থাকবো না।

তিনকড়ি—কি করবে শুনি। ঠাকুর দেবতার পূজা আরও একটু বেশী করে করবে, না?

অনামিকা—হ্যাঁ, তার সাথে ঘরে যাতে কিছু টাকা আসে তার জন্যও একটা ভদ্র কিছু কাজ করবো।

তিনকড়ি—কিছু বুঝতে পারছি না। থাকো অন্ন, তাগোর সাথে লড়াই করে কেউ কখনও এগোতে পারেনা।

অনামিকা—খুব পারে, শ্রম ও চেষ্টা করে গেলে অর্থাৎ পুরুষকার থাকলে দেবতা তুষ্ট হন, আর দেবতার কৃপায় অর্থাৎ দৈববলে অনেক কিছু পাওয়া যায় অপ্রত্যাশিত ভাবে।

তিনকড়ি—তুমি কি করে টাকা আয় করবে তা বলবে না অন্ন!

অনামিকা—যি বা রাঁধুনির কাজ অনেক মেয়েরা করতে বাধ্য হয়অর্থের চাহিদা মেটাতে। ও কাজগুলি আমি খারাপ মনে করি না। তবে এসব কাজে যাওয়া আমার দরকার হবে না।

তিনকড়ি—তবে?

অনামিকা—যথাসময় দেখতে পাবে। আপাততঃ কয়েকদিনের মধ্যে দোকানের মালপত্র বিক্রী করে দেনা শোধ করো, আর আমার কয়েকটা গহনা স্যাকরার দোকানে বিক্রী করে কিছু টাকার ব্যবস্থা করো।

তিনকড়ি—বেশ তাই করবো। আর এর পরে যদি আমার কাছে যাদের দেনা আছে তারা যদি স্বেচ্ছায় কিছু কিছু টাকা দেয় তাহলে তো খুব ভাল কথা। (ক্ষণকাল চিন্তা করে) হ্যাঁ অন্ন, একটা কথা, আমাদের বর্তমান আর্থিক সংকটের কথা তোমার মা বা প্রফেসরের স্ত্রী তোমার মাসিমার কাছে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানাবে না?

অনামিকা—তাঁদের কিছুই জানানো হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

তিন

মাস খানেক পরে। একদিন বিকালবেলা অনামিকাকে দেখা যায় সেলাই কলের কাছে গভীর আগ্রহে নিমগ্না। কলটি ও পেয়েছিল অধ্যাপক পত্নী মীরাদেবীর কাছ থেকে বিয়ের উপহার হিসেবে। সে জানতো এই জিনিষটিই এক সময় আর্থিক সঙ্কট থেকে একটা পরিবারকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে সাহায্য করবে। অনামিকা একমনে সেলাই কলের কাজ করছিল—পাশে স্তূপ করা ছিল কয়েকটি তৈরী ফ্রক, ট্রাউজার, সাদা সেমিজ; একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা কতগুলি ছিটের কাপড় চৌকির উপর রেখে বলল—দিদিমণি, তোমার কপাল ভাল বলতি হবে, আজ তোমার ও টাকা আর ফেলো, নাও।

অনামিকা বিস্ময়-ভরা চোখে বললো এতো ছিটের কাপড়! কি ব্যাপার বিনুর মা?

বিনুর মা—আর বলো কেনে দিদিমণি। তোমাকে কাজ দিবার জন্য সবাই ব্যস্ত। এর ওর কাছ থেকে অনেকে জানতে পারছে তোমার কাটিং ও সেলাই খুব ভালো। ঘোষ গিন্নী ও চৌধুরী বাড়ীর নতুন বউ আবার ছিটের কাপড় দিয়েছে, ফ্রক সেমিজ তৈরীর জন্য। মাপ জোপ ওরা লিখে দিয়েছে, এই নাও।

অনামিকা—খুব ভাল কথা বিনুর মা, বলে স্মিত হাসি হাসলো। অনামিকা বুঝলো স্বামীর চাকুরী পেতে বেশ কিছু দেরী হলেও সংসার খরচ ও ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যয় মেটানোতে খুব বেগ পেতে হবে না।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, পক্ষকাল অতিক্রান্ত হয়। অনামিকার সেলাইয়ের কাজ এবং তৎসঙ্গের আয়ের

অবটা ক্রমে বাড়তে থাকে। অনামিকা বিশুর মাকে ইজার, প্যাণ্ট ফ্রক প্রভৃতি বানানো শিখিয়ে নেওয়ায় বেশী কাজের অর্ডার নিতে অসুবিধা হয় নি।

এদিকে অনেক ঘোরাঘুরি করেও তিনকড়ি সুবিধামত কোন আফিসে কাজ কর্ম জোটাতে পারেনি। এ ব্যাপারে জমিদার-পুত্র রথীন চৌধুরীর হাত ছিল বলে তিনকড়ির মনে সন্দেহ জাগে। কেননা মহকুমা ও জিলা সহরের অনেক প্রতিষ্ঠানে বা আফিসে রথীন চৌধুরীর একটা আধিপত্য ছিল। আর্থিক ও চারিত্রিক দৈন্য থাকলেও বংশকৌলীন্য এ ব্যাপারে তার সহায় ছিল।

খাটবার ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে কাজের অভাব হয় না আর বিভিন্ন রকম কাজের প্রাচুর্যের স্থান হলো কলকাতা। তাই কলকাতা আসার কথা ভাবে তিনকড়ি। এ ব্যাপারে স্ত্রী অনামিকার অনুমোদন ও উৎসাহের কথায় সে মনে বেশ বল পায়। কলকাতা যাত্রার কয়েকদিন আগে মাস দেড়েকের খাওয়া খাওয়ার উপযুক্ত টাকা তিনকড়ির হাতে দিয়ে বলে "তোমার ক্ষমতা মত যে কোন কাজ পাবে তাই নেবে, তবে যার অধীনে কাজ করবে তার ব্যবহার খারাপ হলে তখনি কাজ ছেড়ে অন্য কাজের জোগাড় করবে। চুরি প্রতারণা, ফাঁকির ব্যাপার না থাকলে কোন কাজই অসম্মানের ভেবে পেছপা হবে না।"

তিনকড়ি—আমি চলে গেলে, সব রকম দায় দায়িত্ব তোমার একার উপর পড়বে এ ভেবে আমি একটু বিব্রত বোধ করছি, অনু।

অনামিকা—তোমায় কিছু ভাবতে হবে না তোমার স্বামী ভাল মাইনের কাজ পেতে ৩।৪ মাস দেরী হলেও এদিকে কোন অসুবিধা হবে না। আমি সব চালিয়ে নেবো।

এর পরে ভাল একটা দিন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

অনামিকা তারপর প্রবল উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে ঘরের কাজে আত্মনিয়োগ করে। রান্নাবান্না ঘর গৃহস্থালীর কাজ ছাড়া ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার তদারকী এবং দৈনন্দিন সেলাইয়ের কাজ নিয়মিত ভাবে চলতে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কিছু সময়ের জন্য ঠাকুর ঘরে গিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনার পবিত্র কাজটিও বাদ পড়ে না। অভাব অনটনের সংসারে কর্মনিষ্ঠা, ধর্মচর্যা ও আদর্শ শৃঙ্খলার গুণে সব সময় একটা শান্তি ও আনন্দের পরিবেশ বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৭২)

গৌরসুন্দর, তুমি আপনার মাঝে আপনি-হারা, আপনার লাগি আপনি তুমি সারা জীবন কাঁদিয়া গেলে, কখনও 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' কখনও বা 'অয় রাধে', 'অয় রাধে' বলিয়া ধরার ধূলায় লুটাইলে। তোমাকেই নিত্যগোপালরূপে পাইলাম। স্বরূপ সেখানে বিশ্বরূপের প্রেমে, বিশ্বরূপ স্বরূপের প্রেমে বিভোর। আমার স্বরূপ বিশ্বরূপ সমন্বয় হউক তোমার স্মরণে। ধরা কাঁদে গোলোকের জন্য, গোলোক কাঁদে ধরার জন্য, জড় অজড়ের জন্য, অজড় জড়ের জন্য। এই কান্নার উপর এই বিশ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কান্না বুকে লইয়া জীব জগৎ ছুটিয়াছে। বিশ্বজোড়া এই কান্নার মূর্ত বিগ্রহ তুমি। আমার জীবনে তোমার সমাধান মধুর প্রকাশ সার্থক হউক। আসন করি

৮০ বার। মটার পর বিজয় সরকার আসে। ইহার পূর্বে বেণু প্রেমে যায়।... সুন্দরী রাধুনীকে কাল বিদায় দেওয়া হইয়াছে। সব মানুষই মতলবী। সেবাবৃত্তি মুছিয়া গিয়াছে কেবল দাসী। ৪টার পর মঠে যাই। টিনের চালার কাজ চলিতেছে। সব শুদ্ধ টাকা লাগিবে। 'নিগুর্ণ ব্রাহ্মির সংসঙ্গ' হইতে আসিয়াছিল গুরু নানকের জন্ম উপলক্ষে মঠে একদিন উৎসব করিবার অনুমতি নিবার জন্য। মঠের পক্ষ হইতে ঐরূপ দিতে অর্থাৎ আমরাই গুরু নানকের উৎসব করিতেছি এইরূপ ধারণা নিয়া দিতে গণেনবাবুর আপত্তি। মহম্মদের উৎসব করিব, মুসলমানরা আসিবে না, হিন্দুরাই যোগ দিবে—ইহাতে তাহার খুব আপত্তি। ইহা হইল হিন্দুসভা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যুক্তি। তিনি বলেন, ইহা মুসলমানদের তোষাজ করা। 'প্রণব' পত্রিকা এইরূপ সমালোচনা করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি নিতান্ত সোজা মানুষ, অভিসন্ধির গন্ধ যাহার নাই—তিনিও কি তোষাজ করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে একদিন মুসলমানদের মত কাপড় পরিয়া 'আল্লা' 'আল্লা' বলিয়া সাধন করিয়াছিলেন? মুসলমানেরা সাধারণতঃ সমন্বয় মানে না। আমিও কি তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া গোড়া সাম্প্রদায়িক হইব? গণেনবাবুদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করা যায় না। ঠাকুরের যে মুসলমান শিষ্যও ছিল, আজ পর্যন্ত তিনি তাহা জানেন না। দাশরথীবাবুও এই দলের। ৮।৯০ টার পর আসি। মিহু রান্না করে।

৯ই সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, তুমি সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা—সকল ভূতের আত্মভূত অর্থাৎ আত্মতুল্য হইতেছে তোমার আত্মা অর্থাৎ দেহ স্বভাব লীলা প্রভৃতি। তুমি অশান্ত বিশ্বের শান্ত মূর্ত্তি—মহা মৈত্রী, মহামুদিতা, মহাকরুণা ও মহা উপেক্ষা মূর্ত্তি। তোমার জড়ে মৈত্রী, অজড়ে মৈত্রী, চৈতন্যে মৈত্রী, অচৈতন্যে মৈত্রী, নিত্যে মৈত্রী, অনিত্যে মৈত্রী। বিশ্বের এত বড় মিত্রকে আছে তুমি ছাড়া? একমাত্র একবার মাত্র বিশ্ব বৃন্দাবনে এই 'মিত্র'-কে দেখিয়াছিলেন। আর আজ তুমি মিত্র। তুমি বিশ্ব-সংগঠনের বীজমন্ত্র নিয়া আসিয়াছ, বিশ্বসংগঠনের মন্ত্রমূর্ত্তি তুমি। তোমার চরণতলে world federation গড়িয়া উঠিবে, সর্বজাতি সমন্বয় তোমারই চরণতলে সার্থক হইবে। আসন করি। কাল হইতে গরমের দাইসেসিয়া ৩× খাওয়ার পর বেণুর ঠোঁটের ফোড়া কাটিয়া যায়।...বেণু বৈকালে আনন্দ-বাজার ও যুগান্তরে আগামী রবিবারে গীবেনবাবুর 'বিষ্ণুর চরিত' পাঠের বিজ্ঞপ্তি ও গত রবিবারের রাধাষ্টমী দিনের বক্তৃতার বিবরণ দিয়া আসে....৮টায় বি, কে, পাল আসেন। সচ্চিদানন্দের সঙ্গে সত্ত্ব-রজ-তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতির কি সম্পর্ক এই প্রশ্ন করেন। সত্তার সত্তার ঠোকাঠুকি, জ্ঞান ও আনন্দের মাত্রার মধ্যে দ্বন্দ্ব—ইহাই হইল সগুণ প্রকৃতি। আর যেখানে সব কিছুর সমন্বয় তাহাকেই নাম সচ্চিদানন্দ। নিগুর্ণতার অর্থ সর্বগুণের সমন্বয়—'প্রকাশক প্রবৃত্তিক' শ্লোক ব্যাখ্যা করি। Part ও whole দুই-ই means ও end। নিগুর্ণ সগুণ পরস্পরের means ও end। Mechanism ও organism-এর পার্থক্য এই যে mechanism-এ part whole-এর অধীন, organism-এ কিন্তু দুই-ই দুইয়ের অপেক্ষা রাখে। অংশের মাঝে যাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ, তিনিই সত্য বাস্তব সচ্চিদানন্দ। Truth-in-itself ও truth-for-us-এর আলোচনা হয়। কৌশিকের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। ৯।৯০টার পর যান। ১০৲ টাকা রাখিয়া যান।

১০ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি অযাচিত করুণায় আমার জীবনের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। আমার ভিখারীর রাজা, রাজাধিরাজ, আমার দেহপ্রাণমন 'যেই তুলসী তিল' তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম, বুঝিয়া লহ সব। তুমি আমাকে চাও, আমাকে তুমি ডাকিয়াছ। তোমার চাওয়া আমার জীবনে সফল হউক। তোমার চাওয়ার মত আমি গড়িয়া উঠি। আমার আর কি কাম্য? তুমি আমাকে চাও, হে অনন্ত ইহার চেয়ে আমার আর কি গর্ব থাকিতে পারে? আমি তোমার, তুমি আমার—তুমি আমি, আমি তুমি—ইহাই আমার জপ-মন্ত্র। আসন করি (৮০ বার পা উঠাইয়া নামাইয়া)।...বৃন্দাবন বক্স প্রচার

সমিতির সংযোজক আশুতোষ সিনেট হলে বিনোবাজীর অন্তর্দিন উপলক্ষে আহূত সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ জানায়। স্বীকার করি। অতুলের মারফত তারিণীবাবুকে আসিতে বলি। ৬টায় তারিণীবাবু আসেন ৪০ টায় মোটর আসে। আমরা বওয়ানা হই। তখন সভার কাজ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সভাপতি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে বলে রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, পরে বিজয়সিং নাহার, পরে সুধীর লাহা, আমি, পরে সভাপতি। লোক ৪০০-র বেশী হয় নাই। নিতাগোপাল—দর্শনে ও জীবনে একখানি বিজয়লাল, অপর একখানি বিজয়সিং নাহার, আর একখানি সর্বোদয় লাইব্রেরীতে, আর এক হাইকোর্টের এ্যাডভোকেটকে। ধরার ভার হরণ কিংবা মাটির মুক্তিদানই ভূদান যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য। ৫ হাজার বৎসর পূর্বে গোবর্ধনের যে শীর্ষ বপন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই বর্তমান যুগে মহাত্মাজী ও তাঁহার সেবক বিনোবাজীর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রাণ-সাধক ভারত কম্যুনিজমকে পরিপাক করিবে নিজ culture-এর মধ্যে। কোনও ism-এ, কোনও ব্লকে সে যোগদান করিবে না, ধনিক ও শ্রমিক দুই-ই মানুষের উপাধি, দুই-ই গোটা সমাজের অর্ধেক। কেউ-ই সমগ্র সমাজ নয়। সমগ্র সমাজ দুইয়ের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিবে। ধনিক শোষণ সাধুতা করিয়াছেন, রাজা করিয়াছে, শ্রমিক প্রজাও করিতেছে। Decentralisation শ্রীকৃষ্ণের শোষণধর্ম। ধন ও শ্রম দুই-ই বিকেন্দ্রীভূত হইলে তাহা শক্তি। না হইলে 'এক লক্ষ পুত্র, আর সওয়া লক্ষ নাতি'-র মত মরণ আসিবে। 'মা গৃধঃ কস্যচিৎ ধনম্'। গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। ২ দিন মঠে যাওয়া হয় না।

১২ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া কলিকাতার বুকে দাঁড়াইবার মত সুযোগ দেও। সর্ব সমস্যার সমাধান তুমি। তুমি ছাড়া এ বিশ্ব বাঁচিতে পারে না। প্রলয় পয়োধি জলে ডুবিয়া যাইবার জন্য এই পরিবার সমাজ রাষ্ট্র প্রস্তুত হইতেছে। তুমি বেদ ও জীবন লইয়া দাঁড়াইয়া আছ বিশ্বের ত্রাণকর্তা রূপে নূতন বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য। যতদিন না তোমার জড় অজড় সমন্বিত বেদ ও জীবন বিশ্ব রাজমনোরথে বরণ করিতেছে ততদিন এই জাজন ঠেকাইবে কে? কে এই মরণের মাঝ হইতে বিশ্বকে বাঁচাইবে? জড়-অজড়ের দ্বন্দ্বই সকল দুর্নীতির, সকল মরণের মূল। জড় অজড় সমন্বয়ের মুকুটে নবীন জীবন্ত সমগ্র পুরুষোত্তম বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে। তোমাকে বুকে লইয়া আমাকে ঝড়ের মত ছুটিতে দেও। ৯০ বার আসন করি। ৯।০টার পর জগন্নাথ ভট্টাচার্য পণ্ডিতিয়া রোড, (মাষ্টার) আসেন। তিনি নিবন্ধে ভক্তি-অবতারের সঙ্গে identify করিতে চান, ভক্তির বাণী (?) করিতে চান। ১১টা পর্যন্ত আলোচনা (এরূপ তর্কই) চলে। অনেক রকম মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ৪টার পর আমি অতুল দাস, গোপা ও রেণু মঠের উদ্দেশ্যে বাহির হই। রেণু কিছু বাসে গেলে যায়। আমরা মঠে যাই। ৪।০টার পর ধীরেনবাবুর মহাভারত পাঠ সুরু হয়। তাহার পূর্বে পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষের সঙ্গে 'ব্রজলীলা'র তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মথুরা ও দ্বারকা-লীলার পিছনে রহিয়াছে ব্রজের দর্শন—শোষণ দার্শনিক দিক (উপাখ্যান দ্বারা)। ব্রজলীলার স্পষ্ট, ব্যুরোক্রাটিক দেবতার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লড়াই। কালীয় দমন ও গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতির মধ্যে রহিয়াছে জড়ের মূল্য প্রতিষ্ঠার দর্শন। রাসলীলার সেই মূল্য আস্বাদন। যুবতীশতদ্বারা আক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন, তাহার ছবি আছে রাসলীলায়। 'চড়ি গোপী-মনোরথে মন্মথের মন মথে'—রাসলীলার মধ্যে মন্মথের মন মথিত করিবার কৌশল নিহিত রহিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির গূঢ়তম প্রদেশস্থিত এই মন্মথের দিবা রূপান্তর সম্ভব হইল ব্রজধামে। ৬।০টায় পাঠ শেষ হয়। আগামী রবিবার পূর্ণেন্দুবাবু ভাগবত ধর্ম পাঠ করিবেন-ঘোষণা করা হইল। তাহার পরের রবিবার ধীরেনবাবু পাঠ করিবেন। মন্দিরে প্রবেশ লইয়া কাল খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।

১২ই সেপ্টেম্বর

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৭৯)

২১, ২, ১৯৫৭।...শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনের ভিতরে যদি আমরা ডুবে যেতে পারি, সেইখানেই আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারি—যার যা স্বরূপ সেই স্বরূপের আস্বাদন পেলেই সে সুস্থ হতে পারে নদী সুস্থ হয় সাগরকে পেয়ে—নিত্যগোপাল-সাগরকে আমরা যতটুকু পেতে পারব—ততটুকু সুস্থ থাকব।...গীতা বলছেন 'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ'—যজ্ঞের অবশিষ্ট খেলে পাপ থেকে দেহ-রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সেবাবুদ্ধি—বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের সেবাবুদ্ধিতে কৃত কর্ম যজ্ঞ—আর যা আমার বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত আসক্তি-বিদ্বেষে কৃত তা যজ্ঞ নয়—বাইরে থেকে তার চেহারা ভাই-ই হোক দেহের equilibrium disturbed হলেই রোগ হয় পাপ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা, বিশ্ব-যজ্ঞের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়াই পাপ।...আনন্দ সব শেষ কথা—আমার বিচ্ছিন্ন আমিত্বের আনন্দ নয়—বিশ্বের সঙ্গে যোগে যা সত্য ও কল্যাণময় তার থেকে উদ্ভূত আনন্দ ...যজ্ঞের অর্থ নিজেকে আহুতি দেওয়া—স্বরূপে স্থিত হওয়া।...নিত্যগোপালকে যতখানি আপনার করতে পারব, ততখানি সুস্থ হব। তাঁর মধ্যে নিজেকে ঘুচে যেতে-রূপ যজ্ঞের পর অবশিষ্ট থাকে আমার সত্যিকার আমি...। বিশ্বরূপের মধ্যে মিলিয়ে গেলে, নিজেকে তাঁকে আহুতি দিলেই তিনি আবার তা ফিরিয়ে দেন—তা-ই হল প্রসাদ...। উজ্জ্বল ভারত একটা উজ্জ্বল বিশ্বের ছবি দিতে চাইছে...। তোমার কই পিং মাগুর হয়, কইমাছ হয় না। অপরিচ্ছিন্ন, উদার, বিরাট গভীর যার কর্ম জ্ঞান প্রেম—সে তো মহা যজ্ঞ—উপনিষদ এই রকম ভক্তকে মহাযজ্ঞ বলেছেন...। বিরাট বিশ্বের মাঝে দাঁড়িয়েছি...গড়ে তুলব—নূতন জীবন-চেতনা দিয়ে নূতন সমাজ—যেখানে মানুষ মুক্ত ও মুক্ত উভয়ই ...তাঁর সঙ্গে যতই যুক্ত, ততই আনন্দ... মাটির সঙ্গে বৃক্ষ যতই যুক্ত, ততই সে সার্থক...। তিনি আছেন—তাঁর এই আকাশের সঙ্গে যতখানি আমি যুক্ত, ততখানি আমার আনন্দ...আমি পুরুষোত্তম...তুমি আমি, আমি তুমি...এইখানে, এই পুরুষোত্তম হওয়ার মধ্যে মানুষের পরিপূর্ণ সুস্থতা...। মরণোন্মুখ জাতিকে এই সুস্থতার কাহিনী শুনাবার পাগলামি নিয়ে নরনারায়ণ আশ্রমকে নিয়ে চলেছি...। নিত্যগোপাল, তুমি সুন্দর... সকল মহাকাব্যের তুমি নায়ক,...আমার দুর্জয় আশাকে সফল করো...। তোমার জয় কি টেনে তুলব—এই অভয় মন্ত্রে আমি অভয় হব।...তিনি এসেছেন, আমার সুস্থতার সাগর, আমার শান্তিনাথ...। মানুষে মন্ত্র প্রচার করব...। নিত্যগোপাল, তুমি আসিয়াছ—তুমি আসিয়াই আছ...। তোমার আসাতে ধরার ধূলি হবে ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম-মানুষ।...শুনেছে তোমারি নাম অনাথ আতুরজনে, এসেছে তোমারি দ্বারে দুঃখ ফেরে না যেন...। জগন্নাথ, নিত্যগোপাল...বিরাটের ভিতরে, বিশ্বের মধ্যে মহা মহত্তের মত বিচরণ করে আমরা বিশ্বকে নবীন বলে বরণ করব।...নিত্যগোপাল, নিত্য-গোপাল..।

২০, ২, ৫৭। শ্রীনিত্যগোপাল সব মানুষের মধ্যে এমনই একজন মানুষ যার নাম নিলে সকলের নাম নেওয়া যায়, যার মধ্যে প্রবেশ করলে সকলের মধ্যে প্রবেশ করা যায়।...তাইতে ইচ্ছা হয় তাঁর নাম নেই।... তাঁর এমনই একটী জীবন যে জীবনে নিষ্ঠুরতাও বরণ, উদারতাও বরণ।...নিত্যগোপাল তথাকথিত দুঃখ

ভাল মানুষ ছিলেন না।···আমাদের যারা ভাল মানুষ তারা নিজেরা ঠকে···সেজন্য রাসেল লিখছেন how good men do harm...। কৃষ্ণই নিতাগোপাল আমি বিশ্বাস করি'...কোন্ কৌশলে চললে ব্যক্তি-জীবনে মুক্তি আর আনন্দ দুই-ই মেলে, কোন্ কৌশলে চললে সংসার গুছিয়ে করা যায়...লোক ছিল এক একটা পরিবারকে তাই শোষণ করব। কিন্তু পারলাম না···। আমিও শোষণ করব না, তোমাকেও শোষণ করতে দেব না...। Live and let live চক্ষু লজ্জায় মানুষ যখন শোষিত হয়, তখন সে চক্ষুলজ্জা পাপ।...মানুষের সঙ্গে ভালমানুষী করতে গেলেই তারা পেয়ে বসে।...পরিশেষে 'Little brothers of the poor'...সেবা করে, সে বাড়ীর লোক ঘুমায়···মানুষ সুযোগ পেলেই সুযোগ নেয়। শেষে নিয়ম হল তোমরা সেবা করতে করতে ক্লান্ত হলে আমরা করব।···খানিকটা কিছু না করলে এই জন্য গভর্ণমেণ্ট টাকা দেয় না।... গেল বছর এখানে যখন প্লাবন হল আমাদের জলের কল দিলাম বহু পরিবারকে...চল্লিশ দিনের কম নয়...কিন্তু জল যখন শুখাল, বললাম এইবার তোমাদের ব্যবস্থা কর...তখনই তারা কেপে গেল···তারা চায় কোন ছন্দ না রেখে তাদের খেয়ালখুশীমত ব্যবহার করতে···। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু···একথা সাধারণ মানুষ মানতে পারে না।...ভালমানুষ হবো, কিন্তু এমন ভাল মানুষ হবো না যাতে লাথনা আসে...শেষে আবুহোসেনের মত বলতে না হয় সুসময়ে ছিল যারা অসময়ে ফেলে গেছে।···এইখানে নিতাগোপালের শিক্ষার প্রয়োজন।··· আমি দিতে প্রস্তুত—যোগ্য হয়ে নিয়ো···। কৃপাই কি থাকে, যদি সে কৃপা ধরে রাখবার মত যোগ্যতা না থাকে?...নেহরুকে এই জন্য ভাল লাগে...কোন ব্লকে নেই...সমস্ত পৃথিবী এক রকম বিরোধী···কি বিপ্লব...! স্ত্রী নিয়ে থাকাও চলবে না, না নিয়ে থাকাও চলবে না... সমস্ত সম্পর্ককে recast করে নিতে হবে'...নিত্য-গোপাল, কি সোনার মানুষ তুমি···তোমার তো আদর যত্ন করতে পারলাম না···।···তোমাকে নিলে মানুষ আজ যে এই অর্থহীন ধর্মহীন ক্লেদপূর্ণ জীবন যাপন করছে, সে অবস্থা থেকে মুক্তি পেত। নিতাগোপাল, মানুষকে মানুষ করে যাও...' সেই কুচবিহার থেকে আজ একজন এসেছেন—সতীশ পাল মশায়। তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানাই। নিতাগোপাল, তোমার তত্ত্ব আমায় পাগল করেছে···যতদিন এ তত্ত্ব মানুষের কাছে পৌঁছে না দিতে পারি ততদিন আমার শান্তি নেই, আনন্দ নেই···। মানুষ ধর্মে অর্থে কামে মোক্ষে মানুষ হোক।···নিতাগোপাল... যুগে যুগে তুমি গোপাল—তুমি ধর্মপাল, তুমি বিশ্বপাল—তোমার জয় হোক···তোমার আসাতে ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ।···

২৫. ২, ৫৭।···গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মমত প্রচার করে গেছেন, শ্রীনিতাগোপাল সেই মত আজ কার্যক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্রয়োগের দিব্য কৌশল রেখে গেছেন।···'যৎ করোষি যদশ্নাসি···'—সব আমায় দিয়ে করো, যেমন করে করলে আমার কাছে পৌঁছয় তেমন করে করো।...সব কথা আমার কাছে পৌঁছয় না—সেবাবুদ্ধিতে করলেই শুধু তা আমি নিতে পারি।··· যা কিছু করার এই 'রকম', এই 'কৌশল' যদি আমরা মানতে পারি, তাহলে এইখানেই তাঁকে পাব—তাহলেই মুক্তি আর আনন্দ একই সঙ্গে পাব।···কেন এই ভাগবতে তিনি বললেন?—

'প্রায়েণ অল্পায়ুষ সভ্যঃ কলৌবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দা সুমন্দমতয়ঃ মন্দভাগ্যা হি উপদ্রুতাঃ॥

···সব জায়গায় উপদ্রুত...এ যেন কলিযুগের মানুষের পক্ষে পথ কি? ৮টায় অফিসে বেড়িয়ে রাত ৭টায় ঘরে ফেরার মতের মানুষের সাধনা কি হতে পারে? তাদের পক্ষে কি 'হোম' সম্ভব? যজ্ঞ সম্ভব?···অথচ ভগবানকে তো বাদ দেওয়া চলবে না...। তাই যৎ করোষি যদশ্নাসি···মদর্পণম্-এর বন্দোবস্ত শ্রীকৃষ্ণ করেছেন। আজকের দৈনন্দিন জীবনও চলে না যে কাজগুলি না করলে সেই কাজগুলিকে তুমি তাঁর জন্য কর, তাঁর কাজ যাতে হয় তেমন করে করো।···সারাদিন খাটার পরে জপের সময়, বই পড়ার সময় নেই—ঐ শ্লোকের টীকায়

মধুসূদন সরস্বতী (তিনি বাঙ্গালী ছিলেন—বরিশাল না ফরিদপুরে দেশ) বললেন—ন তু পুথক্‌ত্বপ্যাপারঃ এব করণীয়ঃ। সেবাবুদ্ধির কর্মই তখন হয়। ইংরেজীতে God (Ref ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী) এর উচ্চারণে G-জি, O-ও, D-ডি—গড্‌ হয়—অক্ষরের উচ্চারণ আর শব্দের উচ্চারণ পৃথক। সংস্কৃতে অক্ষরের উচ্চারণও যা, শব্দের উচ্চারণও তা, পৃথক ব্যাপার নয়। পুরুষো বৈ মা ন ক্ষ—অক্ষর পড়ে গেলেই শব্দ হয়।—এই কথাই আমি বলছি—এই বলতেই মানুষের সাথে আমার বিরোধ লেগে গেল। মানুষ তার বিচ্ছিন্ন আসক্তি বিদ্বেষে কাজ করে—আমি যদি নিত্যগোপালের প্রেমের টানে কর্ম করি—তাঁর সংসার-বুদ্ধিতে কর্ম করি—তাঁর সংসার রক্ষার দায় তোমার আছে—সেই বুদ্ধিতে কর্ম কর। সারাদিনের যে কোন কর্মই এমনভাবে কর যাতে তিনি তা পান। বই পড়ে এ তত্ত্ব পাইনি। পেয়েছি শ্রীনিত্যগোপালের আশীর্বাদে।.....বসুধৈব হচ্ছে বিশ্বজনীনতা.....আমার থেকেও তোমাদের কম পড়তে হতো—আমি কত সহজ করে তোমাদের কাছে সব জিনিষটা বাংলা ভাষায় তুলে ধরেছি—নিত্যগোপাল আমাকে এত বিশ্লেষণ করে দিয়ে যান নি—বাইরে থেকে দেন নি—অন্তরের মধ্যে সবই বুঝিয়ে দিয়েছেন। পুরুষোত্তমের প্রসাদ বিমলাকে দিলে মহাপ্রসাদ—ভক্তকে দিলে মহা মহাপ্রসাদ। তেমনি নিত্যগোপালের প্রসাদ আমার মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। .....আমার কর্ম দেখ—বরিশাল হিতৈষীর পাতা খুলে দেখ—আমার অতীত দিনের কর্ম, আমার আজকের কর্ম আর আমার ভবিষ্যতের কর্মে মিল আছে।...গোবিন্দের সেবায় কর্ম করলে ভবিষ্যৎ কোনদিন কিছুতেই নষ্ট হতে পারে না। সার্বজনীনতা আমাদের সব চেয়ে বড় কথা...। আমরা এখানে ১১ জন এমনভাবে চলব যাব যাতে ১১ জনের স্বার্থ বজায় থাকে।.....যুক্তাহার হলো—সময়মতো খাওয়া, ভবিষ্যতে অসুখ হয়ে না পড়ি সেইভাবে খাওয়া...যেদিন থেকে আমার বাক্য তোমার দিয়েছি সেদিন থেকে আমার বাক্য আবোল তাবোল বকে না,...হাত পা চক্ষু কর্ণ—কোনটাই বেতালে চলে না।...কিন্তু মুগ্ধ করে তো হয় না—বুকের মধ্যে প্রেরণা না পেলে কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে কর্ম করা কি সম্ভব? নিত্য-গোপাল-কেন্দ্রত্ব যদি বুকের মধ্যে না আসে মুগ্ধ করে কি অন্তরঙ্গ বস্তুকে ধরে রাখা যায়?...নিত্যগোপাল তো আমার জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। আমি এমন করে চলব না যাতে আর একজনের উপর চাপ পড়ে, আমি এমন দাবী করব না যাতে অন্যের স্বার্থ হানি হয়...গুছিয়ে চলার নাম শৃঙ্খলা, শৃঙ্খলার নাম সন্ন্যাস।...একলা না খাওয়ার নাম সন্ন্যাস, না খাওয়াটাই সন্ন্যাস নয়।...হয়তো তোমার দেহের প্রয়োজনে বেশী খাওয়ার প্রয়োজন আছে—সেটাও সরলকে বুঝতে হয়।... ছন্দ-বোধ-ই হচ্ছে আজকের দিনের জীবন-চলার পথ—তোমার ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন আসক্তি-বিদ্বেষের চিত্তে ছন্দ-বোধ আসবে কোথা থেকে?...অহংকার নিয়ে চললে, সকলের সঙ্গে মিলিয়ে চলার প্রাণ না থাকলে নিত্য-গোপালের এই জীবন-ছন্দ ধরা পড়বে না।...এই ছন্দ-বোধ দিয়ে শ্রীনিত্যগোপাল এক নূতন সংসার সৃষ্টি করতে এসেছেন।...কাজ করার ঢং, কথা বলার ঢং, সব কিছুই নূতন করে শিখতে হবে—সব কিছুর মধ্য দিয়ে তোমার স্বাধীন সত্তা তোমার মর্যাদা যেমন রক্ষিত হবে, অন্যের স্বাধীন সত্তা অন্যের মর্যাদাও রক্ষা করতে হবে।...কোন্ অধিকারে তুমি তিনটার সময় ভগবানকে ভোগ দাও মহোৎসবের দিন? আজ গোবিন্দ এসে দাঁড়িয়েছেন সেবা করার জন্য...। বিকেলে দুজন ভদ্রলোক এসে-ছিলেন—তাদের বলছিলাম—ভক্ত যদি বলে আমি তোমার —আমি তোমার হলাম—তা হলেই তো ভগবান খুশী...। অপেক্ষমান একজন গুরুকে, অপেক্ষমান মাতা-পিতাকে যারা খুশী করতে পারল না তারা সাধনার জগতে কি করবে?..অহংকারীর পক্ষে পথ নেই—গোবিন্দে যে আমি দিল, গভীর গহন অরণ্যেও তার পথ আছে।...

ক্রমশঃ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় করাই ইহার অবতারণা। সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচারসকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আবৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অধুনা-গীতানুসারে ভগবান মহাদেব-নির্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ত্রয়ীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

চতুর্বেদ, সকল সূত্র, সকল পুরাণ এবং সকল ইতিহাসাধ্যয়ন-রূপ যে অভ্যাস, সেই অভ্যাসের নামও জপ। জপ—দ্বি-প্রকার, বাচিক এবং মানসিক। বাচিক জপও, উপাংশু ও উচ্চভেদে দ্বিবিধ। যে জপের উচ্চারণ শ্রোতার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয় না, তাহাই উপাংশু-জপ। যে জপের উচ্চারণ উচ্চস্বরে করা হয় এবং তদ্দ্বিষয়ক সেই 'জপ' শব্দ শ্রোতার কর্ণকুহরস্বরে প্রবেশ করে, তাহাই উচ্চ-জপ। মন দ্বারা ধ্যান বা ধ্যানবৃত্তিই মানস-জপ। ঐ জপেরও বৈবিধ্য বশত, ঐ জপও দ্বিবিধ। উচ্চ-জপাপেক্ষা উপাংশু-জপ, সহস্র-গুণে শ্রেষ্ঠ। উপাংশু জপাপেক্ষা মানস জপ সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। উচ্চ-জপ করিবার ফল, উচ্চ-জপ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা নীচ বা অস্পষ্ট শ্রুত হইলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। উপাংশু-জপ, উচ্চ-জপের ন্যায় উচ্চারিত হইলে তাহাও নিষ্ফল হয়। গার্গি! যে ব্যক্তি জপের ঋষি, জপের ছন্দ এবং সেই ছন্দ-সমন্বিত জপের অধিদেবতাকে ধ্যান-পূর্বক সর্বদাই মন্ত্র-জপ করেন, তাঁহার সেই সকল বৈধানুষ্ঠান-জন্য, তাঁহার সেই অনুষ্ঠিত-জপ ফলপ্রদ হয়। প্রসন্ন গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে ধর্মার্থ-কাম-সিদ্ধির জন্য, সেই প্রসন্ন-গুরুপদিষ্ট উপায়াবলম্বনই ব্রত।" কেহ কেহ বলেন, শ্রীযোগি-যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ সূত্রখণ্ডের দ্বিতীয়োহধ্যায়—কথিত প্রথম শ্লোকের 'হুতং' শব্দের পরিবর্তে, ঐ-অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে 'ব্রতং' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা নহে; কারণ 'হুতং' শব্দের যাহা অর্থ, 'ব্রতং' শব্দের অর্থ তাহা নহে। উভয়ের অর্থ-গত বিশেষ পার্থক্য আছে।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত

প্রথম প্রকরণের তৃতীয় শ্লোকে অষ্টাবক্র বলিয়াছেন,—

"ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে॥"

অষ্টাবক্রের মতে আত্মা, পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ নহেন্। শ্রুতিমতে আত্মাকে ঐ সমস্তই বলা যাইতে পারে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে,—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। অদ্বৈত মত-প্রতিপাদক নানা গ্রন্থানুসারে আত্মাই ব্রহ্ম। কথিত শ্রুতিবচনানুসারে ব্রহ্মাত্মাই এই সমস্ত। এই সমস্তের অন্তর্গত পঞ্চভূতও বটে। অতএব আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথ্বীও সেই ব্রহ্মাত্মা।

অষ্টাবক্র জনককে বলিয়াছেন যে জনকও আত্মা নহেন; অথচ অষ্টাবক্র-সংহিতায় অষ্টাবক্র-কথিত অনেক উপদেশেই জনককে আত্মা বলা হইয়াছে। উক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসারে আত্মা পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ প্রভৃতির সাক্ষী। উক্ত শ্লোকে আত্মাকে অনিত্য-সাক্ষী বলা হয় নাই। সেইজন্য উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মাকে নিত্য সাক্ষী বুঝিতে হয়: আত্মা উক্ত পঞ্চভূতের নিত্য-সাক্ষী বলিয়া, উক্ত পঞ্চভূতকেও নিত্য বলিতে হয়। উক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসারে আত্মা 'চিদ্রূপ'। অষ্টাবক্রের মতে আত্মা 'চিদ্রূপ' বলিয়া অষ্টাবক্রের মতে অবশ্যই আত্মা নিরাকার নহেন্। অষ্টাবক্রের মতে তিনি নিরাকার হইলে, অষ্টাবক্র কখনই তাঁহাকে 'চিদ্রূপ' বলিতেন না। তাহা হইলে তিনি সেই আত্মাকে নিশ্চয়ই 'চিৎ-স্বরূপ' বলিতেন। কোন শাস্ত্রমতেই 'রূপ' নিরাকার নহে। সর্ব্ব-শাস্ত্রমতেই 'রূপ' আকার। সেই জন্য আত্মাকে 'চিদ্রূপ' বলা হইয়াছে বলিয়া, আত্মাকে চিদাকারই বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে অষ্টাবক্রের আত্মাকে নিরাকার বলিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, 'চিদ্রূপ' শব্দ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে তিনি 'চিৎ' শব্দও প্রয়োগ করিতে পারিতেন। অনেক শাস্ত্রমতেই 'চিৎ' নিরাকার। অনেক শাস্ত্রমতে 'স্বরূপ'ও নিরাকার। আত্মাকে 'চিৎ-স্বরূপ' বলিলে, আত্মা 'নিরাকার' ইহাই স্বীকার করা হইত। উক্ত শ্লোকে আত্মাকে সাক্ষী বলা হইয়াছে বলিয়া, আত্মা-সগুণ-সক্রিয়ও স্বীকার করা হইয়াছে; কারণ এই জাগতিক বিচারালয়ের কোন সাক্ষীই নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহেন্, তাহা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক আত্মাকে সাক্ষী বলা হইয়াছে বলিয়া, আত্মাও সগুণ-সক্রিয় স্বীকার করিতে হয়।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত

প্রথম প্রকরণের চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি,
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥"

অষ্টাবক্র জনককে 'চিতি'তে বিশ্রাম-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মতে 'চিতি' শব্দের অর্থ 'চিৎ'। চিৎ অর্থে জ্ঞান। প্রকৃত কথায়, জ্ঞানে কোন ব্যক্তিই অবস্থান করে না, কিন্তু 'কোন-ব্যক্তিতে' জ্ঞানই অবস্থান করিতে পারে। চিৎ অর্থে আত্মাও বলা যাইতে পারে। সুতরাং সেই-জন্য 'চিতি' অর্থেও আত্মা। 'চিতি' অর্থে আত্মা স্বীকার করিলে জনক এবং সেই 'চিতিকে' অভেদ বলা যায় না। অষ্টাবক্রের মতে ঐ 'চিতি' এবং জনক অভেদ হইলে, জনককে 'চিতি'তে বিশ্রামপূর্ব্বক অবস্থান করিতে বলা হইত না। উক্ত শ্লোকীয় 'চিতি' অর্থে 'আত্মা' স্বীকৃত হইলে, জনককে অনাত্মাই বলিতে হয়। জনকের সহিত 'চিতি' অভেদ হইলে, অষ্টাবক্র জনকের 'চিতি'তে অবস্থানেরই প্রয়োজন বোধ করিতেন না। অষ্টাবক্রের মতে জনক 'চিতি'তে অবস্থান করিতে পারিলেই সুখী, শান্ত এবং বন্ধ-মুক্ত হইতে পারেন। অনেকের মতেই অষ্টাবক্র সংহিতায় 'চিতি' শব্দের অর্থ আত্মা। অদ্বৈতমতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং রাজর্ষি-জনক আত্মা-চিতিতে অবস্থিত ছিলেন না, বলা যায় না। অষ্টাবক্র জনককে আত্মা-চিতিতে অবস্থান করিতে বলায়, তাঁহার 'আত্মা চিতি'র সর্ব্বব্যাপিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহার 'জনক' যখায় ছিলেন, তথায় আত্মা চিতির বিদ্যমানতা অস্বীকার করা হইয়াছে। সুখ, শান্তি এবং মুক্তি—তিন প্রকার। সেইজন্য ঐ তিন প্রকার সামগ্রী 'আত্মা' নহে। বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মসূত্র দর্শন প্রভৃতি মতে, আত্মার বিবিধত্ব নাই। বেদান্তদর্শনমতে আত্মার এক-প্রকারতাই নির্দ্দিষ্ট আছে। সেইজন্য আত্মাকে সুখ, শান্তি বিংবা মুক্তি বলা যায় না। উক্ত শ্লোকে সুখ, শান্তি এবং মুক্তির সহিত আত্মা-চিতির অভেদত্ব প্রদর্শন করা হয় নাই। অতএব উক্ত শ্লোকানুসারেও আত্মা-চিতি এবং ঐ তিন অভেদ নহে। ঐ তিন 'আত্মা-চিতি' নহে বলিয়া অবশ্য ঐ তিনই 'অনাত্মা-অচিতি'। সুতরাং আত্মজ্ঞানীর ঐ তিনে প্রয়োজনই হয় না।

সপ্তম সিদ্ধান্ত

প্রথম প্রকরণের পঞ্চম শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥"

অষ্টাবক্র-কথিত উক্ত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার,—"তুমি বিপ্রাদিক বর্ণ নহ, তুমি আশ্রমী নহ, তুমি নয়ন-গোচর নহ, তুমি অসঙ্গ-নিরাকার-বিশ্বসাক্ষী, তুমি সুখী হও।" উক্ত শ্লোকানুসারে 'আত্মার' যে সমস্ত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, জনকেরও সেই সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে অতএব সেইজন্য জনককে 'আত্মা' বলিতে হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে 'জনক' নয়নগোচর নহেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসারে আত্মা 'চিদ্রূপ' অতএব 'জনক' নয়নগোচর নহেন কি প্রকারে বলা যায়? কারণ 'রূপ' নয়নগোচর হয় না, তাহা কোন শাস্ত্রেই বলা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য প্রতিপাদক পুরাণ সকলের মতে শ্রীকৃষ্ণ 'চিদ্রূপ'। সে সকল মতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায়। জনককে 'অসঙ্গ' বলা হইয়াছে,—অথচ যাঁহাকে কি প্রকারে সুখী হইতে বলা হইয়াছে? 'অসঙ্গ' যিনি, তাঁহার কি প্রকারে সুখ-সঙ্গ হইবে? সুখের সহিত সংস্রব ব্যতীত কেহই সুখী হইতে পারে না। জনকাত্মাকে 'নিরাকার' বলা হইয়াছে। আকাশ, বায়ু, শব্দ, মন, বুদ্ধি এবং প্রত্যেক মনোবৃত্তিও 'নিরাকার'। সুতরাং নিরাকারও অপ্রাকৃত নহে;—কারণ ঐ সকল এক-প্রকৃতিরই নানা বিকাশ, ঐ সকল 'নিরাকার' বলিয়া, 'নিরাকার'ও প্রাকৃত। আত্মা-জনকও 'নিরাকার' স্বীকার করিলে,—সেই আত্মা-জনককে অবশ্যই প্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তবে শ্রুতি এবং শঙ্করাচার্য্যের অনেক শ্লোকানুসারে আত্মা এবং অনাত্মা অভেদ স্বীকার করিলে আত্মাকে প্রকৃতি এবং অপ্রকৃতি, উভয়ই স্বীকার করা যায়। নানা শাস্ত্রমতেই আকার ও নিরাকার পরস্পর অভেদ নহে, কিন্তু অষ্টাবক্রের মতে, আকার ও নিরাকার অভেদ প্রমাণ করা যায়। পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসারে আত্মা 'চিদ্রূপ,' চতুর্থ শ্লোকানুসারে আত্মা 'চিতি' এবং পঞ্চম শ্লোকানুসারে জনকাত্মা 'নিরাকার'; সেইজন্য আকার এবং নিরাকার অভেদ বলিতে হয়।

অদ্বৈত সিদ্ধান্ত

প্রথম প্রকরণের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে;—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো!
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা।"

উক্ত শ্লোকানুসারে অষ্টাবক্র এবং জনক অভেদ বুঝিবার কোন কারণ নাই। উক্ত শ্লোকে উভয়ের প্রভেদই সূচিত হইয়াছে উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতবাচক। উক্ত শ্লোকানুসারে অষ্টাবক্র জনককে 'বিভো' সম্বোধন করিয়াছেন। নানা শাস্ত্রানুসারে আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠকেই 'বিভো' সম্বোধন করা যাইতে পারে। প্রথম প্রকরণের প্রথম শ্লোকে জনক, অষ্টাবক্রের প্রতি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্তমেতৎ ব্রূহি মম প্রভো॥",

তদুত্তরে অষ্টাবক্র দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত! বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ভজ॥
ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে॥
যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥"

প্রথম শ্লোকে জনকের মুমুক্ষুতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম শ্লোকানুসারে জনকের জ্ঞানাভাব, মুক্তির অভাব এবং বৈরাগ্যাভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ তিন সামগ্রীর জন্য জনক লালায়িত ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়। সেই জন্যই তিনি ঐ তিন সামগ্রী কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, জানিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অষ্টাবক্রও সংক্ষেপে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকে ঐ তিন লাভের উপায় কহিয়াছিলেন। জনক ঐ উপায়াবলম্বন করিবার পূর্ব্বেই অষ্টাবক্র তাঁহাকে নিম্ন ষষ্ঠ শ্লোকদ্বারা কহিয়াছিলেন,—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা॥"

উক্ত শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে,—"বিভো! তোমার মানসিক ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ নাই, তুমি কর্ত্তা এবং ভোক্তা নহ,—তুমি সততই মুক্ত।"

শ্রীবেণু মিত্র কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি, নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন ধরার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্য, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্গের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। † † †"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে এক করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

2 NOV 1965

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
৯। মুণ্ডকোপনিষৎ
১০। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
১১। স্বরাজের পথে
১২। শ্রীমদ্ভাগবত
১৩। উদ্ধবসংবাদ (পুস্তিকা)
১৪। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

৺প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির ভ্রমপথে
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়ময়ী শ্রীনিত্যগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন
রবীন্দ্র-হৃদয়
প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—দেশবন্ধুনগর) ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়।" চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৬, ১৯৬৯ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (idcology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুই-এর সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

সূচীপত্র : অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৬

জীবনের সামগ্রিকতায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীরেণু মিত্র	১৮১
পুরুষোত্তমানন্দ-দর্শন শ্রীরমীরেশপদে	১৮৭
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ৮৭তম জন্মদিনে (কবিতা) শ্রীশান্তশীল দাশ	১৮৯
অবধূত পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস	১৯০
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ-স্মরণে শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী	১৯৩
প্রবাসীর মন শ্রীবিভা সরকার	১৯৬
সেনানায়ক গোবিন্দচরণের পত্র (পূর্বপ্রকাশিতের পর) ৮সুনীলকুমার ঘোষ	২০২
মুক্তিলাভ (পূর্বপ্রকাশিতের পর) অনামী	২০৮
প্রার্থনাকালীন ভাষণ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	২১৫
প্রাণের প্রণতি (কবিতা) শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভাষ্যতীর্থ	২১৮
পারিবারিক জীবন-আলোচনা ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৯
সাময়িকী : ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ : পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব	২২৫

বিজ্ঞপ্তি

উজ্জলভারত পত্রিকার বাবিংশ বর্ষ শেষ হইল। গ্রাহক অনুগ্রাহক সকলের সহযোগিতায় নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও সে পথ চলিতেছে। নূতন বৎসরের জন্য সকলের অধিকতর সহযোগিতা প্রার্থনা করি। গ্রাহকদের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা যেন দয়া করিয়া চাঁদা পাঠাইয়া দেন।

সম্পাদিকা
উজ্জলভারত

মাটিতে আলু-পটল ও ব্রহ্মজ্ঞান দুই-ই যুগপৎ ফলাইতে সক্ষম বিপ্লবী শ্রীকৃষ্ণ। পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্মের ক্ষেত্রে গীতার পুরুষোত্তমবাদের লাঙ্গলে চাষ লাগাইয়া নূতন বিশ্ব যে গড়া যায় তাহারই খোঁজ পাইতে পড়ুন

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত

সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-র

অবধূত-ভাষ্য

নরনারায়ণ আশ্রম

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		বাংলার ঋষি	৩·০০
শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০	বাংলার বিদুষী	২·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·০০	বাংলার মনীষী	১·৩০
কর্মবাণী	১·২৫	জীবন গড়া	০·৭৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী		রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০	আচার্য জগদীশ	২·৫০
Soul of India Speaks	৫ ০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১ ৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
পকেট গীতা	৫·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ		শ্রীশীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি	
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	বিদ্যাসাগর	২·২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০		

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫, কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

উত্তরা ভারত

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৬৯ ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জীবনের সামগ্রিকতায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ওঁ নমো পুরুষোত্তমায় নিতাগোপালায়

ওঁ নমো পুরুষোত্তমানন্দায়

আমরা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জন্মোৎসবে মিলিত হইয়াছি—আমাদের সম্মিলিত প্রণাম তাঁহাকে নিবেদন করি; প্রণাম নিবেদন করি তাঁহাকেও যিনি পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-দেবতা, যিনি পুরুষোত্তমানন্দকে পুরুষোত্তমানন্দ বানাইয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীনিতাগোপাল—একজন সহজ সুন্দর স্বাভাবিক মানুষ। আজ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, যাঁহারা সমবেত হইতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের সকলকেই আশ্রমের পক্ষ হইতে আমি সাদর সম্ভাষণ জানাই, দূরে কাছের সকলকে আমি প্রাণ ভরিয়া স্মরণ করি। আপনাদের আসা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে কতখানি খুশী করিত, বিপ্লবী কৃষ্ণ-কথা শুনাইবার মানুষ পাইলে তিনি কত আনন্দ পাইতেন, তাহা আপনারা অনেকে জানেন, আমি তাহা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করিব? আপনারা তাঁহার আনন্দকে গ্রহণ করুন।

শ্রীশ্রীনিতাগোপাল ছিলেন অত্যন্ত সহজ মানুষ—তাই তাঁহার পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। রবীন্দ্রনাথের একটী ভাষায় কিছু বোঝা যাইবে—তাঁর 'কোন উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে'। শ্রীনিতাগোপাল অদ্বয়-বাদী, শ্রীনিতাগোপাল অদ্বয়বাদী; তাই তিনি একাধারে ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী ও এ বিশ্বে একজন আনন্দপূর্ণ সঞ্চারী। শ্রীনিতাগোপালের নিজের ভাষাতেই বলি, 'আমি অদ্বৈতবাদীও বটে, প্রেমবাদীও বটে'। এইভাবে শ্রীশ্রীনিতাগোপাল একটী সামগ্রিক জীবন্ত মানুষ এবং এইখানেই তিনি বর্তমান কালে অপরিচিত হইয়াও আগামী দিনের যুগদেবতা। সুস্থ সামগ্রিক মানুষত্বই আগামী যুগের মানুষের সাধ্যবস্তু। আজ চারিদিকেই বিকৃতি, কোন দিকের কোন অবস্থার মধ্যেই সৌন্দর্য নাই। অতীতে ছিল একদিকে চরম অন্ধকার আর একদিকে অতি সৌন্দর্য—আগামী দিনে সর্বত্র মোটামুটি কালর মধ্যে একটা অবস্থা যেটাই মানুষত্ব—কেননা মানুষের মধ্যে দেবত্ব (rationality) ও অসুরত্ব (animality) উভয়েরই অস্তিত্ব। ইহাদের কোন একটী pushed to extreme হইলেই আর মানুষত্ব থাকে না—মানুষের সুস্থতা তাই সব বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অস্তিত্বে। সেই মানুষত্বের সুস্থতার সংবাদ দিয়া বর্তমান কালে শ্রীনিতাগোপাল অনবদ্য। তাঁহারই সহজ জীবন-তত্ত্ব বলিতে ও আচরণ করিতে গিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়া আছেন। কোন একটী অবস্থাই সত্য বলিয়া যদি দীর্ঘ কাল ধরিয়া সম্মান পাইতে থাকে, তাহা হইলে উহা যে সমগ্র সত্যের অর্ধ, উহা যে সমগ্রের বাণী বহন করে না—এ কথা বুঝাইতে গলদ্ঘর্ম হইতেই হয়। এ কথা বুঝাইতে সর্বস্তরের বিকৃতি ও পচনের মধ্য দিয়া পূতিগন্ধময় বিকৃতা তো দেখা দিবেই। বর্তমানের অবস্থা বিকৃতি ও প্রতি-ক্রিয়ার এই পচনাবস্থা। সামন্ত ইহার পরের স্তরের

কথা। সামঞ্জস্যই যে সৌন্দর্য এ কথা নূতন নয় সত্য, আজিকার দিনের সাহিত্যেও তাহার রবীন্দ্রনাথে তাহার সাক্ষাৎ অনেকেই পাওয়া যাইবে, পাওয়া যাইবে বহু বেশী অনুভবও। কিন্তু ধর্ম ও দর্শনের যে রূপটা ভারতবর্ষের জন-জীবনকে প্রভাবিত করিয়া আছে বহুশত সহস্র বৎসর, সেখানে ইহার বড় অভাব। সামঞ্জস্যের সামগ্রিকতা নাই বলিয়াই সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতা—আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অর্থাৎ দর্শনে, ধর্মের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাহার আচরণে, সমাজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে তথা অর্থনীতি ক্ষেত্রে বা রাজনীতিতে সর্বত্র চলিতেছে সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ অংশকে, অর্ধকে সমগ্র বলিয়া বুঝিয়া তাহারই সদম্ভ আচার ও প্রচার। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীনিত্যগোপালকে অনুসরণ করিয়া গীতা উপনিষদ বেদান্তের ভাষ্য রচনাদ্বারা ঐ সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ পারস্পরিক খণ্ডনের স্থলে পারস্পরিক মণ্ডনদ্বারা সামঞ্জস্যের সামগ্রিক জীবনবাদের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেই হউক বা সমাজের ক্ষেত্রেই হউক যে মনোবৃত্তিতে জীবনের গতি নষ্ট করিয়া দেয়, যাহা অপরের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত, যাহা পরিণামে শোষণের যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়—সর্বত্র পুরুষোত্তমানন্দ সেই মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন—এবং প্রতিবাদ করিয়াছেন দার্শনিক ভাবে। এই দার্শনিক বিশ্বাস প্রস্থাপন করাই পুরুষোত্তমানন্দের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয়তা।

তিনি লিখিতেছেন, '...প্রাণের পূজারী আমি। বুদ্ধিমান আমি নই। তবে প্রাণের একটু স্পর্শ শ্রীনিত্যগোপালের নিকট হইতে পাইয়াছি। আমি মানুষ ভালবাসি। ছোট মানুষের সঙ্গে ছোট হইয়া থাকিতে যদি কেহ না আসে তবে তেমন লোক দিয়া নরনারায়ণ আশ্রমের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না।...আমি জানি কোটি কোটি টাকা লইয়া আজ যাহারা মোহান্ত বা মঠধারী, তাহাদের দিন ঐ আগত। যে কারণে ভারতের রাজারাই গেল, জমিদারী গেল, সেই একই কারণে কি কোটিপতি মঠধারীর উৎখাত হইবে না? কি অধিকার আছে তাহাদের বাঁচিবার যাহারা এমন অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্র দেশে কোটি কোটি টাকা পুঁজি করিয়া বেশ নিশ্চিন্তে 'সাধু'-র জীবন চালাইতেছেন? যে দেশে সেবা পাইবার লোকের অভাব নাই, সে দেশে মঠ-মন্দির-আশ্রমের নামে কোটি কোটি টাকা জমিতেছে, ইহা কত বড় বেদনার কথা। তাঁহারা বড় সেবাব্রতের কথা মুখে বলুন, অন্তরে তাঁহারা capitalist। ইহারা ভারতের অগ্রগতির পক্ষে reactionery। আমার আশ্রম এরূপ হয় তাহা আমি চাই না।'—একজন সন্ন্যাসী হইয়া এই যে কথাগুলি পুরুষোত্তমানন্দ লিখিলেন তাহা কোন্ বিপ্লবাত্মক সন্ন্যাসীত্বের পরিচয় দেয়, সমাজ-জীবনে তাঁহার এই প্রজ্ঞাপ্রাণ সমন্বিত ঔপনিষদীয় প্রাণবাদ প্রযুক্ত হইলে সে সমাজ পারস্পরিক সংঘর্ষের পরিবর্তে পারস্পরিক পূর্তি-পূরকতার যে কী গভীর ব্যাপক জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে তাহা বুঝিবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান জানাই।

প্রাণের পূজারী পুরুষোত্তমানন্দ বলিয়াছেন বিশ্বের আগামী দিনের সভ্যতা দাঁড়াইবে প্রাণের উপর—যেখানে সকলের স্বীকৃতি, সকলের মর্যাদা—অথচ একের দ্বারা অপরের অস্তিত্ব নাই। এই প্রাণেরও বুদ্ধি আছে—কিন্তু উহা সেই বুদ্ধি নয় যাহা বিভেদের জন্ম দান করে। এত দিনকার ভেদসৃষ্টিকারী বুদ্ধিপ্রধান সভ্যতার ধ্বংসের চিত্র চতুর্দিকে—একদিকে মানুষের অন্তঃকরণ বলিতে চাহিতেছে পৃথিবী জুড়িয়া আমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিব—অথচ গৃহে, পরিবারে, সমাজে, ক্লাবে, রাজনীতিতে কেহ কোথাও কাহারও সঙ্গে মিলিতে পারিতেছে না! কি অদ্ভুত অবস্থা! এই বিচ্ছিন্নতার মনোভাব আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। অথচ ভিতরে ভিতরে মানুষে মানুষে মিলিবার যে কথা মহাপ্রাণগুলি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাষায়, সে কথা দানা বাঁধিয়া আজ পর্যন্ত উঠিতে পারে নাই—কিন্তু এইবার সময় আসিয়াছে—পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন না করিয়া কি ভাবে মণ্ডন করিয়া চলা যায় গোপীরাসমণ্ডল-মণ্ডন শ্রীকৃষ্ণ-জীবন অনুধাবন করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল এবং শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাহা দার্শনিকভাবে প্রস্থাপন

করিয়া গিয়াছেন। এইবার মানুষে মানুষে মিলিবার সাধনা, অংশ-বিশেষকেই সমগ্র বলিয়া ধরিয়া না লইবার সাধনা রূপ লাভ করিবে। নূতন জন্মলাভ করে যে পচন হইতে, সে পচন সর্ব্বত্র। বিচ্ছিন্নতার কেন্দ্রবুদ্ধির পচন হইতে সামগ্রিক মিলনের তত্ত্ব আজ উদ্ভাসিত হইবে—সে আশার আলোক পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত উপনিষৎ বেদান্ত গীতার ভাষ্যগুলিতে, তাঁহার সমস্ত জীবন-চরিতে। তাই চারিদিকে যখন কেবল বিকৃতি, কেবল জীবনের দুর্বল মূঢ়তা, ব্যক্তি বা সমাজ উভয়ই অসৌন্দর্য্যের প্রকোপে যখন চিত্তে প্রদাহ সৃষ্টি করে, তখনও সর্ব্ব মানুষের ভাগবতী সত্তা বা sublimation এ শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল হৃদয়ে সচেতন মূঢ়তা লইয়াই পথ চলিতেছি। আপনাদের সেই পথে আহ্বান করি—মানুষত্বের সেই সামগ্রিকতায়—যেখানে শুচিতা স্নিগ্ধতা বিনয় শ্রদ্ধা নম্রতার সঙ্গে কেন্দ্রবুদ্ধিকে ধ্বংস করিবার তেজবীর্য। মানুষের সঙ্গে মানুষ মিলিতে পারিবে না—এ কেন্দ্রবুদ্ধিকে দূর করিতেই হইবে—তাহারই সামগ্রিক দর্শন পাইয়া আমরা ধন্য।

মানুষের সঙ্গে মিলিত হইতে হইলে অন্তরে পুরুষোত্তম বিশিষ্টতা সত্ত্বেও ব্যবহারিক জীবনে যে সাধারণ সহজ সরল জীবনযাত্রা চালানো বিশেষ প্রয়োজন, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেইরূপ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন—অন্তরে তিনি বিশেষ, বাহিরে কটিবস্ত্র পরিহিত ছেঁড়া-মাদুরে সকলের সঙ্গে একাসনে আসীন, নিতান্ত সর্ব্বসাধারণের আহারে জীবিকা নির্ব্বাহে তৃপ্ত। তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিতাগোপাল এই দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন—একদিকে তিনি মুহুর্মুহু সমাধিমগ্ন, অপর দিকে তিনিই বিশ্বনাগরিক—সমাধিতে তিনি বিশেষ—বিশ্বনাগরিকত্বে তিনি সাধারণের স্তরে। একশত চৌদ্দ বৎসর আগে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীনিতাগোপাল মাত্র সাতান্ন বৎসর দেহে অবস্থান করিয়া ছিলেন—আজ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ৮৭-তম জন্মতিথি। অথচ এখনও তাঁহাদের জীবনের কথা—এই পরস্পর বিপরীতের সমন্বয়দর্শন মানুষের কাছে উপস্থিত করা গেল না। অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁহাদের কথা আপনাদের কাছে একটুখানি উপস্থিত করিলাম। ১৯১৯-এ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ব্রহ্মসূত্রের অবলুপ্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে জেলে থাকাকালীন ১১ খানা প্রধান উপনিষৎ ও গীতার অবলুপ্ত ভাষ্য রচনা করেন। ২৭ বৎসর পরে গীতার সেই ভাষ্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এই তিনমাস হয়। আপনাদের আহ্বান জানাই ঐ গীতাখানি অন্ততঃ আপনারা পড়িয়া দেখুন মার্কসবাদকে হজম করিয়া ভারতীয় উপনিষদ গীতাবেদান্ত কী এক মহান মধুর সামগ্রিক জীবন চেতনায় উদ্ভাসিত যেখানে দেশ-নিরপেক্ষ কাল-নিরপেক্ষ সকলের এক মিলন ক্ষেত্র বর্ত্তমান। ভারতবর্ষের প্রচলিত অধ্যাত্মবাদ চলিবে না ইহা যেমন ধ্রুব সত্য, জীবনকে শুধু জড়ীয় দৃষ্টিকোণ হইতে—যে জড় অজড়ের সঙ্গে বিরুদ্ধ—ব্যাখ্যাও চলিবে না ইহাও ধ্রুব সত্য। জীবন এত স্বল্প নয়, সামান্য নয়। আজিকার দিনে ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়াও সার্ব্বজনীন হইতে হইবে, দল থাকিলেও বিশ্বের কথা ভাবিতে হইবে।—কঠিন কথা—তবু কোন একটীকে ধরিলেই আর পথ পাওয়া যাইবে না। আপনাদের প্রতি আমার এই আহুতি আপনারা এই সর্ব্বোপাধিহীন ও সর্ব্বোপাধিযুক্ত মিলনভূমিতে সমবেত হউন। জয় শ্রীনিতাগোপাল, জয় শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ।

পুরুষোত্তমানন্দ-দর্শন

॥ শ্রীহৃষীকেশ দে ॥

সমন্বয়বাদ প্রাচীন দর্শন : পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই সব দর্শন বা মতবাদের মধ্যে প্রকৃতিগত মিলও যেমন দেখা যায় অমিলও তেমনি। কোন সেমেটিক ধর্মে জন্মান্তর ও কর্মফলবাদ স্বীকৃত হয়নি। ভারতীয় ধর্মে তা হয়েছে। চীনের কনফিউসিয়াসের ধর্মে এবং জাপানের শিন্টো ধর্মে জন্মান্তরবাদ বা কর্মবাদ নাই। আবার প্রত্যেক ধর্মে পাপ, মিথ্যা, হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতিকে পরিহার করতে বলা হয়েছে। সনাতন ধর্মেও এগুলিকে তামস প্রবৃত্তি বলা হয়েছে। সনাতন ধর্মে সব কিছুর কেবলমাত্র ব্যবহারিক স্বীকৃতি আছে। উপনিষৎ-এ দ্বৈত ও অদ্বৈতের সমন্বয় ও একত্বের বাণী আছে। এই সমন্বয় বাণী বেদের যুগ থেকেই ঋষিরা বলছেন। কিন্তু তাকে বিশেষ জোর দিয়ে এবং নিজ জীবনে আচরণের দ্বারা সার্থক করে বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই সমন্বয়বাদের অপর নাম পুরুষোত্তমবাদ। নিত্য-অনিত্য,আত্মা-অনাত্মা, জ্ঞান-অজ্ঞান, জড়-অজড়, চৈতন্য-অচৈতন্য, দ্বৈত-অদ্বৈত, পাপ-পুণ্য, হিংসা-অহিংসা এমন কি সত্য-অসত্যেও সমন্বয় আছে। যুধিষ্ঠির বিরাট রাজকে বাঁচাবার জন্য অর্জুনকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। বিরাট অবিবেচনাপ্রসূত ক্রোধে পাশা ছুঁড়ে মারেন কঙ্করূপী যুধিষ্ঠিরের ললাটে—ঘটে রক্তপাত। অর্জুন মাতা কুন্তীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যুদ্ধ ব্যতীত যদি কেহ যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত করে তিনি অপরাধীকে নিধন করবেন। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বলেন অসাবধানতাবশতঃ তাঁর নিজের হাতের কঙ্কনের ঘর্ষণে ললাট ক্ষত হয়েছে। এই মিথ্যা ভাষণ কি শুধুই মিথ্যা? এর অন্তর্নিহিত সত্য—আশ্রয়দাতার জীবন রক্ষার্থে মহৎ ইচ্ছা কি কিছুই নয়!

ব্যাঘ্র যখন শাবককে আক্রমণ করে, ব্যাঘ্রী-জননী হীন-শক্তি হলেও ব্যাঘ্রকে বাধা দেয়; বাৎসল্য মহিমা-দীপ্ত তার অন্তরের হিংসার প্রকোপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাঘ্র বিপর্যস্ত হয়। দুর্বলতর ব্যাঘ্রী কেমন করে বলবত্তরকে পরাস্ত করে, ভীরুতা ও দুর্বলতা কেমন করে সাহস ও শৌর্যে বিকশিত হয়, হিংসা অহিংসার মহিমায় সন্তান রক্ষায় দীপ্যমান হয়!

পত্নিনী যখন আলাউদ্দীনকে প্রতারণা করে স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন, সে কি পাপ? সুস্থ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় দ্বৈত অদ্বৈত, নিত্য-অনিত্য দৃষ্টি ভঙ্গির পার্থক্য মাত্র। আপাতঃদৃষ্টিতে যা বিরোধী বলে মনে হয় তার মধ্যেও একত্ব আছে, সমন্বয় আছে। যেহেতু জগতে কিছুই ঈশ্বরের বাইরে নয়, সবই ঈশ্বরের মধ্যে, সবার মধ্যে ঈশ্বর, তবে বিরোধ, বৈপরীত্যকে একান্তভাবে দেখা কেবল বোঝবার ভুল। সকলের মধ্যে সংহতি, সমন্বয় আছে। জ্ঞান বিজ্ঞান বা সাধনার যে স্তর বা অবস্থা থেকে এই সমন্বয়-বোধ নিরঙ্কুশ হয়, সব কিছুই একেরই লীলা, একেরই এদিক ওদিক বোঝা যায়, তাকেই বলে সমন্বয়-স্তর বা পুরুষোত্তম-স্তর। পুরুষোত্তমবাদ উপনিষদের যুগ থেকেই আছে। পরবর্তী যুগে স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গীতা মাধ্যমে তার মহান প্রবক্তা। বর্তমান কালে শ্রীমৎ নিত্যগোপাল ও তদীয় সন্তান শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই দর্শনের প্রচার করেছেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ভগবদ্গীতার পুরুষোত্তম-ভাষ্য লিখেছেন। গীতার এ পর্যন্ত যত ভাষ্য হয়েছে এটি তার মধ্যে অভিনব, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভগবদ্ বাণীর বিচার বিশ্লেষণ।

কর্মী ভগবান, কৃষক ভগবান : স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অবতার পুরুষ বলরাম যে মাটির মানুষ এ কথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। হলধর, হলধারী, অর্থে লাঙল কাঁধে কৃষক এবং কৃষ্ণ কথার মানে মানে কর্ষণকারী চাষী। কৃষ্ণ ও বলরাম জন্মেছিলেন যাদব ও আহীর জাতির মধ্যে অর্থাৎ যদুকুল জাত যে সব ক্ষত্রিয় কৃষিকর্ম ও গোপালন বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তাদের সমাজে। মহাভারত ও শ্রীমৎ ভাগবত রচয়িতা অবতার পুরুষ বেদব্যাস কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন এক ধীবর কন্যার কুমারী অবস্থার পুত্র পরম ভাগবত বিদুর রাজা বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীর দাসী পুত্র। কবীর মুসলমান তাঁতীর ঘরে পালিত শিশু পরিচয়হীন, ভক্ত রুইদাস কর্মকার। আদর্শ ভক্ত ও জ্ঞানী প্রহ্লাদ দৈত্যবংশে জন্মেছিলেন। বিবেকানন্দ কায়স্থ সন্তান, রামকৃষ্ণ নিরক্ষর অতি দরিদ্র। আভিজাত্য বা কৌলীন্য এঁদের কারোরই ছিল না। অথচ এঁরাই ছিলেন ভগবানের একান্ত প্রকৃত কর্মযোগী, ভক্ত, গুরু ও লোক-পাবন। ভগবানকে আমরা আকাশে তুলে ব্রহ্ম, অজেয়, নিরঞ্জন, অনির্দ্দেশ্য করে পর করে দিতে চেষ্টা করেছি। আমরা যখনই ভুল করেছি ভুলে গিয়েছি ভগবান আমাদের, আমরা ভগবানের, তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধু সখা, তিনি সব সাধু অসাধু, উচ্চনীচ, রূপে রূপে বহু রূপে বিরাজমান—তখনই আমরা মরেছি। নৈষ্কর্ম্যের নামে প্রশ্রয় দিয়েছি আলস্য ও তামসিকতাকে। জ্ঞানযজ্ঞ সাধনার নামে ছুটেছি শরীর-নিগ্রহ ও বঞ্চনার দিকে। এই জন্যই যুগপুরুষ পুরুষোত্তমানন্দ বলেছেন—"বিশ্বে আমরা আজ কর্মক্ষেত্রে সকলের পশ্চাতে। কর্মক্ষেত্রের সহিত একেবারে অপরিচিত থাকার বিপদ হইতে বাঁচিবার একমাত্র পথ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধ কর্মীর কর্মভার গ্রহণ. বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ব্রহ্মেরই মত সমান মানদানের শাস্ত্র-প্রচার এবং সেই আদর্শে কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করা। মাটিতে আলু পটল হয় ইহাই জানিতাম। তাই না ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য আমরা খুঁজিয়াছি টিং-এর ক্ষেত্র? কিন্তু মাটি খুঁড়িয়া যে আলু পটল ও ব্রহ্মজ্ঞান দুই-ই মিলিতে পারে, এবার শ্রীকৃষ্ণ নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন"।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের এই মতবাদের সমর্থনে একথা বলা যায় যে, উপনিষদ্ প্রবক্তা ঋষিরা আর না হউন ঋষিরা প্রায় সকলেই গৃহী ছিলেন, বনবাসী বা গ্রামবাসী ছিলেন, কৃষিসেবা ও কৃষিকর্ম করতেন। জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ জনকের সভায় বহু উপনিষদের সূচনা হয়েছিল, তিনি রাজা ও ক্ষত্রিয় হয়েও হল কর্ষণ করতেন। রাজর্ষি হল কর্ষণ ও ব্রহ্মজ্ঞান চর্চা তাঁর এক সঙ্গেই চলত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা দেখিয়ে গিয়েছেন বৈরী ভাবাপন্ন যুযুধান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রযুক্তে শরসন্ধানে ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগ উপদেশ সম্ভব। কিন্তু এ সমস্ত সম্ভব যেখানে কর্মী নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধ বা ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, শুধু পুরুষোত্তম-স্তরের এক শিশু উপনত পুরুষোত্তম-স্তরে প্রবেশোন্মুখ। এই এমন এক কর্মাধিগম অবস্থা যেখানে ক্ষিতিতে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্নতে সর্ব-সংশয়, যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

ঘন্দ্ব সামাসিকত্ব :—পুরুষোত্তম-স্তরে উপনীত হলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না, সব সমন্বিত হয়ে যায়। সমন্বয়বাদে পুরুষোত্তমের স্বরূপ হচ্ছে ঘন্দ্ব সামাসিকত্ব। সমাসের মধ্যে আমি ঘন্দ্ব সমাস, গীতার জ্ঞানগম্ভীর মহাবাণীর মধ্যে এ ব্যাকরণের কচকচানি কেন? ভূপতিত শরৎকুমারই বা তাঁর সমন্বয়বাদের এটি একটি মূলসূত্র বললেন কেন? প্রথম সমাসগুলি হচ্ছে ঘন্দ্ব, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ কর্মধারয় ও বহুব্রীহি। আর যত সমাস এই ছয়টি ডাল পালা বা রকমফের। সমাস কথার অর্থ সমন্বয় = মিলনাত্মক পদ। সংখ্যাবাচক পূর্বপদের সঙ্গে পরপদের মিলনে যেখানে সমষ্টি বুঝায় এবং যেখানে উত্তর পদের অর্থ প্রধানভাবে থাকে, তাহাই ঘন্দ্ব সমাস ; যেমন চারিটি ভুজ যাহার তিনি চতুর্ভুজ। ঈশ্বর কি শুধুই চতুর্ভুজ? তাহলে তিনি ত সীমিত হয়ে গেলেন। তিনি চতুর্ভুজ যেমন সত্য, বহুভুজ, অভুজও তেমনি সত্য। কর্মধারয় সমাসে একটি পদের অর্থ প্রাধান্য লাভ করে অন্যটির মর্য্যাদা হীন হয়। বিষাদরূপ সিন্ধু বিষাদসিন্ধু এখানে বিষাদের মধ্যে সিন্ধু ডুবে যাচ্ছে। ঈশ্বর ত ঈ

বিষাদ নহেন, তিনি হর্ষও। তেমনই,উত্তর পদের অর্থ প্রধান তৎপুরুষ, পূর্ব পদের অর্থপ্রধান অব্যয়ীভাব এবং উভয়ে অর্থপ্রধান বহুব্রীহি। ঈশ্বর এই সমস্তই তথাপি এই সমস্ত তাঁর পুরুষোত্তম-স্বরূপ নয়। উভয় পদের অর্থ-প্রধান যখন তিনি। তিনি সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, নিত্যা-নিত্য আত্ম-অনাত্ম, চেতন-অচেতন সব কিছুর সমন্বয়। তিনি যখন সামাসিকস্য।

ঃ অকাময়ত :—সমন্বয় দর্শনের প্রথম প্রবক্তা উপনিষদের ঋষিগণ। কালক্রমে সে জ্ঞান বিস্মৃত হয়, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সে জ্ঞান পুনঃ প্রচার করেন উপদেশ ও আদর্শ পালনের দ্বারা। সমাজ আবার তা ভুলেছে। এ যুগে সমন্বয়বাদ প্রচার করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীনিতাগোপাল, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ। সমন্বয়বাদের দার্শনিক দিকটা নিতাগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দের বাণীতে প্রাধান্য লাভ করেছে, বিশেষ করে কাম-অকাম, কাম-প্রেম, কাম-প্রেম-অকামের সমন্বয় বাণীতে। বেদে সৃষ্টি তত্ত্বের মূল বাণী হচ্ছে সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ স ঐক্ষত একোঽহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়েয়, সোঽকাময়ত স তপোঽতপ্যত। ইদম্ সর্বম্ অসৃজত। আদিতে সেই সৌম্য সেই দেবই ছিলেন। তিনি দেখিলেন আমি একা, ইচ্ছা করিলেন বহু হইব, তিনি প্রজা সৃষ্টি করিলেন। তিনি কামনা করিলেন, তপস্যা করিলেন, এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

এই ভাগবতী কামনার খেলায়, তাঁহার তপস্যায় কি বিচিত্র দ্বন্দ্বময় এই সংসার রূপে রসে, পাপে পুণ্যে কালজ-মন্দয় গড়ে উঠেছে। কিন্তু স্রষ্টা সেই এক তিনি পুরুষোত্তম। সবই তাঁর তপস্যা খেলা, লীলা, মায়া। কাজেই যে সৃষ্টির গোড়ার কথা কাম—স অকাময়ত—সেই সৃষ্টির মধ্যে থেকে আমরা কাম-আখ্যা (কামাখ্যা) আদি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করব? সে যুদ্ধের ফল সুনিশ্চিত ব্যর্থতা। পুরুষোত্তমানন্দ বলেন, 'কাম নাই এমন কোন জীব আছে কি? ভালবাসে না এমন কোন প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব কি? নিজেকে, নিজের কাম ক্রোধকে, নিজের হিংসা অহিংসাকে সকলেই ভালবাসে'। তথাপি "কামাসক্ত যে সব দেহী দেহ নিয়া, কাম নিয়া ব্যস্ত, কাম যাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া হৃতবীর্য করিয়া ঘুণ ধরা বাঁশের মত করিয়া দিয়াছে" (তাহাদের সান্ত্বনা কোথায়, পরিত্রাণ কোথায়?) ভাগবত বলেন—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিত।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

(এই কামদুর্গত) মানবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তিনি (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণরূপে) মানব দেহ ধারণ করিয়া তাহাদেরই মত লীলা করিয়াছেন (এমন ভাবে যে) তাহারা তাঁহাকে (পুরুষোত্তমকে) পর বা শ্রেষ্ঠ আদর্শ জানিয়া সেইরূপ হয়।

ভগবিতায় সোঽহম্যস্ত্র দেহীর আকৃতি মায়ার,—জগতের হিতের জন্য তিনি এখানে এই পৃথিবীতে আপন মায়াদ্বারা দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। পুরুষোত্তম কামের বিকৃতি থেকে রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণ লীলায় আপন মদনমোহন রূপ প্রকাশ করলেন।

মদনমোহন : কণ্ব, বিশ্বামিত্র, পরাশর আরো কত সংযমী, তপস্যাপরায়ণ ঋষি ও সাধক পর্যুদস্ত হলেন। সকলে কামজয়ে পলাতক। তাঁরা জয়ে জয়ে কামকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছেন, সংগ্রাম করে কোন পুরুষ নারী-প্রকৃতিকে জয় করে নাই, নারীও পুরুষ-প্রকৃতিকে জয় করে নাই। কামাখ্যা (কাম-আখ্যা) শক্তি সেই চিরন্তনী সংগ্রাম-বাণী নিত্য বলে চলেছেন "যো মাং জয়তি সংগ্রামে···স মে ভর্তা ভবিষ্যতি"।

সামনে আমাদের দুটি আদর্শ আছে—পুরুষোত্তম শিব তিনি মদন দমন, আর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তিনি মদন মোহন। এঁরাই মহামায়া কামাখ্যা শক্তির challange গ্রহণ করে অকামী হয়ে প্রকৃতির ভর্তা হয়েছিলেন। আদর্শ তাই, আমাদের হতে হবে তাই। পুরুষোত্তমানন্দ বলেন, "বিষময় কামের মাতামাতির যে ব্যাখ্যা এতদিন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সৃষ্টির ব্যর্থতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কামের এবং মানব জীবনের যাবতীয় ভালমন্দ বৃত্তির যে একটি ভাগবত রূপ আছে, সেই ভাগবত রূপ আস্বাদন করিবার জন্যই যে মানুষ স্বর্গনরক, দেবযান পিতৃযান ছুটাছুটি

করিতেছে, তালমন্দ সমস্ত বৃত্তির স্বরূপ আস্বাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে মানুষের কিছুতেই রেহাই নাই, কোনও রকমে বৃত্তিনিচয়কে চাপা দিয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠে বা ব্রহ্ম-লোকে পলাইয়া বাঁচিতে চাহিলেও সেখান হইতে একদিন 'কামাখ্যা' বিশ্বশক্তি তাহাকে টানিয়া আনিয়া আবার প্রকৃতির খেলার ভিতরে ছাড়িয়া দিবেনই"।

"কাম সার্বজনীন। সে ক্ষেত্রে সৃষ্টিকে কামভোগ বা কামত্যাগের বীভৎস কৈবল্য হইতে রক্ষা করিতে হয়", "বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কাম প্রবৃত্তির বাস্তব কৌশলকে মানুষের দেশে" স্থাপন করিতে হইবে। "তিনিই মূর্ত্তিমান সুস্থ কাম যাঁহার কাছে জগৎ-সৃষ্টি কামবিকারের মধ্যে পড়িয়া ভাবিয়া চৌচির হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হইতেছে না।" যে কাম অব্যাহত সুস্থ সুন্দর সৃষ্টি করে, সৃষ্টি রক্ষা করে, সার্থকতার সহিত সংহারও করে—তাহাই কামের ভাগবত রূপ। সমন্বয় ধর্ম্মে পুরুষোত্তম-স্তরে কামের এই মদনমোহন রূপের উপলব্ধি হয়। "স্রষ্টা যিনি, তিনি ত কাম-কামনাদ্বারা 'কামী' হইয়া পড়েন নাই, অথচ কাম-বাসনা ছাড়িয়া আমাদের মত অকামী হইতেও চাহিতেছেন না। কামবাসনা ত্যাগ করিলে যে তাঁহার সৃষ্টিই মুছিয়া যাইত।" পুরুষোত্ত-মানন্দের মতে "তাই তিনি যে কৌশলে কাম বাসনা করিয়াও অকামী, আজ সেই কৌশল শিখিবার দিন আসিয়াছে"।

এই পুরুষোত্তম-স্তরে আরোহণের সাধনা হচ্ছে 'সর্ব্ব-ভূতাত্মভূতাত্মা' হওয়া—যাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মতুল্য হইয়াছে। এই কল্যাণময় স্তরে আরোহণের ধাপগুলি হচ্ছে প্রার্থনা, আত্মশুদ্ধি, নিজমনকে সর্ব্বপ্রকার লোভ-মুক্ত রাখা, সেবা-জ্ঞান—যা কিছু তা অন্যের, প্রিয়জনের তথা ঈশ্বরের সেবার জন্য করি। দান, দয়া, উপকার করি—এ ধারণা একেবারে ভুলতে হবে। মনের মধ্যে প্রেম না জন্মালে এই সেবার ভাবটা ঠিক ঠিক ফুটে ওঠে না। প্রেম জন্মগত বন্ধনে—যেমন পিতামাতা পুত্র কন্যা ভাই বোন আত্মীয় প্রভৃতির মধ্যে। ঈশ্বরে এই প্রেমের ভাবটি অর্পণ করলে তাকে বলা হয় বাৎসল্য প্রেম। পরস্পরে সাহচর্য্য, কল্যাণ-ইচ্ছাদ্বারা সৃষ্ট হয় বন্ধুত্ব বা সখ্য। সেবার ভাব প্রবল থাকলে এবং অধিকতর সৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য বোধ হলে, রক্ষক তাদের নির্ভরতা থাকলে তাকে বলে দাস্য প্রেম। গুণ ও মহিমায় মুগ্ধ হয়ে অন্তরে যে প্রেমের সৃষ্টি হয় তার নাম শান্ত প্রেম। পূর্ণ একাত্মতা-বোধ এলে তাকে বলা হয়—মধুর প্রেম। শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রেম যেখানে পরিণতি ও পূর্ণতা লাভ করে, সেই প্রেমই পূর্ণ প্রেম কাম এখানে পরিণত হয়ে অকাম ও প্রেমে বিকশিত। যেমন মেটে সবুজ টক আম পেকে সুন্দর ও সুমিষ্ট হয়। এই হচ্ছে গোপীদের অবস্থা বা পুরুষোত্তম-স্তরের অবস্থা। গোপী প্রেমের মূল আদর্শ পুরুষ, সুন্দরতম পুরুষ, ভগবৎ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিলন কামনায় পরিণত হয়েছে পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণে, একাত্মতায়—যে কৃষ্ণ সেই রাধা, যে গোপী সেই গোবিন্দ, যে কৃষ্ণ সেই ভগবান। তখন 'যাঁহা যাঁহা আঁখি ঘুরে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'। তখন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'। আবার পুরুষোত্তম যেমন নারীও নহেন পুরুষও নহেন এবং উভয়ই, যা কিছু আছে সবই, তাই গোপিকা উত্তম শ্রীরাধা বলেন—

"না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি।"

ঈশ্বরের ভাব-মূর্ত্তি বা তাঁর নরদেহে আবির্ভাবই শ্রেষ্ঠ, প্রিয়তমের গুণসম্পন্ন, চিত্তের সহজ একাগ্রতা সেখানে জন্মায়, জগৎ-হিতার্থে লোকশিক্ষার জন্য নরদেহে শ্রীভগবানের রাধারাণীর আবির্ভাব হয়। ভাগবত বলেন,

"অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"

সঙ্গে সঙ্গে দেহগ্রহণ করেন লীলাসহচরগণ—সেই সব অগ্রগামী সাধক ভক্ত জ্ঞানী কর্ম্মী যাঁরা আদর্শ স্থাপন করবেন। এঁরা যুগে যুগে এসেছেন, আবার আসবেন। প্রহ্লাদ, অর্জুন, মহাবীর, বিদুর, রামকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, মীরাবাঈ, নিমাই, ব্যাস, নরেন এসেছেন, হয়ত আবার আসবেন। এদের আবির্ভাব কাহিনী নয়, ইতিহাস। মধুর ভাবের সাধনা, পুরুষোত্তম হওয়ার সাধনা বাস্তব সত্য। ঐতিহাসিক যুগে আমরা দেখেছি ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মনিবেদন

ও একান্ত হওয়ার সাধনায় অনেক সাধকের দেহ হতে যোনী-চিহ্ন লুপ্তপ্রায় হয়েছে, মধুর ভাবের সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ নারীত্ব প্রাপ্ত হয়ে ছিলেন।

পুরাণে আছে দণ্ডকারণ্যে ঋষিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে ভাগবত মাধুর্য আস্বাদনে অভিলাষী হয়ে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মিলন প্রার্থী গোপী ভক্তগণের তিনটি বিভাগ—শ্রুতিচরী, ঋষিচরী ও দেবীচরী। বহু জন্মের তপস্যার ফলস্বরূপ উক্ত ঋষিগণ গোপী দেহ প্রাপ্ত হন। আত্মার কোন লিঙ্গ নাই। এক জন্মে যিনি পুরুষ জন্মান্তরে তিনি নারী হতে পারেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত হয়েছেন। বর্তমানে আমরা একই জীবনে নারী পুরুষের লিঙ্গান্তর দেখছি। ঋষিচরী গোপীগণ রামাবতারে ঋষি ছিলেন। "যে সমস্ত শ্রুতি ব্রহ্মকে রসরূপে, মধুরূপে, কুমাররূপে, আনন্দরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সেই শ্রুতিবৃন্দ আনন্দ-ব্রহ্মকে পরিপূর্ণরূপে আস্বাদনের জন্য যুগ যুগান্তরের সাধনায় শ্রীবৃন্দাবনে গোপীদের প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" * ইহারা শ্রুতিচরী গোপী। "শ্রীভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন, তাই দেবকুমারীগণকে আদেশ করিয়া ছিলেন তোমরা গিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গোপকন্যারূপে আবির্ভূতা হও। দেবকুমারীগণও সে আদেশ পালন করিয়া ছিলেন" ইহাদের নাম দেবীচরী। এই তিন শ্রেণীর গোপীগণের অপর নাম ঋষিপূর্বা, শ্রুতিপূর্বা ও দেবীপূর্বা। এখন দেখা যাইতেছে কষায় ও টক রস ফল যেমন কালক্রমে রৌদ্র, রস ও বায়ুর সহায়তায় মধুময় হইয়া রসময় হইয়া পক্ক হয়, তেমনি কামও সেবা, ত্যাগ, ভালবাসা ও আদর্শ ভাবের ঈষায় শুষ্ক শুষ্ক ও পরিণত হইয়া অকাম ও প্রেমরূপে পরিণত হয়। যে কুঁড়ি সেই ফুল। পুরুষোত্তম-দর্শনে সমন্বয়বাদে ইহাই সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য ও কঠিন সমন্বয়-বাণী। ভাগবতে আছে কৃষ্ণ সকল গোপী অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন; তিনি জন্ম হইতে মাত্র দ্বাদশবর্ষ কাল বৃন্দাবনে ছিলেন। এই আনন্দ রসঘন বিগ্রহকে গোপীগণ দেহ, মন, প্রাণ দিয়া মন্থন করিয়া আস্বাদ করিয়া ছিলেন। এই রসাস্বাদের মধ্যে যদি আত্মসুখ বাসনা না থাকে, সেবা ও সমর্পণ থাকে, তবেই তা গোপী-প্রেম হবে। ভাগবতে আছে দোল উৎসবে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ মেঢ্রসরকে বধ করেন। মেঢ্র অর্থে যোনী। কামোত্তীর্ণ কামদেব শ্রীকৃষ্ণই রাধারমণ। গোপালতাপনী তন্ত্রে আছে গোপীগণ যমুনাকে বলিয়া ছিলেন "হে যমুনা, কৃষ্ণ যদি ব্রহ্মচারী হন তবে তুমি আমাদিগকে পথ করিয়া দাও"। যমুনা তাঁহাদিগকে অগভীর জল মধ্যে পথ করিয়া দেন।

আসল কথা অকামী হইয়া কর্মকরা। কর্মে উৎসাহ থাকিবে, সেবাবুদ্ধি থাকিবে, অপক্ষপাত ও ফললাভ লোভহীন চিত্তে ভগবদ্বিশ্বাস হইয়া কাজ করিতে হইবে। শরৎকুমার তাঁহার শ্রীপুত্রকে গভীরভাবে ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের অতীব দরিদ্র সংসারে এমন আদর্শ ও মধুর সম্পর্ক ছিল যে তিনি সন্ন্যাসী হওয়ায় চারণ কবি মুকুন্দ দাস বলেছিলেন, "আমি তোমার গেরুয়া খুলে নেব, বৌদি কি অন্যায় করেছেন যে তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ"। শরৎকুমার উত্তর দিয়েছিলেন, "সন্ন্যাসী হয়ে আমি ত তোমার বৌদিকে ত্যাগ করিনি"। পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর স্ত্রীকে এক পত্রে লিখেছেন "জগৎকে যে না ভালবাসে সে কি কখন নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে? শুধু তোমাকে ভালবাসা মোহ..... একটাতে আটকাইয়া থাকিবার নাম মোহ। আবার শ্রীভগবানে আটকাইয়া থাকিবার নাম প্রেম। কাম স্বার্থযুক্ত; প্রেম বৈরাগী, উহা কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে আসক্ত না করাইয়া শ্রীভগবানের ভিতর দিয়া জগতের সঙ্গে মিলন করায়। স্বামীকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ কর"। কাম প্রেম ও অকামের এক আদর্শ সমন্বয় মূর্তি ছিলেন পুরুষোত্তমানন্দ।

---

* শ্রীশ্রীরাসলীলা—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—যুগান্তর পত্রিকা—২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯

সমন্বয়বাদের একটি বড় সূত্র মহাধ্বনি দুর্বাপার বাণীতে প্রকাশ পেয়েছিল, যাহারা কামের দ্বারা (১) কাম (২) কামনা করে (৩) তাহারা কামী (৪) আর যাহারা অকামদ্বারা (৫) কাম (৬) কামনা করে (৩) তাহারা অকামী (৭)। *

পুরুষোত্তমবাদ বা সমন্বয়বাদ জটিল দার্শনিক তত্ত্ব মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা সাধারণ মানুষের অবোধ্য বা আচরণ সম্ভাবনার বাহিরে নয়। বস্তুতঃ আজিকার এই দ্বন্দ্বনিপীড়িত বিশ্বে সমন্বয় ছাড়া গতি নাই। সকল রোগের ঔষধ যেমন কাল্পনিক অমৃত, তেমনি সকল দুঃখদুর্দশা ও বৈষম্যের প্রতিকার সামাবাদে এরূপ বলা হচ্ছে। কিন্তু সামাবাদীগণের মধ্যেই অসামঞ্জস্য হলাহল সবচেয়ে প্রকট। প্রত্যেককে যার যার যোগ্য মর্যাদায় রেখে সকলের কল্যাণে ঈশ্বর-নির্ভর যে সেবাধর্মী সমাজ, তাই-ই আদর্শ। একমাত্র সমন্বয়বাদের বাস্তব প্রয়োগে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে তা সম্ভব। যে জীবন-দর্শন কাম-প্রেম-অকামের মত বিষয়কে সমন্বিত করতে পেরেছে, তার পক্ষে বিশ্বের সকল দ্বন্দ্ব, কোলাহল ও অশান্তির নিরাকরণ অবশ্যই সম্ভব ও সাধ্য। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আমাদের দ্বন্দ্বক্লান্ত সমাজকে আজ প্রেম ও সমন্বয়ের পথে পরিচালিত করুন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ৮৭তম জন্মদিনে

।। শ্রীশান্তশীল দাশ ।।

তোমার স্মরণ-সভা বহু ভক্ত জনের সঙ্গমে :
আমার মানস-যাত্রা সেই তীর্থে নিঃসঙ্গে একাকী।
বসে থাকি একপাশে শুনি কথা কত না জনের,—
সেই তীর্থ পূর্ণ হয় তোমার জীবন-আরতিতে।

দিনের অজস্র গ্লানি ভুলে যাই : শুনি কান পেতে
বহু জীবন-কথা, বিচিত্র রঙের আলিম্পন,
নানা মনে নানা রঙ, সে-রঙের সমন্বয় তুমি,
সেই সমন্বয়রূপ তোমা মাঝে মহিম মণ্ডিত।

মনে পড়ে যায় : আমি দেখেছি যে ওই রূপখানি,
আর কানে শুনেছিও কত কথা, জীবনের কথা ;
প্রাণপদ সেই বাণী আজো যেন শুনি মাঝে মাঝে।
সে-বাণীর আলোচনা চলে ওই স্মরণ-বাসরে।

ওই তীর্থ কী পবিত্র! ওইখানে ছিলে একদিন,
আজ নেই ; ধূপ নিবে গেছে তবু কত না সৌরভ ;
সে-সৌরভে তৃপ্ত হয় মন প্রাণ ; অনেক আঁধার
মোচায় সে, এনে দেয় কত আশা, কত না সান্ত্বনা।

নিয়ে আসি সে সান্ত্বনা অনেক তিমির-অন্তকারী,
আমার মানস-যাত্রা ফলপ্রসূ ওই তীর্থে এসে ;
রেখে আসি অন্তরের শ্রদ্ধানত প্রণাম-অঞ্জলি,
যেখানে অনেক ভক্ত দেয় অর্ঘ্য, সে-সভার সাথে।

---

* (১) আত্মসুখ ইচ্ছা করিয়া (২) নারী বা বিষয়রূপ ভোগ্য (৩) পাইতে ইচ্ছা করে (৪) বাসনা তৃপ্তির জন্য ভোগী (৫) আত্মসুখ-ভোগের অভিলাষ না রাখিয়া (৬) আদর্শ বা উদ্দিষ্ট বিষয় বা ব্যক্তির সহিত মিলন (৭) বৈরাগ্যবান বা প্রেমী।

অবধূত পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস ॥

ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীনিত্যগোপালায়

"শ্রীনিত্যগোপাল পরম রূপবান। চম্পক এবং গলিত স্বর্ণের ন্যায় তাঁহার সুন্দর কান্তি। তাঁহার মুখপদ্ম হইতে আনন্দ স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডলে কোটি কোটি প্রজাপতি-বিনির্মিত তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য। তাঁহার নিরুপম মহাভাবের তুলনা নাই। তিনি জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানানন্দ। সমস্ত দিগ্‌ভাগই তাঁহা হইতে বিকশিত হইয়া থাকে। তাঁহার নলিন নয়নদ্বয়ে কত কমনীয় জ্যোতিঃ বিলসিত রহিয়াছে। তিনিই মহানির্বাণের কারণ। তাঁহার কৃপাতে কত পতিত জীবও পরম ভক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিভূতি নিচয়ের মধ্যে পরাভক্তিও একটি বিভূতি। তিনি যে পরম প্রেমিক। সর্ব্ব জীবে তাঁহার প্রেম আছে। তিনি পরম দয়াল। তাঁহার অহৈতুকী দয়া। তিনি নিত্যানন্দ ব্রহ্ম সনাতন। সমস্ত বিধি নিষেধ তাঁহার কিঙ্করস্বরূপ। তিনি সর্ব্বশক্তিমান; তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার চিন্ময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করি।"
—ইহা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের স্বহস্ত-লিখিত আত্মধ্যান।

১২৯০ সনের কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীনিত্যগোপালের ইচ্ছায় অবধূত পুরুষোত্তমানন্দ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ১৪ বৎসর কাল শ্রীনিত্যগোপালের ঐ চিন্ময়ী মূরতি ধ্যান করিতে করিতে শ্রীনিত্যগোপালের লীলা-সহচররূপে শ্রীনিত্যগোপালের লীলা-কর্ম করিয়া ১৩৬৪ সালের ১৮ই চৈত্র মরদেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীনিত্যগোপালের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবনখানিই ছিল "শ্রীনিত্যগোপাল-ধ্যান"-এর বাস্তব মূরতি। শ্রীনিত্যগোপালের ধ্যানের সঙ্গে মিলাইয়া স্বামিজীর জীবনখানি আলোচনা করার চেষ্টা করিব। মানুষ কোন বস্তু সম্বন্ধেই ধারণা করিতে পারে না যদি তার সামনে ঐ বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত না থাকে। ইংরেজী human being শব্দটি একটি চমৎকার অর্থ-প্রকাশক শব্দ। "Be" অর্থ হওয়া, "be" হইতে "being" শব্দ নিষ্পন্ন। Human being শব্দের মধ্যে মানুষ হওয়ার কথাই নিহিত আছে। মানুষ যে কতদূর 'হইতে' পারে তাহার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণ-জীবন, আর এই যুগের শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন। শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন যাহা তাঁহার ধ্যানের ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে উহা পর্য্যালোচনা করিলেই পরিপূর্ণ একটি আদর্শ মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এই আদর্শ মানুষ শ্রীনিত্যগোপালকে অনুসরণ, আচরণ ও ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তমানন্দ কতখানি শ্রীনিত্যগোপাল-রূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝিবার প্রয়াস পাইব।

আজ কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার দৃষ্টান্ত-জীবন ও বাস্তব দর্শন আলোচনা করার জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি। আমার ক্ষুদ্র আধার, ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা দিয়া স্বামিজীর বিরাট জীবন, মহা বিপ্লবী জীবন সম্বন্ধে কি বলিব, আর কি শুনাইব? তথাপি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমার এই অভিকিঞ্চিৎকর অবতারণা।

আমার ছাত্র-জীবন হইতেই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আমার একটা টান ছিল এবং অংশও গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সময়েই বরিশালের পরৎ ঘোষ নাম সারা বাংলারই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল একজন বিশেষ রাজনৈতিক নেতা এবং শ্রেষ্ঠ বাগ্মী রূপে। তাঁহার সম্বন্ধে আমার জানাও তখন ঐ পর্য্যন্তই। "করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে"—আমারও যেন তদ্রূপ অবস্থা, একটা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার চরণে আসিয়া পড়িলাম। ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসে বাংলা ভাগ হইয়া দেশ স্বাধীন হইল। আমার জন্মভূমি ও কর্ম্মভূমি ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল পাকিস্তান হইয়া যাওয়াতে ভগ্ন হৃদয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী

মাসে কলিকাতায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য সপরিবারে চলিয়া আসি। আমার ছোট ভগ্নী ও তাহার স্বামী পূর্ব হইতেই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের চরণাশ্রিত ছিল। তাদের উপলক্ষেই আমি প্রথম স্বামিজীর দর্শন লাভ করি। বরিশালের পরম যোগী যে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তাহাও তখন জানিতাম না—এত অজ্ঞ ছিলাম তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু প্রথম যেদিন তাঁহাকে দর্শন করি, তখন দর্শন করামাত্রই চৈতন্যচরিতামৃতের একটি শ্লোকের কথা আমার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। "যাঁহাকে দেখিলে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়, সেইজন বৈষ্ণব জানিহ নিশ্চয়"। ইনিই তো সেই চৈতন্য চরিতামৃতের নির্দিষ্ট বৈষ্ণব মূরতি—তাঁহার সান্নিধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইয়াছিল, ইনি যে "আমার কত আপন আগে জানিনি"। অন্তরে মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করিলাম আমি যেন কত সহজ কত সরল কত নির্ভয় হইয়া গিয়াছি, আনন্দময় হইয়াছি। তাঁহার ঐ অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ, চম্পক ও গলিত সুবর্ণের ন্যায় কান্তি, মুখখানি আনন্দোজ্জ্বল, অথচ দেখিলেই মনে হয় কিসের যেন চিন্তার আবেশে মগ্ন। আমি সান্নিধ্যে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার ঐ বঙ্কিম আঁখি দিয়া আমার সর্বাঙ্গ যেন ধুইয়া পাখালিয়া দিলেন। সেদিন তিনি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আর আমি বা তাহার কি উত্তর দিয়াছিলাম তাহা এক বর্ণও আমার মনে নাই। শুধু যে ভাবের বন্যা আমার মধ্যে খেলিয়া গিয়াছিল তাহাতেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অতি সুন্দর অতি চমৎকারী কোন কিছু দেখিলে যেমন মানুষ "দেখ দেখ" বলিয়া উপস্থিত অন্য সকলকে দেখাইতে চেষ্টা করে, কোন সুন্দর মনোহারী কথা শুনিলে যেমন স্বতঃই hear hear, শুনুন শুনুন করিয়া অপর সকলকে শোনাইতে চায়, আমারও যেন তদ্রূপ অবস্থা হইল। আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যাহাদের আধ্যাত্মিকতার দিকে কিছু আকর্ষণ আছে তাহাদের অনেককেই চৈতন্য-চরিতামৃতের ঐ শ্লোকটি বলিয়া স্বামিজীকে দর্শন করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলাম এবং বহু জনকে দর্শন করাইয়াও আনিয়াছিলাম। বহুর বস্তুর বুঝি ঐরূপ স্বভাব। একলা একলা একান্ত করিয়া আস্বাদন করা যায় না। তাই বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই সে যেখুন দেখুন, শুনুন শুনুন বলিয়া সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া আস্বাদন করিতে চায়। ধনের, পরম ধনের ইহাই রূপ। সেই হইতে পুরুষোত্তমানন্দের কাছে আমার আনাগোনা চলিতে লাগিল—উদ্বোধনাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা কিছু কিছু পড়িতে লাগিলাম, বিস্ময়ও বাড়িতে লাগিল।

সন্ন্যাসী, জীবনে প্রচুর না হইলেও, বেশ কিছু সংখ্যক দেখিয়াছি ও তাঁহাদের সান্নিধ্যও লাভ করিয়াছি। দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য আমাদের লাঞ্ছনা-বরণকে তাঁহারা প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন এবং আমাদের স্নেহও করিতেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এই সকল আন্দোলন ইহ জাগতিক ব্যাপার বলিয়া পরকালের সাধক হিসাবে সন্তর্পণে রাজনীতি হইতে নিজেদের দূরেও সরাইয়া রাখিয়াছেন। দেখিলাম পুরুষোত্তমানন্দ ব্যতিক্রম। তিনি শুধু স্নেহ বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তিনি প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া সকলের সঙ্গে নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, এতকাল দেখিয়া আসিয়াছি সন্ন্যাসী যাঁহারা তাঁহাদের সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে নাই, এমন কি পিতামাতা জন্মভূমির পর্যন্ত পরিচয় দিতে নাই। পুরুষোত্তমানন্দকে দেখিলাম স্ত্রী পুত্র সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়াই সন্ন্যাস জীবন যাপন করিতে তাঁহার আটকাইতেছে না। এমন কি পূর্বাশ্রমের নাম ধাম ও তাঁর পিতার নামে পরিচয় দেওয়াতেও তাঁহার কোন কুণ্ঠা নাই। এ আবার কেমন সন্ন্যাসী—এ যে একেবারেই নতুন ধারা। প্রচলিত ধারা অনুসারে তাঁহাকে একান্ত সন্ন্যাসীও বলা যায় না, কেননা তাঁর স্ত্রী পুত্র সংসার তাঁহার সাথেই আছে। আবার তাঁহাকে একান্ত গৃহীও বলা যায় না, কেননা তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া আশ্রম করিয়াছেন। ঘরকে বাহির করিয়াছেন, বাহিরকে ঘর করিয়াছেন। ঘরও বুঝি, বাহিরও বুঝি। কিন্তু একই সঙ্গে ঘরেও আছি বাহিরেও আছি এ ভাব তো বুঝি না। ইহার কিছুদিন বাদে আর একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল। আমার ছোট ভগ্নী, স্বামিজীর শিষ্যা শ্রীমতি সুনীতি, যাহাকে তিনি নীলু বলিয়া ডাকিতেন, সে

গুরুতর অসুস্থ হইয়া আমার দক্ষিণেশ্বরের বাসায় আসিল। তৎকালের শ্রেষ্ঠ স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও শল্যচিকিৎসক ডাঃ সুধীর চন্দ্র বসুর চিকিৎসাধীন হইল। ডাঃ বসু সে সময়ে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ইডেন হাসপাতালের সার্জন সুপারিনটেনডেন্ট। তিনি শ্রীমতি সুনীতিকে পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রোপচার করিলেন। অস্ত্রোপচারটি এত জটিল ও কঠিন ছিল যে অস্ত্রোপচারের পরে শ্রীমতি সুনীতি মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। ঐদিন অস্ত্রোপচারের দিনই বৈকালে আমার গুরুপত্নী শ্রীযুক্তা বেণু মিত্র ও প্রতিবেশি সহ স্বামিজী শ্রীমতি নীলুর শিয়রে বসিয়া কিছুক্ষণ প্রার্থনা মঙ্গল ইচ্ছা ও আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন। চলিয়া যাইবার আগে আমাকে হাসপাতালের বারান্দায় ডাকিয়া আনিয়া আমার হাতে কয়েকটী টাকা গুঁজিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, বাবা, তুমি নীলুর জন্য কতকিছু করিতেছ, আমি তো কিছুই করিতে পারিতেছি না, অথচ আমার যাহা কিছু করা উচিৎ। কিন্তু সামর্থ্য নাই এটা নীলুর কাছে লাগাইও। তাঁহার সে যে কি ব্যাকুলতা শিষ্যের জন্য, শিষ্যের বিপদে তাঁহার ইহজগতের ধন সম্পদ, তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি সমস্তই তিনি যেন নিঃশেষে ঢালিয়া দেওয়ার জন্য আকুল। তাঁহার সে দিনের ঐ মূর্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। গুরু অনেক দেখিয়াছি—শিষ্যরাই গুরুকে অর্থ প্রণামী দিয়া থাকেন—আর গুরু যেন শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। এ গুরু আবার কেমন গুরু যিনি শিষ্যের বিপদে শুধু শুভ আশীর্বাদ দেন না, অর্থ-সাহায্যও করিয়া থাকেন? এ ব্যবস্থা যে শুধু নীলুর বেলায়ই হইয়াছে তাহা নয়—পরবর্ত্তী সময়ে আমার জীবনেও ঐরূপ ঘটিয়াছে। এই আকুলতা, এই ব্যাকুলতা, এই প্রেম এবং এই সর্বস্বপণ যে শুধু তাঁহার শিষ্যদের জন্য তাহাই নয়, শিষ্য অশিষ্য নির্বিশেষে সকলের জন্যই তাঁর হৃদয় উদ্বেল হইত। যিনি দেহ মন প্রাণ ও সর্বস্ব ব্যয়ে অকুণ্ঠ, তাঁর অসাধ্য তো কিছুই নাই। তিনিই তো সার্থক প্রেমিক। সর্ব জীবেই তাঁহার প্রেম। তাঁহাকে বুঝিবার মত জ্ঞান বুদ্ধি আমার নাই—দ্বিতীয়তঃ এ বস্তু বুঝিতে হইলে হৃদয় দিয়া বুঝিতে হয়। সে হৃদয়, সে প্রাণই বা আমার কোথায়? তাঁহার এই মূর্তি বুঝিতাম না। কিন্তু কেন যেন ভালও লাগিত। শেষ পর্য্যন্ত ১৯৫৪ সনে তাঁহার কাছে আমি দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। দীক্ষা লওয়াও একটি অপূর্ব্ব ঘটনা। দীক্ষার আসনে বসিয়া প্রথমেই তিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথের "দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন ওরে দীন, ওরে উদাসীন" বলাকার এই কবিতাটি পড়িতে দিলেন যাহাতে সর্ব সংস্কার মুক্ত হইয়া বিপ্লবের জন্য যাত্রার আহ্বান। পড়া শেষ হইলে বলিলেন, "এই আমার কথা। নূতন যুগের সূচনায় একটী দার্শনিক বিপ্লব সমাজের সামনে উপস্থিত করিতে হইবে। ইহাকে স্মরণ রাখিয়া চলিও"। তারপর বীজ-মন্ত্র দিলেন। অতি অনাড়ম্বর ভাবে দীক্ষা দান কর্ম সমাধা হইল। সেই হইতে আমি তাঁহার জন হইলাম। তাঁর অহৈতুকী দয়া লাভে ধন্য হইলাম। সান্নিধ্যও আগের চাইতে স্বভাবতঃই কিছু বেশী পাইতে লাগিলাম। যতই তাঁহাকে পাইতে লাগিলাম ততই যেন না পাওয়ার অনুভূতি আসিতে লাগিল। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, বাস্তব জ্ঞান, তাঁহার শ্রীনিত্যগোপালে ভক্তি, শ্রীনিত্যগোপাল-তত্ত্বের জন্য আবেগ এমন স্তরের যে তাঁহার ঐ অবস্থার সম্বন্ধে ধারণা করা আমার সাধ্যাতীত—আমার অবস্থা "ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পারি"। আমি আসক্তি বিদ্বেষের স্তরের মানুষ, কেমন করিয়া তাঁর করুণা ব্যতীত, তাঁকে ধরিতে পারিব। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে দেখা দিলেই না, ধরা দিলেই না ধরিতে পারি?

স্বামিজী ছিলেন এমন-এক স্তরের মানুষ যিনি কোন বিশেষ অবস্থার মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার জীবনের সকল বৃত্তি—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি—সকলই ছিল অথচ জীবনের কারণে জীবন রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য। তাই তাঁহার জীবনে, প্রতিটি চিন্তায় ও কর্মে নিয়ম, বিধি ও নিষেধ ছিল তাঁহার জীবন-বৃদ্ধির সহায়ক ও কিঙ্কর রূপে। তিনি কোন প্রকার বিধি নিষেধেরই বশীভূত ছিলেন না। তাঁহার জীবনের উৎস ছিল শ্রীনিত্যগোপাল, যিনি ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দতে। সেই

পুরুষোত্তম-বস্তুর ধ্যানে তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন যে শ্রীনিত্যগোপাল-কথা ও শ্রীনিত্যগোপাল-কর্ম ছাড়া তাঁহার আর কিছুই ছিল না। ইহাই তো জাগ্রতের স্তরে সমাধি। ব্রহ্মপুরুষ "নিত্যগোপাল" ভাবিতে ভাবিতে তিনি "ব্রহ্মৈব ভবতি" হইয়াছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ ব্রহ্ম সনাতনই হইয়াছিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন সর্ব সংস্কার মুক্ত, মহান বিপ্লবী। বিপ্লবী দলের সঙ্গে, স্বাদেশিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও স্বামিজীর মত সর্বাবস্থায় বিপ্লবী, সর্ব সংস্কারমুক্ত পুরুষের সঙ্গে আর আমার ইতি পূর্বে দেখা হয় নাই। এই জীবনই তো দৃষ্টান্ত রূপে আমাদের পথ প্রদর্শক। যদি সত্যই আমরা ব্যক্তি-জীবনে, সমাজ-জীবনে বিপ্লব চাই তবে শ্রীনিত্যগোপাল-চরণাশ্রিত পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-পথ গ্রহণ করিতে হইবে।

আমি বেশী কথা বাড়াইব না। তাঁর কথা বলিয়া, দীর্ঘদিন ধরিয়া অজস্র ধারায় বলিয়াও শেষ করা যাইবে না। তাঁহার জীবন-দর্শনের তত্ত্বের দিক লইয়াও আমি এখানে আলোচনা করিব না। তাঁহার তত্ত্ব তিনি এগারখানা উপনিষদের ভাষ্যে, গীতার ভাষ্যে, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এবং অন্যান্য বহু লেখার মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। শুধু আমার আপনাদের কাছে আবেদন যদি আপনারা সত্য সত্যই তাঁহার সমন্বয়ের বার্তাকে আজ যুগের পরম প্রয়োজন বলিয়া বোধ করেন, তবে আসুন আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার কথাকে সকলের মাঝে ছড়াইয়া দেই, লুট লাগাইয়া দেই, হরির লুট দেই। তিনি চলিয়া যাওয়ার আগে কতবার যে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "কাজ রেখে তপনিধি কারে দিয়ে যাব"। আপনারা তাঁহার দুঃখ-ভার লাঘব করিতে অগ্রসর হইলে তাঁহার আত্মা তৃপ্তি লাভ করিবে। অনেক বক্তা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন। সুতরাং সময় আর লইব না। আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার সকল সত্তা দিয়া তাঁহাকে বন্দনা করি—"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ সংকীর্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ পাদপদ্মম্।"

স্বামী-পুরুষোত্তমানন্দ-স্মরণে

॥ শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী ॥

ওঁ নমো ভগবতে শুদ্ধ ভগবতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবৎ পুরুষোত্তমায় নিত্যগোপালায়।

ওঁ আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতঃ
সংকীর্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষং
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।

আজকের এই শুভ দিনটী মানব-ধরণী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জন্ম পরিগ্রহের দিন। তাঁর মত মানুষের দেহ-ধারণের বিশেষ তাৎপর্য আছে বলেই এই দিনটাতে আমরা সকলে মিলেমিশে তাঁর জীবন-কথা আলোচনা করব, এবং তাঁর সারা জীবনের প্রদর্শিত পথে জীবন যাত্রার প্রয়াস পাব। পুরুষোত্তমানন্দ এসেছিলেন আমাদের মত নিছক খাওয়া পরা ভোগ সুখের জন্য নয়, আবার কৃচ্ছ্র-সাধকের মত এই খাওয়া পরা, ভোগ সুখকে হেয় বুদ্ধিতে জীবন থেকে বাদ দিয়ে নিছক মুক্তির পথের সন্ধান দিতেও নয়। পুরুষোত্তমানন্দ ভোগকে ত্যাগের সঙ্গে সমন্বয় করেই, বন্ধনকে মুক্তির সঙ্গে সমন্বয় করেই জীবনে অপূর্ব

স্তরের মুক্তির আস্বাদনের খোঁজ দিয়ে গেছেন। তাই দেখেছি স্ত্রীপুত্র তাঁর সঙ্গে থাকলেও তাঁর সন্ন্যাস-জীবন আটকায় নি, ভারত মাতার শৃঙ্খল মুক্তির আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করতেও কিছু বাধা হয় নি। আবার কায়া-জীবনেও তাঁর মুক্তি-আস্বাদন ব্যাহত হয়নি। বন্দী দশায়ও তিনি বেদান্ত উপনিষদ ভগবৎ গীতার অভিনব ভাষ্য রচনায় মানব সমাজের মহা কল্যাণকর পথ-নির্দেশ রেখে গেছেন।

অতি শিশুকাল থেকেই আমরা স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে পাই একটী সুন্দর দ্বন্দ্ব-বোধের খোঁজ। তাই বালক শরৎকুমার ঘোষ পিতার সঙ্গে কোন কারণে মতের অমিলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন। জনৈকা বৃদ্ধা তাঁকে সারাদিন অভুক্ত দেখে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করাতেও তিনি খান নি। বলেছিলেন, এ গ্রামে যদি খেতে হয় তবে বাবার অন্নই খাব। নতুবা বাবাকে অপমান করা হবে। মতের মিল না হলেও পূজনীয়কে শ্রদ্ধা না করা জীবনে কত বড় ত্রুটি, এ বোধ তাঁর বালক বয়সেই ছিল। পরবর্তী কালে তাঁরই জীবন-দেবতা ভগবান শ্রীনিতাগোপালের স্পর্শে তাঁর শুষ্ক জীবনখানি পুরুষোত্তম দ্বন্দ্বে দিব্য জীবনের অধিকারী হয়েছিল।

মানুষের জীবনের পরম কাম্য বস্তু হল আনন্দ আস্বাদন। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ প্রতি মানুষকে এই আনন্দের অধিকারী হবার পথের খোঁজ দিতে এসেছিলেন। তিনি সকল অবস্থায় কেতরেই আনন্দ আস্বাদন করতেন। তাই নাটকের চরিত্রের মত তিনিও সবসময় বলতে পারতেন আমরা মজা করে কষ্ট করব। সকল রকম কষ্টের মধ্যেও যে মজা করে থাকা যায় তাঁরই শিক্ষা আমরা পুরুষোত্তমানন্দের কাছ থেকে পেয়েছি। ভালতে মন্দতে কিছুতেই তাঁর জীবনের আনন্দের আস্বাদন ব্যাহত হয়নি। তবে কি তাঁর জীবনে কোন ব্যথা কোন দুঃখ ছিল না? বেদনা তাঁর খুব ছিল। যে ভাগবতী আনন্দ, যে সর্বা সমন্বয়ের আনন্দ তিনি জীবনে পেয়েছিলেন তা মানুষের জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানে পৌঁছে দিতে না পারায় বেদনায় তিনি গভীর ভাবে কাতর ছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শনে আমরা পেয়েছি সর্বা মানুষকে, সে যে কোন স্তরেরই হোক না কেন, মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সামগ্রিক সমাজ-জীবনে সুস্থ মানুষ গড়ে তোলা। এতখানি সামগ্রিক চিন্তাধারা বর্তমান জগতে মার্কসবাদের চিন্তা-ধারায় ব্যাখ্যাতেও পাওয়া যায় না। তাঁর কাছে কোন দল বা গোষ্ঠী হিসাবে মার্কামারা চিরস্থায়ী চিহ্নিত কোন সিদ্ধান্তই সত্য নয়। তাঁর কাছে নর-নারী, ধনিক-শ্রমিক উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, অধ্যাত্মবাদী, জড়বাদী বিভিন্ন মানুষ নিয়েই সমগ্র সমাজ, জীবন্ত সমাজ। অধ্যাত্মবাদী ও জড়বাদীও সমাজের একজন। পুরুষোত্তমানন্দ সকল শাস্ত্র মন্থন করে এই সত্যই দেখিয়েছেন যে, প্রতি স্তরই সর্বস্তর। কোন কৌলীন্যই—তা ধনেরই হোক, শ্রমেরই হোক কিংবা বর্ণেরই হোক—এ বিশ্বে চলবে না। প্রতি স্তরের সমন্বয় ছাড়া দেহধারী মানুষের পক্ষে সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন অসম্ভব। একদিকে দেখতে পাই অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ একদিন কর্মকে বন্ধনের কারণ বলে কর্মত্যাগ করেছিল। দীর্ঘকাল এই চিন্তাধারার দুর্বলতার সুযোগে পাশ্চাত্যের জড়বাদ এসে যেন তেন প্রকারেণ কর্ম করে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে আজ উদ্যত। ফলে ভারতবাদী আমরা কর্ম করবার সৌন্দর্যটুকু হারিয়ে ফেলে আজ বিকৃত। একান্ত অধ্যাত্মবাদ ও একান্ত জড়বাদ উভয়েরই কূল থেকে আত্মরক্ষা করে কি ভাবে কর্মকে গ্রহণ করতে হবে, কি ভাবে পরমার্থকে গ্রহণ করতে হবে এ সম্বন্ধে পুরুষোত্তমানন্দ লিখলেন, "দেখিলে মনে হয় কাজ করা খুবই সহজ কিন্তু কর্মের পিছনে রহিয়াছে প্রেমঘন অদ্বৈত জ্ঞানময় নৈষ্কর্ম্য। এই কর্মই ভাগবতী কর্ম, পুরুষোত্তম কর্ম। এই কর্মই বন্ধনহীন। মাটিতে লাঙ্গল চষে আসু, বেতন ও ব্রহ্মজ্ঞান দুই-ই লাভ করা যায়। এই কৌশলের খবর শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত দর্শনে আমরা দেখতে পাই এবং পুরুষোত্তমানন্দ এই তত্ত্বটীই আমাদের কাছে সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন।

স্বামিজী জীবনটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। তাঁর চিন্তার জীবন একটা সামগ্রিক বস্তু। তাঁর কাছে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, সংসার বা সন্ন্যাসের কোন কোঠা-

বিভাগ ছিল না। হৃদয় বৃত্তি দিয়েই এ সকলের মিলন করা যায়। কোন বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি দিয়ে এ সাধনা অসম্ভব। তাই তাঁকে সাধারণের চক্ষে ধরা খুব সহজ নয়। কোন বন্ধনেই তিনি বাঁধা ছিলেন না, এমন কি সন্ন্যাসের বন্ধনেও না। আবার সকল স্তরেই দেখতে পাই পুরুষোত্তমানন্দ তার তার মত হয়ে আছেন।

রাজনীতি ও অধ্যাত্মনীতির দুর্বল অংশগুলি দূর করে সুস্থ রাজনীতি সুস্থ অধ্যাত্মনীতি মানুষকে দেবার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি, কর্ম ও ভক্তি দিয়ে সারা জীবন সাধনা করে গেছেন।

গান্ধীজীর অহিংসার আদর্শ স্বামিজীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি গান্ধীজীর অহিংসাকে শ্রীকৃষ্ণের অহিংসার স্তরে উন্নীত করে এক জীবন-দর্শন গঠন করেছিলেন। গান্ধীজীর অহিংসা এক জায়গায় গিয়ে static হয়ে গেছে, শ্রীকৃষ্ণ-জীবনালোকেই শুধু সে অহিংসা dynamic হতে পারে। এ কথা সত্ত্বেও গান্ধীজীকে তিনি এত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন যে কোন এক ঘটনায় গান্ধীজীকেই তিনি বলতে পেরেছিলেন. I shall fight with Gandhiji in order to maintain his Gandhism। আজ গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরে স্বামীজীর লেখা "গান্ধীজির গঠন মূলক কর্ম পদ্ধতি" নামে বইখানা আপনারা পড়ে দেখবেন। আপনারা এ বইখানি পড়ে উপকৃত হবেন শ্রীমৎ স্বামীজীর সামগ্রিক জীবনের সঠিক ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে তুলে ধরবার মত যোগ্যতা আমার কিছুমাত্রও নাই। তাঁকে যা দেখেছি তা আজ তাঁর জন্ম বাসরে প্রাণ খুলে বলতে পারলে সার্থক হতাম। যতটুকু পেরেছি অসমাপ্ত ভাষা নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি।

এই নরনারায়ণ আশ্রম আজ তাঁরই সমাধি তলে প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে বিশ্বের সকল স্তরের পথ-বিভ্রান্ত মানুষের আশায়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যে জীবন-চেতনা ও জীবন-সাধনার খবর রেখে গেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে নরনারায়ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের আহ্বান জানাই—আসুন ধনিক, আসুন শ্রমিক, আসুন কুলীন, আসুন অকুলীন, আসুন অধ্যাত্মবাদী, আসুন জড়বাদী সকলে হাত ধরাধরি করে জীবন পথে অগ্রসর হব। সকলে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াতে গেলে সকলেরই বর্তমান অবস্থা বদলে গিয়ে নূতন রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তবেই পুরুষোত্তমানন্দ প্রীত হবেন, আমরাও বিশ্ব-দরবারে সার্থক হব।

জয় নিত্যগোপাল
জয় পুরুষোত্তমানন্দ"

শক্তির কার্যই হইতেছে 'জমাট বাঁধা', এবং সেই জমাট বাঁধা বস্তুর প্রয়োগে অন্যকে লুঠ করা। এই শক্তি-ক্ষেত্রকে ভক্তি-ক্ষেত্রে গড়িয়া তোলাই পুরুষোত্তমের প্রয়োজন। ধন যখন শক্তি, শ্রম যখন শক্তি, তখন অবাধ লুঠ অনিবার্য; কিন্তু এই ধন ও শ্রম যদি ভক্তিতে পরিণত হয়, তখন উহারাই করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেবা। ভক্তির মধ্যে রহিয়াছে ভজ্ ধাতু। ভজ্ ধাতুর অর্থ 'সেবা করা' ও 'ভাগ করা'। ভক্তির ক্ষেত্রে আদর্শও ভক্ত, ধনও ভক্ত, শ্রমও ভক্ত। জমাট-বাঁধা (crystalised) যা-কিছুকে বিভক্ত (divided) রাখাই ভক্তিবাদ। তখনই হয় ভজনের পূর্ণ সার্থকতা। ভক্তি নিজের সব কিছুকে লুঠ করিয়া দিবারই মনোবৃত্তি; ইহাই 'হরির লুঠ'।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

প্রবাসীর মন

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

শ্রীমতীর মা বলেন—দীর্ঘদিন হয়ে গেল যে! মনের ভিতরে শুধু এসে প্রায় মাস দুই কাটিয়ে দিলি, এবার তুই যা ছাড়তে কি মন চায় রে। মনের মধ্যে সব সময়ই যে দেব শুধু চিন্তা জেগে থাকে। তবু যে পাঠিয়ে দিতে হয় আমাই যে আমার সেই দূর প্রবাসে একলা পড়ে—ঘরে যে আর সাঁঝের পিদিম জ্বালছে বল। যত সব খোট্টা পাঁড়েদের হাতে খেয়ে কি শরীর থাকে? তার ওপর গরম পড়ে এল প্রায়। এ কটা মাস যে ও সব দেখে বড়ই দুর্ভাবনায়।

শ্রীমতী বলেন—যা বলেছ মা! বড় আপন ভোলা ভয়ডরহীন মানুষটা কখন কি সর্বনাশ ঘটিয়ে বসেন। তোমাদেরই তো দোষ মা—কোথায় কোন্ অজানা দেশে আমায় বিদেয় করে দিলে। যেমন রুক্ষ শুকনো মরুময় দেশ, তেমনই গোঁয়ার মানুষগুলো।

মা বলেন—ও কথা বলিস নি মা! তুই যে আমাদের বড় আদরের মেয়ে। জামাই আমার রাজার মতন জামাই! লোকের কাছে বলতে বুক দশহাত হয়; সভা আলো-করা রূপে গুণে জামাই করেছি। চলই বিদেশ। যেখানে আমার ভোলানাথ সেখানেই যে তোর ঘর মা।

ঠিকই বলেছ মা—ভোলানাথই বটে, ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন শ্রীমতী। তেমনই নন্দী ভৃঙ্গী নিয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ—তফাৎ শুধু অঙ্গে আর ছাই ভস্মটা নেই। সব সময় সাবধান আর ভয়ে ভয়ে থাকা। টুর তো লেগেই আছে। এক জায়গায় স্থির হয়ে কি দশটা দিনের বেশী থাকার উপায় আছে? উটের পিঠে পিঠেই ঘুরে বেড়ায় আমার সংসার। ও তোমরা ভাল করে বুঝবেও না। এত করে বলি মা চল না একবার আমাদের রাজ ঐশ্বর্যটা ভোগ করতে, তা তোমার আর সময়ই হয়ে ওঠে না! জানো মা, সেবার গ্রীষ্মে একটা উট হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে উটওয়ালার জোয়ান ছেলেটার ডান হাতখানা একেবারে চিবিয়ে শেষ করে দিয়েছিলো। মাগো, সে যে কি যন্ত্রণা-কাতর চিৎকার অমন প্রাণবন্ত অসুরের মত দুর্দান্ত ছেলেটার! সে যদি শুনতে মা চোখের জল রাখতে পারতে না! সে যে আমি আজও ভুলতে পারিনি। উট দেখলেই এখন আমার আতঙ্ক হয় মা। মস্ত হাতী দেখিনি তবে এক একটা মদ্দা উট গ্রীষ্মের সময় যা করে সে যদি দেখো। ওরা বলে, 'মত্ত হো গিয়া! দূর হটো! হোসিয়ার হো!' বড় সাবধানে আর ভয়ে ভয়ে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে অভিজ্ঞ উটওয়ালা। তাকে তখন সরিয়ে দেয় জনতার মাঝখান থেকে।

রাতারাতি সেবার ছেলেটাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মুলতানের সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাই, নয়তো কি বাঁচতো ছেলেটা? নেহাৎ পরমায়ু ছিলো তাই না? আহা হা। তার সে যন্ত্রণা-কাতর চিৎকার আজও যে কানে বাজছে। আলো-ঝলমল সন্ধ্যায় কলকাতার সহরে বসেও যে শিউরে উঠলেন তিনি। দুই হাত জোড় করে গৃহদেবতার চরণে প্রণতি নিবেদন করলেন তাঁর জননী প্রবাসী জামাইয়ের কল্যাণ-কামনায়।

শ্রীমতী আবার বলেন, আমি কি সব সময়ই টুরে সঙ্গে যেতে পারি মা? তবে সাধ্যমত চেষ্টা করি বৈ কি। নয়ত রামরতন আছে কড়া হুকুম নিয়ে আমার। কখন কি সর্বনাশ ঘটিয়ে বসেন এই ভাবনায় কি স্বস্তি আছে। কি সর্বনাশটাই না সেবার দু দুটো মানুষের ঘটে গেল। তোমাদের আশীর্বাদের জোরেই না সেবার উনি বেঁচে গিয়েছিলেন!

তুই আর ও সব কথা বলিস নে মা। শুনতে ভাল লাগছে না। ছেলেটা আমার কোথায় কোন্ দূরে একলা

পড়ে রয়েছে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি সবার মঙ্গলই করেন জানে তো কারও অনিষ্ট করেননি—কল্যাণময় সবার কল্যাণই করবেন।

শ্রীমতীকে তখন কথা বলার পেয়ে বসেছে—তিনি আবার বলেন, "জান মা! সেবার সেই ভেবাগারি থ ব ঝড়-এর বাংলোয় বাধা হয়ে আমাদের নীচে শুতে হয়েছিলো, বিশেষ কাজে সেবার চীফ এঞ্জিনীয়ারও এসেছিলেন সস্ত্রীক। তাঁরা শুয়েছিলেন ছাদে। ওঁর শরীরও সেবার বড় খারাপ যাচ্ছিল। তোমাদের আশীর্বাদে যেখানেই যাই মা লোকজনেরা সকলেই বড় ভালবাসে। "লাখ মরে লাখপাল না মরে" এই হল তাদের প্রার্থনা। তারবাবু, ওভারসিয়ার, মুন্সী, চৌকিদার, মালী, বেলদার যে যেখানে থাকে সারা রাত এসে এসে খবর নেয়, মনে ভরসা দেয়। মানুষ কি একা থাকতে পারে? মানুষের স্নেহ শ্রদ্ধা ভালবাসাতেই তো আনন্দ! সেই তো জীবনের পাথেয়! তেমনি অসুস্থ অবস্থায় কাজের কর্তব্যে যেতে বাধা হয়েছেন! ওমা, মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় দেখি আলখাল্লাধারী এক শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ কি এক অজানা গাছের ডাল ঝমর ঝমর নেড়ে নেড়ে গানের মত অদ্ভুত সুরে কি সব মন্ত্র আওড়াচ্ছেন চৌধুরীর মাথার কাছে। ভয়-বিহ্বল হয়ে ডাক দিলুম চৌধুরীকে। অসুস্থ মানুষটা ঘুম ভাঙার বিরক্তিতে ভাল করে কিছু না দেখেই লোকটিকে পাগল ভেবে ধমকে উঠলেন। নির্বাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলুম—মন্ত্র থামিয়ে ডালটি হাতে নাড়তে নাড়তে হন হন করে চাঁদের আলোয় canal এর রাস্তা ধরে ঘুরে গাছপালায় অন্ধকারে তিনি মিলিয়ে গেলেন। ভয়-কণ্টকিত মন নিয়ে কাঠ হয়ে খাটের ওপর ঘুমন্ত চৌধুরীর পাশে বসে রইলুম। গলা দিয়ে স্বর বেরুতে চায় না। বিকট চিৎকারে চারিধার সচকিত করে তুলতে লাগলো কুকুরগুলো। দূর থেকে সসম্ভ্রমে চলে যাচ্ছিল চৌকিদার। চাঁদের আলোয় আমাকে এ ভাবে বসে থাকতে দেখে আর কুকুরের ভাবাভাবিতে কিছু হয়েছে সন্দেহে কাছে এসে দাঁড়ালো সে। বল পেলুম, কণ্ঠে স্বর ফিরে পেলুম একজন জীবন্তের সাহচর্যে।

কেয়া হুয়া মাইজী? বলে সেলাম জানিয়ে সামনে দাঁড়ালো চৌকিদার। কোনও বন্য জন্তু এসেছে নাকি? শুধালো সে।

কম্পিত কণ্ঠে বললুম তাকে সব বৃত্তান্ত রাতের সে কুকুরী প্রহরে। দেখিয়ে দিলুম সেই অজানা আগন্তুকের চলে যাওয়ার পথ অঙ্গুলী নির্দেশে। আরা হো অকুবর—রসুল উল্লা! আপ কুছ ফিকর না করিয়ে—রায় সাহব তনদুরস্ত হো যায়েঙ্গে! আপ বড়ি নসিবওয়ালী হৈ মাতাজী—ওতো পীর সাহব খুদ আয়েথে সাহবকো ঝাড় করনে! খুদা তেরী কুদরত তেরী মেহেরবাণী সবকি জিনগোনী করে।

পরম শ্রদ্ধায় পরম ভক্তিতে তখনও অভিভূত হয়ে সেই আগন্তুকের চলে যাওয়া পথের দিকে মুখ করে হাঁটু মুড়ে নমাজের ভঙ্গিমায় বসলো সেই চৌকিদার প্রাণের প্রণাম নিবেদনে। আমিও জোড় করে প্রণাম নিবেদন করলুম সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে। দেবতার আবার জাত কি? মানুষের শ্রদ্ধাতেই যে তাঁর প্রকাশ। যে ঈশ্বর সেই তো আল্লা! এ যে জগৎগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা!

গোলমালে উঠে পড়েছিলেন চৌধুরী,—স্বপ্ন বলে হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। পরে তিনিও বড় সাহেবের কেয়ার স্বীকার করেছিলেন—মনে পড়ছে কে যেন একজন ছায়ামূর্তির মত মাথার কাছে কি সব বলছিল। ঘুমের ঘোরে আমি তাকে ধমক দিয়ে ছিলুম। শুনতে পাচ্ছি তারপর সে আর দাঁড়ায় নি, হনহনিয়ে চলে গিয়েছিল।

স্তম্ভিত বিরক্ত হয়েছিলেন বড়সাহেব—বলেছিলেন কি রকম মানুষ তুমি চৌধুরী! কে লোকটা একটু ভাল করে জানলেও না? কি মতলবে এসেছিল কে জানে! শুনে শিউরে উঠেছিলেন শ্রীমতী পাশের ঘরে—মনে মনে ক্ষমা চেয়ে ছিলেন এই নাস্তিকের জন্য। সত্যই তারপর কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন চৌধুরী!

রামচৌতরা জায়গাটা নাকি ভারী সুন্দর। বড় মনোরম ছবি এঁকেছেন চৌধুরী তাঁর চিঠিতে। আবার

দুইপারে নাকি দুই মন্দির আছে। মাঝ দিয়ে ইরাবতী নদী। তবু কিছু একটা করার পাওয়া যাবে যাবে মাঝে, সময়টা কাটবে ভাল। বড় নিঃসঙ্গ নিরালা জীবন তাঁদের। দেহাতি লোকেদের সঙ্গে কত আর গল্প করা যায়। কোনও কিছুরই যে মিল নেই তাদের সঙ্গে। কি যেন এক শূন্যতা এক অব্যক্ত বেদনায় মনকে চেপে ধরে। দুটো বাজনার কথা বলার জন্য, একটু আপন জনের মুখ দেখার জন্য মন ছটফটায়। পথ কি একদিনের? পুরো দুটি রাত তিনটি দিন লেগে যায়। কোথাও বা তারও বেশী। আসবো বললেই কিন্তু আসা হয়ে ওঠে না। তাই তো যাবার সময় বড় মন কেমন করে। মনে মনে প্রার্থনা করেন তিনি যেন সবাই ভাল থাকেন, ফিরে এসে যেন সবাইকে দেখতে পান আবার। প্রিয় জনেরা গোপনে গোপনে চোখের জল ফেলে বিদেয় দেন। প্রিয়জনকে যে হাসি মুখেই বিদেয় দিতে হয়। চোখের জল যে অবলাশ আনে।

মা যাবার মনে চিরদিনই রয়েছে এই প্রবাসী কন্যাটির জন্য উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। শ্রীমতীরও মন মাঝে মাঝে দোটানায় দোলে—তবু যেতে হয়, সেইখানেই যে তাঁর আপন ঘর। একটি নিঃসঙ্গ মানুষ তাঁরই ফেরার পথ চেয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। কখনও কোন কিছু নিয়ে জোর করেন নি, নিজের মত খাটান নি। একান্ত নিবিবাদী নির্লিপ্ত মানুষ। তা ছাড়া লেখাপড়ার রাজত্বে তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। সারাদিন কাজের গোলমালে আর বই পড়ায় বেশ কাটিয়ে দেন। কিন্তু তিনি যে সময় সময় হাঁপিয়ে ওঠেন। বই পড়ার বা কত সময় কাটবে আর কতই বা গৃহ কাজ। চাকর বাকর হৈ হৈ করছে। পাওব-বর্জিত দেশে আসা যাওয়ার বালাই নেই বিশেষ কারো; দৈবাৎ আপন জনের আগমন তাই তাঁদের কাছে সত্যই উৎসব বিশেষ। কোথায় রাখবেন, কি খাওয়াবেন আনন্দে উৎসাহে যেন বিচলিত হয়ে ওঠেন এই সদ্য-মুক্তুক্ষিত সদালাপী দম্পতিটি।

সরকারী চাকুরেদের ওপরওয়ালা নীচের ওয়ালার ব্যবধান দুস্তর। মন খুলে সহজ হওয়া যায় না।

হাওড়া ব্রীজ পার হতে মনে হয় যেন কলকাতার সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। নদীর এপারে পড়ে রইল তাঁদের সব, আর তাঁরা রইলেন দূরে কোন সে সুদূর প্রবাসে—দেশের সঙ্গে যেন সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ওখানেও জলে জলের ধারে ধারে কাটছে, তবু এ গঙ্গা কেন মনকে উতলা করে? মনে মনে প্রণাম জানিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করেন তিনি—মা তোমার কোলেই যেন শেষ গতি হয়! শেষের দিনে কোল দিও মা।

বর্দ্ধমান ছেড়ে যেতেই মন আবার নতুন করে আনচান করে ওঠে, ওগো আমার মাটি মা, সবার মঙ্গল কর, সবকারে ভাল রেখ। আবার যেন এই ভরা মন নিয়ে তোমার বুকে ফিরে আসি।

চৌধুরী সাহেবের ঘরে আজ আনন্দলোক—গৃহ তাঁর আনন্দ-নিকেতন।

'ভালবাসি ধরণীরে আমি
ভালবাসি এর ধূলিকণা'

প্রবাসী নিঃসঙ্গ নিরস দিনগুলির অবসানে আজ তিনি মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। ফল-মুখরিত গৃহ'জনে আজ তাঁর প্রাণ-নির্ঝর বয়ে যাচ্ছে। কলাউঙের সব ছেলেমেয়েরা এসে জুটেছে। কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা শিশুসুলভ সাধারণ খেলা করার মন নিয়ে। প্রসন্ন হাস্যে সন্দেশের ঝুড়ি হাতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীমতী নিত্য পূজা শেষ করে। সদ্য স্নাতা শুচিস্নাত রূপে যেন অপরূপ লেগে উঠলেন চৌধুরী সাহেবের চোখে। রাঙাপাড় তাঁতের শাড়ী-খানিতে মানিয়েছে ভাল। পশ্চিমের এ রুক্ষ বন্ধুর দেশের স্থূল পুরুষালি সাজপোষাক দেখে দেখে চোখ বুঝি তাঁর এইটুকুর জন্য অজান্তেই প্রত্যাশী ছিল। এ বঙ্গের বধূ এ বঙ্গ-জননী আজ যেন স্বর্গের সুষমা নামিয়ে এনেছেন। সামান্য সাজই আজ নয়নে অসামান্য হয়ে উঠেছে।

অন্তরাল থেকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন কলমুখরিত বালক বালিকাদের উজ্জ্বলতা আর নির্মল আনন্দ শ্রীমতীর প্রসাধন-নিস্তব্ধতার।

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে এই যে একটুখানি কুড়িয়ে পাওয়া সুখ এতেই কি বলে পাখের? পথের সম্বল? কে জানে! মন তাঁর অকারণেই আনচান করে উঠলো, কিন্তু নকল গাম্ভীর্যের ছলনার বাঁধ ভেঙ্গে তিনি শ্রীমতীর মত এমন সহজ হয়ে এই আনন্দ মেলার অংশীদার হতে পারলেন না। মিশে যেতে পারলেন না এমন মধুর পরিবেশের সঙ্গে। রাজ সাহেবের পদ-মর্যাদা যে লৌহ-প্রাচীর রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে পদমর্যাদাকে অভিনন্দিত দিতে দিতে নিঃশব্দে অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি।

হাতের মিষ্টান্ন ফুরিয়ে যেতেই কণেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন শ্রীমতী। হঠাৎ প্রভাত সূর্যের পানে নয়ন তাঁর চলে গেল। তাইতো, আজ যে তাঁর সূর্য্য বন্দনা হয়নি। এই সব বালক-সূর্য্যরা যে আজ তাঁকে সব ভুলিয়েছে। হাত জোড় করে দাঁড়ালেন তিনি উদিত সূর্যের পানে মুখ তুলে। আপনিই চোখ বন্ধ হয়ে গেল—এ জ্যোতিঃপুঞ্জ সহ্য করা কি সহজ। অন্তরের মায়া-আবরণ উন্মোচন করতে যেন মনে মনে বললেন তিনি—হে পুষন্, অপাবৃণু! অপাবৃণু! আবরণ উন্মোচন কর। আমার অন্তর-লোক উদ্ভাসিত কর। ওগো দিনেশ্বর, আমায় পথ দেখাও।

কোলাহল-মুখরিত ছেলের দল আবার তাঁকে টেনে আনলো মর্ত্যের অঙ্গনে। তাদের নিয়ে তিনি গৃহাঙ্গন ছেড়ে বাইরের বাগানের পথে পা বাড়ালেন। নিপুণ হাতে সম্মার্জনী তাড়নে চারদিক পরিষ্কার করছে জমাদার। ঘমকে দেখলেন তার সাজ পোষাক। ফর্সা ধোপ-দুরস্ত কামিজ সালোয়ার, মাথায় জরীর কুল্লা সমেত পাগড়ীতে হাতের রিষ্টওয়াচে পায়ের সুন্দর নাগরায় এক সৌখিন পুরুষের ছাপ। এ যেন গল্পের রাজপুত্তুর, কোনও আরব্য উপন্যাসের নায়ক হঠাৎ ছদ্মবেশ ধরতে দুহাতে দুই ঝাড়ু নিয়ে তাঁর বাড়ীর কম্পাউণ্ড পরিষ্কার করতে এসেছে। আজ হয়ত বা তার এ পাদ্রিপাটাটুকু বিশেষ করেই সাদিত তাঁরই সম্মানে। তাঁকে দেখে ঝাড়ু ফেলে আকুমি সেলাম জানিয়ে আবার আপন কাজে চলে গেল সে।

বুঝিবা একটু অন্যমনা হয়ে পড়েছিলেন—হঠাৎ চমক ভাঙ্গল রামরতনের কর্কশ কণ্ঠস্বরে—'দেখা মাইজী, চৌকিদার না নসীব। হৈ তো পাঁচল রুপৈয়াকা ঝাড়ুদার, সান দেখো তো চমক লাগে। মাইজী অভি বিবিকো তো দেখা নহী—দেখো তো ক্যা করোগী। বড়ে বদমাস হৈ সব তো। শিরপর চড়া রখ্‌খা থা খতারাম সাহবনে। অব শয়তানী তোড়কে ছোড়েগে তেরী, যে তবিজ নহী তো। ঝাড়ু বন্ধ কর। গর্দা মত উড়া'।

শ্রীমতীর সমস্ত মন বিষিয়ে উঠলো—এমন সুন্দর সকাল, এমন প্রসন্ন পরিবেশ সব যে হতভাগা রামরতন মাটি করে দিলে। তাকে কিছু বলতেও যেন ঘৃণা বোধ হল তাঁর। নিরুপায় হয়ে মনে মনে বললেন তিনি—হে প্রভু। এ তুমি কি করেছ? তোমার এ সুন্দর সৃষ্টিতে কেন এ কদর্য্যতার প্রকাশ? কেন এ দেব মানবের নিত্য নিরন্তর দ্বন্দ্ব।

হঠাৎ তাঁর বহুদিন আগে চৌধুরীর মুখে শোনা ওমরখৈয়ামের দুটি লাইন যেন সত্য রূপ নিয়ে জেগে উঠলো। সে দিন তিনি রুষ্ট হয়ে ছিলেন, তর্ক করে ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর মনে হল জ্ঞানবৃদ্ধ ওমর একদিন জীবন-ভরা অভিজ্ঞতা নিয়েই পরম তত্ত্বটি বলেছিলেন—

মানুষের হীনচেষ্টা তুমিই করেছ লেখা,
তোমারই সৃষ্টিত যত কাল-কলঙ্কিত
আনন্দ নন্দনে আনে তীব্র হলাহল!
যতকিছু মহাপাপে কলঙ্কিত মানুষের মুখ
সে তোমারই চুক।

সত্যই এদের আজ তাঁর শিশুর মতই মনে হল। সব শিশু কি দুর্যোধ দুশীল হয়? মনে মনে ঐ লাইন দুটি আওড়ে ঘরে তাঁর স্পর্শকাতর মন বুঝি বা সান্ত্বনা খুঁজতে খুঁজতে ঘরে চলে গেল।

ছোট ছেলে খোকনের উচ্ছ্বাসে উল্লসিত কলকণ্ঠে বারান্দায় বেরিয়ে এসে মুগ্ধ হয়ে গেলেন শ্রীমতী। অপরূপের এ রূপলীলায় ঘুচে গেল তাঁর অন্তরের সমস্ত গ্লানি। মালি মালিনী এসেছে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে তাদের সবুজ কত ফলফুলের ডালি সাজিয়ে সমারোহে। মালিনী তাঁর দর্শনমাত্র আকুমি প্রণাম জানিয়ে তুলে ধরলে নানা বর্ণের ফুলের তোড়াটি। বেলকুঁড়ির গাঁথা কণ্ঠহার বাহুবন্ধ বেণীবন্ধ। ফুহাত পেতে গ্রহণ করলেন তিনি এ প্রীতির দান। সযত্নে ভিজে কাপড় জড়িয়ে তুলে রেখে এলেন ঠাকুর ঘরে। মনে মনে ইচ্ছা তাঁর রাধিকার নয়ন-বিমোহন এ ফুলের আভরণে সীতাদেবীকে সাজাতে। মালিনী সুরসিকা বোঝা গেল।

কণ্ঠহার সে ছুটিই করে এনেছে চৌধুরীর যুগল কণ্ঠের জন্য, কিন্তু শ্রীমতীর যে তিনটি মালার প্রয়োজন, মন্দিরে যে ত্রিমূর্তি। রামসীতার সদা সহচর লক্ষ্মণ ভায়ের জন্যও যে একটি গোড়ে মালা চাই তাঁর। তা ছাড়া যে এনেছে এ উপহার তাকে যদি মন-বাসনা না জানান, এ ফুল যে নিবেদিত। নিবেদিত ফুলে কি দেবসেবা চলে?

স্মিত হাস্যে জানান মালিনীকে তাঁর ইচ্ছা। কলহাস্যে জবাব দেয় মালিনী, রাণী-সাহেব, এ আপনারই উপযুক্ত কথা। আমাদের রামজীকে আপনি আজ নিজের হাতে পূজা দিয়ে আসবেন, এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের যে রামজীই ভরোসা। আপনাদের এ কথা জানাবার সাহস আমাদের নেই কিন্তু এ যে আমাদের নীরব মনস্কামনা আপনি নিজেই পূর্ণ করলেন। দুই হাত জোড় করে আপন ইষ্টদেবতা রামজীর চরণে প্রণাম নিবেদন করল মালিনী। এরা সরল সাধারণ মানুষ। এরা তো বুদ্ধি দিয়ে চালিত হয় না, এরা বিশ্বাস নিয়ে, ভালবাসা নিয়েই জীবন পথে এগিয়ে চলে। ভক্তি-বিহ্বল কণ্ঠে আবার বলে সন্ধ্যারতির আগেই আমি নিজে হাতে গেঁথে দিয়ে যাব তিনছড়া মতিয়ার মালা আর সীতামাইয়ার জন্য ফুলের গহনা।

এগিয়ে এল মালি তার সযত্নে সাজানো শাকসব্জির ঝুড়িটি নিয়ে। সামনে নামিয়ে বিনয়-নম্র নমস্কার জানালো। তাজা ফলে সব্জিতে সুন্দর রং মিলিয়ে মিলিয়ে সাজানো ডালিখানি যেন এক নিপুণ চিত্রশিল্পীর অপূর্ব চিত্রপট। সবুজের সমারোহের মাঝখানে কিকে হলদে রংয়ের পদ্মফুলগুলো, হাল্কা সবুজ লাউ, রাঙা টুকটুকে লাল নটে, অন্যদিকে কমলা রংয়ের সদ্য তোলা গুচ্ছ গুচ্ছ লকেট ফল, আ মরি! মরি। কি অপূর্বই না হয়েছে! বিশ্বের সে মহাশিল্পীর খেলাঘর থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে এক অনন্ত শিল্প গড়ে তুলেছে আর এক সরল সাধারণ মানব-শিল্পী তার সহজাত শিল্পদৃষ্টি নিয়ে। ম্যাজেন্টা রংয়ের পাকা ডুমুর বা fig, এরা বলে আঞ্জির, কিছু ফলগুলো ও তুঁত ফল, সেগুলি ঠিকমত পাকেনি। বৈশাখেই এ সব ফল ভালভাবে পাকে। তবু বুঝি মালি ডালি সাজানোর মোহে তুলে এনেছে। শুটিচার কামরাঙা, তাও ভাল করে পাকেনি। বৈশাখে এরা পরিপূর্ণতা পায়। একবার মনে হল বলেন এত তাড়া কিসের মালি! ভাল করে পাকতে দাও না তারপর সাজিয়ে এন মনমত করে। কিন্তু সে কথা উচ্চারণে তাঁর বাধলো। তাদের এ আনন্দে তিনি কোনও নিরানন্দের ছায়া ফেলতে চান না। মালি যে এক নিপুণ কারিকর। এ সব যে তার অনেক যত্নের অনেক পরিশ্রমের ফল। অকুণ্ঠ প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। এটা ওটা সেটা নানা প্রশ্নে বিব্রত করে তুলতে লাগলেন। হাসিমুখে বিজ্ঞের মত জবাব দিতে লাগল মালি। নিজের বিদ্যে জাহির করার এমন সুবর্ণ সুযোগ কে সহজে ছাড়তে চায়। মনে মনে হাসলেন তিনি তাদের এ নির্মল আনন্দে। হঠাৎ ঝুড়ি থেকে কয়েকটি গোল গোল সবুজ ফল তুলে সকৌতুকে শুধান—এ 'সব্জিটি' আবার কিরে? তাড়াতাড়ি মালিনী এগিয়ে এসে বলে, জান না বুঝি মাজী?—এ যে কচি শিমুল ফুল। এ দিয়ে বড় সুন্দর তরকারি হয়।

তাই নাকি রে? দিস তো আমায় শিখিয়ে।

মালিনী বলে, ও আর কি শক্ত মাজী। ডুমো ডুমো করে কেটে একটু নিম্ক করে কড়ুয়া পানি অর্থাৎ

ভিজে কুটে জলটা ফেলে দিয়ে ঘি মললা ভেজে আলু দিয়ে রাঁধতে হয়। সকৌতুকে জবাব দেন তিনি, তাই নাকি রে! একটা নতুন রান্না শিখা হল। এ তো কখনও শুনিই নি রে—শিমুলের কুঁড়ির আবার তরকারি। আমরা যে এমনি করে পটলের ডালনা রাঁধি। তবে সেদ্ধ করে জল ফেলতে হয় না। পটল তো আর কড়ুয়া না রে!

পটল বস্তুটি এদের অজানা—তাই সাগ্রহে জানতে চায় সে কেমন?

অনেক ঘরে ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে কলকাতা থেকে আমাদের জন্য সযত্নে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু পটল শ্রীমতীর মা—প্রায় বলতে গেলে রং ধরে গেছে, আর শুকনোও হয়ে গেছে তারা এই চারদিনে। তাই দেখালেন তাদের। সকৌতুকে নেড়েচেড়ে দেখলো মালি—এখানে কি এ সব্জি করা সম্ভব হবে না মাজী? শুধালো মালি। মালিনী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, কেন হবে না মাজী! তুমি আমাদের বীজ আনিয়ে দিও আমরা ঠিক তৈরী করে দেব। হেসে জবাব দিলেন তিনি—না রে! এ দেশের জলহাওয়ায়, এখানের এ রুক্ষ মাটিতে কি বাংলার জিনিষ ফলাতে পারবি তোরা? একদিন যে স্রোতস্বতী নদীর কালো জলের হিল্লোলিত তরঙ্গে বন্যাভূমি আর্যদের অকৃপণ ফলদানে আশীর্বাদ করেছিলো, একদিন যে নদীর স্পর্শে অহল্যা প্রকৃতি প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, হয়েছিল অন্নদাত্রী জীবধাত্রী ধরিত্রী, যে নদীটিকে তাঁরা শ্রদ্ধায় নাম দিয়েছিলেন 'সরঃ', 'সরস' বা সরস্বতী অর্থাৎ প্রাণময়ী। সেই পরম হ্লাদিনী লোক-পরম্পরায় উচ্চারণের গুণে কালক্রমে সরস্বতী থেকে সরস্বতীতে রূপান্তরিতা হল। কিন্তু আজকের মানুষের মনে সেই তটিনী আর কোনও প্রাণহিল্লোল জাগায় না—সে আর আজ জলোচ্ছ্বাসে প্রমত্তা নয়। আজ সেই গিরিকন্যা একেবারেই ক্ষীণা কোন্ ব্যর্থতার বেদনায় কে জানে! তরুতলে তার ক্ষীণধারা এলাহাবাদে ত্রিবেণী সঙ্গমে আর বাংলার হুগলী জেলায় ত্রিবেণীতে রয়েছে বলে মনে করেন। আর এই হুগলীতেই সরস্বতীরই মজে যাওয়া চড়ায় চড়ায় পটলের ফলনের প্রসিদ্ধি। সে পটলকে তোরা এই বন্ধুর দেশে কেমন করে ফলাবি রে? কোথায় পাবি সরস্বতীর সে স্নেহসিক্ত পলিমাটি। এ মাটিতে না হয় পেপে, না হয় কলা, না হয় আতা। আবার এখানেরও নানা ফল যেমন পিচ্, লকেট, আলুচা, অঞ্জির, নাসপাতি, মাল্টা ইত্যাদি বাংলার মাটিতে নৈব নৈব চ। দুঃখ কিসে মালি, এই তো টিণ্ডা পেয়েছিল পটলের বদলে, বলে ঝুড়ি থেকে কয়েকটি টিণ্ডা হাতে তুলে ধরলেন। এমন সময় হঠাৎ দুটি গন্ধরাজ লেবুর দিকে নজর পড়ায় সযত্নে হাতে তুলে নিয়ে গন্ধ শুকলেন মন ভরে। সকৌতুকে শুধালেন—তোদের কাছে গন্ধরাজ লেবুও যে আছে দেখছি রে?

সোৎসাহে মালি জবাব দেয়—হাঁ মাজী, অনেক আছে, কত চান আপনি, আমি রোজ দিয়ে যাব।

মাজী, আমার কাছে বারোমাসি নিম্বুর গাছও আছে।

তাই না কি রে?

হঠাৎ কলাপাতে সযত্নে মোড়া একটা জিনিষের দিকে নজর যায়। সকৌতুকে বলেন তিনি, ওটা কি রে?

—কচনার ফুল মাজী। রান্নাও বানিয়ে দেবেন রায় সাহেবকে, বড় সুগন্ধ, বড় ভাল। আমার বাগানের মত কচনার এ মহল্লাকে কারো নেই। আমিই তো ও বছর দুটি চারা রামজীর মন্দিরে লাগিয়ে দিয়েছি, আর এক বছর পর থেকে ফুল দেবে—বলে চলে মালি মনের আনন্দে।

হঠাৎ সাগ্রহে মালি বলে—মাজী। একটা আর্জি আছে আপনার কাছে।

আর্জি আবার কি রে? সহাস্যে জবাব দেন শ্রীমতী, বলনা কি বলবি।

হাত কচলে সলজ্জ জবাব দেয় মালি, বলে—মাজী। মালিনীর কাছে আমার হার হয় এই কি আপনার ইচ্ছা?

অবাক বিস্ময়ে শ্রীমতী বলে ওঠেন—সে কি কথা রে! তুই হলি তোর বাড়ীর কর্তা, তোর গিন্নীর কাছে তোর হার হবে কি রে? তাও আবার আমার জন্য? কেন বল দেখি।

মাজী—আপনি প্রথম যাবেন রামজীর দর্শনে আর মালিনী গেঁথে দেবে মালা, গহনা, পরবেন আমার শ্রীরামচন্দ্র সীতামাই আপনার হাত দিয়ে, আর আমার কি কোনও সেবা যাবে না মাজীর হাত দিয়ে রামজীর চরণে!

সকৌতুকে শ্রীমতী বলেন—দূর বোকা! ও মালা গাঁথলেই বা, ফুল তো তুইই তুলিয়েছিস বন্ধ করে, আর তুইও যা মালিনীও কি তাই না?

না, মাজী না। ও বড় শয়তানী। এ গর্বে অহংকারে ওর যে মাটিতে পা-ই পড়বে না।

তাতে কি রে? তোর যদি এতই ইচ্ছে—সাজানো থাক এ ডালি এমনিই। বিকেলে যখন মন্দিরে যাব নিয়ে যাব সঙ্গে করে। তোর যত্নের সামগ্রী যাবে রামজীর সেবায়—বলেন শ্রীমতী।

না, মা না। তাও কি হয়। তুমিও যে আমার মা এ যে আমার মাকে নিবেদিত। এ যে অধম সন্তানের তোমার চরণে সেবা। যদি অনুমতি করেন—আমিই সাজিয়ে নিয়ে যাব আপনার সঙ্গে নিজের মাথায় করে সামান্য এক পাক সব্জির ডালি প্রভুর সেবায়। কত সময় মন আকুল হয়ে উঠেছে আমার বহু যত্নের সামগ্রী কিছু দিয়ে আসি প্রভুর পায়; কিন্তু সাহসে কুলায়নি, আমি যে অধমের দাস, কখনও সাহস হয়নি আগের মাজীকে এ ইচ্ছা জানাতে। সকাতরে নিবেদন করে মালি।

এত খুব ভাল কথা। ভাল করে ডালি সাজাবি মনের ইচ্ছা উজাড় করে, নির্ভয়ে; কেমন? কেউ কিছু বললে আমার নাম করে দিবি।

তাড়াতাড়ি মালিনী বলে—আর মাজী। আমি কি অপরাধ করলুম। আমি কি যেতে পাব না রামজীর চরণ দর্শনে আপনার সঙ্গে সঙ্গে?

বেশ তো তোরা দুজনেই যাস।

প্রণয় হাস্যে আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে চলে গেলো এই তরুণ দম্পতী। সামান্য মাটির ঘরে কোন্ ঐশ্বর্যে তারা প্রাণের এত প্রাচুর্য পেয়েছে? এমন পরিপূর্ণতা? শ্রীমতীর মনের সমস্ত গ্লানি যেন তাদের প্রাণ-নির্ঝরে ধৌত করে দিয়ে গেল।

দেশ-নায়ক গোবিন্দবল্লভ পন্থ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ সুশীল কুমার ঘোষ ॥

স্থানীয় সরকার—স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট শাসনকালে গোবিন্দবল্লভ পন্থের কৃতিত্ব অনির্বচনীয় রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় সরকারের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল. জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা ও সুবিধা বৃদ্ধি করে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জেলার শাসন বিভাগ তিনি নূতন করিয়া গঠন করেন বিবিধ ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন স্তরে, বোর্ড অফ রেভিনিউর প্রতিষ্ঠানের নূতন রূপ প্রদান করেন, অধি সংস্কারের নূতন বিধির উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তিনি নবীন সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। প্রবীণ কর্মীদল অবসর গ্রহণ করিলে চারুদী ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার কর্মীগণসহ স্বকীয় রাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন পাছে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ দেশকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া যায়। কয়জন বিজ্ঞ ব্যক্তি লইয়া তিনি প্রথমে সচিবসভা গঠন করিলেন, ক্রমে ক্রমে বিচক্ষণতার সহিত সংকর্ষভাবে উহা বর্ধিত করেন, তাল-সামা বজায় রাখিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, ফলতঃ রাজনৈতিক বিষ প্রচার হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা

করেন। প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রশ্রয় তিনি দিতে চাহিতেন না।

তিনি অনেক সময়ে ইঁহার মন্ত্রিমণ্ডলে মিলন ও সহযোগিতা সম্পর্কে নেতৃত্ব দিতে চাহিতেন, তবে কখন কখন তাঁহার সামানীতি বা ক্ষমতার সমতা (balance of power) নিষ্ফল হইতে দেখা গিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে যখন এই রাষ্ট্রীয় প্রকাশের বিষয় বিশেষভাবে পরিণত হইয়াছিল তখন দেখা গেল এই দেশ বিভিন্ন দলগত মতবাদে বিচ্ছিন্ন, যাহার ফলে কংগ্রেস হইতে সোশালিষ্ট পার্টি বাহির হইয়া যায় কংগ্রেসের বিচ্ছিন্ন দল হইতে K. M. P. P সৃষ্টি হইল।

প্রথম উল্লেখযোগ্য বিরোধিতার আবির্ভাব হয় যখন তাঁহার পূর্ব্বতন সহকর্মী স্বর্গীয় রফি আহম্মদ কিদওয়াই যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব লইয়া শ্রীযুত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের প্রধান দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শ্রীযুত ট্যাণ্ডন তখন কার্য্য করিতেছিলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জন্য এই নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার্য্যকরী হয় নাই, কারণ দূরদর্শী কিদওয়াই শেষ মুহূর্ত্তে এই দ্বন্দ্ব হইতে প্রত্যাহার করেন। এই প্রাদেশিক কংগ্রেস রাজনীতির ধরণ ঠিক হইয়া গেল এবং ইহা বহু বৎসর যাবৎ একভাবে চলিয়াছিল। যদিও ইহার বহির্ভাগ মধ্যে মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন হইতে দেখা গিয়াছিল সাময়িক নূতন দলবদলের ফলে। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন উত্তর প্রদেশের ব্যবহারিক কংগ্রেস রাজনীতির কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন, পরে আচার্য্য কৃপালিনীও হইলেন।

এই সকল পরিবর্ত্তন ও প্রতিযোগিতার মধ্য উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভের শেষ কয়েক বৎসর অশান্তিতে কাটিয়াছিল। তিনি উত্তর প্রদেশের ভূমিতে এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ছিলেন যে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিষদে গমন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং একবার ঐস্থানে যোগদান করিবার শ্রীযুত নেহরুর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার গোবিন্দ বল্লভ শ্রীযুত নেহরুর দ্বিতীয় আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, লক্ষ্ণৌ নগরী পরিত্যাগ করিয়া ইউনিয়ান স্বরাষ্ট্র সচিবের পদ গ্রহণ করিতে অবশেষে দিল্লী গমন করিলেন। তখনও তিনি বিমনা হইয়া উচ্চতর পদ গ্রহণ করেন —যখন তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল, তখন তাঁহার হৃদয় পড়িয়া থাকিত উত্তর প্রদেশে যে দেশের অধিবাসীগণের জীবন-যাত্রার উন্নতি-কল্পে তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন। ছয় বৎসর তিনি দিল্লীতে অতিবাহিত করিলেন তথাপিও উত্তর প্রদেশ ও ইহার সমস্যাগুলি সর্ব্ব সময়ে তাঁহার মন আকর্ষণ করিত। তিনি ভাবিতেন ঐ প্রদেশে যেন মানবিক সম্বলের অভাব ঘটিয়াছে। তিনি এই অবধারণ করিয়া কাতর হইতেন যে তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও উত্তর প্রদেশকে তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না সমস্যাপূর্ণ রাষ্ট্র হইতে এবং ইহা এমন স্থান ছিল যাহা আনন্দের প্রস্রবণ রূপে গণ্য হইত।

শেষ জীবন পর্য্যন্ত মহামতি পন্থ তাঁহার বিশাল প্রজ্ঞা ও বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য, সুবিচার এবং পরিতোষ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে বিফলতায় জন্য মনে কষ্ট অনুভব করিয়াছেন।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম সিমলা কনফারেন্সে সুবিচক্ষণ পণ্ডিত পন্থ কার্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তাব আদান প্রদানের জন্য প্রতিনিধি রূপে প্রেরিত হন। স্বর্গীয় নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার সহিত আলোচনা ও মিটমাটের প্রস্তাব ইহার উদ্দেশ্য ছিল। তৎকালীন পরিস্থিতি অনুসারে কথাবার্ত্তা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাচনের পর উত্তর প্রদেশের প্রধান সচিবের পদ তিনি পুনর্বার অলঙ্কৃত করিয়া ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ সুবিস্তৃত প্রদেশের বিবিধ জনহিতকর কর্ম্মসাধনের সুযোগ পান। তদনন্তর দিল্লী নগরীর ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী জনপ্রিয় পণ্ডিত নেহরুর বিশাল কার্য্যপরিষেষ্টিত সচিব সভায় যোগদান

করেন। বিস্তৃত পরিবেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মাদর্শে তখন তাঁহার সুমহান প্রতিভা আত্ম-প্রকাশ করে। মনীষা-সম্পন্ন পন্থ-প্রতিভা বিস্তার লাভ করিয়া অগণিত উপায়ে সমগ্র ভারতের ঔদাসীন্য দূর করিতে ব্রতী হইল দেখা যায়। সাধারণ লোক-চিন্তার প্রসার লাভ, বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা তাঁহার আয়ত্তের অধীন পড়ায় তাঁহাকে অধিকতর আগ্রহশীল ও বিরাট কর্মবীরের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। হোমমিনিষ্টর রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা পবিত্র-চেতা পন্থজী বিদ্যা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সারবান মহিমা লইয়া বিবিধ প্রচলিত দৈন্য অপনয়নে বদ্ধপরিকর হইলেন। পরস্পরের সহিত সংস্রবহীন সমাজকে উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে যারপরনাই চেষ্টা করিয়া সরকারী তহবিলের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। চিন্তাবিকাশের সুদূর প্রসারী সম্ভাব্যতার মধ্যে তাঁহার ধ্যান-প্রসূত কর্মসুশলতা সুস্থ ও বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিল। গণ-মন-বিশ্লেষক পন্থজীর কর্ম পন্থা বাস্তবের স্বরূপ হইতে পৃথক ছিল না বলিয়া তাঁহার সাধনা যেমন অবলীলাক্রমে ফলবতী হইতে দেখা গেল, দৈন্য-পীড়িত অংশগুলির ব্যর্থতা দূর করিতে তাঁহার সুমহান প্রয়াস ও আত্মবিলুপ্ত চিন্তাধারার স্রোত তেমনই প্রবলভাবে বহিতে লাগিল। প্রাচীন অন্ধতার তিরোধানে সবল, সুপুষ্ট কর্ম-চেষ্টা দেশবাসীর মধ্যে জাগ্রত হইল। পরিচ্ছন্ন মতবাদ, সুস্থ মন নির্মাণ অনন্তকর্মী দেশ-সেবীর চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিলে সর্ব্ব সময়ে দুঃস্থতার যন্ত্রণার বেশ ম্লান ও অস্পষ্ট হইয়া গেল। জীবনের কুশ্রীতার চাপ সাধারণকে সহ্য করিতে হইল না।

বিশিষ্ট কর্মযোগী পণ্ডিত পন্থ রাজ্যসভার যখন নির্ব্বাচিত হইলেন তখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাঁহার জীবন-পথ কুসুমাকীর্ণ করিয়া তুলিল। অচিরে ঐ সভার তিনি অধিনায়কের পদ বিকৃষিত করিলেন। অন্যতম কংগ্রেস-নেতা ও শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দেহত্যাগের পর গোবিন্দবল্লভ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের উপ-নায়ক বা ডেপুটি লীডার হইয়া বসিলেন। বস্তুজগতের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়া স্বার্থত্যাগী পন্থজী আশা আকাঙ্ক্ষার বিমল-জ্যোতি হইতে কখনও বঞ্চিত হন নাই। কল্পনা-স্ফূর্তির মধ্যে আলোড়িত হইলেও সম্ভাবনার শক্তি তিনি কোনদিন হারান নাই। বাস্তবের সংস্পর্শে তিনি হইয়া উঠিলেন উচ্চমনা: নির্ভীক সেনা-নায়ক। ক্ষয়িষ্ণু আপত্তি-সঙ্কুল সমাজকে তিনি বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছেন অবিরত স্বার্থ বিসর্জনে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একজন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বিশিষ্ট প্রধান মন্ত্রী, সমগ্র ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম সচিব ও সুযোগ্য কর্ণধার। পন্থজী কৃতকর্ম্মা অধিনায়ক জওহরলাল নেহরুর একজন বিশ্বাসী সেনাপতি, কর্মরত ভারতসেবী। তিনি ছিলেন নেহরুজীর অবিচলিত ও অকৃত্রিম সহচর। তাঁহাকে পাইয়া নেহরুজীর প্রগতি-পন্থী মন সবিশেষ উপকৃত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সহকর্ম্মী লাভ করিয়া বিজ্ঞ-প্রবর জওহরলাল অনেকাংশে নিশ্চিন্ত থাকিয়া অন্যান্য বিষয়ে সুনিপুণ পর্য্যবেক্ষণের পরে লিপ্ত থাকিতে পারিতেন। বিজ্ঞান-প্রিয় জওহরলাল বৈজ্ঞানিক সত্যের মূলকথা আবিষ্কারে নির্ভরশীল জ্ঞানী সহকর্ম্মীর পরামর্শ লইতে ক্ষান্ত হইতেন না বলিয়া বহু স্থলে জীবন রূপায়নের সমস্যার কতক মূল্যবান সমাধানের পথে উভয়ে মিলিত হইতে পারিতেন। অদৃষ্ট-নির্ভর মধ্যবিত্ত ভারতবাসীর মনে পণ্ডিত পন্থজী যেমন আশার আলোক জ্বালাইতে পারিয়াছিলেন, কল্যাণ-মূলক রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সেইরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সার্থকতা আনিতে চাহিতেন। নৈর্ব্যক্তিক সত্যতা তাঁহার কর্মপন্থা সুমধুর করিয়া রাখিত বলিয়া আপামর জনসাধারণ অকম্পচিত্তে তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনকান্ত তাঁহার ছিল সমুন্নত অথচ সরল ও কর্মমুখর। সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রগতিশীলতায় হইয়া উঠিয়াছিল যুক্তি-নির্ভর, প্রেমবাদী ও অদৃষ্টের অনিবার্য্যতার বিপরীত।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অন্তরঙ্গ বান্ধব ও সংশয়-বিহীন সহকর্ম্মী ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পুঞ্চিলের প্রহারের যে

আস্থার পাত্র তাহা জওহরলাল নেহরুকে বক্ষা করিবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার ফলে। নেহরু পন্থের সম্পর্কের অর্থ, অনেকে বলেন, অগ্রিমিশ্র নেহরু পরিবার সে নামের সার্থকতা বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আস্থাতার গভীরতা এত অধিক যে, যে যুগে ভারতমাতার সুযোগ্য সন্তান চিন্তাশীল জওহরলালের সহিত বিরত হইতেছেন, পন্থজী পরিণামে প্রধান সচিবের সিদ্ধান্তের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন, এবং আরও প্রণিধানীয় ঐগুলি মনোযোগের সহিত ও আগ্রহভরে পালন করিয়া গিয়াছেন।

সমগ্র ভারতের প্রধান সচিব পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট কর্মী গোবিন্দবল্লভ ছিলেন একটি শক্তির স্তম্ভ। সহকর্মী ও শিক্ষা-সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দেহত্যাগের পর পন্থজী হইলেন পণ্ডিত নেহরুর একজন নির্ভরশীল মন্ত্রী ও সহকর্মী—একমাত্র তাঁহারই নিকট তিনি সকল কথা মন খুলিয়া বলিতে পারিতেন এবং সমান পর্যায়ে কথা কহিতেন। শাসনক্ষম সুবিবেচক সচিবরূপে দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভায় যোগদান করিবার পর হইতে সুযোগ্য গোবিন্দবল্লভ স্বকীয় নির্দিষ্ট দপ্তর ভিন্ন অপরাপর সংগঠন-মূলক কার্যে বিপুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আত্মনিয়োগ করিতেন, ইহাতে প্রধান সচিবের গুরুভার অনেকটা লাঘব হইত।

সীমানা নির্দেশ—রাষ্ট্রগুলির সীমানা নির্দেশ লইয়া যখন বহু পরোনাস্তি তিক্ততার উদ্ভব হয়, তখন স্থির-প্রজ্ঞ পন্থজী বিপুল বিবেচনা শক্তির পরিচয় দেন। এই সকল সমস্যা বীরচিত্তে তিনি সমাধান চেষ্টায় রত থাকেন। তিনি যুক্তিতর্কের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, যুক্তি বিবেচনায় প্রত্যাগী পন্থজী বহু লোকের মনস্তুষ্টি সাধনে কৃতকার্য হন। মনোবিদ্যা বিশারদ গোবিন্দবল্লভ বেদখুমান মানবচিত্ত জয় করিতে পারিয়াছিলেন, উদ্দীপনা ও উত্তেজনা প্রশমিত করিতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন, অশান্তিমূলক দিনগুলি তাঁহার বুদ্ধির শানিত অস্ত্রে কাটিয়া যায়। S. R. C. (State Reorganisation Committee)-তে তাঁহার মন্তব্য সাদরে গৃহীত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রীয় ভাষা-সমস্যা—রাষ্ট্রীয় ভাষা লইয়া যখন দেশময় আলোড়ন ও কথা-কাটাকাটির সৃষ্টি হয় তখন সমগ্র ভারতবাসী বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বিভ্রান্ত দেশবাসীকে তখন দর্শন প্রহরীর ন্যায় রক্ষা করিতে গোবিন্দবল্লভ তৎপর হন। তাঁহার সুমধুর বচন, অকাট্য যুক্তি-প্রয়োগ সকলতা অর্পিত ব্যক্তির প্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ করে। যখন বহুরা বিভক্ত করিতে চাহিয়াছিল ভারতবাসীর মন, উচ্ছৃঙ্খলতা আনিতে উদ্যত হইয়াছিল অশান্তিমূলক চিন্তা, বাসনা হইয়া উঠিয়াছিল উগ্রতা ও অবাঞ্ছনীয় অকর্তব্য, তিক্ত তখন পন্থজীর সুবিবেচিত পন্থা সমগ্র অশান্তি ও বিরোধের তিরোধান ঘটাইল। Parliamentary committee-র সভাপতি হিসাবে তিনি এমন নির্দেশ দিলেন যে সকল দল সন্তুষ্ট হইল। এ মহৎ কীর্তি অবিস্মরণীয়।

ধৈর্যগুণে তিনি গুণবান ছিলেন বলিয়া বিপদের সময়ে বা সঙ্কটকালে তিনি অবিচলিত চিত্তে কার্য নির্বাহ করিতে পারিতেন। Parliamentary Committee-তে তাঁহার বিরোধিতা করিতে অগ্রণী Frank Anthony বলিয়াছেন, "But for the Home Minister we would have broken our heads."

Zonal Council এর সভাপতি হিসাবে তিনি সমগ্র দেশের মধ্যে ভাষা-ভিত্তিক বিরোধ ও উত্তেজনা প্রশমনে বিস্তর সাফল্য করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতদ্বৈধ ও মনোমালিন্যের তিক্ততা তিনি অপসরণ করিয়াছিলেন সদ্যুক্তি, আবেদন ও হৃদয়গ্রাহী বিচারবোধের দ্বারা, স্নেহাপ্লুত শক্তিদ্বারা তিনি সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর—কাশ্মীরের রাজনৈতিক প্রশ্ন তৎকালে Ministry for External Affairs এর বিচারাধীন থাকিলেও এই রাজ্যের প্রতি মহামতি পন্থ বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি কেন্দ্রীয় সচিব হইবার অনেক মাস পরে বহুবার বিষয় লইয়া এক মন্তব্য প্রকাশ করেন, Plebiscite এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন। তিনি বলেন :

We made a certain statement at the time when Kashmir acceded to India—a fact which cannot be denied. But at the time we made the statement circumstances were different from what they are now. The time factor is important—many things have happend during the last seven or eight years.

Firstly, Kashmir has been following a certain policy for her advancement and many development schems are in progress. secondly, Pakistan has entered into a military alliance with America. Thirdly, the constituent Assembly of Kashmir which was elected by Adult franchise has taken a definite decision."

তাঁহার অন্তরে এক অন্তর্দাহের বিষয় ছিল যে, তিনি রাষ্ট্রগুলিকে আরও নিখিল ভারতীয় কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করার সংবিধান প্রস্তাবে সম্মত করাইতে পারেন নাই।

কেরল রাজ্য—প্রতিরোধকারীর সঙ্গে ধৈর্য্য পরীক্ষা দেখা গিয়াছিল যখন কেরল রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট-শাসন বলবৎ ছিল। ঐ সময়ের স্থানীয় গণ-বিপ্লবে তিনি যে সহনশীলতা ও তিতিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। ঐ গণ-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার গভীর অবিশ্বাস ছিল। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইহার সূত্রপাত হয়। সাধারণকে উত্তেজিত করা সম্পর্কে পরিস্থিতি তাঁহার অবিদিত ছিল না। সংবিধান-বহির্ভূত প্রণালীতে তাঁহার মত ছিল না বলিয়া তিনি অনেকের নিকট জন-প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন। কেরল রাষ্ট্র সম্পর্কে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন শেষ মন্ত্রী, যাহাকে বিশেষভাবে বুঝাইতে হইয়াছিল। তিনি বিবিধ সঙ্কোচের সহিত রাষ্ট্রপতির শাসনভার গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করেন।

সেই বৎসর জুলাই-আগষ্ট মাসের দুশ্চিন্তার দিনে একজন সাংবাদিক বান্ধবকে তিনি বলেন, I have never spent such agonising days. Usually I can decide after a few days thought. Here it has been too difficult। ঐ বন্ধুটি মন্ত্রীবর পন্থের নিকট তাঁহার ঔদাসীন্যের জন্য সাধারণের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত পন্থ একজন বিশিষ্ট ও বিচক্ষণ শাসন কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার নিকট শাসন কার্য্যে কোন সামান্য বিষয় উপেক্ষণীয় ছিল না। পরিশ্রম-মুখর অসাধারণ, তিনি সকলের আয়ত্তে ছিলেন। এমন সহজলভ্য মন্ত্রী দেখা যায় না। তাঁহার আবাস সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি দর্শকদের সহিত অতিবাহিত করিতেন। যদি কেহ তাঁহার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইতেন তাঁহার সময় নিশ্চয়ই নির্দ্ধারিত থাকিত রাত্রি নয়টার সময় যখন তিনি বেড়াইতে বাহির হইতেন। সেই নির্দ্দিষ্ট কালে দর্শন ও আবেদন গ্রহণ অনিবার্য্য।

উত্তর প্রদেশের সংগঠনমূলক কার্য্যে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু গোবিন্দবল্লভ পন্থের ৭১তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন, Pant's has been a dedicated life and he had towered above the people of our generation by not only his ability and integrity but also his calmness in the face of difficulty and crisis. The country owes a debt of gratitude to him।

স্বকীয় প্রদেশের সমুন্নতিবিধান তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় হইলেও সমগ্র ভারতের কল্যাণ সাধনে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তথাপি নিজ প্রদেশের গুরুতর সমস্যাগুলি তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া থাকিত।

অন্তিম কালে—শেষ দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে দেখা যায়। অত্যধিক পরিশ্রম ইহার মূলে

কার্য্য করিয়াছিল। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সর্ব্ব প্রথম তিনি হৃদ যন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হইয়া কিছুকাল চিকিৎসা ভবনে কাটান। সুস্থ হইলে প্রাণপণ পরিশ্রমে পুনরায় নিযুক্ত হন। কয়েকদিন পরে তাঁহার এক বন্ধু পরিশ্রম কম করিতে বলেন। তিনি উত্তর দেন These are my grace days. I must work hard। ইহা অবিসংবাদিত সত্য, তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছেন, পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এইরূপ কর্ম্মীর জীবনে বিরল।

পার্লামেণ্টে সম্পূর্ণ একদিন কার্য্য করিয়া প্রিয়ংবদ গোবিন্দবল্লভ পন্থ গৃহে ফিরিয়া পরদিবসে বিতর্কের উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যদিও তিনি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত অনুভব করিতে ছিলেন, তথাপি এই নর-শার্দ্দুল তাঁহার লিখিত রচনা পাঠ করিতে লাগিলেন। যখন বুঝিলেন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল, কর্ম্ম-প্রিয় পন্থজী অন্তিম কালে আইন সচিবকে ডাকিয়া তৎ পরিবর্ত্তে উত্তর দিতে বলিলেন। সুবিজ্ঞ আইন সচিব শ্রীঅশোক সেন তাঁহার শরীরে অসুস্থতার লক্ষণ দেখিয়া ও স্বর বিকৃত হইয়া গিয়াছে শ্রবণ করিয়া চিকিৎসককে আহ্বান করেন। এই ভাবে কণ পরে বিশিষ্ট নেতা ও কর্ম্মযোগীর দেহাবসান ঘটে।

ব্যক্তিগত পুণ্যময় জীবনে তিনি বালক ও শিশুদের অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার প্রদীপ্ত জীবনকালের বহু সময়ে দেখা গিয়াছে শুরুতর সম্মিলনে বা conference-এ স্বীয় পৌত্র বা অন্য কোন প্রধান কর্ম্মচারীর বালক বালিকা তাহার নিকট আসিত, ক্ষণকালের জন্য আদর লাভ করিয়া চলিয়া যাইত। নর-পুঙ্গব গোবিন্দবল্লভ একটি পুত্র, সহধর্ম্মিণী, দুই কন্যা লক্ষ্মী ও পুষ্প এবং পৌত্রগণ রাখিয়া গিয়াছেন।

কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়, কিন্তু যিনি নিজ জীবনে সবকেই পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দিয়া আস্বাদন করিতেছেন, তিনি কাহারও একচেটিয়া নন; তিনি প্রত্যেকের মাঝে পরিপূর্ণ থাকিয়াও প্রত্যেকেরই অধিক। কেহই কাহারও কাছে ধরা পড়িলেন না, সকলকেই সমভাবে জীবনে হজম করিতেছেন, তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধিক। 'They complete, by excluding each other' —De Broglie. পূর্ণযোগের এক একটি দৃষ্টিকোণ হইতেছে তপস্যা, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। পূর্ণযোগ সর্বযোগের সমন্বয়।

—গীতাভাষ্য শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

মুক্তি-লগ্ন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ অনামী ॥

॥ চার ॥

রিটায়ার্ড জজ সমরেশ মিত্র কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব উপকণ্ঠে বিরাট বাড়ী তৈরী করে সপরিবারে বসবাস করছিলেন। সমরেশবাবুর পরিবারে ছিলেন স্ত্রী বিভাবতী, চার ছেলে ও দুই মেয়ে। প্রথম দুই ছেলে যথাক্রমে দীলিপ ও ত্রিদিব অনার্স গ্রাজুয়েট এবং উচ্চ সরকারী কাজে নিযুক্ত। উভয়েই বিবাহিত। এরা সপরিবারে কলকাতার বাইরে নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকেন। বড় বউ উর্মিলা ও মেজ বউ সাবিত্রী মাঝে মাঝে কলকাতার বাড়ীতে এসে মাসাধিক কাল থেকে চলে যায়। সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান নীলিমা বিবাহিতা। তার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী অমিতাভ চার বছরের জন্য নিউইয়র্কে যাওয়ায় নীলিমা দর্শনশাস্ত্রে প্রাইভেটে এম. এ পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতির জন্য পিত্রালয়ে এসে রয়েছে। তৃতীয় ছেলে সঞ্জীব আই. এ পরীক্ষা দিয়ে, চতুর্থ প্রদীপ স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সীমা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। প্রদীপ খেলাধূলারও ভক্ত। তা ছাড়া স্থানীয় কংগ্রেস ও বিপ্লবী দলের দুটা অফিসেই ও যাতায়াত করে। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার বয়স প্রদীপের তখন হয়নি। বড়দের নির্দেশে ছোটখাটো কাজ করা, মিটিং-এ যোগদান ও অন্যের সাথে শ্লোগান দেওয়ার মধ্যেই তার কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে। মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে চাকর, কি, রাঁধুনে বামুন, বেয়ারা ও মালি প্রভৃতি নিয়ে বেশ কিছু বাড়তি লোকও ছিল।

সমরেশবাবুর বাড়ীটি দ্বিতল। বাড়ীর বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে সুন্দরভাবে সাজানো আলাদা ফুলের ও তরিতরকারীর বাগান। বাড়ীর সীমানা-দেয়ালের সমান্তরালভাবে ঘেষাঘেঁষি না করে দাঁড়িয়েছিল কয়েকটি নারকেল ও সুপারি গাছ। বাড়ীখানির প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল যেমন প্রীতিদায়ক, পারিবারিক পরিবেশও ছিল পরম শান্তি ও আনন্দের।

সেদিন বিকেল ৩টায় সমরেশবাবু তাঁর ড্রইংরুমে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এমন সময় প্রদীপকে বাইরে যেতে দেখে বললেন "প্রদু, কোথায় যাচ্ছো?" প্রদীপ "এই কাছেই বাবা, মাকে বলেছি।" একথা বলে চলে যায়। প্রদীপ গেট পেরিয়ে বাড়ীর বাইরে যাওয়ার একটু পরেই বিভাবতী ড্রইংরুমে ঢোকেন এবং দাঁড়িয়ে থাকেন। সমরেশবাবু স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে বলেন "তোমার অনুমতি নিয়ে প্রদু কোথায় গেলো?"

বিভাবতী—"ও পাড়ার নেতাজী সংঘে কি একটা ফাংশন হবে আসছে রবিবার। প্রদুর একটা আবৃত্তি আছে, তাই ওখানে ওকে যেতে বলেছে।"

সমরেশ—নেতাজী সংঘে নাকি গান্ধী, লেনিন মার্কস ইত্যাদি নিয়ে রাজনীতির আড্ডাও চলে। স্বাখো, পড়াশুনায় ওর মাথা আছে। কিন্তু মন না থাকলে মাথার কোন দাম নাই। পলিটিকস যারা করে তাদের দলে মিশলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে সে দিকে নজর রেখো।

বিভাবতী—ছুট ফরমাস খাটা ছাড়া ও এ বয়সে কি আর পলিটিকস্ করবে?

---

* যিনি কাহিনী লিখেছেন তাঁর ছদ্মনাম "অনামী"র জায়গায় প্রথম সংখ্যায় অনামিকা বলে ভুলক্রমে ছাপানো হওয়ায় জন্য আমরা দুঃখিত—সম্পাদিকা, উজ্জলকান্তি।

সমরেশ—ও, আর একটু বড় হলে সক্রিয় পলিটিকস্ করবে এ তোমার মত? তোমার ছোট মামা যেমন করেছে।

বিভাবতী—মন্দ কি! তুমি কত বড় বিদ্বান, জজের চাকুরী করেছো, কত অর্থ যশ মান পেয়েছো কিন্তু মিনিষ্টার ঠিনিষ্টার হতে গেলে ছোট বেলায়ই পলিটিক্সে হাতে খড়ি দেওয়া উচিত। তোমার চেয়ে অনেক কম বিদ্যা নিয়ে কতলোক শুধু জেল খেটে মিনিষ্টার হয়ে পড়ছে। বলে মুখে একটা নিষ্ঠুর সহজ কৌতুকের হাসি রচনা করলেন।

সমরেশবাবুও কৌতুকের ছলে বললেন,—কিন্তু পলিটিকসের পথ সুগম নয়, দারিদ্র্যবরণ কারাবাস দৈহিক নিরাপত্তার অভাব অনেক বাকি আছে। তোমার মামা কত লাঞ্ছনা দুঃখ কষ্টের পর উপনয়ী হয়েছে তা তো তোমার জানা আছে।

বিভাবতী—আখো, আমি সত্যি কিছু ভেবে কথাগুলি বলিনি। হঠাৎ কি খেয়াল হোলো কথাগুলো বলে ফেলেছি। আমাদের ঘরের ছেলের সরকারবিরোধী পলিটিকস্ এখনও সম্ভব নয় আমি জানি। তোমার মোটা অঙ্কের পেনসনটা সরকার বাহাদুর বাতিল করে দেবে সে চিন্তা আমার আছে।

এই সময় দুজন যুবক ড্রইংরুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে বিভাবতী অন্য দরজা দিয়ে অন্দরে চলে যান। একজন যুবক "স্যার ভেতরে আসতে পারি" বলাতে সমরেশবাবু ওদের ভেতরে ঢোকার নির্দেশ জানান নম্রভাবে।

যুবক দুইটি ড্রইংরুমে ঢুকে আসনে উপবিষ্ট হতেই সমরেশবাবু বললেন "অচিন্ত্য যে, কি ব্যাপার, তোমার সাথের ছেলেটি কে?

অচিন্ত্য—আমার এক বিশেষ বন্ধু, স্যার। এক সঙ্গে দু'জনে পড়াশুনা করে গত বছর ইকনমিকস্-এ দুজনেই প্রথম বিভাগে এম. এ পাশ করেছি। এখন দুজনেই কমপিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

সমরেশ—বেশ বেশ, শুনে খুশী হলাম। তারপর আজ কি প্রয়োজনে এসেছো বলো।

অচিন্ত্য—(কিছুক্ষণ ভেবে) আচ্ছা স্যার, জাতিভেদ সম্পর্কে আপনার মত কি?

সমরেশ—জাতিভেদ বলতে কি বোঝো?

অচিন্ত্য—এই ধরুন, আমাদের বাঙালী সমাজে গুণানুসারে ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থ ও শূদ্র এই বিভিন্ন স্বতন্ত্র গোষ্ঠী দেখা যায়। এ শ্রেণীবিভাগ কি ভালো বলেন?

সমরেশ—আখো, অচিন্ত্য, আইনের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। শাস্ত্রকারেরা সব দিক থেকে ভেবেই শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন বহু শতাব্দী আগে। বর্তমান যুগে শাস্ত্রকারদের বিভিন্ন নির্দেশ কতটা গ্রহণীয় তাই বিবেচনার বিষয়।

অচিন্ত্য—ঠিক বলেছেন স্যার। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতেই এসেছি।

সমরেশ—আখো, অচিন্ত্য, এখনও আমাদের সমাজে অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও রুচিহীন লোকের সংখ্যা খুব বেশী। যখন শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঘরে ঘরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে তখন জাতি বা শ্রেণীভেদের প্রয়োজনীয়তা চলে যাবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন ওটাকে মেনে নিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

অচিন্ত্য—বিবাহ ব্যাপারটা তা হলে নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই উচিত বলে আপনি মনে করেন?

সমরেশ—আপাততঃ তাই। এখনও ব্যাপকভাবে শ্রেণীভেদ তুলে দেওয়ার মত অনুকূল পরিবেশ দেখছি না। অসবর্ণ বিবাহটা এখন না হওয়াটাই বোধ হয় শ্রেয়।

অচিন্ত্য—আমরা যে সমস্যা নিয়ে এসেছিলাম তার সমাধান আপনার কাছে পেয়ে গেছি।

সমরেশ—তোমরা উচ্চশিক্ষিত আদর্শবাদী যুবক, তোমাদের কি আর উপদেশ দেবো। নিজেদের সমস্যার নিজেরাই সমাধান করে নেবে। পুরাতনের ভালটুকু রক্ষা করে বিচার বুদ্ধি ও যুক্তি নিয়ে যে কোন সমস্যারই সমুখীন হও তার সমাধানে সক্ষম হবে। পুরাতনকে একদম বাতিল করার নাম প্রগতি নয়, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

অচিন্ত্য—আর কথা বাড়াবো না, স্যার। আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। মনে কিছু করবেন না।

সমরেশ—না হে, মনে করবো কি! আমার এখন তো অফুরন্ত অবসর। কাল কথাবার্ত্তায় সময় কাটানো মানে ফাঁকা সময়টাকে পূর্ণ করে দেওয়া। তাই কাজের কথা নিয়ে কেউ এলে ভালোই লাগে।

অচিন্ত্য—আচ্ছা স্যার, আমরা চলি এবার।

সমরেশ—এসো এসো! এরপর যুবকদ্বয় নমস্কারান্তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

*

॥ পাঁচ ॥

তিনকড়ি কলকাতা এসে সাধারণ সস্তার হোটেলে ওঠে। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা—বিরাট কলকাতা সহর। কে তাহাকে চেনে? কে তাহাকে কাজের সন্ধান দিবে? তার বা বিদ্যা তাতে আফিসের নিম্নতম কাজও মুরুব্বীর জোর ছাড়া পাওয়া অসম্ভব। তাই আফিসের চাকুরী পাওয়ার কোন চেষ্টাই করলো না। কিন্তু কাপড়ের দোকান, বইয়ের দোকান, ষ্টেশনারী দোকান, চায়ের দোকান এমন কি মুদি দোকান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কয়েকদিন ঘোরাফেরা করেও কার্য্যপ্রাপ্তির কোন সুবিধা হোলো না। তিনকড়ির স্বাস্থ্য ও চেহারা মোটামুটি অনুকূলেই ছিল। কিন্তু গ্রাম থেকে সদ্য আসা অপরিচিত লোক বলে কেউ তাকে চাকুরী দিতে রাজী হলো না। বাড়ী থেকে যে কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল তা ক্রমে নিঃশেষ হতে চললো। তিনকড়ির মন ঘমে যায়। কিন্তু অনামিকার উৎসাহ বাক্য, কর্ম্মনিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কথা মনে আসতেই মনের নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে এবং টাকা আয়ের একটা সহজ পথ নির্দ্ধারণের কথা ভাবে।

পরদিন দেখা যায় তিনকড়ি খুব ভোরে খবরের কাগজের বাণ্ডিল বগলে করে রাস্তায় ঘুরে ঘিরে বিক্রী করছে। পত্রিকা বিক্রীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তিনকড়ি কোনমতে দুবেলা খাবার ও হাতখরচার টাকাটা সংগ্রহ করলো প্রথম তিনদিন। হোটেল সে আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। একটা থলিতে জামা কাপড়, গামছা, ও টুকিটাকী জিনিষপত্র সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো। তার দিন রাত্রিবেলা ফুটপাথে, পার্কের বেঞ্চিতে বা গাড়ীবারান্দা-ওয়ালা কোন বাড়ীর নীচে আরো দশজনের সাথে তিনকড়ি ঘুমিয়ে কাটায়। চতুর্থদিন যখন বিশেষ খবর সম্বলিত সান্ধ্য পত্রিকা "টেলিগ্রাম" সোৎসাহে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বিক্রী করতে থাকে, তখন দেখা যায় অপর-দিকে স্ত্রী অনামিকা পরম উৎসাহে মেশিন চালিয়ে সেলাইয়ের কাজ করে যাচ্ছে। পঞ্চম দিন সন্ধ্যার একটু পরে একটা সাধারণ দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনকড়ির সকল কষ্ট ও অসুবিধার পরিসমাপ্তির সূত্রপাত ঘটে। জজ সমরেশ মিত্র নিজ মোটরে চড়ে কলকাতার কোন রাজপথ ধরে যাচ্ছিলেন। একটা দ্রুতগামী লরীর সাথে নিশ্চিত সংঘর্ষ এড়াবার জন্য যেমনি তার ড্রাইভার মোটরের গতিমুখ ফিরাবে তক্ষুনি একজন পথচারী খবরের কাগজ বিক্রেতা আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে ল্যাম্পপোষ্টে ধাক্কা খায়। সমরেশবাবু গাড়ী থামিয়ে নেমে গিয়ে দেখলেন লোকটির আঘাত বিশেষ গুরুতর না হলেও তার পক্ষে হেঁটে চলা একেবারে অসম্ভব। আর এ ধরণের কেস্ হাসপাতালে রাখার মতও নয়। আঘাতপ্রাপ্ত লোকটি আমাদের তিনকড়ি; তার বগলে তখনও অবিক্রীত খানকয়েক সান্ধ্য টেলিগ্রাম পত্রিকা। মিত্র মহাশয় তিনকড়িকে মোটরে তুলে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যান এবং ডাক্তার ডেকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। দিন দুই পরেই তিনকড়ি সুস্থ ও সক্ষম হয়ে ওঠে। জজের বাড়ীর মেয়েরা সবাই তিনকড়ির পরিচর্য্যার দিকে লক্ষ্য রাখে। সজীব বলে "তিনকড়িদা, তোমার ও আমাদের বরাত ভালো। একটা ধাক্কা দিয়ে সামান্য আঘাতের বিনিময়ে প্রাণটা বাঁচাতে পারলে। না হলে মোটর চাপা পড়ে মরেই যেতে। আইনের দিক ছেড়ে দিলেও মানবতার দিক দিয়ে গৌণভাবে প্রচণ্ড আঘাত পেতেন বাবা।

তিনকড়ি—আপনারা ভাল বরাত নিয়ে জন্মেছেন, সজীববাবু, বরাত আপনাদের ভাল থাকবেই। আর

আমার বরাত বলে কিছু নেই তবে স্ত্রীর পুণ্যের ফল বলতে পারেন।

বিভাবতী—তোমার স্ত্রীর পুণ্যের ফল সে আবার কি?

তিনকড়ি—মা, আমার স্ত্রীর ঠাকুর দেবতায় ভীষণ ভক্তি। রোজ সকাল সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরে গিয়ে পূজা প্রার্থনা করা তার চাই-ই।

বিভাবতী—বেশ ভালো কথা। তোমার বউয়ের কথা পরে শুনবো, আজো তো ২।৪ দিন।

তিনকড়ি—২।৪ দিন কেন, আপনাদের দয়া হলে বরাবরের জন্যও থেকে যেতে পারি।

সমরেশবাবু ইতিমধ্যে তিনকড়ির খোঁজখবর নিয়েছিলেন। তিনি তিনকড়িকে বাড়ীর দাঙ্গার সরকার ও ব্যক্তিগত বেয়ারার কাজে থাকা ও খাওয়া পরা সহ মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এ কাজে যে নিযুক্ত ছিল সে অসুখের দরুণ সম্প্রতি কাজ ছেড়ে চলে যায়। তিনকড়ি প্রথমটায় ইতঃস্তত করছিলো। ঠিক চাকরের কাজ না হলেও প্রায় তদ্রূপ কাজ এই ভেবে। কিন্তু শেষটায় অনামিকার ক্লান্তিহীন খাটুনী ও সংসারের অর্থসমস্যার কথা ভেবে প্রস্তাব গ্রহণে রাজি হয়। কাজটা পেয়ে তিনকড়ি নিশ্চিন্ত হয়। মাসে ৪০।৪৫ টাকার মত অনামিকাকে পাঠাতে পারবে ভেবে খুশী হয়। হউক চাকর বেয়ারার কাজ, মিত্র সাহেব ধীর স্থির দয়ালু লোক, তাঁর এবং সে কারণে পরিবারস্থ অন্য সবার কাছে ভাল ব্যবহারই সে পাবে এ বিশ্বাস তার মনকে উৎসাহিত করে তোলে।

* * * *

এর পর বছর দুয়েক কেটে গেছে। তিনকড়ি বার পাঁচেক দেশের বাড়ীতে এসেছে, প্রতিবার সাত থেকে দশ দিনের ছুটী নিয়ে। তিনকড়ির মাইনে ৪০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০ টাকা হয়েছে। অনামিকার পরিশ্রমের ফলে সেলাইয়ের কাজে মাসিক আয় দেড়শো টাকার সীমায় পৌঁছায়। অর্থের খুব স্বাচ্ছল্য না এলেও অনামিকার নৈপুণ্যে সংসারের খাওয়া পরা ও ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া সঙ্গীত শিক্ষা নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবেই চলতে থাকে। বড় মেয়ে অনিলা প্রথম স্থান অধিকার করে নবম শ্রেণীতে উঠেছে। লেখাপড়া, গান আবৃত্তি ও সেলাইয়ের কাজ প্রত্যেকটীতে অনিলা কৃতিত্ব দেখাচ্ছিল। স্কুলের পারিতোষিক বিতরণী সভায় অনিলা গানে ও আবৃত্তিতে সকলকে মুগ্ধ করে। পুরস্কার গ্রহণের জন্য যখন সভাপতি মহাশয় অনিলাকে ঘন ঘন ডাকেন তখন তার পুরস্কারের বহর দেখে সভায় উপস্থিত অনেকেই আশ্চর্য হয়ে যান। সাধারণ শাড়ী পরা ও প্রায় নিরাভরণা অনিলার কাছে উচ্চসংস্কৃত ধনীর ঘরের সাজ-গোজ ও ফ্যাশান-দুরস্ত আদুরে মেয়েদের ম্লান দেখা যায়। অনিলার ছোট বোন অমলা পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে পড়াশুনায় অমলাও মোটামুটি ভাল। অমলা সিনির তালে গান শেখে। শান্তস ইনফ্যাণ্ট ক্লাশে পড়া শুরু করেছে। বড় মাদুর বা সতরঞ্চি মেঝেতে পেতে অনিলা ভাই বোনদের নিয়ে সকাল সন্ধ্যায় যথাসময় পড়াশুনায় বসে। তার আগে ঠাকুর ঘরে মায়ের সাথে কিছু সময় কাটায়। অনামিকার সেলাইয়ের কাজ পুরাদমে চলতে থাকে। বিশুর ঘরে অনামিকা শক কাটিং ও সেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে আনায় ওদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়ের অঙ্কও ক্রমে বৃদ্ধি পায়। অনামিকা এক রাত্রে স্বপ্ন দেখে, যেন এক দেবীমূর্তি তাহার শিয়রের কাছে দণ্ডবৎ হয়ে বলছেন বাছা, তোর কর্মনিষ্ঠা ও ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তোর দুর্দিন কেটে গিয়ে সুদিন শীগগিরই আসবে। এই বলে দেবীমূর্তি অদৃশ্য হলেন। অনামিকা দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে "মা দুর্গা" কথাটি অস্পষ্ট উচ্চারণ করলো এবং ওষ্ঠে হাসি ফুটিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

তিনকড়ি কলিকাতা যাওয়ার কিছুদিন পরে জমিদার রথীন চৌধুরীর খুব ভাল একটি মেয়ের সাথে বিয়ে হয়। তারপর থেকে রথীন চৌধুরীর বাইরের আচরণে একটা ভদ্রতা ও সংযম দেখা যায়। আশেপাশের লোকেরা এবং বিশেষ করে অনামিকা নিরুপদ্রব জীবন যাত্রার আশায় উৎসাহিত হয়।

॥ ছয় ॥

সমরেশবাবুর ভবনে কনিষ্ঠ ছেলে প্রদীপের জন্মতিথি উপলক্ষে একটা ছোটখাটো উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছে। তিনকড়ি প্রদীপকে খুব ভালবাসতো। প্রদীপও তিনকড়িদার খুব অনুরক্ত ছিল। তাই তিনকড়ি প্রদীপকে একটা আংটি উপহার দেবে বলে পূর্বেই মনস্থির করেছিল। খুব হিসাব করে প্রতি মাসে ২।১ টাকা করে সঞ্চয় করার ফলে আবশ্যকীয় টাকা ওর হাতে জমেছিল। উৎসবের আগের দিন বিকাল ৪টায় তিনকড়ি প্রদীপকে নিয়ে বেড়াবার নাম করে বের হয় এবং ২।৩টী অলঙ্কারের দোকান ঘুরে ওরা আসে নিউ গিনি হোম নামে ছোট্ট একটী অলঙ্কারের দোকানে। এখানে প্রদীপের আঙুলের মাপমত কম খরচে তৈরী আংটি পাওয়া যায়। তিনকড়ি লক্ষ্য করলো দোকানের মালিক ওদের নাম ধাম এবং বিক্রীত আংটির তথ্যাদি এবং বিক্রয়ের তারিখ ও সময় একখানা লাল খাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। প্রদীপ তখন ইতস্ততঃ পাইচারি করছিলো অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। আংটি বিক্রেতা কি করছে না করছে সেদিকে প্রদীপের কোন কৌতূহল ছিল না। তিনকড়ি প্রদীপকে নিয়ে যখন নিজ ভবনে ফিরে এলো তখন রাত পৌনে সাতটা। মিত্রগৃহিণী তিনকড়ির হাত দেখে ওকে একটু মিষ্ট কটু তিরস্কার করলেন, মনে মনে যে খুশী হয়েছেন সে ভাবও দেখালেন।

এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় কোন বড় রাস্তার নিকটস্থ জনবিরল গলিতে অবস্থিত কোন লোহা লক্কড়ের দোকানের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। ট্যাক্সিতে ড্রাইভারের পাশে দুজন কিশোর বালককে রেখে স্যুটপরা ৩জন যুবক ট্যাক্সি থেকে চকিতে নেমে উক্ত দোকানে ঢুকেই রিভলবার উঁচিয়ে তয় দেখিয়ে ২ হাজার টাকার নোট ভর্ত্তি একটা থলি ছিনিয়ে নেয় এবং বেরিয়ে এসে কালবিলম্ব না করে ট্যাক্সিতে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার দ্রুতবেগে গাড়ী চালিয়ে দেয়। দোকানের লোকেরা ট্যাক্সিতে ড্রাইভারের পাশে দুটী ছেলেকে দেখতে পায়। দোকানের লোকজনের চীৎকারে ও সোরগোলে কাছে পিঠের বহু লোক এসে জড়ো হয়। কিন্তু দুর্বৃত্তদের পেছনে ধাওয়া করার সুযোগ পায় না। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের মালিক ফোনে নিকটবর্ত্তী থানায় ও-দিকে জানায়। তার নির্দেশে ৩।৪ জন পুলিশ চলে আসে এবং দোকানের মালিকের বিবৃতি নিয়ে দুর্বৃত্তদের সন্ধানের প্রচেষ্টায় লেগে যায়। ট্যাক্সিতে ও পুলিশ ভ্যানে চড়ে বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্তভাবে সন্ধান কার্য্য চালিয়েও তাদের পাত্তা পাওয়া যায় না। দুর্বৃত্তগণ পালিয়ে আত্মগোপন করতে সমর্থ হয়।

অন্য অনেকেরই মত মিত্র পরিবারের লোকেরা ঐ ঘটনার কথা জানতে পারেন পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজের মাধ্যমে। কিন্তু এই ঘটনার সাথে পরোক্ষভাবে তাদের যে কোন ভবিষ্যৎ বিপদ জড়িত থাকতে পারে এ তাদের কল্পনায়ও আসে নাই।

॥ সাত ॥

বিবাহের পর তিনকড়ি কয়েক বছরের মধ্যে বার তিনেক সপরিবারে অধ্যাপক দেবাশীষের বাড়ীতে গিয়ে শাশুড়ী বিমলাসুন্দরীর সাথে দেখা করতো। শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে অনামিকা নানাভাবে সংসারের কাজে আটকা পড়ায় কোথায়ও একদিনের জন্যও যাওয়া সম্ভব হয়নি। মায়ের খবর নেওয়া ও মাকে খবর দেওয়া তারপর চিঠির মাধ্যমেই চলতো। বিমলাসুন্দরীও অধ্যাপকের স্ত্রী মীরা দেবীর অসুবিধার কথা ভেবে এবং নিজের শারীরিক অপটুতার জন্য নিজে এসে মেয়ে জামাই ও নাতি নাতনীর সাথে দেখা করতে পারেনি।

অনামিকার জ্যেষ্ঠা মেয়ে অনিলার বহুমুখী প্রতিভা ও কৃতিত্বের খবরে বিমলার তো কথাই নেই অধ্যাপক ও অধ্যাপক পত্নীও অত্যন্ত খুশী ও আনন্দিত হয়েছিলেন। অধ্যাপক পত্নী মীরা দেবী অনিলাকে উপহার স্বরূপ একটা দামী কলম পাঠিয়েছিলেন অনামিকার নামে রেজিষ্ট্রী পার্শেল করে। কলমটি পেয়ে মা ও মেয়ে দুজনেই খুব খুশী হয়েছিল।

এদিকে তিনকড়ির মেয়ে অনিলার নানা গুণের কথা জেনে স্থানীয় বেশ কিছু লোকই খুশী হতে পারেনি।

শুধু তাই নয়, অনিলাকে কেন্দ্র করে অনেক রসিকা মহিলাদের ঈর্ষাপ্রণোদিত অদ্ভুত আচরণের কথা শোনা যেতো। তারই কয়েকটি নমুনা, যা পারিবারিক তথা সামাজিক গ্লানির উপর আলোকপাত করবে, নীচে লিপিবদ্ধ করা গেলো।

বিমলেন্দু বসু বীরগঞ্জ গ্রামের স্বচ্ছল অবস্থার লোক। নিকটস্থ মহকুমা সহরের আদালতে ওকালতি ব্যবসা করছেন। ব্যবসায় অর্থাগম বেশ ভালই। কিন্তু জেদী, কলহ-প্রিয়া ও অহঙ্কারী স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর দাপটে তিনি বাড়ীতে জড়ত্ব হয়ে থাকতেন। সন্তানের মধ্যে এদের ছিল দুইটি কিশোরী মেয়ে। কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। বসু মহাশয়ের স্ত্রীর এক জানপিটে আড্ডাবাজ খুড়তুতো ভাই প্রলয়কুমার মাঝে মাঝে এসে ৩ ৪ দিন করে থেকে দিদির অন্ন ধ্বংস করে ও ভায়ীদের আধুনিকতাব নূতন নূতন টিপ শিখিয়ে চলে যেতো। এখানে থাকার সময় রবীন চৌধুরীর সাথে প্রলয়কুমার ভাব জমাতে সক্ষম হয় এবং তারই খানিকটা প্ররোচণা পেয়ে প্রলয়-কুমার তিনকড়ির বাড়ীতে একটা ছুতা ধরে আসে এবং অনামিকাকে মাসিমা বলে সম্বোধন করে ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াস নেয়। অনিলা নিজের বুদ্ধিতে ও মায়ের উপদেশ মত, প্রলয়কুমারের সান্নিধ্য এড়াবার চেষ্টা না করলেও, কোন রকম কথা আদান প্রদানের মধ্যে যায় না। অনামিকার সহজাত কোমল, মিষ্ট ও স্নেহার্দ্র ব্যবহারে প্রলয়কুমার উৎসাহিত হয় এবং একদিন অনিলার সাথে নিজের বিবাহের অভিপ্রায় জানায়। অনামিকা কোন রকম বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ না করে বলেন—বাবা প্রলয়, তুমি বড়লোকের সুন্দর সুন্দর ছেলে এবং সুপাত্রও বটে। কিন্তু অনিলার বিয়ের বয়স হয়নি, আরও বছর দুই বিলম্ব আছে। ওকে বিয়ে কর্ত্তে হলে তোমার অন্ততঃ গ্রাজুয়েট হতে হবে। তার আগে তোমার অভিপ্রায় পূরণ করা তো কোন রকমেই সম্ভব নয়, বাবা। প্রলয়কুমার এর কোন উত্তর খুঁজে পেলো না। মুখ গম্ভীর করে "আচ্ছা আসি মাসিমা" বলে সেই যে তিনকড়ির বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হোলো, আর কোন দিন তার ত্রিসীমানায় সে যায়নি। ধনীর দুলাল বখাটে ছেলে প্রলয়কুমারের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো এবং অনামিকার অহঙ্কার ও তাচ্ছিল্যের কথা দিদি হেমাঙ্গিনীর কাছে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে পেশ করলো। নিজের বখাটে ভাইয়ের অনাদর হেমাঙ্গিনী হজম করে গেলো বটে, কিন্তু অনামিকার উপর তার একটা বিদ্বেষ জন্মালো নিতান্ত ঈর্ষার প্রভাবে, যা তিনি উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই প্রকাশ কর্ত্তেন।

বিমলেন্দু বসুর বাড়ীতে পাড়ার নিষ্কর্মা প্রৌঢ়া ও বয়স্কা মহিলাদের বৈকালিক মজলিস বসেছে। স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে সমগোত্রীয় মহিলাদের কারোর না কারোর বাড়ীতে এই মজলিস বসার রেওয়াজ চলছিলো কয়েক মাস ধরে। বিমলেন্দু তখন কোর্টে ছিলেন বলে হেমাঙ্গিনীর স্বাধীন ইচ্ছার কোন অন্তরায় ছিল না। হেমাঙ্গিনী রায়গিন্নী সৌদামিনীকে লক্ষ্য করে বললেন "হাঁ, দিদি, কালে কালে হোলো কি! মেয়েরা স্কুলে পড়বে, গান গাইবে, নাচবে, ঘরের ফুটোগাছটি ছোঁবে না, আর প্রাইজ নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ীতে এসে দেখবে মা বেচারী সংসারের ঘানি টানতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ঘর সংসার উচ্ছন্নে যেতে চলেছে। কেমাল ওষুধের কারবারী গুপ্তবাবুর স্ত্রী মন্দাকিনী হেমাঙ্গিনীর মনের কথা আঁচ কর্ত্তে পেরে বলে উঠেন "বলিহারি যাই অনিলার মা অনামিকা ঠাকুরণকে। বলতে গেলে এখন গরীবই, ভাল করে দুবেলা খেতে পাওয়ার পয়সা নেই। অথচ মেয়েদের লেখাপড়া গান শেখাবার কী কষ্ট! ক্রক সেমিজ ওয়ার বানিয়ে বিক্রী করে কত টাকা আয় হয় বলো"? রায়গিন্নী, "স্বামী বেচারা তো বাপের দোকান বিক্রী করে দেনা শোধ করে কলকাতা গেছে চাকরির খোঁজে। বলতে গেলে সে একরকম বেকার। অথচ অনামিকা ঠাকরান এমনভাবে সব চালাচ্ছে যেন অবস্থা খুবই সচ্ছল। কে জানে বাপু আর কি ভাবে টাকা আয় করে।"

গুপ্তগিন্নী, "টাকার জন্য কিছুই অসম্ভব নয় দিদি যাক, এসব বিশ্রী কথা আলোচনা করে কাজ নেই।'

হেমাঙ্গিনী রায়গিন্নীকে লক্ষ্য করে বললো, "বিশ্রী কথা না বলাই ভাল দিদি, তবে অনামিকা ঠাকরণের কেমাকের কথা শুনলে তাজ্জব হয়ে যাবে"!

রায়গিন্নী উৎসুকা নিয়ে বলে ওঠে, "সে আবার কি ভাই?" হেমাঙ্গিনী, "আমার খুড়তুতো ভাই প্রণয় যেমন সুন্দর তেমন বলিষ্ঠ, বাপে টাকার কুমীর। চাকুরীর দরকার নেই বলে পড়াশুনার দিকে বেশী এগোয়নি। প্রণয় অনিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল অনামিকা ঠাকরণকে। তিনি তাতে কি বলছিলো জানেন?" সবাই এক সঙ্গে বলে ওঠে "কি বলছিলো, দিদি?" হেমাঙ্গিনী কপট গাম্ভীর্য এনে বলে, "তিনি বলেছিলেন, অনিলার বিয়ে হবে অধ্যাপক ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটের সাথে। তোমার মত বড়লোকের অশিক্ষিত বখাটে ছেলের সাথে কখনও ওর বিয়ে হবে না। ভাগ্যিস ভাই মেজাজ ঠিক রেখে ভদ্রভাবে চলে এসেছিলো। এ নিয়ে কোন সোরগোল করেনি।" গুরুগিন্নীর সাথে এসেছিলো তার প্রতিবেশী একজন সরলবুদ্ধি শান্ত-স্বভাবের এক মহিলা, নাম লীলা নাগ। লীলা বলে উঠলো, "আপনারা যাই বলুন, অনামিকাদেবীর নাকি ঠাকুর দেবতায় খুব ভক্তি। প্রত্যহ পূজা আর্চা না করে জলস্পর্শ করেন না।" মন্দাকিনী "পূজার কথা ছেড়ে দাও বউমা। পূজা আর্চা ছেলেখেলা নয়, রীতিমত টাকা খরচ করতে হয়। কিছু ফুল বেলপাতা আর কয়েকখানা বাতাসা দিয়ে নমো নমো করে পূজা হয় না। এক পূজা পার্বণেই আমার মাসে ৩০।৪০ টাকা বেরিয়ে যায়।

এই সময় হেমাঙ্গিনীর দুই মেয়ে পাশের ঘর থেকে এসে সমস্বরে বলে "মা, আমরা কাল কিন্তু স্কুলের পরীক্ষা দিতে যাবো না। প্রিপারেশন কিছু হয় নি। পরীক্ষা দিয়ে মিছেমিছি ফেল করে লাভ কি?

হেমাঙ্গিনী—"তোরা যা ভাল বুঝিস করিস্।"

বড় মেয়ে "মা, আর একটা কথা। পাড়ার ডাক্তার ডাক্তারদা ও বউদিদা কাল সকালে আমাদের একটা বাস নিয়ে পিকনিকে যাবেন, কি মজা হবে।"

হেমাঙ্গিনী—"আমার আপত্তি কি বাপু, উনি আবার···!"

ভগ্নীদ্বয়—"সে আমরা জানিনা, তুমি মত দিলেই হলো" বলে ঘর থেকে গুণ গুণ করে কি একটা গান গেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো। রায়গিন্নী হেমাঙ্গিনীকে লক্ষ্য করে বলে, "যা বলে মেয়েরা তোমায়, তোমার মত ছাড়া এক পাও চলে না, খুব ভক্তিভক্তি তোমার উপর। বেশী পড়া পড়া করোনা, তা হলে এমনটি আর থাকবেনা।"

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। মজলিস তখনই ভেঙ্গে যায় এবং খিড়কির দরজা দিয়ে আগন্তুক মহিলারা নিষ্ক্রান্ত হয়ে অন্য কোন উপযুক্ত বাড়ীতে আড্ডা জমাতে যান। এদিকে বাড়ীর চাকর সামনের দরজা খুলে দিতেই উকিল বিমলেন্দু বাবু ঢোকেন। পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে ইজি চেয়ারে বসে পড়ে শরীরটা এলিয়ে দেন। স্ত্রী হেমাঙ্গিনী এসে কক্ষস্বরে বলেন "আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে, কেসটায় হেরে গেলে নাকি?"

বিমলেন্দু—আদালতের কেসে খুব কমই হার হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমার ওকালতি ব্যর্থ হবে না এ ভরসা রাখি। তবে গৃহ-আদালতে তোমার ওকালতির কাছে আমার সব শিক্ষা দীক্ষা ও ক্ষমতা চূর্ণ হয়েছে।"

হেমাঙ্গিনী—"কেন, আমি কি করেছি ··?

বিমলেন্দু—"কি আর করবে! গরীব ছোট ঘরের মেয়ে অনিলার ও তার মায়ের নাম আজ সবাইর মুখে। আর স্বচ্ছল অবস্থায় থেকেও তোমার অন্যায় প্রশ্রয়ে মেয়েরা দু-দুবার পরীক্ষায় ফেল করে দিনরাত গল্পগুজব, সিনেমার আলোচনা ইত্যাদিতে মেতে আছে ও সদর্পে চলাফেরা করছে, স্কুলেও বই খাতা নিয়ে দুদণ্ড বসছে না।"

হেমাঙ্গিনী কর্কশ কণ্ঠে গলা চড়িয়ে জবাব দেয় "ভাখো, আমার যা ইচ্ছে তাই করবো, মেয়েরা বড় হয়েছে, ওরা নিজেদের ভাল নিজেরা বুঝতে শিখেছে। পড়াশুনা সবাইর হয় না। পড়ার কথা তুলে ওদের নিন্দে করতে হবে না"।

বিমলেন্দু—"পড়াশুনা সবারই হয়, উৎসাহ ইচ্ছা ও

চেষ্টা থাকলে। স্বাস্থ্য শুধু গর্ভে ধারণ করলেই মা হওয়া যায় না। বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সন্তানকে সব রকমে তৈরী করাই মায়ের বড় দায়িত্ব। অর্থের অভাব নেই, মেয়েদের বুদ্ধি ও মেধারও অভাব নেই, তোমার পরিচালনার ক্ষমতার অভাবেই সব অনর্থ ঘটছে"।

হেমাঙ্গিনী—"ঢের শুনলাম, আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওদের জন্য টিউটর রাখলে, আবার ২ মাস পরেই টিউটরকে ছাড়িয়ে দিলে টাকার মায়ায়"।

বিমলেন্দু—তোমার এসব তাহা মিথ্যা কথার উত্তর দেওয়া নিষ্ফল। আমারই ঘাট হয়েছে। আমি আর একটি কথা বলবো না, আমাকে রেহাই দাও।"

হেমাঙ্গিনী—ঘাট তোমার কেন হবে, আমারই হয়েছে। তুমিই আমাকে রেহাই দাও। আর টাকার তো তোমার অভাব নেই। মেয়েদের ভাল ঘর ভাল বর দেখে বিয়ে দিয়ে দাও।

বিমলেন্দু গলার স্বর নরম করে বললে, বেশ তাই চেষ্টা করবো। তবে অনেক টাকা ব্যয় করলেই ভাল ঘর ভাল বর মেলেনা। মেয়েদেরও শিক্ষা দীক্ষা থাকা চাই।

হেমাঙ্গিনী প্রতিবাদের সুরে বলে, আবার ঝগড়ার কথা তুলছো? মেয়েরা দেখতে শুনতে বুদ্ধিতে খুব খারাপ নয়। লেখাপড়া সবাইর হয় না। আর স্বভাব চরিত্রের কথা? তা বিয়ের পর অন্য রকম হয়ে যাবে। বিমলেন্দু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে, ঠিক আছে। আর কথা বাড়ানোর দরকার নেই।

এর পর দাম্পত্য কলহ থেমে যায়।

ক্রমশঃ

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৮০)

তিনি আমার সমস্ত অন্ধকারের দুর্যোগের মধ্য দিয়ে হাত ধরে নিয়ে এসেছেন...। আমি যাদের ডেকেছিলাম, তাদের হাত আমি ধরতে চেষ্টা করছি, তারা হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে...। সাধনার জগতে যদি আসতে চাও বলতে হবে—তুমি এসেছ, তুমি শরণাগত..। আর সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপন না করলে শরণাগত হওয়া চলে না।...সকলের জন্য সকলে...। সব কর্ম ব্রহ্ম কর্ম...কর্ম ব্রহ্ম হলেই সব সমাধান হবে...তখনই ধরায় ধূলি হবে ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম মানুষ।...

২৭, ২, ৫৭। ওঁ—ওঁ। উপনিষদ বলেছেন সঙ্কল্প-ময়ঃ পুরুষঃ। এই সংকল্প যার যত স্থির, প্রকৃতি তার কাছে তত মাথা নোয়ায়। এই সংকল্পকে টলাবার জন্য আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুটো শক্তিতে প্রকৃতি আত্ম-প্রকাশ করে। কোনো পথে চলতে আবরণ এসে পথ ঢেকে দেয়, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। দাদখানি চাল মুহুরির ডাল যখন মুড়ি দেখতে দেখতে দাদখানি তেল মুহুরির বেল হয়ে পড়ে, তখন সেটা আবরণ ও বিক্ষেপের দৃষ্টান্ত। বাজারে যাবে বাজারে যাও। দৃঢ় সংকল্প রক্ষা কর। বুদ্ধদেব একদিন বলেছিলেন, শরীর শুকিয়ে যাক, তবু সংকল্প আলো চাই। ক্রতু অর্থ সংকল্প... সংসার বন্ধন যখন, তখন ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু একে বন্ধন না করে পারা যায় কি না।...১৯১৯ এ আমি

বেরিয়ে পড়েছি আলোর আহ্বানে কিন্তু সংসারকে সঙ্গে নিয়ে—অবশ্য বিষয়ী লোকের সংসার আমার ছিল না। কিন্তু সংসার ছিল...। দৃঢ় সংকল্প—এই নূতন পথে, মানুষের সাধারণ চেনাশোনার বাইরের পথে চলতে বাধা কি কম এসেছে? তবু সংকল্প দৃঢ়। ঘটনা আমার হাতে ছিল না—তবু সেই সংকল্পের পথ ধরেই এতটা পথ আসা গেছে।... বিশ্বকল্যাণ সভায় প্রতিদিন আমাকে বক্তৃতা দিতে হত...। এই বিশ্বকল্যাণ নিয়েই অশ্বিনীবাবু জগদীশ-বাবুর মত লোকের সঙ্গেও বিরোধ।...কলকাতা চলে এলাম চাকুরী ছেড়ে।...একদিন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের রাস্তার জনসমাগমের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হল—সকলেরই কাজ আছে—আমার কাজ নাই। আমার বুকের মধ্যে যে কাজ প্রকাশিত হবার জন্য আকুপাকু করছে—তাকে রূপ দেবার পথ তখন জানি না! মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—ভয় রাখে।...নিতাইবাবুর ওখানে খাকি...চারটে বুভুক্ষু মুখ আমার উপর নির্ভরশীল অথচ আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়েছি চিরকালের মত...। নিতাইবাবু বললেন একদিন আমার আলোচনা শুনে—তুমি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লেখ। শুনে অবাক লাগল—আমি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখব কি? আমি একটা মুখ্যু মানুষ—বি-এ, ও পাশ করিনি—বুকের মধ্যে কতগুলি কথা খচখচ করে—তাই বলি...। নিতাইবাবু ধমক দিয়ে বললেন, হ্যাঁ তুমি পারবে, লেখ। খরচ চলবে কি করে? ...স্থির হল গুরুভাইরা মিলে সেটা বহন করবেন...dynamite-এর মত শক্তি হয়, সংকল্প যদি স্থির থাকে—বাধা ভেসে যায়...। ৪০ টাকা করে মাসে কলকাতা থেকে যেত—বরিশালের বাসায় বসে আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লিখে চলেছি..এক একদিন কী অন্ধকার সামনে! শংকরের পথে চলিনি, বাদরায়ণের পথে চলিনি—ঐ শ্রীনিত্যগোপালের চরণতলে মাথা রেখে পড়ে থেকে বুকের মধ্যে আলো জ্বলে উঠেছে...। তাঁর আশীর্বাদে সর্বভাষ্যের সমন্বয় করতে পেরেছি বলে মনে করি।

এই বেদান্ত ভাষ্য বুকে নিয়ে প্রচারে বেরিয়েছি..। ১৯১৮-তে বিশ্বকল্যাণ সভা থেকে যে সংকল্পের যাত্রা সুরু হয়েছিল, একটানা সেই এক সংকল্পকে চালিয়ে এসেছি—কত প্রতিকূল ঘটনা...বন্ধুজনের আঘাত, কংগ্রেসের ঝগড়া, রাজনীতির আবর্ত, দারিদ্র্যের কঠিন সংঘাত সংকল্পচ্যুত করতে পারত—ভেসে যেতে পারতাম...। ছেলেদের ছেঁড়া কাপড়, তাদের পুজোয় কাপড় না থাকা, স্ত্রীপুত্রকন্যার অনাহার—এসব ঘটনা সংকল্পকে টলিয়ে দিতে পারত।...সত্যব্রতকে তার মা একদিন একটা কাপড় পরতে দিয়েছে—বেশ ছেঁড়া—সে কাপড়টা দেখে বলল, এত ছেঁড়া কাপড় পরা যায়? শিশু দুকানায় নূতন কাপড় চায়, নিত্যব্রত ঘোসেদের বাড়ীতে শুনল, তোরা চাকর, তাই পুজোতে তোদের নূতন কাপড় হয় না...। এমনি কত ঘটনাই তো সংকল্পকে টলিয়ে দিতে পারত...। কলকাতা এলাম ঐ বেদান্তভাষ্য নিয়ে...। কলেজ স্কোয়ারে বসে বন্ধুবান্ধবদের কাছে ঐ আলোচনাই করি।...যারা শুনত, তাদেরই একজন থিয়োসফিকাল সোসাইটীতে যেত; হীরেন দত্ত মশাইর কাছে সে-ই আলোচনা করে সাক্ষাৎ করাল...। আমার কাছে তিনি দুটো শ্লোকের অর্থ শুনতে চাইলেন...। বললেন আগামী রবিবার তুমি বক্তৃতা দাও। ...প্রথম দিনের বক্তৃতা শুনে শ্রোতাদের মধ্য থেকে দাবী এল এঁর বক্তৃতা আমরা আগামী রবিবারেও শুনতে চাই। এমনি করে এক নাগাড়ে চৌদ্দ রবিবার শ্রীনিত্যগোপালের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেদান্ত আলোচনা করলাম...। এইসব বলছি এইজন্য যে সংকল্প অটুট থাকলে প্রকৃতি পথ খুলে দেয়। সংকল্প যার নেই সে নারদের মত কৃষ্ণের জন্য জল আনতে গিয়ে মেয়েদের মায়ায় পড়ে। চাকুরী না করার সংকল্পও অটুট ছিল...হীরেন দত্ত মশাই টাকা দিয়ে রাখতে চান...কুলদা প্রসাদ মল্লিক তখন থিয়োসফিকাল সোসাইটীতে মাইনে করা প্রচারক ছিলেন...তাঁর স্থানে আমাকে রাখতে চেয়ে ছিলেন...। সে পথ আমার নয়—মাইনে করা চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি...। চাকুরী করিনি—স্ত্রীপুত্রকন্যাকে পথেও তো ভাসাইনি। বিপ্লব creative, সে সৃষ্টি করতে করতে চলে, বিদ্রোহ আলাদা ধ্বংসই সে আনিয়া দেয়। আমি শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনতত্ত্ব দিয়ে বিপ্লব এনেছি তাই স্ত্রীপুত্রকন্যাকে তাদের তুলে দিয়ে আমি আমার

পথে এসেছি।...আমি কোন দলের সুযোগ নেইনি—আমার দলে সংসারী নেই, সন্ন্যাসী নেই, কংগ্রেসী নেই, কম্যুনিষ্ট নেই, আস্তিক নেই, নাস্তিক নেই। আমি উপাধিহীন মানুষ চেয়েছিলাম—মানুষ হয় সংসারী, নয় সন্ন্যাসী—কোন একটা না একটা উপাধিতে আটকে থাকে—তারা আর মানুষ থাকে না—তাই আমার দল নেই। ...কোন মানুষকে আমি আপন মনে করি না, পরও মনে করি না...আসক্তি নেই কারো প্রতি, বিদ্বেষও নেই কারো প্রতি।...আমি পথকে ভালবাসি, সেই পথে মেলে যার সঙ্গে সে আপন, মেলে না যদি, চলে যাই আপন পথে...পথ আমার নেই...। ১লা বৈশাখে আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে আমাদের ফেলে কালী বাড়ী যায়?...যেখানে যে প্রয়োজনে গেছ, সেই প্রয়োজনের জন্য...তার মধ্যে থেকে আমার একটা জুড়ে নেওয়া বিশেষতঃ দলকে বাদ দিয়ে সেটা খুবই অসমীচীন।...পথ থেকে বিচলিত হইনি...। কো আগষ্ঠি? কে আগে? তার ঘরে লক্ষ্মী ঢোকেন...কোজাগরী লক্ষ্মী...। মর্যাদার সঙ্গে যে অর্থ তা রাধারাণী আমায় দিয়েছেন।...সংসারের থেকে কোন সেবা, স্ত্রীপুত্রকন্যার সেবা নেই নি...আটকা পড়িনি, পড়ব না।...১৯১৯ এ যেদিন চাকুরী ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলাম শ্বশুরমশায় সেদিন কত সাবধান করেছিলেন, দাদা কত গাল দিয়েছিলেন...কিন্তু আমার তো নিত্যগোপাল মুখ রেখেছেন...পথ থেকে তো বিচলিত হই নি।...সব মানুষ আমি নিতে পারি—condition একটা মাত্র—খেয়াল বাদ দিতে হবে।...সংকল্পে দৃঢ় হও, শরণাগত হও—দেখবে জীবনে পথ খুলে গেছে।—টাকা নেই, সে কথা তোমাদের বলে লাভ নেই—তবু আমার চলার পথের কথা জানাতে গিয়ে বলতে হয়.. টাকা নেই বলে কি মুষড়ে পড়ি? তবু আমার পথেই চলতে হবে—কেউ বা কোন ঘটনা আমাকে ভুলাতে পারেনি। কারো খপ্পরে পড়িনি। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমায় লড়তে হচ্ছে।...এত প্রতিকূলতা কেন আমার? সব রকম আবেষ্টন যে আমার চারদিকে—কোন এক রকমের আবেষ্টন তো আমি রাখি নি। বিরুদ্ধতাকে ছেঁটে ফেলে নিজেকে আরামে রাখবার মত আবেষ্টন তৈরী করে নিয়ে নিজেকে নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা তো কখনও করি নি।...কিছুই আমি ঘরে রাখিনি—না মানুষ, না বস্তু—সব ছেড়ে দিয়ে দেখেছি...তবু এগিয়েছি, পেছনে সরি নি। আপন জনের সঙ্গেও—শিশু থেকে বুড়ো পর্যন্ত—আমার আদর্শের পথে আনবার জন্য ঝগড়া চালিয়েছি—ভালও বেসেছি, আদর্শের কথা বলতে গিয়ে ঝগড়া করতেও হয়েছে। আদর্শ বাদ দিয়ে স্নেহ করতে পারি নি বলেই তো সকলে মনে করেছে আমি কাউকে ভালবাসি না। মানুষ আসক্তিকে ভালবাসা বলে—ছেড়ে রেখে, বিরাট ব্যাপক আদর্শের মধ্যে, সন্ন্যাসের পথেও যে ভালবাসা যায়, সে খবর তারা রাখে না বলেই তো আমার ভালবাসাকে তারা বুঝতে পারে না।—সংকল্পের সঙ্গেই আমার প্রীতি...। আমার যাত্রাপথে যা অনুকূল তা নেব, প্রতিকূল যা তা ফেলে দেব...। প্রকৃতিকে—মানুষকে—ঘটনাকে—দোষ দিয়ে লাভ নেই—যার সংকল্প স্থির নেই, জীবনে যার misson নেই...সে এ পথে এগোবে কি করে, শান্তি পাবে কি করে?...আমার জীবনে ক্ষুদ্র প্রয়োজন, ক্ষুদ্র সুখসুবিধা আরাম...কিছু রাখি নি।

ক্রমশঃ

প্রাণের প্রণতি

।। শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ।।

পাপে ব্যাভিচারে অসত্যে ঘরে হয়েছে মেদিনী দীর্ণ ;
শ্রীগোলোক ত্যজি হয়েছেন হরি অবনীতে অবতীর্ণ।
শুদ্ধ সত্ত্ব শত তপস্বী
মুক্ত করেছে মিলি সেই মসি
পঙ্কে ফুটেছে শ্বেত-পঙ্কজ—কুসুমে সুষমাকীর্ণ।

পরম পুরুষ এল গদাধর লয়ে বীরেন্দ্র সিংহে—
ধর্ম্মের ধ্বজা হ'ল উড্ডীন সমাগরা ধরা বিশ্বে।
স্থির করিয়া মন তম জাল
এল শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
করুণাঘন বুকে তুলে নিল পাপীতাপী কত নিঃস্বে।

কবি আলোকিত কাঁকরধা ক্রোড় মুক্তকেশীর অঙ্ক—
এলে এলে তুমি শরৎকুমার দূরিতে পৃথ্বী-পঙ্ক।
মাতৃমন্ত্রে লইয়া দীক্ষা
শাসক শোষকে দানিতে শিক্ষা
জাগালে জাতিরে বাজায়ে নিত্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

অসত্য-পাপে এই ধরা ভরা হেরিলে সিন্ধুর চক্ষে
নিপীড়িত জন-অন্তর পীড়া তুলিলে কম-বক্ষে।
চমকিত করি সারা দেশবাসী
বিপ্লবী গৃহী বলে সন্ন্যাসী
গুরুপদ ধরি ধাইয়া চলিলে অমৃতপথের লক্ষ্যে।

গড়িতে সমাজ নিলে নব নাম পুরুষোত্তমানন্দ,
শ্রুতিমূলে দিলে নিত্য নূতন উজ্জীবনের ছন্দ।
কাঞ্চন কামিনী ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী
অমরা বারতা এনে দিলে বহি
নরই নারায়ণ সেই সেবাতেই মগন সত্তাসঙ্ক।

ভূমা ধ্বজাধারী সৌম্যকান্তি মমতায় মাখা দৃষ্টি
পতিতেরে কত বুকেতে ধরিলে ঝরায়ে করুণা-বৃষ্টি।
বড় সাধ ছিল সব অন্তর
কলুষমুক্ত হোক সুন্দর
ধূসরা ধরায় চেয়েছিলে নব নন্দন-বন-সৃষ্টি।

সবারই ভোগ্য বসুধার বহু বিশেশ্বরের বিত্ত—
ব্যাপি রয়েছেন ব্রহ্ম-নিখিল ধনী নির্ধন চিত্ত।
সর্ব্ব সমন্বয়ে মহাজাতি
সৃজনেতে প্রাণ দিয়েছিলে পাতি
দেশনায়কেরা করে কানাকানি যাহার লাগিয়া নিত্য।

হে যুগ-সারথি, দূর গো কৈবা মোদের মনের শ্রান্তি—
তোমার পতাকা স্কন্ধে বহিতে নাহি আসে যেন ক্লান্তি।
তোমার রথের চক্রের রেখা
দিন দিন হোক ইন্দুর লেখা
তব যজ্ঞের হবি পিয়ে পাক নিখিল মানব শান্তি।

পাদ-পদ্মের পাইনি পরশ আমি গৃহী নগণ্য—
পূত পবিত্র সমাধি ক্ষেত্রে এসেছি তাহারি জন্য ;
অর্পি অর্ঘ্য কবিতার ছন্দ
আত্মমমাখা মাখি পদরজ
ধন্য শিরা শ্রীরেণু-রেণুতে হইনু সত্য ধন্য।

পারিবারিক জীবন-আলোচনা

॥ ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[স্থান—কল্পনার বড় বসবার ঘর। সব সোফা ইত্যাদি দেওয়ালের কাছে কাছে রাখা হোয়েছে। মাঝখানে সারি সারি ফোল্ডিং চেয়ার অর্দ্ধ বৃত্তাকারে সাজানো হোয়েছে। তাদের সামনের ফাঁকা জায়গায় ছোট টেবিলে সাধারণ ফুলদানীতে কিছু ফুল ও একটী জলের গেলাসে জল ঢাকা দেওয়া ও দু'তিনটী চেয়ার আছে। কল্পনা এইসব ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত—ধনা ও গায়ত্রীর এক সঙ্গে প্রবেশ।]

ধনা]কল্পনাকে—"তুমি বাপু দরজার কাছে দাঁড়াও গিয়ে, এক্ষুণি উনি এসে পড়বেন—সময় হোয়ে এলো প্রায়। জানো তো উনি বরং একটু আগেই আসেন। দেরীতে নয়!

কল্পনা—"আগেই তো আসা উচিত, আমি তো দরজার দিকে চোখ রেখে কাজ করছি, ঢুকলেই এগিয়ে যাবো :—তবে বিশেষ সম্বর্দ্ধনার কি দরকার? উনিও তো আমাদেরই একজন। তা নয় কি! আমার চিন্তা শুধু এই যে এখনও পাড়ার মেয়েরা তো কেউ এলো না। তাদের ঠিকমতো বলা হোয়েছিলো বলেই তো জানি!

গায়ত্রী—আমি ২৫ জনকে আর ধনা ২৫ জনকে মানে ৫০ জনকে সবতন্ত্র বলা হোয়েছে। আশাকরি অন্ততঃ ২৫জন আসবে। খুব বেশী লোক তো তুমিও চাওনি, ছোটখাটো ঘরোয়া আলোচনা। বৈঠকের মতোই তো এগুলি হওয়া দরকার!

ক—নিশ্চয়! তাইতো আমার বাড়ীতেই ব্যবস্থা করেছি, যাতে নিজের বাড়ীর মতো এখানে স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা বলতে পারে। তবে কিন্তু এঁদের একটু সময়-জ্ঞান থাকা দরকার। উনি অন্তত দুই থেকে দুটার দিনে এসে ওঁর সময় ও শক্তিক্ষয়টা যদি সার্থক না মনে করেন তবে সেটা দুঃখের ব্যাপার হবে। যদিও এসবে তিনিও অভ্যস্ত, দুঃখ পেলেও দমে যান না।

[পাঁচটী মধ্যবয়সী মহিলার কথা বলতে বলতে প্রবেশ। গায়ত্রী এগিয়ে গিয়ে তাঁদের আদরে এবং বলতে বলেন। "খুব সময়ে এসে পড়েছেন, আমাদের খুব ভালো লাগলো। উনি এখনই এসে পড়বেন। আমার তো ভয় হোচ্ছিল যে এসে বুঝি একেবারে খালি ঘরটাই তাঁকে দেখতে হয়!"

(একটী মহিলার প্রবেশ—বয়স ২৫ কি ৩৫ বোঝা যায় না ঠিক) ঘরে ঢুকেই সবাইকে একান্ত পরিচিতের মতো বলেন, "কি ভালো আপনারা সব আগেই এসে পড়েছেন! আমারও আর একটু আগেই আসার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠলাম না। আমার নাম অপরাজিতা (বলতে বলতে চেয়ারে বসলেন)।

কল্পনা—'আমার নাম তো জানেনই, আগেও দেখা হোয়েছে আপনার সঙ্গে! তোমরা ভাই নিজেরাই নিজেদের নাম বল না যেমন উনি বলে নিজেকে পরিচিত করলেন!"

(প্রত্যেকে নিজের নিজের নাম নিজেদের চেয়ারে বোসে থেকেই বলে গেলেন—তবে নতুন পাঁচটী মহিলা একটু সঙ্কুচিত ও গম্ভীর ভাবে। এরই মধ্যে আরও দু'একটী করে ৭।৮টী মহিলা এসে জুটলেন ও অন্যদের দেখাদেখি নিজেদের পরিচিত কোরে নিলেন। ছবির সঙ্গে ৪।৫টী মহিলার প্রবেশ—তাঁদের ৩।৪টী শিশু সন্তানের পিছনে আয়ার প্রবেশ)

ছবি—আমাদের একটু দেরী হোয়ে গেলো, তবে

দেখ্‌ছি যেন কাজ এখনও আরম্ভ হয়ে যায় নি।

ক—কী যে বলো, কাজ তো সব সময়ই হোচ্ছে, তবে তোমাদেরও বিশেষ কিছুই বাদ যাবে না। আমরা এতক্ষণ নিজেরা পরিচিত হোচ্ছিলাম।

ছবি—তবে এঁদেরও পরিচয় করিয়ে দিই, জয়া, তুমি বাচ্চাদের নিয়ে পাশের ঘরে ওদের খেলার জিনিষগুলো দাও—দেখাশোনা কর, কেমন?

জয়া—আমি নয়, তুমি। আমি তো সারাক্ষণই বাড়ীতে এ কর্ম করছি, এখন আমি এ ঘরে থাকবো।

বন্দনা—আচ্ছা আমিই যাচ্ছি বাচ্চাদের কাছে, আমার বেশ লাগে ওদের নিয়ে থাকতে। (চলে গেলেন বাচ্চাদের নিয়ে)

জয়া—হ্যাঁ, এক আধ দিন দুচার ঘণ্টা তো লাগবারই কথা।

অপরাজিতা—আমি তো তাই ওদের একটু দূর থেকেই খুব ভালোবাসি, বেশীক্ষণ ওদের নিয়ে থাকতে হোলে বড়ই হাঁপিয়ে পড়ি! (সকলেরই অল্পবিস্তর হাসি দেখা গেল—গম্ভীর আবহাওয়াটা কেটে গেলো যেন)

অপরাজিতা—তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই কয়জনই আজ একত্র হোলাম। কেন আমরা আজ এখানে এসেছি কেউ কি বলবেন?

প্রথমা—আজ আপনি বক্তৃতা দেবেন তো!

অপরাজিতা—না ভাই, বক্তৃতা দেব না—কথা বলবো। শুধু একা আমি নই, আপনারাও কথা বোলবেন। এখানে আমরা কেউ-ই শুধু চুপ কোরে শুনে যাব না। নিজেদের যা অভিজ্ঞতা সেটা বলবো। অভিজ্ঞতা না থাকলেও অন্ততঃ নিজস্ব মতামত প্রকাশ করবো, ভাল মন্দ ফলাফল নিয়ে এক তর্কবিতর্ক করবো। গলা শুকিয়ে গেলে কিছু পানীয় চেয়ে নেব, কি রাজী তো?

(উপস্থিতেরা সমস্বরে)—খু—ব রাজী।

অ—তাহলে আরম্ভ করা যাক। এই দেখুন আমি তিনটী মেয়েদের সাপ্তাহিক পত্রিকা এনেছি; এতে কি কি জিনিষ আছে বলি—প্রথমটীতে আছে কতরকম কোরে রান্না করা যায়—বিশেষ কোরে ছোটদের জন্য মজার মজার জন্তুদের চেহারা বানিয়ে—তারই নানারকম ছবি ও প্রণালী লেখা আছে অনেকগুলি পাতায়। তারপর কয়েক পাতা জুড়ে আছে মেয়েদের চুল বাঁধার নানা ফ্যাশানের প্রণালী ও ছবি। উলের জামা ইত্যাদি বোনার প্রণালী ও ছবিও প্রচুর আছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রশ্নোত্তরও আছে দুটী পাতায়। তারপর আছে রাশির ফল—এ সপ্তাহ কেমন যাবে কোন রাশির! এর পরে কি আছে জানেন? নানারকম সাংসারিক সমস্যার বিবরণ ও তাদের সমাধানের উপায় সম্বন্ধে মতামত।

প্রথমা—আ

ওটাই পড়ুন।

দ্বিতীয়া—না না, ও আমরা যা জানি তাতেই হবে, তার চেয়ে চুলের ফ্যাশন সম্বন্ধে পড়াই ভালো।

তৃতীয়া—আমার মনে হয়—এসব আমরা যতটুকু জানি তাতেই কাজ চলে যাচ্ছে; স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও আজকাল অনেক লেখাই দেখতে পাওয়া যায়; গ্রহ ও রাশিফলও খবরের কাগজে প্রতি রবিবারই তো বের হোচ্ছে, কিন্তু সাংসারিক সমস্যার কথা তো কই বিশেষ পড়ি না। ওটা আমার ধারণা ছিলো যে কোথাও লেখা হয় না। হয়তো দরকার হয় না কারো। কিন্তু আমার তো ওটাই বিশেষ কোরে শুনতে ইচ্ছে কোরছে।

চতুর্থ—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওটাই আগে পড়ুন, পরে অন্য সব পড়লেই হবে।

অ—তবে এক কাজ করা যাক্। আজ এটাই পড়া যাক্। তারপর আপনারা এ তিনটে পত্রিকাই রেখে দিন্ না; সুবিধা মতো পড়বেন। আর যদি যাঁরা কাছাকাছি থাকেন এমন তিনটী দল গড়ে এক একটী বই নিয়ে অন্যদের সঙ্গে বদল করেন, দেখবেন বেশ ভালো লাগবে। তারপর একটী দিয়ে অন্য বইটী নিয়ে নিয়ে আপনারা নিজেদের মধ্যেই তিনবার মিলিত হোতে পারবেন। পরের বার আবার আমি যখন আসবো—তখনও তিনটী নতুন পত্রিকা আনবো, কেমন?

৫ম ৬ষ্ঠ ম—হ্যাঁ, বেশ তাই হোক।

অ—"প্রথম সমস্যাটার নাম" "শেষ সুযোগ" (A last Chance)। বিবরণ হোচ্ছে এই—যদিও আমার চারটী সন্তান বর্ত্তমান, তবু যদি আমার বিয়েটা সুখের হোত তবে আমি আরো একটী সন্তানের জননী হোতে চাইতাম। কিন্তু আমার স্বামীর সঙ্গে মোটেই বনিবনা হচ্ছে না। তিনি নিজের সন্তানদের বেড়ানোর পরিবর্ত্তে তাঁর বন্ধুবান্ধব নিয়ে মত্ত থাকতেই ভালোবাসেন। এমন কি, বলেন যে যদি আমার আবার একটি সন্তান হয়, তিনি নাকি বাড়ী ছেড়ে চলেই যাবেন। আমি ভাব ছিলাম যে ছেলেমেয়েরা বড় হোয়ে গেলে আমি নিজেই এ বাড়ী থেকে বিদায় নেব; কিন্তু তারজন্য আমায় তো অনেক বছর যাবৎ এই দুর্গতি ভোগ করতে হবে। এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার অন্য কোন উপায় কি নেই।—বোঝাই যাচ্ছে যে এটি কোন মহিলা তাঁর বিবাহিত জীবনের একটি সমস্যার কথাই বলছেন এবং সহানুভূতি ও সমাধানের উপায় সম্বন্ধে মতামত জানতে চাইছেন। এখন আসুন আমরা ভেবে দেখি, কী ভাবে তাঁর কাজে লাগতে পারি।

অম্বা—আরে, এ তো আমাদের সবারই জানা আছে! বহু সংসারেই তো এ সব হোচ্ছে, এ আবার একটা সমস্যা নাকি? এই তো অলীকবাবু মস্ত রাজনীতিক, তাঁর নিজের এলাকায় সব পরিবারের পরম উপকারী বন্ধু; কিন্তু তিনি তাঁর নিজের স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়ের কথা কি কখনও ভাবেন, না তাদের অন্য কিছুটী করেন; তাঁর স্ত্রী বেচারী কী করেই সবদিক বজায় রাখছেন! অবশ্য তিনি ধরেই নিয়েছেন যে এই রকম হওয়াটাই তাঁর অদৃষ্ট এবং তাই সাধ্য মতো কর্ত্তব্য কোরে চলেছেন!

৬ষ্ঠ—তা বটে, কিন্তু এজন্য তাঁর দুঃখ আছে প্রচুর। আমার কাছেও কত সময় দুঃখ করেন।

৭ম—তা যাই বল, অলীকবাবুর বন্ধুরা ও আত্মীয়বর্গ সকল সময়ই তো ওঁদের দেখা শোনা ও নানাভাবে সাহায্য কোরে থাকেন।

৮ম—তাতেই যদি হোত তবে তাঁদের বড় ছেলেটী পরীক্ষায় বারবার ফেল কোরত না।

৯ম—সে উনি নিজের সংসার নিয়েই সারাক্ষণ থাকলেও এরকম হোতে পারতো। নাম কোরতে চাই না—আমাদের পাড়ারই এক ভদ্রলোক আমি তিনি সারা জীবন অভিযুক্তা করেছেন আর নিজের ঘরে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থেকেছেন। বাইরের লোক দূরের কথা, নিজের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গের জন্য কখনও কিছু করেননি—মেশেননি কারো সঙ্গে। তাঁর তো কয়েকটি মেয়ের মধ্যে একটি মাত্র ছেলে এবং সে কিছু তাঁদের সুসন্তান হোয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করছে না! ভদ্রের ছেলে হোয়ে সে নিজে কত যে দুষ্কর্ম করে বেড়াচ্ছে! তার জের সামলাতে এখন তো ভদ্রের প্রাণান্ত!

১০ ম—আর আমাদের 'রমানাথ' ডাক্তারের সংসার দেখো না,—নিজে ডাক্তার—আর তারই ছেলে কিনা ডিফ্‌থিরিয়া রোগে মারাই গেলো! নিজের প্রাক্‌টিস্ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, সকলেরই প্রিয় এবং সত্যিই অত্যন্ত ভালো লোক, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কি কষ্ট বলো দেখি!

১১।—তবে এখন তো স্ত্রীকে নিয়ে প্রত্যেক বছর দুমাস কোরে দেশভ্রমণে যান্।

১২।—গাছের গোড়া কেটে ফেলে আগায় জল ঢালার ব্যবস্থা আর কি।

১৩।—এই দেখ না প্রোফেসর মজুমদারের কত নাম। কত বই লিখেছেন, কত যে সাধারণ ছেলেকে পড়িয়ে তাদের অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করিয়েছেন তা তো আমরা নিজেরাই দেখেছি! অথচ নিজের একটি মাত্র ছেলে—ম্যাট্রিক পাশও করতে পারলো না! এমন অমানুষ হোয়েছে যে বিধবা 'মা'কে মারতে আসে, দিন রাত ঝগড়াঝাটি করে সকলের সাথে।

১৪।—আচ্ছা এসব বোলছ, এঁদের কানে গেলে কি ভালো হবে।

অ—আমার মনে হয় আমরা কারো নাম না কোরে মোটামুটি ঘটনাটি বা বিবরণটি (facts) নিয়ে

আলোচনা করলে আর কারো কিছু মনে করবার কারণ থাকবে না।—সত্যিই তো লোকে যে অবস্থায় পড়ে, যা কিছু করে সেই মত না কোরে হয়তো উপায় ছিলো না তার। হয়তো এরকম না করলে তার আরও খারাপ অবস্থায় পড়তে হোতো। আমাদের তো আর তাদের সম্বন্ধে সবকিছু জানা সম্ভব নয়, তাই তারা ভালো কোরেছে কি মন্দ কোরেছে বিচার করার চেয়ে বরং কী ভাবে চললে এ অবস্থায় পড়তে হয় না—আর কী উপায়েই বা এসব অবস্থায় পড়ে গেলে খুব কম ক্ষতিগ্রস্ত হোয়ে, বা একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত না হোয়ে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে—তাই ভেবে দেখবো এবং অন্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবো। এইটুকুই আমরা পারি আর এটুকু করতে পারলেও আমার মনে হয় সংসারের গাড়ি অনেকটাই বজায় রাখা যায়।

১৫। সত্যি দেখ, দেশে রাজনীতিরও চাই, শিক্ষকও চাই, ডাক্তারও চাই, বিচারপতিও চাই। আরও কত কি চাই! কত লোকেরই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তো আজ আমরা স্বাধীনতা ভোগ করছি! আমাদের পুরাণে নিজের সন্তানকে নিজে দাতাকর্ণ সংহার করেও অতিথির তৃপ্তিবিধান কোরেছেন—ভেবে দেখ একবার। স্বামীরা আমাদের দেশে তাঁদের স্ত্রী-সন্তানদেরও নিজেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো দেখেন, এদের আত্মত্যাগ নিজেদেরই আত্মত্যাগের মতো দেখেন এবং এতেই তাঁদের আত্ম-ত্যাগের সম্পূর্ণতা।

১৬। রাখো তোমার পুরাণ-প্রসঙ্গ; সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। দিক দেখি কেউ জীবন দিয়ে মৃত সন্তানের! ওসব অলৌকিক কথা এনো না, তার চেয়ে স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে কথা বলো এবং চলো।

১৭। অনেকেরই সংসার আর সমস্যার আলোচনা হোচ্ছে কিন্তু মূল যে প্রথম সমস্যাটীর অবতারণা করা হোয়েছিলো—তার কোন উপায় তো কেউ বোলছেন না।

১। হ্যাঁ, ওখানে কি উপায় বলা হোয়েছে সেটাই বলুন।

২। কেন, তার চেয়ে তুমি তোমার একটা নিজের মতামত দাও না।

১। তুমি নিজেই দিলে পারো তো!

২। দিতে আমি খুবই পারি, তবে তার ফল এসব নিয়ে আবার কিছু ফ্যাসাদে পড়বো না তো!

অ—কেন ফ্যাসাদে পড়বেন?

২। ঐ যে আপনারা লিখে লিখে নিচ্ছেন কি সব! আমরা কে কি বলছি তাই তো লিখছেন?

অ—ও তাই খনা—কী লিখছো একটু দেখাও না ওঁকে?

খ—এই যে দেখুন—আমরা বিবরণটী ঠিকই লিখছি বটে, কিন্তু কে বলছেন বা তার সম্বন্ধে বলছেন তা মোটেই লিখিনি। দেখুন কোথাও কোনও নামের উল্লেখই নেই। আপনারা যে কয়েকটী সংসারের নাম এনেছেন তা-ও আমি নাম না দিয়ে এমনও সংসার দেখেছি যেখানে··· এইভাবে লিখেছি। এতেও যদি আপনাদের কোন অসুবিধা লাগে তবে আপনারা যেমন লেখা ঠিক বলে মনে কোরবেন, তেমনই লেখা যায় কিনা আলোচনা করা যেতে পারে! লেখা কিন্তু দরকার, কারণ সংসারে যেসব সমস্যা ওঠে, সাংসারিক ব্যাপারেই ওঠে আর সেই সমস্যা সমাধানের উপায় ভাবতে গেলে সেই উপায় অবলম্বনের ফলে অন্য সমস্যা এসে সে সংসারের পুরোণ সমস্যাটীর জায়গা দখল করে—এ তো আমরা চাই না! তাই সব আলোচনাটীই বার বার পড়ে ভেবে চিন্তে আমাদের দেখতে হবে সময় মতো।

২। দেখুন, ঠিক বুঝতে পারছি না তো!

গায়ত্রী—আমি বলি কেমন খনা?

খনা—বলো।

গায়ত্রী—যখন যেন প্রথম মূল সমস্যাটীর সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আমি বল্লাম যে ঐ মায়ের যখন এ অবস্থা অসহ্য হোয়েছে তখন তিনি একাই অন্য কোন জায়গায় গিয়ে কিছুদিন থাকুন ছেলেমেয়েদের স্কুলের হোষ্টেলে রেখে দিয়ে। অথবা তাদের নিয়ে নিজের বাপ-মার কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকুন। এ দু'টী হোল দুরকমভাবে এ

সমস্যাটির সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আমার মতামত—অর্থাৎ একজনের মতামত। এরকম আপনারা প্রত্যেকেই নিজের মতামত প্রকাশ করলে বেশ ২৪।৩০ রকম সম্ভাবনার কথা বোঝা যায়—এবং তার মধ্যে যেটা এই পরিবারের পক্ষে নেওয়া সহজ সেটা তারা নিতেও পারে। এজন্য প্রত্যেকটি মতামত লিখে রাখা দরকার; কিন্তু কে কোন্ মতামতটা দিলো তার বিশেষ কিছুই দরকার নেই। বুঝতেই পারছেন যে যা মতামত প্রকাশ করবেন সেটা তো তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার ফলস্বরূপ হবে, সেটা আর একজনের গ্রহণযোগ্য হোতেও পারে, না হোতেও পারে। কাজেই এক্ষেত্রে মানুষটার চেয়ে তার মতামতটারই দাম বেশী, আর দায়িত্বও কিছু নেই—তাই তার নামটা লেখার কোন প্রয়োজন থাকছে না।

১। কি গো বুঝেছ? এবার নিশ্চিন্ত তো? তাহোলে বল দেখি উনি যে দু'টীকে উপায় বলেন—তার কোন্‌টা ঠিক মনে কর?

২। ১নং—হ্যাঁ গো বুঝেছি এবং নিশ্চিন্ত হোলাম। তবে ও দু'টীর কোনটাই আমি ঠিক বোলে মনে করি না। তাছাড়া অন্য সমস্যা এলে জায়গা বদল করার বিষয়ে আরও বিশদভাবে বোঝা দরকার।

খনা—আচ্ছা ও বিষয়ে পরে আরো আলোচনা হবে, কিন্তু এখন বলুন দেখি কেন ও দু'টীর একটীও আপনার ঠিক বলে মনে হয় না?

২। কারণ এতে সমস্যাটীকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হোল; পালিয়ে যাওয়া যাবে বলে। অবশ্য অন্য উপায় না থাকলে তাই করতে হতে পারে। তবে অন্য উপায় আর কিছু নেই এটা আমি ঠিক যেন বিশ্বাস কোরতে পারছি না।

গায়ত্রী—এড়িয়ে যাওয়া সাময়িক ভাবে শুধু। এতে হয়তো তার স্বামী নিজের আচরণের অসঙ্গতিটা বুঝতে পারবে—যখন দেখবে যে তার স্ত্রীর মাধ্যমে সে নিজের কতগুলি প্রয়োজন কত সুষ্ঠুভাবে মিটিয়েছে—এবং সে নিজে তার স্ত্রীর প্রয়োজন সম্বন্ধে কতটা অচেতন ছিলো। ছেলেমেয়েরাও যে তার কতটা প্রিয়—তা-ও বুঝতে পারা ও তাদের জন্য কিছু করতে আগ্রহ হবারও সম্ভাবনা থাকবে।

১২। হ্যাঁ, এরকম কতই তো হয়; স্বামী ক'দিন পরেই গিয়ে স্ত্রীকে বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে আসে।

২। হ্যাঁ, এবং কিছুদিন আবার মোটামুটি ভালোই চলে তারপরেই আবার আগের মতো অবস্থা অসহ্য হোয়ে দাঁড়ায়!

১২। তা, এই কোরে কোরে তো বহু সংসারই চলেছে এতোদিন! এটাই সংসারের রীতি!

২। মানে এই ধরণের সংসারের রীতি বলুন!

১৪। তবে এরকমও হোতে পারে যে স্বামী এটার শান্তিমূলক সমাধানের চেষ্টা না করে শান্তিমূলক সমাধানের কথা ভাববেন এবং স্ত্রীকে শাস্তি দেবার জন্য (বা অন্য কোন কারণেও) আর স্ত্রী বা সন্তানদের খোঁজও কর্বেন না! এও তো হয়!

গায়ত্রী—এইটি হওয়ার ব্যাপারেই বলা হোয়েছিলো যে অন্য অন্য একটী সমস্যা এসে পুরোণ সমস্যাটীর জায়গায় বসতে পারে।

২। ও, এবার বুঝেছি।

১২। এ রকমও হয় বটে—তবে খুবই কম হয়। আর হোলেও অনেক সময় আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা এসে স্বামীকে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে (বা অন্য-ভাবে চাপ দিয়ে) তাকে কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা (বা বাধ্য) করে থাকেন এবং সংসারচক্র আবার চল্‌তে থাকে।

ছবি—হ্যাঁ, তবে এটাও ঠিক যে আবার আগের অবস্থা ফিরে আসা সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রেও সমান সম্ভাবনা থাকে। কারণ বাইরের অনুরোধ বা চাপের ফল কিছুতেই স্থায়ী হোতে পারে না—বার বার ঐ অনুরোধ বা চাপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সত্যিকারের সমাধান স্থায়ী হোতে হোলে অন্তর দিয়ে দু'জনকেই জিনিষটী বুঝতে হয়। তখন একজন অপর জনকে তার কর্ত্তব্যপালনে সাহায্য করে যদি কর্ত্তব্যপালনের মধ্যে আনন্দের

অবস্থানটা আবিষ্কার কর্ত্তে পারে—তাহোলে আর বাইরে থেকে অনুরোধ বা চাপের প্রয়োজন হয় না।

গায়ত্রী (খনাকে)—তবে তুমিই একটা পথ বার কর না দেখি। এতোই যখন জানো তুমি।

খনা—আমি যদি জানতাম, বলতাম বই কি, আমি যতটুকু জানি ততটুকুই বললাম।

১। তাই তো আমি চাইছি যে ও বইতে যা বোলেছে, সেটাই কেন শোনা যাক্ না!

২। বইতে লেখা থাকলেই যে সেটা সবক্ষেত্রে চলবে তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে বলো?

১। যাই হোক সেটাও তো এক রকম উপায় হোতে পারে, শোনাই যাক্ না।

৩।৪। (সমস্বরে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই বলুন।

অ—বলছি। মনে হয় যে অশান্তির কারণটা হোচ্ছে এই যে আপনার স্বামী "পরিবার-নিয়ন্ত্রণে"র দায়িত্বটা সম্পূর্ণ আপনার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন এবং আপনারও সে দায়িত্বটা নেবার মোটেই ইচ্ছা নেই। এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে তিনি তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিতে ঠিক পারছেন না, আর এজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা কোরতেও নারাজ—কারণ প্রথম থেকেই যে হাল ছেড়ে বসে আছেন। এখন তিনি শুধু দায়িত্বটা ভুলে থাকার উপায়স্বরূপ অন্যভাবে নিজেকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা কোরছেন। প্রথমতঃ, আপনি আপনার কাছাকাছি "পরিবার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে" গিয়ে খবর নিন এবং যতদিন আপনাদের সুবিধা না হয় ততদিন সন্তান না হবার ব্যবস্থা করে আপনার নিজের মন শান্ত করুন। আপনার স্বামীকে বলুন যে আপনি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিচ্ছেন যাতে সন্তান না হয় এবং আপনি আপনার স্বামীর এ ব্যাপারে উদ্বেগ বুঝতে পারেন আর আপনার নিজেরও উদ্বেগ আছে এ সম্বন্ধে। তারপর চেষ্টা করুন যাতে দুজনই বিয়ের সময় যেমন দুজনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, তেমনই হোতে। মানে আপনি শুধু তাঁর স্ত্রী না হোয়ে তাঁর "বান্ধবী"ও হোন। সমস্যা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা কোরবেন না। এখনও আপনাদের সংসার সুখের হোতে পারে। অবশ্য খুবই চেষ্টা কোরতে হবে।

১ (২কে) কি গো—এ উপায়টা পছন্দ তো?

২ (১কে) হ্যাঁ, তবে ঐখানে লেখা আছে বলেই নয়। তাছাড়া আমি আরও ভেবে দেখতেও চাই।

১। তোমায় নিয়ে আর পারা যাবে না।

অ—আমি কিন্তু ওঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমরা সবাই ভালো করে ভেবে দেখবো। এবং পরে যখন দেখা হবে আলোচনা করব। কেমন?

৩। পরে কেন—এখন তা হোলে কি করা হবে?

অ—এখন যে তাই সময় হোয়ে গেলো! আরও একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা ছিলো; ভাবছি সেটা যদি আজ বোলে রাখি তবে পরের বার যখন আসবো তখন সকলেই ভালো ভালো মতামত দিতে পারবো—কারণ ভেবে দেখার সময় পাওয়া যাবে। আপনাদের কি মত?

১৪, ১৫ ও ১৬—হ্যাঁ, বেশতো, তাই করুন।

অ—এই পত্রিকাটীতেই দ্বিতীয় সমস্যাটির কথাও লিখেছে—'এর নাম বিক্ষুব্ধ ভাবাবেগ' (Desparate Mood):—"একটুতেই আমি কেন মনে এতো আঘাত পাই? কীভাবে নিজেকে আমি অন্যরকম কোরতে পারি? আমার প্রথম বিবাহ অত্যন্ত ঝঞ্ঝাসঙ্কুল হোয়েছিলো। আমার স্বামী প্রায় প্রথম থেকেই অন্য মেয়েদের প্রতি আসক্ত ছিলেন। আমি সে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে অন্য একজনকে বিবাহ কোরেছি। ইনি আমার অতি প্রিয়, সহৃদয় এবং এঁকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। কিন্তু তবু আমি সামান্য কারণে এত দুঃখ বোধ করি এবং তারপর আর কথা বলতেই পারি না। যেন নিজের মধ্যেই গুটিয়ে যাই। এর ফলে মনোমালিন্য হয় এবং আমার নিজেরই উপর আমার বিতৃষ্ণা আসে। এক এক সময় আমার ভয় হয়, আমার কি মানসিক কোন রোগ হোল? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার যেন কেউ নেই—আমায় যেন কেউ-ই চায় না। এমন কি কোন বই আছে যা পড়ে আমি আমার এই 'ভাবাবেগে'র কারণ সম্বন্ধে বুঝতে পারি?"

১৬।—এ সম্বন্ধে আমরা আর কি বলতে পারবো?

অ—প্রথমতঃ আপনারা যাদের জানেন (নাম দরকার নেই) তাদের মধ্যে কারো না কারো এমন হয়, যেমন কি? তারা সেজন্য কি কোরে থাকে? এবং তাতে কি রকম ফল হয়? এ রকম হবার কারণ সম্বন্ধেই বা তারা কি মনে করে? আপনারাই বা কি মনে করেন? এই সব কত কিছুই তো ভেবে দেখবার আছে।

৩। সত্যি, যদিও এসব আমাদের অনেকেরই জীবনযাত্রার মধ্যে বা কাছাকাছি লোকেদের মধ্যে দেখা যায়, আমরা যেন ধরেই বসে থাকি যে এই রকমই হবার কথা—তাই হোয়েছে; কিছুই যেন আমাদের এ সম্বন্ধে করবার বা করবার নেই। আশ্চর্য্য, কিন্তু সত্যি। তাই নয়?

অ—খুব সত্যি—এখন এক কাপ চা পেলে বেশ হোত। এই যে এসেই গেছে—(সাবিত্রী চা এক কাপ এগিয়ে দিলো অপরাজিতাকে—খনার হাতে ট্রে এনে দিয়েছে কল্পনা।—বাচ্চারা ছুটে গিয়ে 'মা'দের কোলে উঠ্‌ছে.....) ক্রমশঃ

সাময়িকী

ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ: এক-দলীয় শাসন, না বহু-দলীয় শাসন—গত কয়েক মাস ধরিয়া ভারতে যেরূপ রাজনৈতিক ঝড় বহিয়া চলিয়াছে এবং তাহার ফলে যে ভাঙা গড়া চলিতেছে তাহাতে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু ভারতবর্ষেরই নয় বিশ্বের চিন্তাবিৎ ব্যক্তিগণের ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। সকলেরই মনের মধ্যে একটি মাত্র প্রশ্ন, ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক রূপ কি আকার পরিগ্রহ করিবে?

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ তাঁহার সম্পাদনায় উজ্জয়ন্তভারত মাসিক পত্রে ১৩৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) "আমাদের কথা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ আজ সর্ব্ব ক্ষেত্রে শেষ প্রশ্নের সম্মুখীন। তাহার প্রশ্ন আজ আর বিশেষ কোনও ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া নয়। তাহার প্রশ্ন সর্ব্বতোমুখী। জটিল এই প্রশ্নসমূহের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ জীবন্ত স্বষ্টির যাত্রা পথে অচলায়তন ভারতের মূলতঃ স্থিতি-প্রধান কৃষ্টির পিছটান তাহার গতিরোধ করিবেই"। তিনি ঐ প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছিলেন, "আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা দ্বিশতাব্দীর অবস্থান করিতেছি। ইহলোক-পরলোক, নর-নারী, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ধনিক-শ্রমিক ও হিন্দু-মুসলমানের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে সনাতন ভারতের স্বাস্থ চিন্তাধারা এতদিন মিলাইয়া রাখিয়াছে, তাহারই সুযোগ লইয়া ইংরেজ এ দেশকে পরশ্বলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল"। ইংরেজ আজ ২২ বৎসর হইল এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল সমস্যার কি বিন্দুমাত্র সমাধান হইয়াছে? বরং ঐ সকল সমস্যা আরও তীব্র রূপ ধারণ করিয়াছে।

স্থিতিধর্ম্মী চিন্তাধারায় পুষ্ট ভারত হাজার হাজার বছর ধরিয়া কৈবল্যের সাধনায়, একান্ত আত্মমুক্তির সাধনায়, পরলোকের সাধনায় ব্রতী ছিল। জৈব প্রয়োজনের দিক ছিল অবহেলিত অপাংক্তেয়। তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বহিরাগত প্রাণধর্ম্ম, গতিধর্ম্ম তাহাকে আজ সর্ব্বস্তরে আক্রমণ করিয়াছে। সে কি আজ

প্রাধান্যের উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, না আত্মরক্ষার তাগিদে সে পুনরায় অতীতকেই সবেগে আঁকড়াইয়া ধরিবে? অতীতকে ত্যাগ করিলে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ থাকে না, আবার বর্তমানকে অস্বীকার করিলে তার যাত্রা-পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই দোটানায় পড়িয়া ভারতবর্ষের আজ ত্রিশঙ্কু অবস্থা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সে না পারিতেছে একতা আনিতে, না পারিতেছে বহুত্বকে হজম করিতে। অথচ ভারতবর্ষের মাত্রেরই মুখেই Unity in Diversity-র কথা। গত ২০ বছর ভারতবর্ষে একদলীয় শাসন ছিল। ২০ বছর পরে একে একে বহু প্রদেশে একদলীয় শাসনের স্থান দখল করিল বহুদলীয় শাসন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইতেছে। এমন কি যে সকল দল মার্কসবাদ লেনিনবাদকে ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে, যাহাদের আদর্শের মধ্যে আছে দুনিয়ার শ্রমিকের একত্বের কথা, তাহাদের নিজেদের মধ্যেই আজ একত্ব নাই। মার্কসবাদ লেনিনবাদে বিশ্বাসী দলগুলির মধ্যে তফাৎ যে কোথায় তাহা রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষেও ধরা কঠকর। একই কমিউনিষ্ট পার্টি, যাহার সাংগঠনিক কাঠামো অত্যন্ত সুদৃঢ় বলিয়া আমরা এতকাল জানিতাম, সেই দলটিও গত ৭ বছরের মধ্যে ভাঙিয়া তিন টুকরা হইল। শুধু তিন টুকরা হইয়াই তাহার শেষ নয়, পরস্পর তাহারা সংঘর্ষে লিপ্ত। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলি যেখানে যেখানে যুক্তফ্রন্ট গঠন করিয়া একদলীয় কংগ্রেসী শাসনের স্থান দখল করিয়াছিল, সেখানেও একে একে আসনের পালা সুরু হইয়াছে। আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদগ্র কামনায় "ন অন্যৎ অস্তি ইতি"-বাদী দলগুলি কেহ কাহাকেও সহ্য করিতে পারিতেছে না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবিরত ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচারে মত্ত। আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যতটুকু দেশের দশের কল্যাণের কথা বলা প্রয়োজন ততটুকুই শুধু বলা হইতেছে। কিন্তু, কথায় চিঁড়া ভিজে না—৩২ দফা কার্যসূচি হিমঘরে স্থান পাইয়াছে। দেশের কল্যাণ করিতে, দেশকে গঠন করিতে যে অবস্থার প্রয়োজন, সেই পরিবেশ-সৃষ্টির প্রয়াস কোথায়? গোটা জাতিকেই যেন আজ একটা অন্ধকার অনিশ্চয়তায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। পারস্পরিক বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, অসহ্য অসংযম, সংনমনীলতার অভাব আজ গোটা জাতিকেই কুঁড়িয়া কুঁড়িয়া খাইতেছে যে সকল মানবীয় গুণ—যাহার দ্বারা সমাজ বিধৃত সুস্থ ও সচল থাকে—সেই তিতিক্ষা সংযম, বিদ্যা বিনয় শ্রদ্ধা সহনশীলতা সমদর্শিতা, যাহা যে কোন তন্ত্র বা সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে অবশ্য-প্রয়োজন সেগুলি বুঝি আজ সব তিরোহিত। সকল রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর পরস্পরের নিন্দায় মুখর ও বিবদমান। প্রয়োজন-মূল্যকে একান্ত করিয়া অতি মাত্রায় বাড়াইয়া তুলিলে প্রাকৃতিক বিধানেই এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। অতীত ভারত ব্রহ্মকে, আত্মাকে, অজড়কে একান্তভাবে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম ঈশ্বর সমাজ নরনারীর সম্বন্ধকে শোষণ করিয়াছে, আর তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঐ শোষণের জ্বালা হইতে মুক্ত হইবার জন্য জড়কেন্দ্রিক কমিউনিজম্-প্রদর্শিত প্রয়োজন-মূল্যকে একান্তভাবে গ্রহণ করিলে আরও গভীর শোষণের মধ্যে পড়িতেই হইবে এবং হইতেছে। প্রাকৃতিক বিধানেই ইহা ছাড়া অন্যথা হইবার উপায় নাই। স্থান কাল পাত্র ভেদে যেখানে প্রয়োজনও ভিন্ন ভিন্ন, প্রয়োজনকে একান্ত করিলে, অতিমূল্য দান করিলে সেখানে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি বিপরীত, প্রয়োজনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কি করিয়া সম্ভব? ইহা যে সম্ভব নয় রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পর বিবাদের মধ্যেই ইহা সুপ্রমাণিত। এই দোটানায় পড়িয়া ভারতবর্ষ আজ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। জড়ের দাবী ও অজড়ের দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিলে, খণ্ড দলগুলির মধ্যে অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাহার জীবন্ত সৃষ্টি আর সম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক চেহারা যাহা ধারণ করিয়াছে তাহাতে একদলীয় শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও যে বিলুপ্ত হইতে যাইতেছে তাহা অনুমান করা আর কঠিন নয়। কি কেন্দ্রে কি অন্যান্য প্রদেশে যেখানে এখনও কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে

শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে সে সব প্রদেশেও, কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার ফলে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে আগামী নির্বাচনে পুনরায় জয়ী হইতে পারিবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদিও ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের (জনগণ-সমর্থিত ও গান্ধিজী, জওহরলালের ও আরও বহু মহাত্মনদের ভাবধারায় পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত ঐতিহ্যবাহী বলিয়া) ভাবমূর্তি কিছু উজ্জ্বল হইয়াছে, তথাপি ইহার আর পূর্বের সামর্থ্য ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, কেন না ইহার বিরুদ্ধ শক্তিগুলিও গত ২০ বৎসরে প্রভূত বলশালী হইয়াছে। সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থায় বহুদলীয় শাসন ক্রমশঃ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে। অথচ এই সকল খণ্ডদলগুলি কি করিয়া নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও অখণ্ড মনে গড়িয়া উঠিয়া দৃঢ়বদ্ধভাবে দেশের দশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সে বিজ্ঞান ও দর্শন আপাততঃ ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে অনুপস্থিত। একান্ত দলীয় বুদ্ধি সীমাবদ্ধ বলিয়া সমগ্র দেশের সকল দাবী পূরণ করা এই সকল একান্ত দলীয় বুদ্ধিসম্পন্ন দলগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীনিতাগোপাল বলিয়াছেন, "আমি দল গড়িতে আসি নাই। দল জন্মায় গেড়ে ডোবায়, স্রোতস্বিনীতে কখনও দল জন্মায় না:—সকল দল লইয়া আমার এক অখণ্ড দল। আমি সকল দলের ভিখারী।"

বহুত্বের ক্ষেত্র হইতে প্রাণ-ধর্মের যে challenge আজ ভারতবর্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহার মোকাবিলা সে করিবে আজ কোন্ কৌশলে? একান্ত বিরুদ্ধতার দ্বারা আপাইয়া যাওয়া যায় না। বিরুদ্ধ শক্তিকে পরিপাক করিয়া ও তাহার অতীত হইয়াই অগ্রগতি, প্রগতি, প্রকৃষ্ট গতি লাভ করিতে হয়। ইহাই প্রকৃতির বিধান। দ্বন্দ্ব অর্থ বিরুদ্ধতা, দ্বন্দ্ব অর্থ মৈথুন; দ্বন্দ্বের এই দুই রূপের কোন একটিকে বাদ দিয়া চলার উপায় নাই। যাঁহারা দ্বন্দ্বের শুধু বিরুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার interpenetrated দিককে অস্বীকার করেন, তাঁহারাই দ্বন্দ্বপাশবিদ্ধ হইয়া জীবন্ত পাখীর ব্যর্থতা প্রাপ্ত হন। বিশ্ব-জগতের এই দ্বন্দ্ব লইয়া মানুষ আজ বিপন্ন। অজড়বাদী আত্মবাদী ভারত জড়ের দাবীকে, দৈব প্রয়োজনের দাবীকে, দেহের দাবীকে অস্বীকার করিতে যাইয়া আজ জড়ের দাবীর কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত হইতেছে, তেমনি অজড়ের দাবী, আত্মার দাবী, ব্যক্তির দাবীকে অস্বীকার করিয়া জড়বাদীগণও বিপন্ন হইতেছে। কমিউনিজমকে অবলম্বন করিয়া যে সকল রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা গত পঞ্চাশ বৎসরে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের দিকে তাকাইলে ইহা আজ আর বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। চীন, সোভিয়েট রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আজ যে-স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, জড়বাদী দর্শনের ভাবধারাসহায়ে ব্যক্তির মূল্য, নিজ-মূল্য, আত্ম-মূল্য, জাতীয়তার মূল্য অস্বীকার করিয়া একান্ত সমষ্টির মূল্য, আন্তর্জাতিকতার মূল্য প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে উহাদ্বারা বিশ্বসঙ্ঘ রচনা, একবিশ্ব রচনার স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। দ্বন্দ্বের ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে যে অর্থ অর্থাৎ 'উভয় পরার্থ প্রধান দ্বন্দ্ব', দ্বন্দ্বের দুই বিপরীত ও অবিপরীত সত্তাকেই প্রথমিকা হওয়ার, প্রধান হওয়ার মর্যাদা দান করার মধ্যেই সমতা আসিতে পারে। ছোট যে একান্ত ছোটই নয় এবং বৃহৎও যে একান্ত বৃহৎ নয়, ছোট ছোট থাকিয়াও যে বৃহৎ হইতে পারে, আপবিক যুগে বিজ্ঞান প্রকৃতির অন্তরের এ-রহস্য আজ উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে। মানুষের কাছে এখন একমাত্র সমস্যাই হইতেছে প্রকৃতির এই সামঞ্জস্য, সাম্য, সৃষ্টি-রহস্য, তার গতির এই দ্বন্দ্বকে সমাজের সকল স্তরে—রাজনৈতিক স্তরে, অর্থনৈতিক স্তরে, ব্যক্তিতে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, নর-নারীর সম্পর্কে, ধর্মের ক্ষেত্রে, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতায়, স্বার্থে পরার্থে সকল ক্ষেত্রে—প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সমন্বয়কে কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠা দান করা যায়, অসাম্য দূর করিয়া কেমন করিয়া জগতে সাম্য তথা শান্তি আনয়ন করা যায়।

আমরা বিশ্বাস করি, এই আকাঙ্ক্ষিত সাম্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা এই ভারতবর্ষেই সম্ভব। বহু হাজার বৎসর ধরিয়া একান্ত অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন

ভারত-ভূমিতে প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক গতিতেই কম্যুনিজম্ আজ আসিয়া পড়িয়াছে। কম্যুনিষ্ট কম্যুনিষ্ট বলিয়া গালি দিলেই সে আজ দূর হইবার নয়। কম্যুনিজ্‌ম্ আজ তার কোন্ যোগ্যতায় ভারতের মাটিতে শিকড় সঞ্চার করিতে পারিল, তাহার সেই মূল সত্যকে অন্বেষণ ও নিজ জীবনে অঙ্গীকার না করিয়া তাহাকে আজ আর কিছুতেই হটাইয়া দেওয়া যাইবে না। যে কম্যুনিজ্‌মের প্রথম আভাস রাশিয়াতে, তাহারই সংস্কৃত ও পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিবে এই ভারতেই। কেননা ভারতবর্ষের ধর্ম ও ভাবধারার মধ্যে নমনধর্মশীলতা আছে যে যোগ্যতায় সে অপরকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া নিজেকে সকলের মধ্যে বিস্তার করিয়া দিয়াছে। যে সময়ে ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা করার জন্য নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া সঙ্কোচনের পথ ধরিয়াছিল, বিশেষভাবে মুসলমান সাম্রাজ্যের আমলে, সেই সময় হইতে তাহার অধঃপতন ও পরাধীনতার যুগ সুরু হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বহু সমাজ সংস্কারক মহাপুরুষের আবির্ভাবে আবার ভারত তাহার পূর্ব ঐতিহ্য ও প্রগতিশীলতা ফিরিয়া পাইতেছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি ভারতের মাটিতেই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নবরূপ দেখিতে পাইব। পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক দেশেই একদলীয় শাসন বিদ্যমান—ভারতবর্ষে হইবে উহার ব্যতিক্রম। এখানে বহু খণ্ড দল মিলিয়া হইবে একটি অখণ্ড দল যাহারা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া দেশ গঠনের কাজে ব্রতী হইবে। কমিউনিজমও নবরূপ ধারণ করিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। ভারতবর্ষে কোনরূপ গোঁড়ামিই আর চলিবে না। অধ্যাত্মবাদীদের গোঁড়ামিও নয়, কম্যুনিষ্টদের গোঁড়ামিও নয়। ভারতবর্ষই প্রমাণ করিবে কেমন করিয়া অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদ মিলিয়া মিশিয়া সমগ্র জীবনের সেবায় বাস্তবরূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে।

বর্তমানে আমাদের সামনে বড় প্রয়োজনই হইল সেই নতুন ধারাকে বরণ করিয়া লইবার মত মানসিক প্রস্তুতির সাধনা গ্রহণ করা। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থাও তাহাকে সেই দিকেই ঠেলিয়া দিতেছে। সকলকে লইয়া সকল দলকে লইয়া একটি অখণ্ড দল তথা যুক্তফ্রন্টের ভাবধারা গ্রহণ ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর নাই। বর্তমানের যুক্তফ্রন্ট কোন যুক্তফ্রন্ট নয়—ভবিষ্যতের যুক্তফ্রন্ট তাহাকে গঠন করিতেই হইবে, নতুবা সমূহ বিনষ্টির হাত হইতে সে রক্ষা পাইবে না। তাহাকে আসক্তি বিদ্বেষ মুক্ত হইয়া ধৈর্য সংযম পরমতসহিষ্ণুতা শ্রদ্ধা বিনয় সহায়ে আগাইয়া যাইতে হইবে। আইডিয়ালজিকে আইডিয়ালজির দ্বারাই আয়ত্তে আনিতে হয়। সুতরাং এই নতুনকে বরণ করিবার মত এমন একটি সমন্বয়মূলক দর্শনের প্রয়োজন যাহা ভারতবর্ষের diveristy-র ক্ষেত্রে diversity-র যথার্থ স্থান ও মান রক্ষা করিয়াই, তাহার বিলোপ-সাধন করিয়া নয়, unity আনিতে পারে। সকল ধর্মের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থের ক্ষেত্রে, দেশের ক্ষেত্রে, বিশ্বের ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সকল বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া একত্ববিধান করিতে পারে—তবেই সার্থকভাবে কমিউনিজমের প্রতিস্পর্দ্ধিতা প্রমাণিত হইবে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার "আমাদের কথা" প্রবন্ধে এই দিকেরই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সারা জীবনের সাধনার ফল "বিপরীতধর্মী বস্তুর সমন্বয়ের" অর্থাৎ শ্রীনিতাগোপালের সর্ব-সমন্বয়ের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া একটি জীবন-দর্শনের বার্তা গীতা, উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির ব্যাখ্যার মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন যাহা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে ও শ্রীকৃষ্ণ-সৃষ্টির মধ্যে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে পরিস্ফুট হইয়াছিল। কমিউনিজম্ এদেশে আজ নূতন হইলেও ইহার পরিপূর্ণ জীবন্ত আদর্শই শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। কমিউনিজমের অভাব হিসাবে এদেশের গীতা উপনিষদের অকাঙ্ক্ষসমন্বিত ব্যাখ্যার রাজনৈতিক রূপের প্রচার এখন প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা না করিয়া শুধু এখানে সেখানে পুলটিস লাগাইয়া কোন প্রতিকার হইবে না। পুরুষোত্তমানন্দ দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ এই যুগের সমাধান-সূত্র রাখিয়া গিয়াছেন। জয় শ্রীনিতাগোপাল, জয় শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ। ভারত আবার উজ্জ্বল ভারতরূপে গড়িয়া উঠুক।

শ্রীপার্থসারথি বিশ্বাস

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জন্মোৎসব : বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ ২৬শে নভেম্বর ১৩৬৯ শনিবার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৭-তম জন্মতিথি অনাড়ম্বরভাবে পালিত হয়। পরদিন রবিবার ঐ উপলক্ষে সাড়ম্বরে উৎসব পালিত হয়। সকাল ৮টায় নরনারায়ণ আশ্রমের দাদশ-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা উত্তোলিত হয়। পরে আশ্রম-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের পূজা ও অঞ্জলি অন্তে ভোগ হয়। আশ্রমস্থ ইস্কুলের শিশুগণসহ প্রায় দুইশত ছেলেমেয়ে এবং অপরেরা সহ আরও প্রায় আড়াইশত লোক প্রসাদ পাইয়াছিলেন। বিকাল চারিটায় সভায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের সর্বসময়য়ের জীবন-দর্শন যাহা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই আলোচিত হয়। সভার উদ্বোধন সঙ্গীত করেন শ্রীবিজন মহলানবীশ ও শ্রীমতী গোপা বসু। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কয়েকজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তি শ্রীমৎ স্বামিজীর জীবন-দর্শন আলোচনা করেন। কয়েকটী প্রবন্ধ এই সংখ্যায় ছাপা হইল। সভার মাঝখানে শ্রীযুক্তা সুনীতি চক্রবর্তী, শ্রীমতী শুভ্রা গিরি ও শ্রীব্রত সান্যাল গান করেন। পরে সন্ধ্যা-রতি হয়, এবং তাহার পরে শ্রীসুধীনসুধার বসু, শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীজ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণ দে, শ্রীনিখিল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিজন মহলানবীশ রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

খেলারী (পালামৌ)

১০ই অগ্রহায়ণ শনিবার (ইং ২৬শে নভেম্বর ১৩৬৯) শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৭তম জন্মতিথি খেলারী, পালামৌ-প্রবাসী শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার মহাশয়ের ভাব আশ্রমে : কবিতা-নিলয় : বাসভবনে বহু জন সমাগমের পরিপূর্ণতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামীজীর জীবন-দর্শন আলোচিত হয় এবং তাঁর পূজো হয়। দরিদ্র নর-নারায়ণগণকে প্রসাদ ও পঞ্চাশখানি ধুস-কম্বল (Cotton-Blanket) বিতরিত হয়। উপস্থিত জনগণের মধ্যে শিশুদের দুধ এবং চকলেট আর বয়স্কদের মধ্যে গরম দুধ বিতরণ করা হয়।

দ্বিপ্রহরে শ্রীনবীনচন্দ্র ঝাঁ মহাশয় শ্রীশ্রীমদ্ভগবৎ গীতা পাঠ ও অবধূত মহারাজের ব্যাখ্যা উপস্থিত নর-নারী-গণকে শোনান।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে স্বামীজীর জীবন-দর্শন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে শোনান শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার। তাঁরই হিন্দী অনুবাদ করে শোনালেন শ্রীনওলকিশোর সিংহ।

তারপর গান বাজনার অন্তে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় জয় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজীকি জয় ধ্বনিতে !

। জয় পুরুষোত্তমানন্দ

"গীতার প্রয়োজন ধরার ধূলিতে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকর্ম-লোক, পুরুষোত্তম-লোক প্রতিষ্ঠা। কর্মক্ষেত্র এই মাটির বুকেই হইবে জড়-অজড় দ্বন্দ্বের চরম অবসান। কর্মের বুকে নৈষ্কর্ম্যের আস্বাদনই গীতার কর্মযোগ।"—

গীতা, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

উজ্জ্বলভারত, দ্বাবিংশ বর্ষ ১৩৭৫-৭৬, ১৯৬৯
বর্ষসূচী

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

অঙ্কুর (কবিতা)
শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী

অথ অন্ধ-খঞ্জ সংবাদ (কবিতা)
শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

অবধূত পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

অক্ষেদানন্দ অনুধ্যান
শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

অমৃতের কবি রবীন্দ্রনাথ
ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

আজকের প্রার্থনা (কবিতা)
বেলা নিল

আঠারো বৎসর আগে
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

আমাদের কথা
সম্পাদকীয়

আমাদের সংস্কৃতি ১৩৯
শ্রীভারতী

আমার বাড়ী
শ্রীভারতী

আমি বিশ্বনাগরিক ১৫৪
শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

আলোকের দেশ (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ

একখানি পত্র ৪৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

একটি খবর
শ্রীকুমারনাথ মৈত্র

একটি পাখীর দুইটী গ্রীবা (কবিতা)
শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

কবি গালিব
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

কালী সঙ্গীত
শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

জন্মাষ্টমী (কবিতা)
শ্রীহরপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ

জীবনের সামগ্রিকতায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীধেনু মিত্র

দুই আমি (কবিতা)
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায়

দুইটী সেবাশ্রমের কথা
প্রত্যক্ষ দর্শী

দেশনায়ক গোবিন্দবল্লভ পন্থ
৺সুশীলকুমার ঘোষ

ধ্বংসেতে কৃতিত্ব কোথায় (কবিতা) ৬৬
শ্রীশান্তশীল দাশ

পরিণাম (কবিতা)
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

পাকাপী (কবিতা)
শ্রীহরপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ

পারিবারিক জীবন-আলোচনা
ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুষোত্তমানন্দ-দর্শন
শ্রীহৃষীকেশ দে

প্রবাসীর মন ১৯৬
শ্রীবিভা সরকার
প্রার্থনাকালীন ভাষণ
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
প্রাণের প্রণতি (কবিতা) ২১৮
শ্রীহরিপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ
বাংলা কথা-সাহিত্যে সামগ্রিকতা
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
বেদান্ত শক্তিদর্শন সমন্বয়
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
বেদোক্ত বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদের কথা ১৫৮
শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার
মহাত্মাজীর পুনরাবির্ভাব
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
মুক্তি-স্নান ১৬৯, ২০৮
অনামী
যে স্মৃতি আজও তুলিনি
শ্রীকহিরাল সাহা
লাঞ্ছনালাঞ্ছিত নৈরিশ্ব পতাকা ৩
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শিক্ষা দেবে কে
শ্রীকপিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীদুর্গা (কবিতা) ১৩০
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী ২১, ৫৫, ৮১, ১২০
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের
৮৭তম জন্মদিনে (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ
শ্রীরাধা
শ্রীরেণু মিত্র
শ্রীশ্রীদুর্গা (কবিতা)
শ্রীহরিপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ৩৩
শ্রীরেণু মিত্র
সাময়িকী
সাম্যবাদের মঙ্গলঘট (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ
সিদ্ধান্ত দর্শন
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ-স্মরণে
শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী
স্মৃতি-মহুয়া
শ্রীমান

দাম ১৩.৯৫–১৭.৯৫

দাম ১৩.৯৫–১৭.৯৫

লুপ্তপ্রায় পায়ে হাঁটা অভ্যাসের পুনরুদ্ধারকল্পে

বাটার জুতো পায়ে দিয়ে প্রথমেই যে অনুভূতি সেটি হচ্ছে সুখের। লঘুভারে চলার যে সুখ, তার সঙ্গে মিশে আছে সুঠাম পদক্ষেপের নির্ভরতা। এ সুখ, সম্ভব বাটা এনজিনিয়ারিংএর কল্যাণে। প্রত্যেকটি অনুভূতি পরিপূর্ণ মনের। তৃপ্তি পায়ে দিয়ে সেই জুতো, যার নকশা হয়েছিল সাজপোশাকের সহচর। সজীব, ছিমছাম নকশা, মনের উপকরণের গুণে অপূর্ব আরাম। আর, এ কথা তো সকলেরই জানা : বাটার জুতো সাবলের হাটার চলাই তৈরি। মাইলের পর মাইল, দিনের পর দিন।

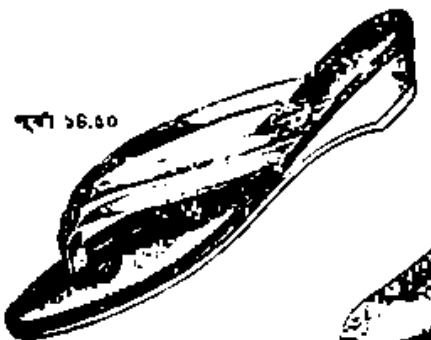

দাম ১৬.৫০

দাম ১৩.৯৫

Bata

দাম ৪৭.৯৫

দাম ১৩.৯৫

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি, নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে' সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি-সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন করার মুক্তিতে ধনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পঙ্ক ও গন্ধবাহুল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্গের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণধর্ম্মক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

কর্মক্ষেত্রে ভূমির মূল্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন কৃষাণ উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। যে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অখণ্ড ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
স্বরাজের পূর্ণরূপ
গীতাতত্ত্বজ্ঞী
উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
পুরুষোত্তম-দৃষ্টভঙ্গিতে আলোচনা
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২·০০

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীপ্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির রূপরেখা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিত্যগোপাল
ও শিক্ষা সুধার কথা ·৩১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়ঋষি শ্রীনিত্যগোপাল
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
৩। ঈশ্বরচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন
৪। ঘরোয়া-হৃদয়
৫। প্রাথমিক শিক্ষা

20 JAN 1970

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পো: অশ্বিনীনগর, পো ভায়া—দেশবন্ধুনগর) ২৪ পরগণা